আমার লেখা গল্পের এই সংগ্রহ তাঁদেরই কাছে আমার কৃতজ্ঞতার উৎসর্গ হয়ে রইল, যাঁদের শুভেচ্ছা আমার লেখকতার জীবনে সবচেয়ে বড় সহায় ও সম্বল হয়েছে।

—সুবোধ ঘোষ

তিন অধ্যায়

অহিভূষণ হঠাৎ এসে বললো 'ভাই ভবানী, একটা কনফিডেন্সিয়াল টক ছিল তোর সঙ্গে।'

আড্ডার মাঝখানে বসেছিলাম। বারীন তখন বলছিল—'কি আশ্চর্য, মেয়েটাকে মুহূর্তের জন্যও হাসতে দেখলাম না। লোকের দিকে একটু চোখ তুলে তাকাবার সাহস পর্যন্ত নেই। এই ধরনের মেয়েদের মতিগতি যদি একটু অ্যানালিসিস করে দেখ, তাহলে বুঝতে পারবে যে, তারা শুধু চায়

পুলিন বাঁড়ুয্যের মেয়ে বন্দনার কথা বলছিল বারীন। এইরকম একটা অপ্রাসঙ্গিক অবস্থায় এসে অহিভূষণ বাধা দিল। আরও বেশী অপ্রসন্ন হয়ে উঠলাম, অহিভূষণ যখন বললো—'এখানে বলতে পারবোনা ভাই, একটু ডিসট্যান্সে যেতে হবে।'

এইরকম বিশ্রীভাবে অযথা ইংরেজী বলে অহিভূষণ। ইদানীং আরও বেশী করে বলে। অবশ্য আমরা জানি, অহিভূষণের লেখাপড়া ফোর্থ ক্লাসের চৌকাঠ পার হয়নি। সেই যে আট বছর আগে আমরা অকৃতী অহিকে একা ফোর্থ ক্লাসে রেখে সদলে থার্ডে চলে গেলাম, তারপর থেকে জীবনে সত্যিই ক্লাস হিসেবে ওর সঙ্গে আর এক হতে পারলাম না। অহি আজও যে আমাদের ক্লাবে ও আড্ডায় আসে সেটা তার নিজেরই আগ্রহ। আমরা ওকে কখনো চাইনি। চলে যেতেও অবশ্য স্পষ্ট করে কখনো বলি না। কিন্তু আমাদের আচরণে সেটা ওর বোঝা উচিত ছিল। অহি যেন আমাদের তাচ্ছিল্যগুলিকে একেবারেই গায়ে মাখে না। সব জেনেশুনেই সে আমাদের সঙ্গে মেশে। তার প্রতি আমাদের একটা নির্বিকার ঔদাসীন্য অনাগ্রহ ও করুণাকে সে মাথা পেতে মেনে নিয়েছে। অহি যেন আজও আমাদের ক্লাসটা ছাড়তে চায় না। শেষ বেঞ্চের এক কোণে, একটু পৃথক হয়ে, সবার পেছনে বসে থাকবে, তবু আমাদেরই সঙ্গে।

বলতে ভুলে গেছি, বারীনও সেই ফোর্থ ক্লাসে ফেল করেছিল। আর পড়াশুনা না করে স্কুল ছেড়ে দিল। কিন্তু আজ আট বছর পরেও বারীন আর আমরা যেন এক ক্লাসেই আছি। বারীন কনট্রাকটারী করে, এরই মধ্যে বেশ কিছু, যাকে বলে, বেশ সম্পন্ন হয়ে উঠেছে বারীন। কিন্তু অহি? অহি ঠিক তার উল্টো। অহির কথা একেবারে স্বতন্ত্র। বড় সাংঘাতিকভাবে ফেল করেছে অহি। বাইশ টাকা মাইনের একটি চাকরী করে। দুঃখটা আসলে ঐ বাইশ টাকায় বাঁধা দীনতার জন্য নয়। আসল কথা হলো চাকরীটাই। বড় নীচ নোংরা নগণ্য চাকরী। কখনো কোনো ভদ্রলোকের ছেলেকে এরকম চাকরী করতে আমরা দেখিনি, শুনিনি।

খুব ভোরে ঘুম ছেড়ে বাইরে বেড়ানো যাদের অভ্যাস, তারাই শুধু অহিভূষণের চাকরীর স্বরূপটা জানে, কারণ তারাই ব্যাপারটা স্বচক্ষে দেখতে পায়। এক হাতে

প্রকাণ্ড একটা খাতা, আর-এক হাতে একটা লক্কড় সাইকেলের হ্যাণ্ডেল ধরে সহরের যত লেন আর বাই-লেনের মোড়ে মোড়ে কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়িয়ে থাকে অহিভূষণ। ভোরের আবছা অন্ধকারের মধ্যে সরু গলির মুখ থেকে এক-এক করে চার-পাঁচটি অদ্ভুত ধরনের মূর্তি এসে অহির কাছে দাঁড়ায়। খাতাটা খুলে অহি তাদের হাজিরা লেখে। নীচুস্বরে কয়েকটা কথা বলে অহি, কখনো বা বিরক্ত হয়ে ধমক দেয়। তারপরেই অহিভূষণের লক্কড় সাইকেল আবার আর্তনাদ করে ওঠে। আর একটা গলির মোড়ে গিয়ে দাঁড়ায় অহিভূষণ চাটুয্যে।

আমাদের এই ছোট সহরের ছোট মিউনিসিপ্যালিটির একজন কর্মচারী হলো আমাদের পরিচিত ও প্রাক্তন সহপাঠী অহিভূষণ। রাত্রি ভোর হতে না হতে, পাখির ঘুম ভাঙ্গার আগেই মেথরেরা সহরের ময়লা পরিষ্কার করে। এক একটা দল বের হয় ঝাড়ু হাতে রাস্তা ঝাঁট দিতে। কয়েকটা দল বের হয় মাথায় ওপর পুরীষবাহী বড় বড় টিনের টব নিয়ে। দু'চাকার ওপর পিপে বসানো একটা অদ্ভুত ধরনের গাড়ী আছে মিউনিসিপ্যালিটির। একটা বুড়ো বলদ খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে গাড়ীটাকে রাস্তা দিয়ে টেনে নিয়ে যায়। পিপের গায়ে দু'সারি ফুটো আছে। খুব ভোরে উঠলেই দেখতে পাওয়া যাবে, পিপে গাড়ীটা ভ্রাম্যমান ধারাযন্ত্রের মত হেলে দুলে কঁকিয়ে কঁকিয়ে চলে যাচ্ছে, রাস্তার ধুলোর দৌরাত্ম্যকে শান্তিজল ছিটিয়ে শান্ত করে দিয়ে। আমাদের অহিভূষণের চাকরীটা হলো—এই সব কাজ তদারক করা। তারই জন্য বাইশটি টাকা মাইনে পায় অহি। লেখাপড়া শেখেনি, বাপ বেঁচে নেই, বাপের পয়সাও ছিল না। মা আছে, মায়ের অসুখও আছে। তা ছাড়া নিজের পেটের দায় তো আছেই। সামর্থ্য নেই, যোগ্যতা নেই, তাই বোধহয় এই সামান্য জীবনের দায়টুকু মেটাতে গিয়ে, উপায় খুঁজতে খুঁজতে একেবারে নরকের কাছাকাছি চলে এসেছে অহি। দুপুরবেলা যখন আদালতে দশটার ঘণ্টা বাজে, অর্থাৎ ঠিক যে-সময়ে ভদ্রলোকের কাজের জীবন কলরব করে ওঠে, সেই সময়ে এক ভাঙা ঘরের নিভৃতে অহিভূষণের ক্লান্ত শরীর নিঃশব্দে ঝিমোয়। সূর্য উঠলে আমরা ঘরের বার হই। সূর্য উঠলে অহি ঘরে ঢোকে। আমরা কাছারী রোড দিয়ে গাড়ী ঘোড়া শব্দ ও জনতা ভেদ করে যাই জীবিকা অর্জন করতে। অহি ঘুরে বেড়ায় নির্জন নিস্তব্ধ ও অবসন্ন শেষরাত্রের অস্পষ্ট গলিঘুঁজির মোড়ে মোড়ে, ড্রেন পায়খানা ডাষ্টবিনসঙ্কুল একটা ক্লেদাক্ত জগতের চোরাপথে।

বিকেলবেলা অহিকে আরও দু'বার কাজের ক্ষেত্রে দেখা যায়। লক্কড় সাইকেলটার পিঠে সওয়ার হয়ে মাইল দেড়েক দূরে সহরের বাইরে গিয়ে শ্মশানঘাটের সিঁড়িতে একবার দাঁড়ায়। ডোমটার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলে, মড়া আর চিতার হিসাব নেয়। তারপরেই গিয়ে দাঁড়ায় খালের ধারে—ময়লা ময়দানের কাছে। উঁচু ইনসিনারেটারের চিমনি থেকে দগ্ধ পুরীষের দুর্গন্ধ ধূম বাতাস আচ্ছন্ন করে। অহির সাইকেলের শব্দে অলস গৃধিনীর দল আবর্জনার স্তূপের আড়ালে চমকে ওঠে, বড় বড় পাখা ছড়িয়ে আকাশে উঠে চক্কর দিয়ে উড়তে থাকে। অহি দাঁড়িয়ে থাকে

কিছুক্ষণ। উড়ন্ত গৃধিনীর পাখার চঞ্চল ছায়া আর শব্দের নীচে দাঁড়িয়ে এইখানে সূর্যাস্ত দেখে অহিভূষণ।

কথায় কথায় অহি বলে—এমন চাকরী থাকলেই বা কি আর গেলেই বা কি? চাকরীর ব্যাপারে কত ভাবে ফাঁকি দিচ্ছে অহি, সেই সব বিবরণ বেশ ফলাও করে মাঝে মাঝে শোনায়। আমাদের একেবারে নিঃসংশয় করবার জন্য অহি প্রায়ই বলে —'সত্যি বলছি ভবানী, প্রাণ গেলেও আমি গলি-ফলির ভেতর ঢুকতে পারব না।'

বারীন প্রশ্ন করে—'ময়লা ময়দানে যেতে হয় না তোকে?'

—'কস্মিন্‌কালেও না। আমি দূরে রাস্তার ওপরে দাঁড়িয়ে কাজ দেখি।'

আমি জিজ্ঞাসা করি—'চিতে গুনতে যাস না আজকাল?'

অহি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়—'মোটেই না! ঘাটের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে হিসাব নিই, শ্মশানে নামি না।'

একটু চুপ করে থেকে অহি আবার নিজের থেকে একটু অস্বাভাবিকভাবে গর্ব করে বলতে থাকে—'কি ভেবেছে মিউনিসিপ্যালিটি, বাইশটে টাকা মাইনে দেয় বলে বামুনের ছেলেকে দিয়ে যাচ্ছেতাই করিয়ে নেবে?'

আমরা প্রায় একসঙ্গে সবাই হেসে ফেলতাম। অহি একটু আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে থাকতো, আমাদের হাসির অর্থ বুঝবার চেষ্টা করতো।

অহির কথা নিয়ে বেশীক্ষণ মাথা ঘামাবার মত উৎসাহ কারও ছিল না। কথা প্রসঙ্গে এক-আধটু যা হলো তাই যথেষ্ট। পর মুহূর্তে আমরা উৎকর্ণ হয়ে উঠতাম, কারণ বারীন একটি সুস্বাদু কাহিনী পরিবেশন আরম্ভ করে দিয়েছে—'কি বলবো ভাই, আজকাল যা সব কাণ্ড আরম্ভ করেছে ললিতা!' ফিক্ ফিক্ করে হাসে। ইয়া বড় বড় চোখ করে বেপরোয়া তাকিয়ে থাকে। হাবেভাবে স্পষ্ট জানিয়ে দিচ্ছে যে কিন্তু আমি ভাই ভিড়তে চাই না।'

অহি বেফাঁস রসিকতা করে বসে—'তাহলে আমি ভিড়ে যাই, কি বল?'

হঠাৎ প্রসঙ্গ বন্ধ করে দিয়ে, মুখটা কঠোর করে অহির দিকে তাকিয়ে বারীন বলে—'তোমাকে এর মধ্যে ফোড়ন দিতে বলেছে কে?'

এ-সব কুৎসার অম্বলে ফোড়ন সচরাচর আমরাই দিয়ে থাকি। অহি কখনো মন্তব্য করতো না, ভদ্র বাড়ীর তরুণীদের নামে কোনো রসাল প্রসঙ্গ উঠলে অহি বরং নিস্পৃহভাবে চুপ করে থাকতো। অতি পরিচিত এই সব প্রতিবেশিনীদের কাহিনীগুলিও ওর কাছে আজ যেন রাণী পরী আর দেবীর রূপকথার মত এক অতি দূর অলীকদেশের গল্প হয়ে গেছে। এই সব প্রসঙ্গে তাই অহিকে কখনো উৎসাহ প্রকাশ করতে আমরা দেখিনি। এই প্রথম হঠাৎ ভুল করে ফেললো। সঙ্গে সঙ্গে বারীনও তাকে সাবধান করে দিল। চুপ করে রইল অহি। আর কখনো তার এ ভুল হয়নি। অহি এইভাবে তার অধিকারের সীমা আমাদের ধমক খেয়ে বুঝে ফেলে। যেন মাথা পেতে ক্রুটী স্বীকার করে নেয়। মেলামেশার দিক দিয়ে আমাদেরই আড্ডার ছেলে অহিভূষণ, আমাদেরই প্রাক্তন সহপাঠী, এক সহরের ছেলে। কিন্তু মনের রুচির

দিকে থেকে সে যেন ভিন পাড়ার লোক, সে তত্ত্ব তাকে আমরা কারণে অকারণে বুঝিয়ে দিই। অহিও বুঝতে পারে।

কিন্তু একটি ক্ষেত্রে একটু ব্যতিক্রম ছিল। সেদিনের আড্ডায় বারীন যেই মেয়েটির নামে যা খুশি তাই বলছিল সেই মেয়েটির নাম বন্দনা। এই বন্দনার মতিগতি একটু অ্যানালিসিস করে বারীন বুঝতে পেরেছে যে

বন্দনার নামে যখন কথা উঠতো, তিলমাত্র ভদ্রতার সঙ্কোচ বা শ্রদ্ধার বালাই কেউ অনুভব করতো না। বিশেষ করে বারীন। বন্দনাকে একটু ভাল করে আমরা চিনে ফেলেছি। তাই অবিশ্বাস কবার মত কোনো প্রশ্ন থাকতে পারে, কষ্ট করে এতটা ভাববার কোনো দরকার ছিল না আমাদের। অন্য কোনো মেয়ের সম্পর্কে বারীনের রসনার অসংযম হয়তো আমরা বাধা দিতাম, প্রশ্ন করতাম, সন্দেহ প্রকাশ করতাম। কিন্তু বন্দনা ঠিক সেই সব মেয়েদের দলে নয়, তাদের বাইরে, অনেক নীচে। যদিও আমাদেরই পরিচিত পুলিন বাঁড়ুয্যের মেয়ে বন্দনা। বন্দনার চারিত্রিক রহস্য নিয়ে সবাই আপসোস করতো, কটুক্তি করতো ঘৃণায় ছটফট করে উঠতো। কখনো বা এক ঝাঁক রসিকতার মাছি ভন্‌ভন্ করে উঠতো। অহিও হেসে হেসে মাথা নেড়ে মন্তব্য করতো—ডোবালে ডোলালে, ভদ্র সমাজের নাম ডুবিয়ে ছাড়লে ছুঁড়ি।

শুধু এই একটি ক্ষেত্রে অহির অধিকারের সীমা স্মরণ করিয়ে দেবার কথা আমাদের কারও মনে হতো না। এক্ষেত্রে অহির অধিকার যে নিরপেক্ষভাবে আমরা স্বীকার করে নিয়েছিলাম। বন্দনাকে কুৎসা করার এই সমানাধিকার পেয়ে অহি যেন ধন্য হয়ে যেত। মুখ খুলে রসিকতা করতো অহি। এই একটি সুযোগকে বার বার সদ্ব্যবহার করে অহি উপলব্ধি করতো, সে আমাদেরই মধ্যে একজন।

শুধু সন্ধ্যে হলে অহি আমাদের আড্ডায় একবার আসে। না এসে পারে না। নেশাড়ে মানুষ যেমন সন্ধ্যে হলে একবার শুঁড়ির দোকানে না যেয়ে পারে না, অহির অবস্থাটা বোধহয় সেই রকম। সেই কবে আট বছর আগে আমাদের সঙ্গে এক ক্লাসে পড়তো অহিভূষণ, একই রিং-এ বক্সিং করতো, একই প্যারালাল বার-এ পীকক হতো—সেই পুরানো নেশা আজও বোধহয় ছাড়তে পারেনি অহি। একটু বেশী ধোপ-দুরস্ত কাপড়-চোপড় পরে সন্ধ্যেবেলা আমাদের আসরে দেখা দেয়। আমাদের বিদ্রূপ বিরক্তি অশ্রদ্ধা—সবই অকাতরে সহ্য করে। ছেলেবেলায় অহির এক-একটা কঠোর স্ট্রেট লেফ্‌ট্ ও ডানহাতের পাঞ্চ্ কতবার যে আমাদের ছিটকে বের করে দিয়েছে রিং থেকে বাইরে—তিন হাত দূরে। আজ যেন সেই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করছে অহি। আমাদের সব অশ্রদ্ধার আঘাত সহ্য করে, সাধ করেই পরাজিত হয়ে আমাদের রিং-এর মধ্যে থাকতে চায় অহিভূষণ।

—একটু ডিসট্যান্সে যেতে হবে ভাই, প্রাইভেট টক আছে।

অহির অনুরোধ শুনে উঠে গিয়ে একটু আড়ালে দাঁড়ালাম। বললাম—'কি বলছিলি, বল।'

অহি- 'তোর কাকাকে একটু বুঝিয়ে বলতে হবে ভাই, যেন আমার নামটা কেটে না দেন।'

আমার কাকা হলেন মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান। কাকা একটু বেশী পরোপকারী ও সদয় মানুষ। তাই খুব আশ্চর্য হলাম, অহিভূষণের মত এক গরীব কর্মচারীর চাকরীটা খাবার মত উৎসাহ তাঁর কেন হবে?

বললাম—'তোকে বরখাস্ত করার কথা হয়েছে নাকি?'

- 'বরখাস্ত নয় ভাই, আমার নামটা কেটে দিচ্ছেন।'

'বরখাস্ত নয়, নাম কেটে দেওয়া হচ্ছে, কথাটার অর্থ বুঝতে পারছি না, অহি। ঠিক করে বল।'

—'তুই তো জানিস, আমার পোস্টটার নাম ছিল ?'

- 'না, জানি না।'

—'আমি হলাম এ সি এস।'

—'সেটা আবার কি জিনিস?'

—'আমি হলাম অ্যাসিস্টেণ্ট কনজারভেন্সী সুপারভাইজার। পাঁচ বছর ধরে এই নাম চলে আসছে। আজ হঠাৎ তোর কাকা চেয়ারম্যান হয়ে কোথায় একটু উপকার করবেন, না উঠে পড়ে লেগেছেন আমার নামটার পেছনে। নামটা বদলে দিচ্ছেন।'

—'তাতে তোর ক্ষতিটা কি? মাইনে তো আর কমলো না।'

—'না মাইরি, সর্দার স্ক্যাভেঞ্জার নাম সহ্য করতে পারবো না, মাইরি। তুই বল ভাই, ভদ্রলোকের ছেলে হয়ে '

—'তোরই বা এত নাম নিয়ে মাথাব্যথা কেন? তোর আগে যে লোকটা সর্দার ছিল, সেই মানকিরাম যে তোর চেয়েও বেশী মাইনে পেত।'

অহির মুখটা বিষণ্ণ হয়ে উঠলো। একটু অভিমান করেই যেন বললো—'শেষে তুইও মানকিরামের সঙ্গে আমার তুলনা করলি, ভবানী?'

একটু রাগ করে বললাম—'মানকিরাম তোর চেয়ে ছোট কিসে রে অহি? মানুষকে যে খুব ছোট করে দেখতে শিখেছিস, অথচ '

অহি চুপ করে তাকিয়ে রইল, কোনো উত্তর দিল না। এইভাবে সামান্য একটা ধমকে তার সব বিদ্রোহ শান্ত হয়ে যায়। আজও চুপ করে আমার ধমক আর মন্তব্য টাকেই মেনে নিল অহি।

বাড়িতে ফিরে এসে অহির কথাটা কেন জানি বারবার মনে পড়ছিল। কাকাকে হেসে হেসে বললাম—'অহি নামে আপনাদের মিউসিপ্যালিটির একজন প্রকাণ্ড অফিসারের ডেসিগনেশনটা নাকি আপনি খারিজ করে দিচ্ছেন?'

কাকা উত্তর দিলেন—'হুঁ, ঐ নামটা আইনত চলে না। ঐ নাম থাকলে মাইনে ও গ্রেড আইন মাফিক করতে হয়। তা ছাড়া, তাহলে অহির চাকরীও থাকে না। কেন না, অ্যাসিস্টেণ্ট কনজারভেন্সী সুপারভাইসার রাখতে হলে ট্রেনিং-নেওয়া পাশ করা লোক চাই। অহির তো সে সব যোগ্যতা নেই।'

—'কিন্তু সর্দার স্ক্যাভেঞ্জার নামটা সত্যিই বড় বিশ্রী। গরীব হলেও ভদ্রলোকের ছেলে তো, অহির মনে বড় ব্যথা লেগেছে।'

কাকা দুঃখিত হয়ে বললেন—'কি করবো বল? কোনো উপায় নেই। অহির মাইনে তিন টাকা বাড়িয়ে দেবার ক্ষমতা আছে আমার এবং বাড়িয়ে দেবো ঠিক, কিন্তু ঐ পোস্টটা, ওভাবে ঐ নাম দিয়ে রাখবার উপায় নেই। আইনে বাধে।'

পরদিন সকালবেলা অহির কথা একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম কিন্তু ঘরে বসে অহির গলার স্বর শুনতে পেয়ে আবার ঘটনাটা নতুন করে মনে পড়ে গেল। কাকার সেরেস্তায় এসে অহি কাকাকে সেই অনুরোধ নিয়ে আবার পাকড়াও করেছে।

অহি বলছিল—'আমার এই পোস্টের নামটা বদলে দেবেন না, কাকাবাবু।'

কাকা বোধহয় একটু বিরক্ত হয়ে বললেন—'কেন হে কাকাবাবু?'

কাকার উত্তরটার মধ্যে এবং গলার স্বরে একটা প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের আভাসও ছিল যেন। অহির মুখে এই 'কাকাবাবু' ডাকটা হয়তো তিনি পছন্দ করলেন না।

কাকার সেরেস্তার কাছে দাঁড়িয়ে একটু আড়াল থেকে উঁকি দিলাম। দেখলাম, অহি দাঁড়িয়ে আছে। অহির নোংরা খাকি হাফপ্যাণ্ট আর বগলদাবা হাজিরা খাতাটা ওর সর্দারীর সাজটা নিখুঁত করে তুলেছে। অহির মুখটা আজও কিন্তু সেই পুরানো ধাঁচেই রয়ে গেছে। নাক আর চিবুকে সেই দাক্ষিণী নটরাজের ব্রঞ্জের মত ছাঁদটা আজও মুছে যায়নি। গড়নটা কঠিন, কিন্তু ছাঁদটা কোমল। এই অহি একদিন আমাদের স্কুলে প্রাইজের অনুষ্ঠানে কপালে রক্তচন্দনের তিলক কেটে মেঘনাদ সেজেছে, আবৃত্তি করেছে। কী সুন্দর ওকে মানতো!

আপাতত দেখছিলাম, অহিভূষণ কাকার প্রশ্নে একটু কাঁচুমাচু হয়ে বললো—'আজ্ঞে আমি বলছিলাম '

কাকা—'কিছু বলতে হবে না তোমাকে। আমি যা করছি তোমার ভালোর জন্যই করেছি। হয়তো মাইনে কিছু বাড়িয়ে দেব যদি

অহি—'মাইনে বাড়াবার জন্য আমি আপনাকে বিরক্ত করতে চাই না স্যার। কিন্তু আমার পোস্টের নামটা যদি আপনি একটু অনুগ্রহ করে

কাকা আমার পরম দয়ালু মানুষ, কিন্তু ভিক্ষে করবার এত বস্তু থাকতে কেউ এসে পোস্টের সম্মান ভিক্ষে করবে, সে-ঔদ্ধত্যকে বোধহয় পৃথিবীর কোনো দয়ালু প্রশ্রয় দিতে পারেন না। কাকা হঠাৎ ভয়ানকভাবে চটে গিয়ে চোখ পাকিয়ে হিন্দী করে বলতে লাগলেন।—'মাইনে বাড়ানোর দরকার নেই, না? তবে চাকরীটারই বা কি দরকার হে সর্দার? খুব বাড় বেড়েছে দেখছি?'

—'আজ্ঞে না হুজুর! সঙ্গে সঙ্গে এক সর্দার স্ক্যাভেঞ্জারের মুখ দীনতায় সঙ্কুচিত হয়ে আর্তস্বরে যেন ক্ষমা প্রার্থনা করে উঠলো।'

কাকা বললেন—'যাও, খাড়া মৎ রহো।'

এরপর অহি আমাদের সান্ধ্য আড্ডায় রোজ হাজির হবার অভ্যাস ছেড়ে দিল। তবে আসে মাঝে মাঝে, একটু গম্ভীর হয়ে থাকে। অহি বোধহয় আমাদের অন্তরঙ্গ-

তার সীমা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছে।

অহির আচরণের এই পরিবর্তন সকলেই লক্ষ্য করলো। আমিই একদিন সকলকে রহস্য ফাঁস করে দিলাম—মিউনিসিপ্যালিটি অহিকে সর্দার-স্ক্যাভেঞ্জার নাম দিয়েছে, অ্যাসিস্টেন্ট কনজারভেন্সী সুপারভাইসার নামটা রদ করে দেওয়া হয়েছে, তাই অভিমান হয়েছে অহির। কাকার কাছে এই নিয়ে তর্ক করতে গিয়েছিল। কাকা ধমক দিয়ে খেদিয়ে দিয়েছেন।

এর পরে যেদিন অহি আড্ডাতে এল, সকলে মিলে বেশ মিঠেকড়া করে ধমকে দিল—'তোর আবার এই সব ঘোড়ারোগ কেন রে অহি? মাইনের পরোয়া করিস না, তাই নিয়ে চেয়ারম্যানের সঙ্গে মুখের ওপর তর্ক করতে যাস।। সর্দার স্ক্যাভেঞ্জারের কাজটা করবি, অথচ বললে তোর একেবারে মাথা কাটা যাচ্ছে। তুই কি ভাবছিস নিজেকে, তুই একটা ভয়ানক রকমের অফিসার?'

ধমক খেয়ে প্রতিবাদ করে না অহি। অভিযোগ স্বীকার করে নেয়। আজও অহি নিরুত্তর থেকে অভিযোগ স্বীকার করে নিল। কিন্তু বলিহারি ওর ধৈর্য আর সহ্যগুণ। শুধু আমাদের আড্ডায় স্পর্শটুকুর লোভে ও সব সহ্য করতে পারে।

পর পর অনেকদিন পার হয়ে গেল, অহি আর আড্ডায় আসে না। হঠাৎ একদিন হাসতে হাসতে ক্লাবের বৈঠকে দেখা দিল অহি।

বীরভূমের এক গাঁয়ের এক গরীব স্কুলমাস্টারের মেয়ের সঙ্গে অহির বিয়ের কথা পাকাপাকি হয়ে গেছে। অহি নিজে গিয়ে মেয়েকে দেখে এসেছে। আমাদের কাছে একটা সলজ্জ আনন্দে সব কথাই বললো অহি—মেয়েটি দেখতে বেশ, ম্যাট্রিক ক্লাস পর্যন্ত পড়েছে, গানটানও গাইতে পারে।

অহি যেন তার জীবনের এক নতুন সূর্যোদয়ের কথা বলে চলে গেল। কিন্তু সেই মুহূর্তে সে বুঝতে পারেনি যে, কী বিসদৃশ, কী অশোভন, কী অন্যায় কুকাণ্ডের একটি বার্তা সে আমাদের কানের কাছে ছেড়ে দিয়ে গেল। আমাদের মনের শান্তি নষ্ট হলো।

আমরা বুঝলাম, কত বড় ভাঁওতা দিয়ে এক ভদ্রলোকের মেয়ের সর্বনাশ করতে চলেছে অহি। বেচারী স্কুলমাস্টার কল্পনাও করতে পারছে না যে, এক সর্দার স্ক্যাভেঞ্জারের হাতে তাঁর মেয়েকে তিনি সঁপে দিতে চলেছেন। তিনি হয়তো শুধু জানেন, অ্যাসিস্টেন্ট-কনজারভেন্সী-সুপারভাইসার নামে এক ঝকঝকে অফিসারের সঙ্গে তাঁর মেয়ের বিয়ে হতে চলেছে।

সমাজের একটা স্বাভাবিক আত্মরক্ষা করার শক্তি আছে। সেদিনই দু'পাতা চিঠি লিখে সব ব্যাপার আমরা জানিয়ে দিলাম স্কুলমাস্টার ভদ্রলোককে। অহিও তিন দিন পরে বীরভূমের এক গেঁয়ো ডাকঘর থেকে টেলিগ্রাম পেল—বিয়ের প্রস্তাব বাতিল।

আমাদের যা করবার সবই আমরা গোপনেই করেছিলাম। অহি কী বুঝলো, তাও আমরা জানি না। কিন্তু অহি আর আমাদের আড্ডায় এল না। এক মাসের মধ্যে একবারও নয়। এতদিনে সত্যি করে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল অহি।

মনুষ্যত্বের দিক দিয়ে বোধহয় অনেকদিন আগে থেকেই বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল অহি। শুধু ধোপদুরস্ত কাপড় পরে জোর করে ভদ্রলোক সাজবার চেষ্টা করতো। অল্পদিনের মধ্যে আমরা দেখলাম, হাঁ, খাঁটি সর্দার-স্ক্যাভেঞ্জার বটে অহি। হাজিরা খাতা বগলে নিয়ে গলিতে গলিতে নিঃসঙ্কোচে ঘুরে বেড়ায়, শ্মশানের চড়ায় নেমে চিতা গুনে আসে, ময়লা ময়দানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ট্রেঞ্চ কাটায়, ড্রেনের পাশে বসে মেরামত তদারক করে। নোংরা খাকি-হাফপ্যান্ট পরে ক্লেদাক্ত পৃথিবীর চিহ্নিত পথে আন্তরিক নিষ্ঠা নিয়ে চরে বেড়ায় অহি, লক্কড় সাইকেল আর্তনাদ করে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে পুলিনবাবু আর বন্দনা ঠিক এই ধরনের সমস্যাকেই জটিল করে তোলবার চেষ্টা করলো।

দেনা দৈন্য আর বেকার অবস্থায় জীবনের বারো আনা ভাগ সময় পণ্ড করে দিয়ে পুলিন বাড়ুয্যে শেষকালে জুতার দোকান খুলেছিলেন। আমরা দেখতাম, পুলিনবাবুর দোকানে মেঝের ওপর তিন-চারজন মুচি সকাল দুপুর সন্ধ্যা জুতো সেলাই করে। একটা কাচের আলমারা ছিল দোকানে, তার মধ্যে নতুন চামড়ার বাণ্ডিল সাজানো—ক্রোম, উইলোকাফ, কিড আর শ্যামোয়া। দোকান ঘরের মধ্যে কিছুটা স্থান ভিন্ন করে, একটা ভাল মেহগনি টেবিল আর চেয়ার নিয়ে বসে থাকতেন পুলিনবাবু। টেবিলের পাশে আবার একটা সুন্দর রঙীন পর্দা ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন। এখানে বসলে মুচিদের আর ঠিক পাশাপাশি বা মুখোমুখি দেখতে পাওয়া যায় না। ঐ রঙীন পর্দাটা যেন পুলিনবাবুর মনের একটা সতর্ক ও জাগ্রত শ্রেণী-মর্যাদার প্রতীকের মত ঝুলতো। মুচিদের কর্মভূমি থেকে তিনি যেন স্পষ্ট করে তাঁর জীবনের আসরটুকু সযত্নে ভিন্ন করে রাখতেন। শত হোক, পরলোকগত ত্রৈলোক্য পণ্ডিতের নাতি তো! সাত-পুরুষের কৌলিক চেতনাকে একটা উপার্জনের দায়ের সঙ্গে একাকার করে দিতে পারেন না তিনি। তিনজন মুচির মধ্যে একজনকে তিনি মিস্ত্রি বলে ডাকতেন। আলমারি থেকে চামড়া বের করে মাপ মত কেটে কেটে মুচিদের দেওয়া, খদ্দেরের পায়ের তলায় কাগজ পেতে মাপ এঁকে নেওয়া ইত্যাদি সব কাজ মিস্ত্রিরই করে। জুতোর দোকানের জুতোত্বের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখেন না পুলিনবাবু, তাঁর সম্পর্ক শুধু দোকানত্বের সঙ্গে। এরচেয়ে বেশী নীচে নামতে পারেন না পুলিনচন্দ্র বাঁড়ুয্যে।

এই পুলিনবাবুর মেয়ের নাম বন্দনা। এই সহরের স্কুলেই পড়েছে, এ-পাড়া আর ও-পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে মিশে কোনকালে মহিলা সমিতির বাৎসরিকীতে অভিনয় করেছে। চার বছর আগের কথাই ধরা যাক, আমার ভাগ্নীর বিয়েতে বন্দনা একাই গান গেয়ে বাসর জমিয়েছে। বন্দনার স্কুল-বান্ধবীরা অনেকেই আজ আর বাপের বাড়িতে নেই, শ্বশুরবাড়ি থেকে তারা মাঝে মাঝে যখন আসে, সবারই সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয় তাদের। শুধু দেখা হয় না বন্দনার সঙ্গে। বন্দনা আজ সেই পুরাতন সখিত্বের বৃত্ত থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। বন্দনার খোঁজ বড় কেউ করে না।

বন্দনা এখন কী বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে, সবাই জানে সে-কথা। সেই সখিত্বের আগ্রহ দূরে থাক, তাদের মনের দিক দিয়ে অস্পৃশ্যতা গোছের একটা বাধা বন্দনাকে আজ একেবারে অস্পষ্ট করে দিয়েছে।

হাসপাতালে কী একটা কাজ করছে বন্দনা। বন্দনার মা অবশ্য লোকের কাছে বলেন—নার্সের কাজ। কিন্তু তাই বা কি করে হয়? বন্দনা তো নার্সবিদ্যা পাশ করেনি। যাই হোক এতটা বাড়াবাড়ি পুলিন বাঁড়ুয্যের উচিত হয়নি। জীবনে টাকার প্রয়োজন কার না আছে? কিন্তু তাই বলে সব ভদ্রয়ানার সংস্কার অমান্য করে, সমাজের স্বীকৃতি-অস্বীকৃতির তোয়াক্কা না করে, রুচি-অরুচির বালাই না রেখে, শুধু কাজ আর পয়সাকে শ্রেষ্ঠ করে তোলা মানুষের লক্ষণ নয়। একে জীবিকা অর্জন বলে না, এটা হলো জীবনকে বিকিয়ে দেওয়া। পুলিন বাঁড়ুয্যে খুবই গরীব সন্দেহ নেই। তার গরীবত্বের জন্য অবশ্য আমাদের সবারই সমবেদনা আছে। কিন্তু গরীবত্ব ঘোচাবার যে পথ তিনি বেছে নিলেন, সেই পথটাকে কেউ সম্মান করবে না।

পুলিনবাবু বোধহয় তাঁর ভবিষ্যৎটা বুঝতে পারেননি, নইলে এতটা স্পর্দ্ধা তাঁর হতো না। কিন্তু অতি অল্পদিনেই তিনি বুঝলেন, একেবারে মর্মে মর্মে বুঝলেন।

কাকা একদিন আমাকে ডেকে বললেন—'হ্যাঁ রে ভবানী, পুলিন চামারের দোকানে জুতো-টুতো কেমন তৈরী করে? বেশ ভাল?'

কাকা অক্লেশে যে কথাটা বললেন, তাতেই হঠাৎ একটা শক্ পেলাম যেন। আজ মাত্র এক বছরের মধ্যে পুলিন বাঁড়ুয্যে কাকার কাছে কত সহজ ও স্বাভাবিক নিয়মে পুলিনচামার হয়ে গেছে।

বিব্রতভাবে উত্তর দিলাম—'হ্যাঁ, ভালই তৈরী করে।'

কাকা 'তাহলে এবার পুজোর সময় পুলিন চামারকেই অর্ডার দিস্।'

কথাটা যেন বাতাসে ছড়িয়ে পড়লো। ঠাট্টা করে নয়, বেশ সহজভাবে সকলে পুলিন-চামার কথাটা ব্যবহার করে। পুলিনবাবুও নিশ্চয় স্বকর্ণে কথাটা শুনেছেন। এখন বুঝুন তিনি, এই নতুন উপাধির গৌরব প্রতিমুহূর্তে তিলে তিলে উপভোগ করে প্রায়শ্চিত্ত করুন।

জুতোর অর্ডার দিতে গিয়ে দেখলাম, কমাসের মধ্যে আশ্চর্য রকমের বদলে গেছেন পুলিনবাবু। এক বছর আগেও আমাকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করেছেন। আজ আমাকে 'আপনি' করে বলছেন। আলমারী খুলে নানারকম চামড়া বের করে দেখালেন। এক জোড়া অক্সফোর্ড হান্টিং-এর দরকার ছিল আমার। পুলিনবাবু খুশি হলেন। আমার পায়ের তলায় একটা কাগজ পাতলেন, পেন্সিল দিয়ে মাপ এঁকে নিলেন। ভয়ানক রকম একটা অস্বস্তির মধ্যে আমার পা-টা সিরসির করে উঠলো। যেন একটা অপরাধ করছি, মনের কোণে এই রকম একটা দুর্বলতা নিঃশব্দ গঞ্জনার মত পীড়া দিতে লাগলো। এইরকম অপ্রস্তুত অবস্থায় দাঁড়িয়ে দেখলাম, পুলিনবাবু আমার পায়ের কাছে মাথা ঝুঁকিয়ে জুতোর মাপ নিচ্ছেন। পুলিনবাবুর হাতের পেন্সিল এক অপার্থিব তুলির মত সুড়সুড়ি দিয়ে আমার পায়ের পাতার চারদিকে

ঘুরছে। আমি দেখছিলাম, প্রৌঢ় পুলিনবাবুর কাঁচা-পাকা চুলে ভরা মাথাটা আমার হাঁটুর কাছে হেঁট হয়ে আছে।

এর পরেও দেখেছি, সেই মেহগনি টেবিল চেয়ার আর রঙীন পর্দা নেই। মিস্তিরী নেই। পুলিনবাবু মেজের ওপর জুং করে বসে নিজেই কাঁচি দিয়ে হিসেব মত চামড়া কেটে মুচিদের দিচ্ছেন। পুলিন চামারের দোকান সত্যিই সার্থক হয়ে উঠেছে এতদিনে।

বন্দনাকেও আমরা প্রায়ই দেখতে পেতাম, কখনো পায়ে হেঁটে—কখনো বা রিক্সায় চড়ে হাসপাতালে যায়। বারীন সবচেয়ে বেশী চটে যেত বন্দনার সাজ-সজ্জার নিষ্ঠা দেখে। নার্সদের অ্যাসিস্টেণ্ট কুড়ি টাকা মাইনে, তার জুতো শাড়ি আর ব্লাউজের এতটা বাহার একটু বিসদৃশ ঠেকে বৈকি! তার ওপর আবার মাঝে মাঝে রিক্সায় চড়ে। আমরা অবশ্য বন্দনার পক্ষ নিয়ে কখনো-সখনো প্রতিবাদ করতাম—একটু রিক্সাতে চড়লোই বা। এতটা পথ এই দুপুরের রোদে চলাফেরা করা একটা মেয়ের পক্ষে কষ্টকর নয় কি?

বারীন একেবারে ক্ষেপে উঠতো—'থাক থাক, আমাকে আর শেখাতে এস না কেউ। জমকালো শাড়ি আর রিক্সার পয়সা যে এমনিতেই হয়, সে তত্ত্ব আমি বুঝি।'

পথে বন্দনার সঙ্গে আমাদের মুখোমুখি দেখা হয়। কিন্তু লক্ষ্য করেছি, বারীন আমাদের সঙ্গে থাকলে বন্দনা কখনো ভুলেও চোখ তুলে তাকাতো না, একটু সঙ্কুচিত হয়ে মুখটা অন্য দিকে ঘুরিয়ে নিত। কখনো বা চকিতে মুখটা বিবর্ণ হয়ে উঠতো, যেন হঠাৎ ভয় পেয়েছে। বারীন আবার চটে উঠে আমাদের কানের কাছে বলতো—ঠিক এই, এই ধরনের হাব-ভাব যে-সব মেয়েদের দেখা যায়, যারা ইচ্ছে করেও হাসতে পারে না, চোখ তুলে তাকাতে পারে না, তাদের মতিগতি একটু অ্যানালিসিস করলেই বুঝতে পারবে যে, তারা শুধু চায়

পুলিনবাবু তো এরই মধ্যে দমে গিয়ে একেবারে অমানুষ হয়ে গেছেন। কিন্তু পুলিন-গিন্নী দমবার পাত্রী নন। যার স্বামী জুতো বেচে, মেয়ে সদর হাসপাতালে কে জানে কী করে, তাকে আজও একটু লজ্জিত হতে দেখিনি। যে কোনো পরিচিতা প্রতিবেশিনীর সঙ্গে দেখা হলে আলাপক্রমে একবার নিজের বংশগর্বটাকে বড় করে এবং আলাপিতাকে একটু নীচু ঘর প্রমাণ না করে তিনি শান্ত হন না। প্রয়োজন হলে সৌজন্য ভুলে ঝগড়া করতে কুণ্ঠিত হন না। যে সব বুড়ী নির্জলা একাদশী করতে পারে না, তাদের গায়ে পড়ে দু'কথা শুনিয়ে দিয়ে আসেন। তাঁকে কেউ আমল দেয় না, তবু গায়ে পড়ে সবাইকে বিব্রত করেন। পুলিনবাবু আর বন্দনার ঠিক উল্টোটি হলেন পুলিন-গিন্নী। কোন্ বামুনের বাড়িতে এক ফোঁটা গঙ্গাজল নেই, কারা তিথিনক্ষত্র মানে না, কার মেয়ের অলগ্নে বিয়ে হয়ে গেল—সব খবর রাখেন পুলিনগিন্নী এবং সবাইকে তার জন্য কটূক্তি করতে ছাড়েন না।

কবে এবং কী করে পুলিনগিন্নী বন্দনার একটা বিয়ের ব্যবস্থাও প্রায় পাকাপাকি

করে ফেলেছেন, তা আমরা আগে জানতে পারিনি। কিন্তু ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। পাত্রের মামা বন্দনাকে আশীর্বাদ করতে এলেন এবং উঠলেন আমাদের বাড়িতে। পাত্রের মামা আমার কাকার বন্ধু। তাঁর কাছেই সব খবর শুনলাম—তাঁর ভাগে অর্থাৎ পাত্রটি হলো পাটনার একজন প্রফেসর। বেশ ভাল চেহারা, মডার্ণ ও স্মার্ট ছেলে। পুলিনগিন্নী বন্দনাকে নিয়ে মাত্র দু'দিনের জন্য পাটনা গিয়েছিলেন। মেয়ে দেখে পাত্র খুশি হয়েছে, পাত্রপক্ষ রাজী হয়েছে।

আমরা আশ্চর্য হলাম, কাকা আতঙ্কিত হলেন। তারপরে সবাই মিলে হাসতে লাগলাম। কাকার বন্ধুমশায় অপ্রস্তুত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—'কি ব্যাপার ?'

কাকা তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন—'যাক, আপনার ভাগ্য ভাল যে আমার এখানে উঠেছিলেন। আপনার ভাগ্নের জন্য অন্য সম্বন্ধ দেখন। সব কথা পরে হবে। এখন বিশ্রাম করুন।'

রাত্রিবেলা ক্লাব থেকে ঘরে ফিরেই দেখি পুলিনগিন্নী খুড়িমার সঙ্গে কথা বলছেন। বারান্দায় চেয়ার টেনে নিয়ে পুলিনগিন্নীর কথাবার্তা শোনার জন্য বসলাম।

পুলিনগিন্নী যেন করুণভাবে আবেদন করছিলেন—'আপনি বিশ্বাস করুন দিদি, বন্দনা কখনো রোগীর বেডপ্যান-ট্যান ছোঁয় না। চাকরী করে এই মাত্র, তাই বলে ব্রাহ্মণের মেয়ে কি এতটা নোংরামি করতে পারে দিদি ?'

একবার উঁকি দিয়ে পুলিনগিন্নীর চেহারাটা দেখলাম। সে চেহারাই নয়। একটা প্রচ্ছন্ন আশঙ্কায় পুলিনগিন্নীর মুখটা নিষ্প্রভ হয়ে আছে। যেন তাঁর সর্বস্ব ডুবতে বসেছে। খুড়িমার কাছে যেন একটা পরিত্রাণের প্রার্থনা বার বার কাতরভাবে শোনাচ্ছিলেন পুলিনগিন্নী।

খুড়িমা বললেন—'এ-সব কথা আমায় বলে লাভ নেই। কর্তারা যা ভাল বুঝবেন, তাই হবে!'

পুলিনগিন্নী যেন ফুঁপিয়ে উঠলেন—'আপনি ভবানীর কাকাকে একটু বুঝিয়ে বলুন দিদি। ছেলের মামা ওঁর বন্ধু। আমি জানি, উনি হ্যাঁ বললেই বিয়ে হবে, উনি না বললেই বিয়ে ভেঙে যাবে। উনি তো বন্দনাকে ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছেন, উনি জানেন বন্দনা কেমন মেয়ে।'

খুড়িমা বললেন—'উনি যদি ভাল বোঝেন তবে '

পুলিনগিন্নী ওঠবার আগে খুড়িমার হাত ধরে আর একবার অনুরোধ করলেন—'আপনি একটু বুঝিয়ে বলবেন দিদি।'

পুলিনগিন্নী যাবার সময় কাকার বৈঠকখানার দরজার কাছে হঠাৎ কী ভেবে একটু দাঁড়ালেন। কাকা তখন তাঁর বন্ধুকে এই কথা বোঝাচ্ছিলেন—'মেয়ে হল হাসপাতালের জমাদারণী, এরকম একটি মেয়ের সঙ্গে আপনার ভাগ্নের বিয়ে দিতে চান ?'

পাত্রের মামাবাবু কিছুক্ষণ হতভম্ব থেকে বললেন—'না।'

কথাগুলি কানে যাওয়া মাত্র, পুলিনগিন্নী ছটফট করে পালিয়ে গেলেন।

পুলিনগিন্নীর ষড়যন্ত্র ফেঁসে গেল, এই ব্যাপারে বোধহয় খুশি হলো সবাই। বারীন খুশি হলো এই কারণে যে, বন্দনার বিয়ে ভেঙে গেল। বন্দনার চেয়েও কত গরীবের মেয়ের বিয়ে হয়েছে বড়লোকের সঙ্গে। তার মধ্যে তো বিসদৃশ কিছু কেউ দেখেনি। গরীব বলে নয়, পুলিন বাঁড়ুয্যে আর বন্দনা, বাপ-বেটি মিলে যা বেপরোয়া জুতোটুতো বেচতে আরম্ভ করলো—তারই ফল ফলছে একে একে। সমাজে কুলের প্রশ্ন হয়তো বড় পুরনো হয়ে গেছে, সে-সব নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। এটা শীলের প্রশ্ন। এক সমাজে থাকতে হলে একই রকম শীলাচার মানতে হবেই। তার ব্যতিক্রম হলে সমাজ ক্ষমা করতে পারে না। আমরা কালচারের দিকটাই দেখছিলাম।

আমরা যে ভুল করিনি, তার প্রমাণ এই যে, বার বার দু'বার আমরা জিতে গেলাম। দু'বারই দু'টো অন্যায় হতে চলেছিল, তাই সামান্য আঘাতে ভেঙে গেল। প্রথম অহি, দ্বিতীয় বন্দনা।

ঐ মানুষগুলিও কত সহজে ও সামান্য আঘাতে ভেঙে গেল। সর্দার স্ক্যাভেঞ্জার বলা মাত্র হু হু করে নেমে গেল অহি। পুলিনবাবুও তাই। চামার নামে শুধু একটা কথার কথায় যেন চামার হয়ে গেলেন। আসলে ওদের মনুষ্যত্বটাই স্ক্যাভেঞ্জার ও চামার হয়ে গিয়েছিল অনেকদিন আগেই। আমরা শুধু মুখোসটা খুলে দিয়েছি। আমাদের দোষ নেই। অপবাদ দিয়ে আমরা ওদের মিথ্যে করে দিয়েছি, একথা সত্য নয়। এবং যেটুকু শিক্ষা আমাদের বাকী ছিল, তাও অল্পদিনের মধ্যে চরম করে শিখিয়ে দিল বন্দনা।

হৃদয়ভেদী এক-একটি সংবাদ শুনতে পেলাম। সতু তাদের চাকরটাকে হাস-পাতালে ভর্তি করতে গিয়েছিল। কম্পাউণ্ডার এসে দু'টো টাকা ঘুষ নিয়ে গেল। কোথা থেকে বন্দনাও এসে নির্লজ্জ ও নিষ্কম্পস্বরে চাইলে—আমারও পাওনা আছে। একটা টাকা দিতে হবে। না দিলে

শশীদের বাড়িতে রোগিণী দেখতে লেডীডাক্তার এসেছিলেন। তার সঙ্গে বন্দনাও এসেছিল। লেডীডাক্তার ফী নিলেন আট টাকা, বন্দনা পেলে এক টাকা। এই ন্যায্য পাওনা ছাড়া অক্লেশে হাত পেতে বকশিশ দাবী করে বসলো বন্দনা—আরও কিছু দিতে হবে। শশীর বাবা কৃপণ মানুষ, বার বার আপত্তি তুললেন। বন্দনা জেদ ছাড়লো না। অপ্রস্তুত হয়ে, শশী তাড়াতাড়ি নিজের পকেট থেকে আট আনা বকশিশ দিয়ে উদ্ধার পেল।

সতু আর শশীর কাছে এই কাহিনী আমরা শুনলাম। বুঝলাম সত্যিই মনে-প্রাণে জমাদারণী হয়ে গেছে বন্দনা। একটা চক্ষুলজ্জারও ধার ধারে না।

আমাদের মনেও আর কোনো অনুশোচনা নেই। যা করেছি, ভালই করেছি। অহিভূষণকে বন্দনাকে ও পুলিনবাবুকে আমরা ঘৃণা করি না কিন্তু সর্দার স্ক্যাভেঞ্জার, জমাদারণী ও চামারকে আমরা আমাদের রুচিগত জীবনের আসরে ও বাসরে গ্রাহ্য করতে পারি না। কোনো অন্যায় করিনি আমরা, ওদের কোনো ক্ষতি করিনি

আমরা, ওদের জীবিকাই ওদের কালচার নষ্ট করেছে। ওরা যা ওরা তাই। আমরা শুধু নিজেদের বাঁচিয়েছি।

অনেকদিন পরে সমস্যাটা হঠাৎ তৃতীয় অধ্যায়ে পৌছে গেল, যেন অদ্ভুত হয়ে উঠলো। ক্লাবে গিয়ে দেখলাম, টেবিলে দশ-বারোটা রঙীন লেপাফাবদ্ধ চিঠি পড়ে রয়েছে। বিয়ের চিঠি, অহির সঙ্গে বন্দনার বিয়ে। অহি আমাদের নেমন্তন্ন করেছে।

বিশ্রী রকমের একটা অস্বস্তি বোধ করছিলাম। কি অদ্ভুত কাণ্ড! অহির সঙ্গে বন্দনার বিয়ে! এই কি উচিত হলো। কিন্তু কেন উচিত নয়? এই বিয়ে সমর্থন করতে কোনো আনন্দ পাচ্ছি না। কিন্তু অসমর্থন করারও কোনো হেতু খুঁজে পাচ্ছি না।

বারীন অযথা রেগে পাগল হয়ে উঠলো। বারীনের মতে এটা হলো অহির সর্বনাশ। বারীন চেঁচাতে লাগলো—'শত বাজে লোক হোক অহি, তবু বন্দনার মত জমাদারণীর সঙ্গে অহির বিয়ে হতে পারে না।'

সতু ও শশী তার চেয়ে জোরে চেঁচিয়ে উত্তর দিল—'বন্দনা যতই যা তা হোক, কোন সর্দার-স্ক্যাভেঞ্জারের সঙ্গে ওর বিয়ে হওয়া উচিত নয়।'

দু'পক্ষেরই আচরণ বড় গর্হিত, হৃদয়হীনতার মত লাগছিল। ওদের নিয়ে আর মাথা ব্যথা কেন? ওরা সরে গেছে, ওরা আমাদের কেউ নয়। ওদের জীবিকা ভিন্ন, তাই ওদের জীবনও ভিন্ন। আজ ওদের কথা নিয়ে এতটা বিতণ্ডা করা আমাদের পক্ষে অনধিকার চর্চা নয় কি?

কিন্তু কার মনে কি আছে কে জানে? পরের মঙ্গলের গরজে সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠলো। সতু ও শশী পুলিনবাবুর কাছে বেনামা চিঠি ছাড়লো—যেন এ বিয়ে না হয়। এত ভাল মেয়ে আপনার, তার জন্য ঐ সর্দার স্ক্যাভেঞ্জার পাত্র?

বারীন চারপাতা কাগজ ভরে অহিকে চিঠি লিখলো—সাবধান, নিজের সর্বনাশ করো না। বন্দনার মত জমাদারণী মেয়েকে কি তুমি চেন না? যে-সব মেয়ে ইচ্ছে করেও হাসতে পারে না চোখ তুলে ভদ্রভাবে তাকাতে পারে না, তাদের মতিগতি সম্বন্ধে একটু অ্যানালিসিস করলে দেখতে পাবে যে তারা শুধু চায়

তাহলে কি এ-বিয়ে ভেঙে যাবে? এর আগে দু'দু-বার তাদের আমরা ভেঙেছি। আমাদের নাগালের মধ্যে তারা এসেছিল, তাই। আজ কিন্তু ঘটনা সে নিয়মের মধ্যে নেই। তারা নিজের পৃথিবীতে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে? তবে কি কোনো উপায় নেই?

অহির বিয়ের নিমন্ত্রণলিপি অর্থাৎ সেই রঙীনখামের চিঠিগুলি ক্লাবের টেবিলের ওপরেই পড়ে রইল। কেউ আগ্রহ করে তুলে নিল না, সঙ্গেও নিয়ে গেল না। কোনো প্রয়োজন হয়তো ছিল না। প্রতি সন্ধ্যায় তাস খেলার সময় আমরা মাত্র দু'টি করে সেই রঙীন চিঠির সদ্ব্যবহার করতাম। সিগারেটের ছাই ফেলার জন্য কোনো পাত্র তাড়াতাড়িতে পাওয়া যেতো না, এ হেন সঙ্কটে গোটা দু'য়েক রঙীন

থামই ভস্মাধারের কাজ করতো। তাস খেলা শেষ হলে ক্লাবের মালী এসে সতরঞ্চি গুটিয়ে রাখতো। ছাই ঠাসা রঙীন থাম দু'টো ছুঁড়ে বাইরে ফেলে দিত।

অহি আর বন্দনার বিয়ে নিয়ে তর্জন-গর্জন ধিক্কার ভ্রুকুটি—সবই কেন জানি হঠাৎ চাপা পড়ে গেল। অহির বিয়ের রঙীন আবেদনের চিহ্নগুলি চোখের সামনে থাকা সত্ত্বেও ঘটনাটা যেন কারও মনে পড়ছে না। অহির বিয়ের মত একটা ঘটনা, একি নিজের তুচ্ছতায় চাপা পড়ে যাচ্ছে? মাত্র ক'দিন আগে যারা এই ব্যাপার নিয়ে ক্ষুব্ধ হয়েছিল, তারাও যেন আজ ভয় পেয়ে চুপ করে গেছে। বারীন সতু আর শশী এ বিষয়ে কোনো কথাই বলে না। শেষ রঙীন থামটা যেদিন আমাদের আড্ডা থেকে ভস্মাবশেষ নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল, সেদিন হঠাৎ আমার একবার কৌতূহল হয়েছিল—অহির বিয়েব দিনটা কবে?

তারপরেই মনে হলো—জেনেই বা কি হবে?

সন্ধ্যের দিকে খুব জোরে বৃষ্টি হয়ে থেমে গেল। ধীরে ধীরে বাড়ি থেকে বের হয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম। তারপর রওনা হলাম। আজই রাত্রে অহির বিয়ে। কেমন করে তারিখটা সঠিক জানতে পারলাম, জানি না। তবু বুঝলাম, পুলিনবাবুর বাড়ির দিকে চলেছি, একা একা, অন্ধকারে, চুপে চুপে।

বরের আসরে বসেছিল অহি। ছোট একটি সামিয়ানা, ওপরে একটি বেলোয়ারী ঝাড়ের আলো জ্বলছে। দু'টি ছোট কার্পেট পাতা। তার ওপরে বসে আছে জন-কয়েক বরযাত্রী—মিউনিসিপ্যালিটির মুন্সি হীরালাল, রামনাথ পানওয়ালা, অক্ষয় ময়রার ছেলে গোলক আরও ঐ ধরনের কয়েকজন। সবাই বেশ ভাল সাজগোজ করে এসেছে, বেশ সজ্জনের মত বসে আছে। বড় কৃতার্থ খুশি ও গর্বিতভাবে বরযাত্রীরা বসেছিল।

আসরের দিকে আর বেশি দূর এগিয়ে যেতে পারলাম না। আজ আবার অনেক বছর পরে অহির ঘুসি খেয়ে যেন রিং থেকে বাইরে ছিটকে পড়েছি। ঐ রিং-এর ভেতর অহি এখন সর্বেশ্বর। সামিয়ানার নীচে যেন এক ভিন্ন পৃথিবীর শান্ত আলো ফুটে রয়েছে। সেখানে সবচেয়ে স্পষ্ট হয়ে আছে অহি। দক্ষিণী ব্রজের চিবুক আর কপালের ওপরে চন্দনের ছিটে লেগে রয়েছে। কী সুন্দর দেখাচ্ছে অহিটাকে।

পিঁড়িতে বসিয়ে বন্দনাকে বিয়ের আসরে নিয়ে আসা হলো। বন্দনাও আশ্চর্য করলো। লাল চেলির শাড়ি জড়ানো সলজ্জ ও সহাস্য একটা মূর্তি ধনুকের মত বেঁকে রয়েছে। হিন্দুস্থানী পুরুত মন্ত্র পড়লেন। ভীড় নেই, কলরব নেই। আস্তে শাঁখ বাজলো। ভদ্র ষড়যন্ত্রের সব আবর্জনা সরিয়ে পুলিনবাবুর বাড়ির বাগান আর উঠো-নের এককোণে আজ একটা নতুন সংসারের রূপ স্পষ্ট ও কঠিন হয়ে উঠেছে। ইতি-হাসের দেবীবর মিশ্র আড়ালে আড়ালে যেন বেঁধে দিচ্ছেন। কাকা আর ক্লাবের সুগম্ভীর সমাজতত্ত্ব এইখানে এসে চরমভাবে ভুয়ো হয়ে গেছে।

হঠাৎ দেখলাম, আমার পাশে কতকগুলি অপরাধী দাঁড়িয়ে আছে—সতু শশী আর···একে একে সবাই এসেছে। যাক। কিন্তু বারীন কই?

একটু পরেই দেখলাম বারীনও আসছে! আমাদের পাশ কাটিয়ে চলে গেল, তবু আমাদের দেখতে পেল না। বিয়ের আসরটার দিকে এক লক্ষ্য রেখে ধীরে এগিয়ে গেল বারীন। একেবারে আসরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। হিন্দুস্থানী পুরুত তখন জোর চেঁচিয়ে মন্ত্র আবৃত্তি করে হোম করছিলেন। দেখলাম, বারীন হাঁ করে অহির দিকে তাকিয়ে আছে। বারীনকে দেখতে পেয়ে অহির সারামুখে অদ্ভুত একটা হাসি উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। বন্দনার মাথাটা আরো হেঁট হয়ে পড়লো।

কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে থেকেই বারীন উঠে গিয়ে বারান্দায় দাঁড়ালো। দেখলাম, পুলিন-গিন্নীর সঙ্গে বারীন একটা বচসা বাধিয়েছে। পুলিন-গিন্নী হাসছেন। তারপর পুলিনবাবুর কাছে গিয়ে বারীন হাত নেড়ে চেঁচিয়ে যেন একদফা ঝগড়া করলো। পুলিনবাবু হাসতে লাগলেন। পরমূহূর্তে বারীন কোথায় যেন চলে গেল এবং কয়েক মিনিট পরে ফিরে এল। বারীনের সঙ্গে বারীনের জেঠীমা, বারীনের বোন দীপ্তি, বারীনের ভাগ্নী ডলি।

বারীন হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে পড়লো। চাকরগুলোকে ধমক দিল। শেষে স্পষ্ট শুনতে পেলাম, পুলিন-গিন্নীর ওপর চটে গিয়ে বারীন গরম গরম কথা বলছে—'ছি ছি, কোনো একটা ব্যবস্থা নেই, আপনাদের এ কী রকমের কাণ্ড?'

দেখলাম দীপ্তি আর ডলি একটা ঘর থেকে জিনিসপত্তর টানাটানি করে বের করছে। বাসর ঘর তৈরি করছে। বারীনদের গোমস্তা এক ঝুড়ি ফুল দিয়ে গেল। ঘরের চৌকাঠের কাছে, একটা হ্যাসাক বাতি জ্বালাবার জন্য, খুটখাট করে কাজ করতে বসলো বারীন।

বারীনের কাণ্ডকারখানা দেখে আমাদের সঙ্কোচ কেটে গিয়েছিল। শেষকালে একেবারে প্রকাশ্যভাবে আসরের কাছে গিয়ে আমরা দেখা দিলাম। বিয়ে তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

বারীন আমাদের দেখেই বলে উঠলো—'এই যে, তোমরা শুধু গিলতে এসেছো, গিলেই যাও।'

এতক্ষণে সত্যি একটা বিয়ে বাড়ির কলরব জেগে উঠেছে। অহি আর বন্দনা আমার পাশ দিয়ে বাসর ঘরে চলে গেল। সবাই হাসি মুখে ইসারায় অভিনন্দন জানালাম। লজ্জায় ও আনন্দে অহি আমাদের দিকে একবার তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিল।

বেশ পেট ভরে গিলে নিলাম আমরা। বারীন তখনও ব্যবস্থা তদারক করছে। পুলিনবাবু সামনে এসে বললেন—'লজ্জা করে খেও না কিন্তু তোমরা। লুচি-মিষ্টি যত খুশি চেয়ে নেবে।'

আজ তিন বছর পরে পুলিনবাবু হঠাৎ আমাদের 'তুমি' বলে সম্বোধন করলেন।

এইবার আমরা বাড়ি ফিরবো। বারীন তখন বাসর ঘরের কাছে ঘুরঘুর করছিল। ডাকলাম বারীনকে।

বারীন সামনে এসে দাঁড়াল। বড় বেশি ক্লান্ত দেখাচ্ছিল বারীনকে। কপালটা

ঘেমে আছে, আস্তে আস্তে হাঁপাচ্ছে। মাথার উস্কো-খুস্কো চুলের ছায়ার আড়ালে ওর চোখ দুটো যেন অন্ধকারে লুকিয়ে থাকবার চেষ্টা করছে।

বারীনকে বললাম—'কি হে, আর কতক্ষণ? চল এবার।'

বারীন সেই মুহূর্তে ঘাবড়ে গিয়ে যেন ব্যস্ত হয়ে পড়লো—'না এখন আমি যাব না। কাজ আছে।'

বারীনের বাড়াবাড়ি দেখে আমরা বিরক্ত বোধ করছিলাম। হয়ত আর একটু পরেই খুব রেগে উঠতাম, কিন্তু আগে বারীন নিজের থেকেই বেফাঁস বলে ফেললে—'খুব কষে চটাচ্ছি, কিন্তু আশ্চর্য মেয়ে, প্রত্যেক কথায় শুধু হাসছে।'

সকলে এক সঙ্গে আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করলাম—'কাকে চটাচ্ছো? কার কথা বলছো? কে হাসছে?'

হঠাৎ সাবধান হয়ে উঠলো বারীন। সামলে গেল। সেই পুরাতন শ্লথ বিদ্রূপের সুরে, একটু লঘু কুৎসার হাওয়া জাগিয়ে শুধু কথার চালাকিতে শেষবারের মত আমাদের ফাঁকি দেবার চেষ্টা করলো—'তোমাদের মিসেস চ্যাটার্জি আবার কে? ফাইন হাসছে কিন্তু, যাই বল।'

আর বলবার কিছু নেই। বারীনকে রেখে আমরা রওনা হলাম। আরও কিছুক্ষণ থাকুক বারীন। আজ যেন ওর অন্তরাত্মা চরমভাবে হেরে গিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করছে। আজ বোধহয় বারীন সত্যিই অ্যানালিসিস করে বুঝতে পারছে যে—এই ধরনের মেয়েরা, যারা চোখ তুলে তাকাতে পারতো না, ইচ্ছে করেও হাসতে পারতো না, তারা শুধু চায় যে…

রাতের পাখি

বাগানের পাঁচিলের গা-ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে একটা নিমগাছ। এরকম চেহারার নিমগাছ এ পৃথিবীতে অনেক আছে। জঙ্গলে আছে, জাঙ্গালে আছে, সড়কের এপাশে আর ওপাশেও আছে। ওই যে ফল্গুর ওপারে, অনেক দূরে, একটা টিলার মাথার উপরে সেকেলে একটা কেল্লাবাড়ির ধ্বংস ইট-পাথরের হাড়গোড় ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে, সেখানেও ঠিক এমনই চেহারার নিমের একটা জঙ্গল অনেক ছায়া নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই নিমের দিকে আশ্চর্য হয়ে তাকাবার কিছু নেই। তাকিয়েও আশ্চর্য হবার কিছু নেই। গয়ার অক্ষয়বাবু কিন্তু তাঁর বাগানে এ-হেন একটা নিতান্ত সাধারণ ও সামান্য চেহারার নিমেরই দিকে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে আছেন।

কচি নয়, বুড়োও নয়, একটা মাঝারি আকারের নিমগাছ। অক্ষয়বাবু এখন একেবারে ঠিক-ঠিক হিসেব করে বলে দিতে পারবেন, যদি আজকের এই ফাল্গুন মাসটাকেও হিসেবের মধ্যে ধরা হয়, তবে এই নিমের বয়স হলো আট বছর এক মাস।

গত এক বছরের মধ্যে একটা দিনও অক্ষয়বাবু তাঁর বাড়ির পিছনের এই

বাগানে সকাল দুপুর বা বিকেলের কোন ক্ষণেও বেড়াতে আসেননি। মাত্র এক বিঘে জমি নিয়ে সব্জী ও ফুলের একটা বাগান। মস্ত বড় চেহারার একটা কদম আছে, আর ছোট-ছোট চেহারার কয়েকটা আম লিচু পেয়ারা আর আলুবোখরা আছে। লোকের চোখে এমন কিছু বাহারে বাগান নয়; কিন্তু অক্ষয়বাবুর কাছে খুবই আদুরে বাগান। রিটায়ার করবার পর অক্ষয়বাবুর জীবনের অবসর নিতান্ত একটা আলস্য হয়ে নেতিয়ে পড়েনি। এই বাগানই তাঁর শ্রান্ত জীবনের অচঞ্চল অবসরের প্রাণটাকে নতুন একটা আগ্রহ আর ব্যস্ততা দিয়ে একটু চঞ্চল করে রেখেছে। সন্ধ্যাবেলা দেখে গেলেন, গোলাপের কুঁড়ি সামান্য একটু ফুল্ল হয়েছে, পাপড়ির মুখটা সামান্য একটু খুলেছে। সকাল হতেই সব কাজের আগে একবার বাগানে এসে দেখে যান, কুঁড়িটা ফুটলো কি না। যদি দেখা যায়, ফুটেছে কুঁড়ি, বেশ উৎফুল্ল হয়ে হাসছে সেই গাজিপুরী গোলাপ, তবে আবার অন্য সব কাজের আগে একবার ঘরের দিকে ফিরে আসবেন, আর ঘরের ভিতরের দিকে তাকিয়ে বলে উঠবেন—গাজিপুরী গোলাপ এবার ফুটতে শুরু করেছে, সুচারু।

রেলওয়ের সার্ভিসে ছিলেন অক্ষয় মিত্র, পুরো চল্লিশটি বছর। সে জীবন ছিল নিরন্তর দৌড়াদৌড়ির জীবন। মাসের পনরটা দিন ট্রেনেই কেটেছে। সঙ্গে কাগজপত্রের ফাইলের বোঝা আর সঙ্গী একজন চাপরাশি। এক স্টেশনে ট্রেনে উঠেছেন, অন্য স্টেশনে নেমে বুকিং অফিসের খাতার যত হিসাবের কিলবিলে অঙ্কের যোগ-বিয়োগের পরীক্ষা করেছেন। না, এখন আর হিসেবও নয়, অঙ্কও নয়, আর নিরন্তর ট্রেনযাত্রার ঝাঁকুনিও নয়। এখন তিনি নিজের ইচ্ছায় আস্তে আস্তে হাঁটেন; যখন খুশি তখন বাগানের ঘাসের উপর থমকে দাঁড়ান আর দেখতে থাকেন, ওই ছোট্ট কপি ক্ষেতের খাত দিয়ে কলকল করে জল গড়িয়ে যাচ্ছে। কুয়ো থেকে জল তুলছে আর ঢালছে বিশ্বেশ্বর, বিশুমালী।

কিন্তু কোনদিনও তিনি এই নিমের দিকে কখনও চোখ তুলে তাকিয়েছেন কি না সন্দেহ। তাকিয়ে থাকলেও ঠিক এরকম দুটো অদ্ভুত স্নেহাক্ত বিস্ময়ের চোখ নিয়ে নিশ্চয় তাকাননি। বাগানের পাঁচিল-ঘেঁষা একটা নিমগাছ, এটা এই বাগানের চেহারার বাহার বাড়িয়ে তোলেনি। বাগানটার কাছেও এই নিমগাছটা নিশ্চয় একটা শোভাও নয়। তার চেয়ে অনেক বেশী শোভা ধরে ওই কদম, ভাদ্র মাসের বৃষ্টির জলের ছোঁয়া পেয়ে যখন নতুন কোরকে ছেয়ে যায় গাছটা।

এই এক বছরের মধ্যে এক দিনের জন্যেও বাগানে বেড়াতে আসেননি অক্ষয় বাবু; তার কারণ এই যে, এই একটা বছর তাঁর বুকের ভিতরে যেন শুধু শুকনো ধুলো উড়েছে; আর চোখের কাছে ভেসেছে ভয়ানক এক ছাই-ছাই শূন্যতা। অমল, অক্ষয়বাবুর একমাত্র ছেলে অমল আর নেই। প্রায় এক বছর হলো অমল একদিন অক্ষয়বাবুর এই বাড়ির সব আনন্দ মিথ্যে করে দিয়ে চলে গিয়েছে। অদ্ভুত একটা জ্বর, সে জ্বরের মতিগতির রহস্য কোন ডাক্তারই ধরতে পারলেন না।

পুরো তিন দিন সেই জ্বরে বেহুঁশ হয়ে থাকবার পর শেষে মরেই গেল ছেলেটা। আটাশ বছর বয়সের ছেলে, এঞ্জিনিয়ার ছেলে, মাত্র দু'বছর আগে যে ছেলের বিয়েও হয়ে গিয়েছিল, যার বউ বাইশ বছর বয়সের একটা মেয়ে, সেই তপতীও এখন এই বাড়ির একটি ঘরের ভিতরে চুপ করে একটা চেয়ারের উপর বসে লেস বুনছে।

আজ যে আবার হঠাৎ, পুরো একটি বছর পরে বাগান দেখতে বের হয়েছেন অক্ষয়বাবু, তার কারণ এই নয় যে, তিনি নিজেই জোর করে নিজেকে বারান্দার চেয়ার থেকে তুলে ধরেছেন আর হাঁটিয়ে হাঁটিয়ে বাগানের ভিতরে নিয়ে এসেছেন। আজও তাঁর বুকের ভিতরে শুকনো ধুলো উড়ছিল, কিন্তু ওই তপতীর একটা কথা শুনেই যেন সেই ধুলো হঠাৎ একটু থিতিয়ে গেল। তপতী নিজেই এসে বলে গেল, বাবা আপনি এরকম চুপ করে বসে থাকেন কেন? অন্তত এই বাগানে একটু ঘুরে-ফিরে বেড়ালেও তো পারেন।

কথাটা সুচারুও শুনতে পায়। ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে এসে তপতীর মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন সুচারু। চিক্‌চিক্ করে সুচারুর দুই চোখ; যেন তাঁরও প্রাণের একটা দীর্ঘশ্বাসের একটা গুমোট আবার একটু ভেঙে গেল। তারই ছেলে অমল যে-মেয়ের জীবনটাকে একটা শূন্যতার মধ্যে বসিয়ে রেখে দিয়ে চলে গিয়েছে, সেই মেয়ে নিজেই উঠে এসেছে, আর এই বাড়ির স্তব্ধ প্রাণটাকে বাগানের হাওয়াতে বেড়াতে যাবার জন্য অনুরোধ করছে।

তপতীর অনুরোধের কথাটা শুনে অক্ষয়বাবুর নিদারুণ বিষাদের ওই মুখেও যেন একটা সান্ত্বনার হাসি ফুটে ওঠে।—হ্যাঁ, যাচ্ছি। তোমার লেস বুনতে বোধহয় আরও অনেক সুতো লাগবে।

তপতী—হ্যাঁ। যা ছিল সব ফুরিয়ে গিয়েছে।

অক্ষয়বাবু—রঙীন সুতো কিনে আনবো? খুব সুন্দর রেশমী সুতো?

তপতী—আনুন।

তখনই চাকর গোবিন্দকে ডাক দিয়ে আর টাকা দিয়ে বাজারে পাঠিয়ে দিলেন অক্ষয়বাবু—সবচেয়ে ভাল রেশমী সুতো, দাম যা-ই হোক না কেন, এখুনি কিনে নিয়ে এস।

তারপর উঠে এসে বাগানে বেড়াতে শুরু করেছেন। তারপর এই নিম গাছের দিকে তাকিয়েছেন। থমকে দাঁড়িয়েছেন। মনে পড়েছে অক্ষয়বাবুর সে-বছর ছুটিতে রুড়কি থেকে এসে যখন একটা মাস বাড়িতে ছিল অমল, তখন একদিন হঠাৎ কোথা থেকে একটা নিমের চারা নিয়ে এসে নিজের হাতেই পাঁচিলের এইখানে পুঁতে দিয়েছিল। অক্ষয়বাবুও তখন এই বাগানের ঠিক এখানেই দাঁড়িয়ে ডালিমের গাছটাকে দেখছিলেন। আর, অমলকে দেখতে পেয়েই হেসে ফেলেছিলেন—ওটা কিসের চারা অমল?

—নিমের চারা।

—এত গাছ থাকতে নিম কেন ?

—শুনেছি, নিমের হাওয়া খুব ভাল।

আজ অমল নেই; কিন্তু ওর পোঁতা ওই নিমগাছটা আছে, যে গাছটা কোনদিনও অক্ষয়বাবুর সামান্য একটু, শুধু একটু চোখ দিয়ে দেখা আদরও পায়নি, সেই গাছটা আজ যেন অক্ষয়বাবুর দুই চোখের সব আদর কেড়ে নেবার জন্যে আস্তে আস্তে মাথা দোলাচ্ছে।

নিমের গোড়াতে অনেক আগাছার ভিড; তারই ভিতর থেকে মাথা তুলে বের হয়ে এসেছে তেলাকুচার লতা। নিমটার গা বেয়ে উঠে তেলাকুচার লতাগুলি নিমের পাতাভরা মাথাটাকে ছেয়ে ফেলেছে। ঝুলে ঝুলে হাসছে তেলাকুচার টুকটুকে লাল পাকা-ফলগুলো। দুটো টিয়ে পাখিও এসে নিমের ডালে বসেছে। পাকা তেলাকুচা খেয়ে খেয়ে টিয়ের খুশি-প্রাণের ডাকও বেজেই চলেছে। যে টিয়ের ডাকের শব্দ কোনদিনও শুনতে ভাল লাগেনি, সে টিয়ের ডাক শুনতে আজ বেশ ভালই লাগে।

কিন্তু এই নিমের কথাটা তপতীর কাছে গল্প করে না বলাই ভাল। শুনলে তপতীর মন আবার নিঝুম হয়ে যাবে, মুখটা করুণ বিষাদে ভরে যাবে। দোতলার যে-ঘরটা তপতীর ঘর, তারই জানালার কত কাছে দাঁড়িয়ে আছে এই নিমগাছ। যদি ঝড়ের বাতাসে খুব বেশি জোর থাকে, আর এই নিমের মাথাটাকে একটু বেশি দুলিয়ে দেয়, তবে একটা ডালের পাতা যে সত্যিই তপতীর ঘরের জানালাটাকে ছুঁয়ে ফেলবে। তখন তো তপতীর ওই শান্ত চোখ দুটো আনমনা হয়ে এই নিমেরই দিকে তাকিয়ে থাকবে। চোখ দুটো ঝাপসা হয়েও যাবে। তপতীকে না বলাই ভাল যে, এই নিমের চারাটা একদিন অমল নিজের হাতেই পুঁতেছিল।

অমল মারা যাবার পর এই এক বছরের মধ্যে শুধু একবার, এই তিন মাস হলো, তপতী দুমকার বাড়িতে গিয়ে মাত্র দশটা দিন ছিল। কথা ছিল, সেখানে একটা মাস থাকবে তপতী। কিন্তু তপতী যেন দুমকার বাড়ির ন'টা দিন কোনমতে সহ্য করেছে, তারপর একটা দিন শুধু ছটফট করেছে, তার পরের দিনেই আবার গয়াতে ফিরে এসেছে। তপতীকে গয়াতে পৌঁছে দিয়ে গিয়েছে তপতীর দাদা সত্যেন। সত্যেন দুঃখ করে বলেছে—অনেক করে বলেছি, কিন্তু তপতী আর থাকতে চাইলো না।

দুমকার বাড়ি, তপতীর দাদা সত্যেনের বাড়ি; সেখানে তপতীর বউদি আছেন, সত্যেনের তিনটে ছেলে-মেয়ে আছে, তিন বছর আগে একদিন যে-বাড়িতে ওই সত্যেনই তার বোন তপতীর বিয়েতে সম্প্রদানের মন্ত্র পড়েছে, সে-বাড়িতেও থাকতে শান্তি পেল না তপতী। ছুটে চলে এল গয়ার এই বাড়িতে, যে-বাড়িতে ওরই স্বামী অমলের যত স্মৃতির ছোঁয়া আজও লেগে রয়েছে।

এটা কল্পনাও করতে পারেননি অক্ষয়বাবু, সুচারুও পারেননি। তাঁদের শোকের বেদনার মধ্যেও যেন একটা অপরাধের লজ্জা কাঁটার মত বিঁধেছিল। অমল তো গেল, তপতীর ভাগ্যটাকেও তো শূন্য করে রেখে দিয়ে গেল। তপতীকে সান্ত্বনা দেবার ভাষাটাও যে কোন যুক্তি খুঁজে না পেয়ে এলোমেলো একটা অর্থহীন অনুনয়ের প্রলাপ হয়ে ওঠে।

সেই তপতী নিজেই শান্ত হয়েছে, আর এই বাড়ির বাপ-মার শোকার্ত প্রাণকেও যেন একটা সান্ত্বনা দিয়ে যেমন বিস্মিত তেমনই শান্ত করেও দিয়েছে।

দুমকা থেকে সত্যেনও কয়েকবার চিঠি লিখে অক্ষয়বাবুর সত্তর বছর বয়সের প্রাণে একটা নতুন সান্ত্বনা ছড়িয়ে দিয়েছে।—তপতী এখন আপনাদেরই মেয়ে। ওর তো নিজের বাবা মা কেউই নেই। কাজেই, আপনাদের কাছে থাকতে পারলেই তপতী যে শান্ত হবে আর শান্তি পাবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

সুচারুর কাছে কথাটা বলতে গিয়ে অক্ষয়বাবুর চোখ ছলছল করে উঠেছিল—ছেলে গেল, কিন্তু মেয়ে পেলে, সুচারু।

বাইরের লোক হঠাৎ এই বাড়িতে ঢুকে সোজা ভিতরের এই বারান্দায় এসে দাঁড়ালে দেখতে পাবে, সত্যিই এক মেয়ে তার বাবার চেয়ারের কাছে একটা বেতের মোড়ার উপর চুপ করে বসে আছে আর লেস বুনছে। বিকেলবেলা যদি সোজা দোতলাতে গিয়ে একটা ঘরের ভিতরে কেউ উঁকি দেয়, তবে দেখতে পাবে, মেয়ে চুপ করে একটা গল্পের বই পড়ছে, আর মা তার মাথায় চিরুনি বুলিয়ে চুল বেঁধে দিচ্ছেন। তপতী এখন এই বাড়ির শান্তি ও সান্ত্বনা। আর তপতীর কাছে এই বাড়ি এখন অফুরান আদর আর যত্ন। তেইশ বছর বয়সের বিধবা তপতীর জীবন চিরকালের নীড় পেয়ে গিয়েছে।

অমল যে-ঘরে থাকতো, সে-ঘরে নয়, তপতী থাকে ঠিক তার পাশের ঘরে। অক্ষয়বাবুর ইচ্ছা, আর-একটু দূরের কোন ঘর হলে ভাল হতো। মনে আছে অক্ষয়বাবুর, এই সেদিনও এক সন্ধ্যাবেলায় অমলের এই দরজা-বন্ধ ঘরের কাছে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল তপতী। অক্ষয়বাবুর বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে। এগিয়ে যেয়ে তপতীর মাথায় হাত বোলাতে থাকেন অক্ষয়বাবু। আর সুচারু এসেই তপতীকে হাত ধরে টেনে নিয়ে গেলেন—চল, এখন আমার কাছে বসে থাকবে, লক্ষ্মীটি!

অমলের বইগুলিকে আলমারিতে তুলে বন্ধ করে রাখা হয়েছে, যেন দেখতে না পায় তপতী। যে আলনাতে অমলের জামা-কাপড় থাকতো, সেটা এখন অন্য ঘরে। অমলকে মনে পড়িয়ে দেবে, এরকমের যা-কিছু এখনও এবাড়িতে আছে, তার সবই আড়ালে সরিয়ে দিতে হয়েছে। কিন্তু সরিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়নি অমলের ফটোটাকে, এটা তপতীর ঘরের [illegible]ল একটি সুস্থির স্মৃতির ছবি হয়ে রয়েই গিয়েছে। ওই ফটোটাকে সরিয়ে [illegible] কথা কখনও মনেও

হয় না অক্ষয়বাবুর। ওটা তো থাকবেই। ওটাও না থাকলে আর কী নিয়ে থাকবে তপতী? ওই ফটো তপতীর প্রাণের মধ্যে আছে বলেই তো তপতী এই বাড়িকে জীবনের চিরকালের ঠাঁই করে নিয়েছে। কিন্তু যেন আর কান্না-কাটি না করে তপতী; যেন হঠাৎ চোখ দুটোকে করুণ করে আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে একটা ঘণ্টা পার না করে দেয়। যেন হাতের লেস হঠাৎ ফেলে রেখে দুটো উদাস চোখ নিয়ে আর স্তব্ধ হয়ে বসে না থাকে।

তাই এই নিমগাছের কথাটা তপতীর কানে তোলবার দরকার নেই; উচিতও নয়। এখন বরং একবার · ।

হ্যাঁ, মনে হয় আজ নিজেই একবার বাজার ঘুরে এলে ভাল হয়। সুচারুকে জিজ্ঞেস করলেই বলে দেবে, কী খেতে ভালবাসে তপতী? গয়ার বাজারে এখন কমলালেবু এসে গিয়েছে মনে হয়!

বাগান থেকে ফিরে এসে আর ঘরে ঢুকে সুচারুকে জিজ্ঞাসা করেন অক্ষয়বাবু—তপতী কি এবারও সারাটা শীতকাল খালি পায়েই থাকবে? তুমি তপতীকে একটু বুঝিয়ে বল। এখনই বল। আমি আজই বাজারে গিয়ে তপতীর জন্যে নতুন একজোড়া জুতো আনতে চাই।

সুচারু—তুমি আগে নিয়ে এসো তো; তারপর আমি মেয়েকে বুঝিয়ে রাজী করাবোই।

দুই

বাঃ, কী চমৎকার পাতা ধরেছে! নিম গাছটার দিকে তাকিয়ে অক্ষয়বাবুর চোখের এত খুশি হবার কোন অর্থ হয় না। পৌষে-মাঘে সব নিমেরই পাতা ঝরে যায়, আর ফাল্গুন-চৈত্রে নতুন পাতায় ভরে যায়। ঘন সবুজ ফিকে সবুজ আর ঘষা তামার মত রঙের কচি পাতা। অক্ষয়বাবুর মনের মধ্যেই যে একটা বিস্ময় আছে, সেটাই তাঁর চোখ দুটোকে আশ্চর্য করে দেয়, যখনই বাগানে বেড়াতে এসে এই নিমগাছের দিকে হঠাৎ একবার তাকান। অমলের সেই চেহারাটাও কত স্পষ্ট করে মনে পড়ে যায়। চোখে চশমা, গায়ে গেঞ্জি, হাতে ঘড়িটাও আছে; একটা শাবল দিয়ে মাটি খুঁড়ছে অমল। নিমের চারাটাকে পুঁতে দিয়েই মাটির উপর জল ছিটিয়ে দিল অমল।

মাসের পর মাস কেটে যায়; বাগানে বেড়াতে এসে অক্ষয়বাবুর চোখে এই নিমের এক-একটা অদ্ভুত কীর্তির কাণ্ডও চোখে পড়ে। এক জোড়া কালো বুলবুল এসে নিমের পাতার আড়ালে উসখুস করে এক ডাল থেকে আর এক ডালে লাফিয়ে লাফিয়ে বসছে, ঘুরছে, আবার খামকা চমকেও উঠছে।

আজকাল মাঝে মাঝে তপতীকে সঙ্গে নিয়ে বাগানে বেড়াতে বের হন অক্ষয়বাবু। একদিন নিমগাছের একটা কাণ্ড দেখে হেসে ফেললেন, তপতীও হেসে ফেলে। কোথা থেকে একটা ঘুড়ি কেটে এসে এই নিমের মাথার উপর

উড়ছে। ঘুড়ির সুতো নিমের পাতায় আর ডালে জড়িয়ে গিয়েছে। একদল বাচ্চা ছেলে পাঁচিলের উপর উঠে আর পড়ি-মরি করে দৌড়ে দৌড়ে নিমগাছের দিকে এগিয়ে আসছে। কিন্তু বাচ্চার দল যেই না এসে গাছটাকে ছুঁয়েছে, অমনি ঘুড়িটা যেন বাতাসে মাথা ঠুকে দিয়েই উপরে উঠে গেল, তারপর দুলতে দুলতে অনেক উঁচু মগডালের মাথার উপর পড়ে আটকে রয়ে গেল।

—ও বিশু! মালীকে ডাক দিয়ে কথা বলেন অক্ষয়বাবু—গাছটার গোড়াতে এত আগাছা কেন? ওগুলো উপড়ে ফেলে জায়গাটাকে একটু পরিষ্কার করে দাও।

নিমফুল ফোটে, মৌমাছি আসে, অলস ঘুঘু সারা দুপুর এই নিমগাছের ডালে ডালে আস্তে আস্তে হাঁটে আর নিমফলে ঠোকর দেয়। বিশুমালীকে জিজ্ঞাসা করেন অক্ষয়বাবু—আগেও কি এত মৌমাছি আসতো, বিশু?

—হ্যাঁ বাবু, বহুৎ পতঙ্গভি আ গা হ্যায়।

অক্ষয়বাবু—কী পতঙ্গ; প্রজাপতি, ফড়িং, এই সব?

—হ্যাঁ বাবু।

—কিন্তু তেলাকুচা লতা কোথায় গেল?

—ও তো বর্ষাতমে আওয়েগা।

বিশুমালীও একদিন একটা গল্প বলে অক্ষয়বাবুর চোখের বিস্ময় আরও নিবিড় করে দিল। একটা রাতের পাখি রোজই এই নিমগাছে এসে ঘুমোয়, আর ভোর হলেই চলে যায়।

—কী পাখি? জিজ্ঞাসা করেন অক্ষয়বাবু।

নাম বলতে পারে না বিশু; কারণ বিশু সেই পাখিটাকে খুব স্পষ্ট করে আর ভাল করে কোন দিনও দেখতে পায়নি।

একদিন বিকালে যখন খুব জোরে একটা ঝড় দেখা দিল, তখন বাড়ির বারান্দাতে বসেই দেখতে পান অক্ষয়বাবু, নিমের ছোট্ট একটা কচি ডাল হঠাৎ ছিটকে গিয়ে একেবারে দোতলার ঘরের বন্ধ জানালার কাঁচের উপর গিয়ে আছড়ে পড়লো। জানালাটা খুলে যায়। আর দেখাও যায়, তপতী একেবারে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তপতীর চোখ দুটোও এত আকুল হয়ে কে জানে কী দেখছে। ঝড়ের বাতাসে আলু-থালু হয়ে উড়ছে তপতীর ভাঙা বেণীর চুল।

সুচারুকে ডাক দিয়ে কথা বলেন অক্ষয়বাবু।—মেয়ে যে এখনও বড় বেশি ভাবছে। কী ভাবে বলতে পার?

—যাকে না ভেবে থাকতে পারে না, তাকেই ভাবছে।

—আর কিছু ভাবছে না তো?

সুচারু—দুমকা থেকে সত্যেন বার বার চিঠি দিচ্ছে।

—কাকে চিঠি দিচ্ছে?

—তপতীকে, আর আমাকেও।

—কেন ?

—এইবার কিছুদিনের জন্য, অন্তত এক মাসের জন্য তপতীকে ছেড়ে দেবার জন্য অনেক করে আমাকে লিখেছে সত্যেন।

—সত্যেন কেন এত অনুরোধ করে, বুঝি না।

—তোমারই বা এটা কী রকমের কথা হলো ? অনুরোধ না করে কি পারে ? মায়ার টান আছে বলেই করে। মুশকিল হলো, তপতী যেতে চায় না। আমি অনেক করে বলেছি, তবু রাজী হলো না।

—আমি বলি, এক মাস নয়, আট-দশ দিনের জন্য তপতী একবার ডুমকা ঘুরে এলেই পারে।

—আমি তা-ও বলেছিলাম, কিন্তু তপতী রাজী নয়।

—কী বলে তপতী ?

—তপতী বলে, যেতে যখন ইচ্ছেই করে না, তখন যেয়ে কাজ নেই। দাদা বরং একবার এসে আমাকে দেখে যাক।

—অক্ষয়বাবু বলেন—আমিও তো তাই বলি।

তপতী যে এই বাড়ির আলো-ছায়ার সঙ্গে কীভাবে ওর মন-প্রাণ মিশিয়ে দিয়েছে, সেটা কোন দিন সত্যেনের চোখে পড়েনি বলেই সত্যেন বার বার চিঠি লিখে তপতীকে ডুমকাতে নিয়ে যাবার অনুমতি পেতে চায়।

অক্ষয়বাবু আর সুচারু সাবধান হলে হবে কি ? তপতী যখন-তখন অমলের ঘরের দরজার তালা খুলে ঘরে ঢোকে, আর চুপ করে বসে থাকে। অমলের বইগুলির ধুলো ঝেড়ে দিয়ে আবার আলমারির ভিতরে সাজিয়ে রাখে। আর, অমলের টেবিলের দেরাজ নিজেরই একটা চাবি দিয়ে খুলে নিয়ে একগাদা চিঠি বের করে, অমলেরই কাছে লেখা তপতীর যত চিঠি। তিন-চারটে চিঠি পড়া হয়ে গেলেই আর শান্ত হয়ে থাকতে পারে না তপতী। টেবিলের উপর মাথাটাকে নামিয়ে দিয়ে ফুঁপিয়ে ওঠে, এই চিঠির সব আশা মিথ্যে করে তুমি চলে গেলে কেমন করে ?

রাত যখন হয়, তখন নিজের ঘরে বসে বাক্সের ভিতর থেকে বের করা চিঠিগুলোকে পড়ে ; তপতীর কাছে লেখা অমলের চিঠি পড়তে পড়তে তপতীর চোখে এখনও পুরনো অভিমান ছটফট করে, ভুরু কুঁচকে যায়। আবার হেসেও ফেলতে হয়। না বুঝে কী ছাই কত রাগের কথাই না লিখেছে।

সত্যেনের চিঠি এলে খুশি হয় তপতী, কিন্তু চিঠি পড়লেই সেই খুশি মিথ্যে হয়ে যায়। সুচারুর কাছে নিজেই এসে বলে যায় তপতী, দাদা আমাকে ভয়ানক বিরক্ত করছে, মা। আমি কিন্তু ডুমকা যাব না।

অক্ষয়বাবুও সত্যেনের চিঠি এলে অস্বস্তি বোধ করেন। সত্যেনের চিঠি যেন হাত বাড়িয়ে অক্ষয়বাবুর জীবনের শান্তিটাকে টানাটানি করতে চাইছে। তপতীর ভবিষ্যতের জন্য তো সত্যেনকে ভাবতে হয় না। সে-বিষয়ে ভাবনা

করবার সব দায় নিয়েছে যারা, তারাই ভাবছে। এবাড়ির বুড়ো-বুড়ির জীবনের মেয়াদতো প্রায় ফুরিয়েই এসেছে। অক্ষয় মিত্রের যা-কিছু আছে, এই বাড়ি আর ব্যাঙ্কের খাতায় জমা করা সব টাকা, সবই তপতীর নামে লিখে দেবার জন্য তিনি তৈরীও হয়েছেন। উকিল কান্তিবাবুর সঙ্গে কথা বলাও হয়ে গিয়েছে। তপতীর ভবিষ্যৎ কখনও টাকার অভাবে পড়ে দুঃখ পাবে না।

কিন্তু সত্যেন এসে হাজির। সত্যেনকে অনেক বুঝিয়ে ফিরিয়ে দিতে চায় তপতী। কিন্তু সুচারু আবার তপতীকে অনেক বুঝিয়ে রাজী করাতে চান, তোমার দাদা যখন নিজেই এসেছেন, তখন একবার অন্তত সাতটা দিনের জন্য দুমকা ঘুরে এস।

তপতী—আমার খুব খারাপ লাগবে, মা।

সুচারু—আমাদেরও তো খুব খারাপ লাগবে। কিন্তু সহ্য করতেও হবে।

সুচারুর ওপরে রাগ করে সোজা অক্ষয়বাবুর কাছে গিয়ে ডুকরে ওঠে তপতী—আমাকে যেতে হবে নাকি বাবা?

—না না। তুমি যাবে না। চেয়ার থেকে ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়ান আর টলমল করতে থাকেন অক্ষয়বাবু। আমি সত্যেনকে স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিচ্ছি।

সুচারু বাধা দিলেন বলেই আর সত্যেনকে স্পষ্ট করে বোঝাতে পারলেন না অক্ষয়বাবু।

দুপুর বেলাটা খাওয়া-দাওয়ার পর নীচের তলার নিরিবিলি ঘরে শুয়ে পড়ে থাকে সত্যেন। আর উপর তলার একটি ঘরে বিছানার উপর তপতীর এক পাশে বসে থাকেন অক্ষয়বাবু, আর-এক পাশে সুচারু। মেয়েকে সাত দিনের জন্য দুমকা যেতে দিতে রাজী হয়েও যেন রাজী হতে চাইছে না দু'টি অদ্ভুত মমতার প্রাণ।

কথা বলতে গিয়ে ভিজে যায় তপতীর চোখের পাতা।—আমার এই বিছানা যেন ঠিক এই রকম পাতা থাকে, মা। গুটিয়ে রাখবে না।

সুচারু—সব ঠিক করে রাখবো আমি, তুমি কিছু ভেব না।

তপতী—আমি কিন্তু সাতদিনের বেশি একটা দিনও দুমকাতে থাকতে পারবো না, বাবা। সে-কথা দাদাকে ভাল করে বলে দিন।

অক্ষয়বাবু—আমি বলে দিয়েছি তপতী, তুমি কিছু ভেব না।

সন্ধ্যা হতেই ট্যাক্সি এল। রওনা হতে হবে। অক্ষয়বাবুর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে কাঁদতে থাকে তপতী। অক্ষয়বাবুর গলা ঘড়ঘড় করে।—আমি যে কী বলবো বুঝতে পারছি না।...সাবধান সত্যেন, মেয়ে যেন হঠাৎ কোন অসুখে-বিসুখে না পড়ে।

সত্যেন করুণভাবে হাসে—না না, আপনি চিন্তা করবেন না।

সুচারু বলেন—রাত দশটার বেশি এক মিনিটও দেরী না করে খাবার খেয়ে নিও।

খাবারের বাস্কেটটা সত্যেনের হাতের কাছে এগিয়ে দেন সুচারু।

চলে গেল ট্যাক্সি। অক্ষয়বাবুর টলমলে শরীরটা এবার ক্লান্ত হয়ে চেয়ারের উপর বসে পড়ে।

অনেকক্ষণ পরে সুচারু এসে যখন কাছে দাঁড়ান আর বেচারা সত্যেনের কথা বলতে গিয়ে হেসে ফেলেন, তখন অক্ষয়বাবুও হাসেন। সত্যেন বলেছে,—আমার বোনের কাণ্ডটা দেখছেন তো? আমি যেন কেউ নই, নেহাৎই একটা বাইরের মানুষ। তপতী আমাকে মুখের ওপর কত স্পষ্ট করে বলে দিল, বাবা আর মা-কে ছেড়ে কোথাও থাকতে আমার ভাল লাগবে না, আমার ভয় করবে।

সুচারু—যাক্ গে, সাতটা দিন তো দেখতে দেখতে পার হয়ে যাবে, তুমি আর অত মন খারাপ করো না।

সাতদিনের ছ'টা দিন পার হবার পর রাত্রিবেলা শুতে যাবার আগে অক্ষয়-বাবু বলেন, তাহলে কাল সকালেই একবার স্টেশন যেতে হয়, কী বল?

সুচারু বলেন—যেও।

সেই রাত্রিতে যখন মাঠের ঝিঁঝির ডাক ক্লান্ত হয়ে এসেছে, তখন বাগানের পাঁচিলের কাছে ঝুপ করে একটা শব্দ হয়। জেগেই ছিলেন অক্ষয়বাবু, কাজেই শব্দটাকে বেশ স্পষ্ট করে শুনলেন। কী ব্যাপার? ঘরের জানালা খুলে বাগানের দিকে তাকালেন। তারপরেই দেখতে পেলেন, এক হাতে লণ্ঠন আর আর-এক হাতে লাঠি নিয়ে পাঁচিলের কাছে ছুটোছুটি করছে বিশুমালী। চেঁচিয়ে ওঠে বিশু—চোর! চোর!

তারপরেই বিশু আসে। জানালার কাছে দাঁড়িয়ে কথা বলে আর হাঁপায়—ধরতে পারা গেল না! চোরটা নিমগাছের একটা ডাল ধরে উপরে উঠেছে, পাঁচিল টপকে ওদিকে পড়েছে, আর ভেগেছে।

অক্ষয়বাবু—কিছু নিতে পেরেছে?

বিশু—না।

ভোর হতে আর বেশি বাকি নেই। জেগেই বসে থাকেন অক্ষয়বাবু। আর ভোর হতেই ঘর ছেড়ে বাইরে এসে বাগানের দিকে এগিয়ে যেতে থাকেন। সবার আগে মনে পড়ে, আজ তপতীর ফিরে আসবার কথা। সেই ট্রেনের আজ সকাল ন'টার আগেই গয়াতে পৌঁছে যাবার কথা।

বাগানে ঢুকেই সবার আগে চোখে পড়ে, বিশুমালী নিমগাছটার কাছে দাঁড়িয়ে কী যেন করছে।

বিশুকে অনেকবার বলেছেন অক্ষয়বাবু, তুমি নিমগাছ থেকে দাঁতন ভাঙবে না। বাড়ির সামনে সড়কের পাশে একটা নিমগাছ আছে, যত খুশি দাঁতন ওই গাছ থেকে ভেঙে আনতে পার।

—এই বিশু কেয়া হোতা হায়! এগিয়ে যান অক্ষয়বাবু। এ কী কাণ্ড,

নিমের মস্ত বড আর শক্ত একটা ডাল ভেঙে ঝুলে রয়েছে। সেটাকেই হাত দিয়ে ঠেলাঠেলি করে একেবারে ভেঙে ফেলবার চেষ্টা করছে বিশু।

বিশু বলে—চোর তোড দিয়া। চোর পালিয়ে যাবার সময় নিমের এই ডাল ধরে লাফ দিয়ে পাঁচিলে উঠেছিল। চোরেরই শরীরের ভারে ভেঙে গিয়েছে এত বড় এই ডালটা।

সকাল আটটা বাজতেই অক্ষয়বাবুর স্টেশনে যাবার সব ব্যস্ততা স্তব্ধ হয়ে গেল। কারণ দুমকা থেকে একটা চিঠি এসেছে। তপতী লিখেছে, এখানে এরা আমাকে কিছুতেই ছাডতে রাজী হচ্ছে না, বাবা। আরও সাতটা দিন থাকতে বলছে। আমার একটুও ভাল লাগছে না; আমি বডজোর আর তিন-চারদিন এখানে থেকেই গয়া ফিরে যাব। আপনি চিন্তা করবেন না।

তিন

সে চিঠির সাতদিন পরেও নয়, সাত মাস পরেও নয়, আজ প্রায় আট মাস হলো তপতী দুমকা থেকে গয়াতে ফিরে আসতে পারেনি। তবে তপতীর চিঠি এসেছে। প্রথম একমাসে তিনটে চিঠি, তারপর চার মাস প্রতি মাসে একটা করে চিঠি, তারপর শেষ তিন মাসে মাত্র দুটো চিঠি।

চার মাস আগেরও একটা চিঠিতে লিখেছিল তপতী—আমার ঘরের টেবিলে যে-জিনিস যেখানে আছে, ঠিক সেখানেই যেন থাকে, মা। আমার চিঠি থাকে যে কাঠের বাক্সটাতে, একবার দেখবেন তো, সে বাক্সটার তালা ঠিক বন্ধ আছে কি না। বাক্সটার উপরে কোন বাজে জিনিস যেন চাপিয়ে না রাখা হয়।

দু'মাস আগে তপতীর যে চিঠি এসেছে, তার অনেক কথার মধ্যে একটা ভাল কথাও আছে।—আমার শরীর ভাল, দুমকাতে শালবনের পাশে পাশে বেড়াবার খুব ভাল জায়গা আছে। গয়ার ফল্গুর মত অত চওড়া নয়, আমাদের দুমকার শালবনের কাছের নদীটা ছোট হলেও জলের বেশ স্রোত আছে। আপনিও রোজ নিয়ম করে একবার বাগানে নিশ্চয় বেড়াবেন, বাবা।

তপতীর শেষ চিঠির ভাষাটা যেন করুণ হয়ে ছটফট করেছে।—আমি কবে যে এখান থেকে ছাড়া পেয়ে গয়াতে ফিরে যাব, কিছুই বুঝতে পারছি না, বাবা। আমাকে ক্ষমা করুন।

চিঠিটাকে হাতে ধরে নিয়ে অনেকক্ষণ নিজের মনেই বিডবিড় করছিলেন অক্ষয়বাবু—আমিও যে কিছুই বুঝতে পারছি না। কী ক্ষমা করবো?

তপতীর শেষ চিঠির উত্তর তো দেওয়াই হয়েছিল—যাই হোক, তুমি আর দেরী করো না তপতী। এবার চেষ্টা করে চলে এস। বুঝতেই তো পারছো, এখানে আমাদের শূন্য হয়ে থাকতে কত খারাপ লাগছে।

কিন্তু তপতীর চিঠি আর আসে না। আসছেও না।

কিন্তু তপতী আজও হঠাৎ যদি ফিরে আসে, তবে দেখতেই পাবে যে, তার ঘরের কোন জিনিসের এই আট মাসে একটুও নড়চড় হয়নি! সেই বিছানাও তেমনই পাতা হয়ে রয়েছে। সুচারু নিজে একবার ঘরে ঢুকে পালক-ঝাড়ু বুলিয়ে বিছানা থেকে ধুলো সরিয়ে দিয়ে যান। টেবিলের উপরে তপতীর সব জিনিস, সবই ঠিক আছে। চুল বাঁধবার একটা ফিতেকে ভুল করে টেবিলের উপরে ফেলে রেখেছিল তপতী—সেই ফিতেটাও ঠিক সেই টেবিলের এক কোণে পড়ে আছে।

অক্ষয়বাবুর শরীরটাও বড় ক্লান্ত। একবার চেয়ারে বসে পড়লে আর সহজে উঠতে চান না। সামান্য একটা শব্দ শুনলে চমকে ওঠেন, বাড়ির সামনের সড়কে কিছু একটা নড়েচড়ে উঠলেই চোখ দুটো বড় হয়ে তাকায়।

মাঝে মাঝে বাগানে বেড়িয়েও আসেন। হয় সকালে, নয় বিকালে, কিংবা সন্ধ্যায়। কিন্তু খুবই আনমনার মত ঘুরে বেড়ান অক্ষয়বাবু। ডালিম ফুল ফুটেছে কিন্তু চোখে পড়ে না। কত গাজিপুরী গোলাপের কুঁড়ি কতবার ফুটে উঠলো, কিন্তু দেখবার জন্যে দু'চোখ অপলক করে আর এগিয়ে যেতে পারেন না।

কিন্তু এ কী? একদিন হঠাৎ নিমগাছটার কাছে থমকে দাঁড়ালেন অক্ষয় বাবু। এটা তো বৈশাখ মাস, নিমের মাথা তো এত নেড়া হয়ে থাকবার কথা নয়। নিমের পাতা গেল কোথায়? শুকনো হয়ে ঝরেই গিয়েছে? না, এই ফাল্গুনে গাছে নতুন পাতা ধরেই নি?

—ও বিশু? রাতের পাখিটা আজকাল ঘুমোতে আসে না?

বিশু হাসে—না। গাছে যদি ভাল করে পাতা ধরে তবে আবার আসতে পারে।

নিমের নেড়া-নেড়া ডালগুলি ঝড়ের আভাসে আর দোলে না; শুধু নড় বড় করে। আষাঢ় মাসের প্রথম তিনদিন খুব বৃষ্টি হয়ে গেল, তবু ওই নিমের গায়ে কোন নতুন পাতার সবুজ ছিটেও ফুটে উঠলো না।

আষাঢ়ের আরও কয়েকটা দিন পার হয়ে গেল। একদিন সকালবেলা খুব কড়া রোদের আলোতে সারা বাগান ভরে গেল। সেদিন বিকেলে বাগানে বেড়াতে গিয়ে চমকে উঠলেন অক্ষয়বাবু। দেখলেন নিমটার বুকে একটা গজাল বিঁধে রয়েছে।

কে করলে এই কাণ্ডটা? বিশুমালীকে জিজ্ঞেস করতেই বুঝতে পারলেন অক্ষয়বাবু, ওটা বিশুমালীরই একটা দরকারের গজাল। কাপড় শুকোতে দেবার জন্য দড়ি টানাতে হবে, তাই নিমগাছটার বুকে ওই গজাল পুঁতে দিয়েছে বিশু।

অক্ষয়বাবু বলেন—গাছটাতে গজাল না পুঁতলে কি চলতো না?

বিশু বলে—এ গাছে আর কোন জোর নেই, বাবু।

—কেন ?

—গাছের শিকড় ইঁদুরে কুরে দিয়েছে।

—কোথায় ইঁদুর ?

—সে কি আর চোখে দেখতে পাবেন ? মাটির তলায় ইঁদুরের রাস্তা আছে। পাঁচিলের ওদিক থেকে ইঁদুর এদিকে এসে গাছের শিকড় কুরে দিয়ে চলে যায়।

—বাঃ, খুব অদ্ভুত ব্যাপার। বলতে বলতে চলে যান অক্ষয়বাবু। আর বাগানে ঘুরে বেড়াতে ইচ্ছে করে না। আর বেড়িয়ে দেখবারই বা কী আছে ? সেই তো যত পেয়ারা আতা আর ডালিম। ঠাসাঠাসি একগাদা সূর্যমুখীর গায়ের উপর ফড়িং উড়ছে। মুলোর ক্ষেতের জলে ব্যাঙ লাফিয়ে বেড়ায়।

কয়েকদিন পরে একদিন দেখলেন, শুকনো মরা নিমগাছটার ধড়টা আর নেই। বিশুমালী গাছটাকে কেটে আর চেলা করে রেখে দিয়েছে। গাদা করে রাখা নিমের চেলার উপর গিরগিটি ঘুরছে।

বিকেলের রোদ মরে গিয়ে আবার মেঘ ঘনিয়ে উঠতেই বিশুমালী তাড়াতাড়ি হাত চালিয়ে নিমের ওই চেলাকাঠের গাদা ঝুড়িতে তুলে তুলে সরিয়ে দিল, রান্নাঘরের চালার নীচে জড়ো করে রেখে দিল।

না, সেই নিমের আর কোন চিহ্ন রইল না। যেখানে নিমটা দাঁড়িয়েছিল, সেখানে এখন কাঁচা মাটি ফুলে ফুলে রয়েছে। রাতের পাখিটা যদি কোন সন্ধ্যায় ফিরেও আসে, তবে একটা নিশ্চিহ্ন স্মৃতির শূন্যতা দেখে খুব আশ্চর্য হয়ে চলে যাবে।

ভিতরের বারান্দার চেয়ারে চুপ করে বসে বিকেলের আকাশের মেঘের দিকে একবার তাকালেন অক্ষয়বাবু। তারপর ডাকলেন—পঞ্জিকাটা একবার দিয়ে যাও তো, সুচারু।

কে জানে পঞ্জিকা খুলে কী দেখলেন, আর কী খুঁজে বার করলেন, অক্ষয়বাবু। কিন্তু পঞ্জিকাটাকে হাতেই ধরে রাখলেন। সন্ধ্যা হলো, তবু ওভাবে অনেকক্ষণ বসে থাকবার পর চমকে উঠলেন। তারপর উঠে দাঁড়ালেন।—বাঃ বেশ সুন্দর বাঁশি বাজছে। বাজাচ্ছে কারা ?

নিকটে নয়, অনেক দূরে, বোধহয় ফল্গুর ধারে গয়লাদের কোন বস্তিতে বাঁশি বাজছে। মেঘলা রাতের ভিজে বাতাসে ভেসে ভেসে সেই বাঁশির শব্দ যেন আরও মিষ্টি হয়ে গিয়েছে।

অনেক রাতে বিছানাতে শুয়ে পড়ে থাকলেও ঘুমোতে পারেন না অক্ষয়বাবু। মাথায় পাখার বাতাস দিয়ে সুচারু বলেন—আজ হঠাৎ এরকম করছো কেন ?

অক্ষয়বাবু হাসতে চেষ্টা করেন—কিছু না। শুধু ভাবছি, আজ রাতে গোয়ালাদের বস্তির বাঁশির শব্দটাকে শুনতে এত ভাল লাগল কেন ?

ভোরের দিকে ঘুমিয়েই পড়লেন অক্ষয়বাবু। কিন্তু সকাল হতেই ধড়ফড় করে জেগে উঠলেন। ভিতরের বারান্দায় এসে চেয়ারের উপর বসে পড়লেন।

চোখে পড়ে অক্ষয়বাবুর, বাগানের পাঁচিলের ওখানে, যেখানে নিমগাছটা ছিল, ঠিক সেখানে কাঁচা মাটির উপর হাত চালিয়ে কাজ করছে বিশুমালী।

হ্যাঁ, সেখানে একটা বাতাবীলেবুর চারা পুঁতেই ফেলেছে বিশু। বিশুর কাছে একটা জলভরা মাটির ঘট। সেই ঘট থেকে জল তুলে নিয়ে গাছের গোড়ায় দু'চার বার ছিটিয়ে দিল বিশু। তারপর হাত ধুয়ে ফেললো।

অক্ষয়বাবু ডাকেন—শোন, সুচারু।

সুচারু—বল।

অক্ষয়বাবু—মেয়ে আর আসবে না।

চমকে ওঠেন সুচারু—কেন?

অক্ষয়বাবু হাসেন—মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে।

সুচারু—কে বললে?

অক্ষয়বাবু—এই তো পঞ্জিকাটা এখানেই রয়েছে, একবার দেখে নিলেই পার।

পরিপূর্ণা

রাত দশটারও বেশি হয়ে গিয়েছে বলে মনে হয়। ক্লান্ত বাড়িটার মেজাজও যেন ক্লান্ত হয়েছে। সুলতার বিয়ে হয়ে গিয়েছে। বর-বউ বাসরঘরে গিয়েছে। খাওয়া-দাওয়ার হুল্লোড়ও আর নেই। নিমন্ত্রিতদের প্রায় সবাই চলে গিয়েছে। যারা আছে তারা পাড়ারই লোক।

এখন শুধু সামিয়ানার নীচে এলোমেলো করে ছড়ানো খালি চেয়ারগুলির ওপর এলোমেলো বসে গল্প করছে ওরা, যারা বিয়েবাড়ির কাজে খেটে খুটে ক্লান্ত হয়েছে। ওরা সবাই সুলতার দাদার বন্ধু। এদিকে বেশ একটু তফাতে চেয়ারে বসে আনমনা হয়েও মাঝে মাঝে ওদেরই নানা গল্পের নানা কথা শুনছিল কুমুদ রায়।

বাসর-ঘরের দিক থেকে খল-খল আর খিল-খিল হাসির শব্দ যেন বসন্তকালের মিষ্টি তুফানী হাওয়ার শব্দের মতো মাঝে মাঝে ভেসে আসে। ওরা বলে—ঐ শোন, এখানেও আবার বোধহয় সেই রকমের কাণ্ড করছে জয়ন্তী সেন

জয়ন্তী সেন? নামটা শুনেই চমকে ওঠে কুমুদ রায়। জয়ন্তী সেনের নাম শুনে কুমুদ রায়ের পক্ষে একটু চমকে ওঠবারই কথা। কিন্তু এরা যে জয়ন্তী সেনের কথা বলছে, সে কি সেই জয়ন্তী সেন, যাকে কুমুদ সেই ভয়ঙ্কর দাঙ্গার সময় মানিকতলার পথে একা দেখতে পেয়ে আর অভয় দিয়ে নিরাপদে এই ঢাকুরিয়া পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছিল?

সে জয়ন্তী সেনের সঙ্গে এখনও মাঝে মাঝে কুমুদের দেখা হয়। ঠিকই,

পথে মুখোমুখি হলেও সেই আগের মত অত হাসিখুশি হয়ে আর আলাপ করে না জয়ন্তী। কিন্তু একেবারে বোবাটি হয়ে পাশ কাটিয়ে চলেও যায় না। কম কথা বললেও কথা বলে। শুকনো হাসি হলেও একটু হাসে। সেদিন সন্ধ্যায় গড়িয়াহাটার মোড়ে ফুটপাথের ওপর বিছানো এক খোলা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে রজনীগন্ধার দর করছিল জয়ন্তী। অফিস থেকে ফেরার পথে কুমুদ সেই সময়ে ট্রাম থেকে নেমে মোড়ের কাছে দাঁড়ালো। কুমুদের দিকে চোখ পড়তেই চমকে উঠলো জয়ন্তী। যেন লজ্জা পেয়ে চমকে ওঠা। ভয় পেয়েও হতে পারে। কিন্তু কিসের ভয় আর কিসের লজ্জা? বরং কুমুদেরই পক্ষে লজ্জিত হওয়া উচিত। একদিন এসে শুধু একটু চা খেয়ে যাবার জন্য কুমুদকে অনুরোধ করেছিল জয়ন্তী। আজ যাব কাল যাব করতে করতে তিন বছরের মধ্যেও একবার গিয়ে জয়ন্তীদের বাড়ির এক কাপ চা খেয়ে আসবারও সময় হলো না। কে জানে কি মনে করলো জয়ন্তী!

সব ঘটনার ইতিহাস এত স্পষ্ট মনে পড়ে, সময়ে-অসময়ে হঠাৎ মনেও পড়ে যায়, তবু কি আশ্চর্য, আর একবার এসে চা খেয়ে যাওয়ার জন্য জয়ন্তীর সেই আগ্রহভরা একটা অনুরোধের দাবী আজও রক্ষা করতে পারা গেল না কেন? সময়ের অভাব তো নেই। বেশ তো মাসে অন্তত একবার সিনেমা হাউসে গিয়ে বাজে ছবি দেখবারও সময় পাওয়া যায়। অথচ যে মেয়েকে একেবারে ভুলে যাওয়া আজও সম্ভব হলো না, এমন কি হঠাৎ অকারণেই এক একবার দেখতে বড় ইচ্ছা করে, সেই মেয়ের একটা অনুরোধ তুচ্ছ হয়ে গেল কেমন করে? সেই অনুরোধটাকেই কি খুব ভয় করে কুমুদ রায়?

এই ত্রিশ বছর বয়সের জীবনে অনেক মুখ থেকে চা খাওয়ার জন্য অনুরোধ শোনবার সৌভাগ্য হয়েছে কুমুদ রায়ের। সেই সব মুখের অনেকগুলিই তো জয়ন্তীর চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর। কিন্তু সামান্য চা খেয়ে যাবার জন্য অনুরোধের রূপটা যে কত সুন্দর হতে পারে, সেই সত্য জীবনে মাত্র একজনের মুখের দিকে তাকিয়ে মাত্র একটি দিনই অনুভব করতে পেরেছিল কুমুদ রায়।

কলকাতা সহরের চারদিক জুড়ে আর সহরের ভিতরেও তখন এখানে-ওখানে খুনিয়ারা দাঙ্গার মাতমাতি আর পাড়া-পোড়ানো আগুনের জ্বালা জ্বলছে। পথ চলা নিষেধ করে দিয়ে যখন-তখন কার্ফ্যু জারি করছে পুলিশ। শ্যাম-বাজারের মামারবাড়ি থেকে বের হয়ে বাস ধরবার আশায় এদিক-ওদিক ঘুরতে ঘুরতে যখন মানিকতলার মোড়ের আগুন দেখতে পেয়ে ভয়ে থরথর করে উঠেছে জয়ন্তীর সারা শরীর, ঠিক সেই সময়েই পথের ওপর পিছন থেকে কে যেন ডাকে—আপনি এই হাঙ্গামার মধ্যে এদিকে কোথায় চলেছেন?

যেন ভয়-ভাঙানো দৈবের ডাক। চমকে মুখ ফিরিয়ে, আর ঢাকুরিয়ারই কুমুদ রায়কে দেখতে পেয়ে জয়ন্তীর দু'চোখের ভয়ের ঘোর কেটে যায়। জয়ন্তী বলে—আমি ঢাকুরিয়া যেতে চাই, কুমুদবাবু।

কুমুদ বলে—আমার সঙ্গে চলুন, আমিও ঢাকুরিয়া যাচ্ছি।

ঢাকুরিয়ার আর পাঁচজনের মত জয়ন্তীও কুমুদকে চেনে। হরিশ রায়ের ছেলে কুমুদ রায়, যাদের বাগানে প্রতি বছর সার্বজনীন দুর্গোৎসবের ঘটা সাত দিন পর্যন্ত চলে। ঐ সার্বজনীন আনন্দের অর্ধেক খরচ হরিশবাবু দিয়ে থাকেন। দেবেনই বা না কেন? খুব বড়লোক তো নন। কুমুদের চাকরিটাও ভাল, মস্ত বড এক জুট মিলের ওয়েলফেয়ার অফিসার। এখনও বিয়ে হয়নি কুমুদের। পাড়ার লোক মনে করে, নিশ্চয় কোন ব্যাপার আছে। প্রেম-ট্রেমের ব্যাপার বোধহয়, যার জন্য কুমুদ আজও বিয়ে না করে দিব্যি দিন কাটিয়ে দিচ্ছে।

ঢাকুরিয়ার আর পাঁচজনের মত কুমুদও জয়ন্তীকে চেনে। কোন এক প্রেসে প্রুফ-রীডারের কাজ করেন বিলাসবাবু, তাঁরই মেয়ে জয়ন্তী। কে জানে কত মাইনে পান বিলাসবাবু! ওভারটাইম খেটে মাইনের পরও কিছু আয় হয়। তাতে শুধু দিন চলে যায়, কিন্তু জীবন বোধহয় চলে না। অনেকগুলি ছেলেপিলে, কোনটিকেই আজ পর্যন্ত স্কুলে পড়াতে পারলেন না। শুধু ঐ জয়ন্তী, দেনা-টেনা করেও জয়ন্তীকে কলেজ পর্যন্ত, অর্থাৎ ঐ আই-এ'র ফার্স্টইয়ার পর্যন্ত পড়িয়েছিলেন; তারপর আর নয়। অনেকেই জানে, এবং কার কাছ থেকে যেন কুমুদও কথাটা শুনেছিল, দেশের বাড়ি বেচে দিয়ে মেয়ের বিয়ের জন্য টাকা মজুত করে রেখেছেন বিলাসবাবু। কিন্তু কই? আজও তো বিয়ে হলো না জয়ন্তীর। তবে কি টাকাগুলো সব ফুলুরী খেয়েই ফুঁকে দিলেন বিলাসবাবু? পাড়ার লোকে জানে, সকালবেলা শুধু দু'আনার ফুলুরী খেয়ে চাকরী করতে বের হয়ে যান প্রুফ-রীডার বিলাসবাবু।

রাস্তার এই ফুটপাথে কার্ফ্যু, ঐ ফুটপাথে কার্ফ্যু নেই। বেশ হিসাব করে পথ চলতে হয়। একটা দোকানের সামনে দুটো লাস পড়ে আছে, ভয়ঙ্কর হুল্লোড় তুলে একদল লোক দোকান ভাঙছে। শিউরে ওঠে জয়ন্তী। ভয় পেয়ে থমকে দাঁড়ায়। এক হাত বাড়িয়ে খপ করে জয়ন্তীর একটা হাত ধরে ফেলে কুমুদ—ভয় পাবেন না, তাড়াতাড়ি হেঁটে চলুন।

যেন কতদিনের চেনা বন্ধু আর বান্ধবী। জয়ন্তীর হাতটা পরম নির্ভয় আর নিরাপদ হয়ে কুমুদের হাতের মুঠোয় বাঁধা পড়ে আছে। তাড়াতাড়ি হাঁটে আর হাঁপায় জয়ন্তী, আর হঠাৎ কেমন যেন আক্ষেপের মত স্বরে বলে ওঠে—উঃ, আপনি আমার চেয়ে কত বড, তবু আমাকে আপনি করে বলছেন কেন?

কুমুদ হাসে! হাওডার ব্রীজের মুখে এসে পৌঁছতেই কুমুদ বলে—হাঁটতে তোমার বড কষ্ট হচ্ছে জয়ন্তী, একটা ট্যাক্সি ডাকি, কেমন?

ট্যাক্সিওয়ালা বলে—ঢাকুরিয়া যেতে একশো টাকা—

মুখ কালো করে জয়ন্তী বলে—এত টাকা দিতে পারবো না কুমুদবাবু। হেঁটেই চলুন।

কুমুদ—ট্যাক্সিভাড়া আমি দেব।

চেঁচিয়ে ওঠে জয়ন্তী—না, না, না, ছিঃ, আমার একটু কষ্টের জন্যে একশো' টাকা খরচ হবে, কি যে বলেন আপনি!

বিকেলও পার হয়ে গিয়েছে। ঢাকুরিয়া পৌঁছতে হলো সন্ধ্যা। অর্ধেক আস্ত আর অর্ধেক ভাঙা, কলাগাছ ঘেরা একটা বাড়ি। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে হাঁপ ছেড়ে কুমুদ হেসে হেসে বলে—বাড়ির মেয়ে এইবার বাড়িতে যান, আমি চলি।

কোন কথা বলে না জয়ন্তী। এতক্ষণের এত ভয়, উদ্বেগ, পথচলার কষ্ট আর আতঙ্ক, তবু যেন কিসের ছোঁয়ায় সবই স্নিগ্ধ ও মধুর হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এই মুহূর্তে সব যেন শূন্য হয়ে যাচ্ছে, চলে যাচ্ছে কুমুদ রায়। তাকে আর একটা মিনিটও এখানে থামিয়ে রাখবার কোন অর্থ হয় না। কুমুদ রায় জয়ন্তী সেনের কেউ নয়।

কুমুদ বলে—কি? কথা বলছো না কেন?

জয়ন্তী—একটু রেষ্ট নিয়ে তারপর যদি যেতেন...।

কুমুদ—না, আমার জন্যেও বাড়ির সবাই বোধহয় এতক্ষণে দুশ্চিন্তায় ছটফট করছে, যাই সশরীরে দেখা দিয়ে তাদের নিশ্চিন্ত করে দিই।

জয়ন্তী—কিন্তু......

জয়ন্তীর মুখের দিকে তাকিয়ে একটু আশ্চর্য হয় কুমুদ। কিন্তু কি? এর মধ্যে আর কিন্তু থাকবার তো কথা নেই। হঠাৎ পথের আলাপ, কয়েক ঘণ্টা শুধু একসঙ্গে পথ চলার পালা এই তো এখানে এসে শেষ হয়ে গেল। আর এখানে আসবার কোন দরকার কোন দিন হবে না। কিন্তু কি বলতে চায় জয়ন্তী?

জয়ন্তী বলে—কিন্তু আপনি তো আর কোন দিনও এখানে আসবেন না।

কুমুদ বলে—তা, তা, আসতে পারি হয় তো; কিন্তু কেন, কিসের জন্যে?

জয়ন্তী বলে—একদিন এসে চা খেয়ে যাবেন।

বলতে বলতে কেঁপে হাঁপিয়ে কেমনতর হয়ে যায় জয়ন্তীর শরীরটা। চোখ দুটো যেন নতুন করে ভয় পেয়ে শিউরে উঠছে। সারা মুখ যেন চমকে ওঠা রক্তের এক ঝলক আভা ছড়িয়ে পড়েছে। হাসতে চেষ্টা করছে জয়ন্তী, কিন্তু ভীরু চোখ দুটো ছলছলিয়ে উঠছে।

দেখতে অদ্ভুত, বেশ তো সুন্দর—রোদ-বৃষ্টি খেলার মত একটি ছবি। জয়ন্তীর মুখের দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে কুমুদ। মনে হয়, এই অনুরোধের ডাকে আর একবার আসাই উচিত। এলে ক্ষতি কি?

কুমুদ বলে—আসবো বই কি।

চলে গেল কুমুদ—তারপর আরও কতবার জয়ন্তীর সঙ্গে দেখা হয়েছে। দেখা হতেই অপ্রস্তুত হয়ে কুমুদ বলে—মনে আছে জয়ন্তী। যাব, একদিন

যাব, নিশ্চয়। কাজের ফাঁকে একটু সময় পেলেই যাব।

জয়ন্তীর একটা উত্তর শুনে একদিন সত্যিই লজ্জা পেয়েছিল কুমুদ—সত্যিই কি আপনার কোনদিন সময় হবে?

যেন জয়ন্তীর জীবনের ছোট একটা আশাও ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। সন্দেহ দেখা দিয়েছে জয়ন্তীর মনে। কিসের সন্দেহ? কলাগাছে ঘেরা একটা অর্ধেক আস্ত আর অর্ধেক ভাঙা বাড়ির আহ্বানকে এমন কিছু দামী বস্তু বলে মনে করে না চারশো' টাকা মাইনের ওয়েলফেয়ার অফিসার, জয়ন্তী কি সত্যিই এইরকম একটা সন্দেহ করে বসলো?

কিন্তু কুমুদ জানে, নিজের মনের কাছে তো ফাঁকি দিয়ে কোন লাভ নেই, অনেকবার যেতে ইচ্ছা করেছে। কিন্তু ভয়; গেলে কি জয়ন্তীর কোন ক্ষতি হয়ে যাবে না? একবার যাবার পর যদি বার বার যেতে হয়, যদি জয়ন্তী ভুল করে মনে করে ফেলে যে, কুমুদ তাকে দেখবার জন্যই আসছে? না যাওয়াই ভাল। যাওয়াও আর হয়নি। কি ভাবলো, কি মনে করলো জয়ন্তী, তা জয়ন্তীই জানে।

কিন্তু ওরা কি সেই জয়ন্তী সেনের কথা বলছে? ভাল করে শুনতে আর বুঝতে চেষ্টা করে কুমুদ।

হ্যাঁ, সেই জয়ন্তী সেনের কথাই ওরা বলছে। বিলাসবাবুর মেয়ে জয়ন্তী। কিন্তু এ কিরকম অদ্ভুত, ভয়ানক, বেহায়া, নির্লজ্জ জয়ন্তীর কথা!

বাসর-ঘরের দিক থেকে খিলখিল হাসির উচ্ছ্বসিত শব্দ আবার ভেসে আসে। ওরা বলে—হ্যাঁ, ব্যাপারটা হাস্যকর হলেও একটা ট্রাজেডি। মেয়েটার আজও বিয়ে হোল না, কোনদিন হবেও না, কোন ভরসা নেই, তাই তো এরকম হন্যে হয়ে পরের বাসর-ঘরে ঢুকে······

—এই নিয়ে বার বার তিনবার দেখা গেল। একবার নিতাই-এর বোন সুধার বিয়েতে দেখেছি, আর দু'বার শ্যামলবাবুর দুই মেয়ে নিভা আর শোভার বিয়েতে। বাসর-ঘরে ঢুকে বরের সঙ্গে সে যে কি ঢলাঢলি, কাণ্ড দেখে আর সব মেয়ে লজ্জা পেয়ে ঘর ছেড়ে চলেই গেল।

—বাস্তবিক, জয়ন্তী সেনের বাহাদুরী আছে বলতে হবে। বাসর-ঘরের আমোদ জমাতে ওরকম ওস্তাদ মেয়ে আমি আর দ্বিতীয়টি দেখিনি। কিন্তু একটু মাত্রা ছাড়া; চিরুণী হাতে নিয়ে শোভার বরের, সেই গোবেচারা ভদ্রলোকের পাট-করা-চুলের টেড়ি পালটে দিয়ে দিব্যি চেঁচিয়ে উঠলো জয়ন্তী সেন—এইবার ভাল করে দেখ শোভা, বর পছন্দ হয় কিনা।

শোভার মাসিমা একটু রাগ করেছিলেন—দেখিস বরের কোলের ওপর যেন বসে পড়িস না জয়ন্তী।

হেসে চেঁচিয়ে ওঠে জয়ন্তী—তাতে কি আর ক্ষতিটা হবে মাসিমা? শোভা একটা বেশ ভাল সতীন পেয়ে যাবে।

দূর ছাই, কি যে বলে জয়ন্তীটা! মেয়েরা মুখে আঁচল চাপা দিয়ে ফিস-ফিস করে ওঠে।

সুধার বিয়ের সময় বাসর-ঘরে বরের সঙ্গে গলা মিলিয়ে ডুয়েট গেয়েছিল জয়ন্তী, গানটাও আবার একটা বেহায়া প্রেমের গান। তাও ভাল ছিল, কিন্তু যখন বরকে অবিরত চিমটি কেটে অস্থির করে তুললো জয়ন্তী, তখন অমন মুখচোরা মেয়ে সুধাও চুপ করে থাকতে পারেনি।

—কি বললে সুধা?

—সুধা বললে, এবার একটু থাম তো জয়ন্তী। তোর চিমটিগুলো গুড়-মাখানো নয়।

—জয়ন্তী কি বললে?

জয়ন্তী বেপরোয়া হেসে চেঁচিয়ে উঠলো, নিশ্চয়ই গুড় মাখানো, জিজ্ঞেস করে দেখ তোর বরকে!

বাসর ঘরের দিক থেকে আর খিলখিল হাসির স্বর অনেকক্ষণ হলো ভেসে আসে না। বাসর-ঘরটা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল কেন?

শুনতে পায় কুমুদ, ওরা তখন বলছে—এ একটা ভয়ের ব্যাপার হয়ে উঠেছে। কারও বাসর-ঘরের দরজায় জয়ন্তীকে দেখলেই সবাই একটু ঘাবড়ে যায়। হলোই বা বাসর-ঘর, একটা অবিবাহিত বয়স্ক মেয়ে পরের বর নিয়ে এরকম ঘাঁটাঘাঁটি করবে, কনে আর কনের বাড়ির লোকেরা পছন্দ করবে কেন? তাই সকলে সাবধান হয়ে গিয়েছে। সুলতার বৌদি বলেছেন, এ-বাড়িতে জয়ন্তীর ওসব বিশ্রী ফষ্টি-নষ্টি চলবে না। বাড়াবাড়ি করে তো থামিয়ে দেওয়া হবে।

আর নয়, উঠে দাঁড়ায় কুমুদ রায়। এতক্ষণ ধরে যেন এক ভয়ানক জুয়া-চুরির কাহিনী শুনছিল কুমুদ রায়। যেন একটা স্বপ্নের ফুল হঠাৎ কয়লা হয়ে ঝরে পড়ছে। সেই শান্ত আর লাজুক আর চোখ ছলছল জয়ন্তী যেন একটা নিষ্ঠুর মিথ্যা! যাক্, খুব ভাল হয়েছে, ঐ গিল্টি-করা চরিত্রের মেয়ের একটা অনুরোধের জালে ধরা পড়েনি কুমুদ রায়।

চলেই যাচ্ছিল কুমুদ রায়, কিন্তু থমকে দাঁড়ায়। বিয়ে বাড়ির ভিতরে হঠাৎ কেমন যেন একটা গভীর ব্যস্ততা জেগে উঠেছে। যারা সামিয়ানার নীচে বসে গল্প করছিল, তারাও হঠাৎ চমকে উঠে ভিতরে চলে গেল। শুনতে পায় কুমুদ, একটা হাসি-হাসি কথা কাটাকাটি যেন আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে। সুলতার বৌদি জয়ন্তীর হাত ধরে হাসতে হাসতে আসছেন। বৌদির মুখের হাসিটিও কেমন যেন, বেশ চতুর অথচ বেশ শক্ত।

বৌদি বলেন—অনেক করেছ ভাই জয়ন্তী, আর কেন? নিজের বরের জন্যে একটু রাখ, সব ফুরিয়ে দিচ্ছ কেন?

জয়ন্তী হাসে, কেমন যেন জ্বলন্ত সেই হাসি।—একটুও ফুরিয়ে দিইনি বৌদি,

সব জমা আছে।

বৌদি হাসেন—খুব ভাল কথা। তা এখন অনেক রাত তো হলো, বাড়ি যেতে চাও তো একটা গাড়ি ডেকে দিই।

জয়ন্তী হাসে—হাত ধরে গল্প করতে করতে যখন গেট পর্যন্ত নিয়ে এসেছেন তখন বাড়ি না যাওয়া ছাড়া উপায় কি?

ঠিক হয়েছে, এই রকমই অপমান ঐ মেয়ের জীবনে উপযুক্ত উপহার। সামিয়ানার নীচে এক কোণে দাঁড়িয়ে জয়ন্তীর মুখটার দিকে তাকিয়ে দুঃসহ ঘৃণায় জলে ওঠে কুমুদ রায়ের চোখ।

কুমুদকে দেখতে পেয়েছে জয়ন্তী। চমকে ওঠে জয়ন্তী, তার পরেই যেন গেটের বাইরের অন্ধকারের মধ্যে মিশে যাবার জন্যে ছুটে চলে যায়।

আর কুমুদ রায়ও যেন সেই মুহূর্তে তার ঘৃণার জ্বালা শান্ত করার জন্য বাইরের বাতাস পাওয়ার আশায় ছুটে বের হয়ে যায়।

কিন্তু শান্ত হয় না সেই ঘৃণার জ্বালা! পথের আলো অন্ধকার আর বাতাস সবই যেন তেতে রয়েছে। তার চোখের সম্মুখ দিয়ে ছায়ামূর্তির মত হন্‌হন্‌ করে হেঁটে চলে যাচ্ছে যে, সেই তো সেই জয়ন্তী সেন।—জয়ন্তী! হঠাৎ ডেকে ওঠে কুমুদ।

জয়ন্তী দাঁড়ায়। কুমুদ কাছে এগিয়ে এসে বলে—ইচ্ছে ছিল না, তবু একটা কথা না জিজ্ঞেস করে থাকতে পারছি না।

জয়ন্তী বলে—বলুন।

—তোমার এ দশা হলো কেন?

—কি?

—এ যে, যার জন্যে স্থলতার বৌদি আজ তোমাকে তাড়িয়ে দিতে বাধ্য হলেন।

জয়ন্তী হাসে—মানুষের বাসর-ঘরে ঢুকে বেহায়ার মত হৈ-হৈ করি বলে?

কুমুদ—অ্যাঁ?

জয়ন্তী আরও হাসে—একটু থিয়েটার করি কিন্তু তাতেই ওরা কত ভয় পেয়ে যায়। শুধু পাইয়ে মজা দেখি, এই মাত্র। আপনি কি মনে করেন যে....।

কুমুদ চেঁচিয়ে ওঠে।—জঘন্য থিয়েটার। ওগুলো তোমার মনের একটা লোভের খেলা।

জয়ন্তীর অমন কালো চোখের নরম ভুরুও বেঁকে শক্ত হয়ে ওঠে।—হয়তো তাই, তাতে আপনার কি?

হঠাৎ মুসড়ে পড়ে কুমুদ রায়ের যত রাগী ঘৃণার অহঙ্কার। বড় শক্ত প্রশ্ন করেছে জয়ন্তী, প্রশ্নটা যেন কুমুদ রায়ের গলায় বিঁধেছে; উত্তর দিতে পারে না কুমুদ।

জয়ন্তীর হাসিটা আরও তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে।—যদি বিলাসবাবুর মেয়ে না হয়ে

ধরুন আপনারই বাড়ির মেয়ে ঐ থিয়েটার করতো, তবে আপনারা তাকে কি বলতেন বলুন তো ?

কুমুদ—কি বলতাম ?

জয়ন্তী—বলতেন, কী সুন্দর মিশুকে মেয়ে !

আর একটা আঘাত যেন এই পৃথিবীর সব অহঙ্কেরে ভদ্রতার মাথায় ভয়ানক এক ঠাট্টার আঘাত করেছে জয়ন্তী। বিব্রতভাবে কুমুদ বলে—তা নয় বোধহয়।

আর কোন কথা না বলে চলতে সুরু করে জয়ন্তী। কুমুদ বলে—একটা কথা শোন। তুমি বোধহয় আমার ওপর রাগ করে আছ।

জয়ন্তী আশ্চর্য হয়—আপনার ওপর রাগ করবো কেন ?

কুমুদ—তোমার সেই নেমন্তন্ন রাক্ষ পর্যন্ত···।

হেসে ফেলে জয়ন্তী—আপনি আমাকে খুবই ভুল বুঝেছেন কুমুদবাবু। আপনার ওপর রাগ করবো কোন্ সাহসে ? আপনি এলে খুবই খুশি হতাম কিন্তু আসতে পারেন নি বলেও কোন দুঃখ নেই।

কুমুদের মনের বিরাট একটা বিশ্বাসের পাহাড়কে যেন অবাধে একটা টোকা দিয়ে অনায়াসে ভেঙ্গে চূর্ণ করে দিচ্ছে জয়ন্তী। জয়ন্তীর মনে তাহলে কোন দুঃখ নেই, কুমুদের জন্য কোন মুহূর্তেও পথের দিকে তাকিয়ে প্রতীক্ষা করেনি। কোন আশা করেনি জয়ন্তী, একটুও ব্যাকুল হয়নি জয়ন্তী। এই তিন বছরের হৃদয়টার সবই তাহলে শূন্য।

বোধহয় এই শূন্যতার বিদ্রূপ সহ্য করতে না পেরে কুমুদের গলার স্বরটা তপ্ত হয়ে বিদ্রূপ করে—বাঃ !

আবার আশ্চর্য হয় জয়ন্তী। কুমুদের চোখ দুটো ছটফট করছে। কি কঠোর এই দৃষ্টির ভঙ্গী, যেন শত্রুর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে কুমুদ রায়।

জয়ন্তী বলে—আমি যাই।

কুমুদের গলার ভিতর থেকে যেন একটা বদ্ধ আক্রোশ খান্‌খান্ হয়ে ফেটে পড়ে—তোমাকে খুবই ভুল বুঝেছিলাম জয়ন্তী। ঠিকই বলেছেন স্থলতার বৌদি, তোমার সবই ফুরিয়ে গিয়েছে। পরের বাসর-ঘরে ঢুকে থিয়েটার করে করে সবই ফুরিয়ে দিয়েছ।

জয়ন্তী—কিছুই ফুরিয়ে যায়নি, সব জমা আছে। যার চোখ নেই সে-ই শুধু দেখতে পায় না।

বলতে বলতে জয়ন্তীর দু'চোখে যেন অদ্ভুত এক জ্বালা ঠিকরে ওঠে; তারপরেই একেবারে গলে যায়। শিশিরমাখা কালো পাথরের মত চিকচিক করে জয়ন্তীর জলভরা কালো চোখ।

আর ভাবতে পারেনি, বোধহয় হাতটাকে সামলাতেও পারেনি কুমুদ। জয়ন্তীর একটা হাত হঠাৎ শক্ত করে ধরে ফেলে কুমুদ—তোমাকে একটুও ভুল

বুঝিনি।

জয়ন্তী—তাহলে একদিনের জন্যেও আসতে পারেন নি কেন? বিলাসবাবুর মেয়ে ভালবেসে ফেলবে, সেই ভয়ে?

কুমুদ হাসে—না। বিলাসবাবুর মেয়েকে ভালবেসে ফেলবো, শুধু এই ভয়ে।

জয়ন্তী—আজ ভয় করছে না?

কুমুদ—ভয় করছে, যদি এখনি হাত ছাড়িয়ে নাও।…চল, তোমার বাড়ি পর্যন্ত যাই।

এটা একটা আশ্চর্য বিয়ে; সেই বিয়ের বাসর-ঘরে কি যে আশ্চর্য ব্যাপার হবে, ভেবে কূল পায় না অনেকেই। একে তো জয়ন্তীর মত ঢলানি মেয়ের বিয়ে, তায় কুমুদের মত বর। কলাগাছে ঘেরা অর্ধেক আস্ত আর অর্ধেক ভাঙা বাড়ির এক উৎসবের রাতে বাসর-ঘরের ভিতরে আর কাছে এসে যারা ভিড় করলো, তাদের মধ্যে বেশি চঞ্চল হয়ে উঠলো সুলতা, শোভা, নিভা আর সুধা, সেই সঙ্গে সুলতার বৌদিও। কুমুদের সঙ্গে জয়ন্তীর বিয়ে, জয়ন্তীর সৌভাগ্যের বাহবা দিতে হয়। বড় বেশি আশ্চর্য হয়ে বাহবা দিয়েছে সবাই। কিন্তু সবচেয়ে বেশি আশ্চর্য হওয়া এখনও বাকি আছে। এই তো সবেমাত্র বাসর-ঘরে ঢুকেছে বর আর কনে। সুলতার বৌদি অনেকেরই কানে কানে ফিসফিস করে বলেন…কাউকে কিছু বলতে কইতে হবে না। তোমরা শুধু চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখ।

কি দেখবো বৌদি?

—জয়ন্তীর ঢলানি। পরের বরকে কাছে পেয়ে যে মেয়ে ঢলে পড়ে, নিজের বরকে নিয়ে সে আজ কি কাণ্ডটা করে একবার দেখ! বিনা টিকেটের তামাশা দু'চোখ ভরে দেখে নিয়ে তারপর যে যার বাড়ি চলে যেও।

কথা শেষ করেই বৌদি আবার ফিসফিস করেন—ও কি, ও আবার কোন ঢঙ। লজ্জায় মরে যাই ব্যাপার দেখছি!

হ্যাঁ, সেই জয়ন্তী সেনই বাসর-ঘরের এক কোণে মাথা হেঁট করে বসে আছে। পায়ের নখটুকুও দেখা যায় না। বেনারসীর সাজে বন্দিনী হয়ে যেন একটা নীরব ও স্থির ছবি বসে আছে। আঁচলটাও খুঁটছে না জয়ন্তী, হাত দুটোও দেখা যায় না। বোঝা যায় না, কি আছে হাতে। ব্রেসলেট না কঙ্কন? ক'গাছি চুড়ি, ক'ভরির চুড়ি?

কিন্তু আর কতক্ষণ? সবাই যে আশায় আশায় আর দাঁড়িয়ে বসে ক্লান্ত হয়ে গেল।

বৌদি বলেন—বরের সঙ্গে একটা রঙ্গের কথা কও জয়ন্তী আমরা শুনে ধন্যি হয়ে যাই।

জয়ন্তী—আপনিই বলুন।

বৌদি—আমি কি করে বলি জয়ন্তী? তোমার কাছ থেকে যদি সে আর্ট রপ্ত করে নিতাম, তবে হয়তো বলতে পারতাম।

নিভা, সুধা, সুলতা আর শোভা খিলখিল করে হেসে ওঠে। জয়ন্তীর অচঞ্চল চেহারাটার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বৌদি সকলের কানের কাছে ফিস-ফিস করেন—চল, আর সময় নষ্ট করে লাভ নেই।

ঘর ছেড়ে চলে গেল সকলেই।

ঘরের বাইরে এসে নিভা বলে—জয়ন্তী এমন গম্ভীর হয়ে গেল কেন বৌদি?

বৌদি একটু চড়া গলায় অথচ বেশ মিষ্টি করে কটকটিয়ে উত্তর দেন—গম্ভীর নয়, গম্ভীর নয়। ও-রকমই হয়। বেহায়ার মত সবই আগে আগে পরের বাসর-ঘরে ফুরিয়ে দিলে ··।

হাসি সামলাতে গিয়ে কথা শেষ করতে পারেন না বৌদি এবং হাসি সামলেই বলে ওঠেন—দূর ছাই, এখনও যে খাওয়া-দাওয়া বাকি আছে, অথচ রাত বোধহয় দশটারও বেশি হয়ে গেল।

খাওয়া-দাওয়া সারতেও বেশ দেরী হয়ে গেল। কিন্তু কি আশ্চর্য, বাড়ি যাবার জন্য যার সবচেয়ে বেশি তাড়া, তিনিই একটু দেরী করলেন। এবং নিভা, শোভা ও সুলতাকে আশ্চর্য করে দিয়ে তিনিই বাসর-ঘরের বন্ধ দরজার কাছে এসে ঘুরঘুর করতে লাগলেন। যা খুঁজছিলেন তা পেয়ে গেলেন বৌদি। বন্ধ জানালার একটা ফাঁক।

সুলতা বলে—আঃ, কি করছো বৌদি! এমন কি আর নতুন ব্যাপার দেখবে?

বৌদি ফিসফিস করেন—ভাবতে দুঃখ হয়, পরের বাসর-ঘরে লোভীর মত সব ফুরিয়ে দিলে, নিজের বরকে কাছে পেয়েও কি দিয়ে···।

বলতে বলতে জানালার ফাঁকে চোখ রেখে চুপ করে গেলেন বৌদি। পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট, বিশ মিনিট, নড়বার নাম করেন না বৌদি।

সুলতা ডাকে—আঃ এতক্ষণ ধরে দেখবার কি আছে, চলে এস বৌদি।

কিন্তু বৌদির চোখটা যেন জানালার ফাঁকে সেঁটে গিয়েছে। শোভা দু'বার বৌদির আঁচল ধরে টেনেছে, তবুও বৌদির হুঁস হয় না। সুধা একবার পিঠে চিমটি কাটে, বৌদির কঠিন শরীরটা একটুও কাঁপে না।

—ভোর করে দেবে না কি বৌদি! সুলতা যখন বৌদির হাত ধরে জোর করে একটা টান দেয়, তখন যেন হুঁস ফিরে পেয়ে, কিন্তু যেন একটু হাঁপাতে হাঁপাতে জানালার কাছ থেকে সরে আসেন বৌদি।—উঃ।

নিভা বলে—কি বৌদি?

বৌদি বলেন—কী মেয়ে রে বাবা! এমনটি আর কোথাও দেখিনি, কখনও শুনিনি।

শোভা—খুব চলেছে বুঝি ?

বৌদি—চলা তো দুটিখানি কথা।

সুধা হাসে—তাহলে গলে গিয়েছে বলুন।

বৌদি—সেটাও তো দুটিখানি কথা।

সুলতা—তবে আবার কি কথা ? কি করছে জয়ন্তী ?

বৌদি—সে কথা আর বলা যায় না। একেবারে উপচে পড়ছে।

কা লা গু রু

কত মহকুমা অফিসার এল আর গেল, কিন্তু মিষ্টার টেনব্রুকের মত কেউ নয়। ছোট শহর সেখপুরার হৃদয় তিনি প্রায় জয় করে বসেছেন। একা উদ্যোগী হয়ে, চাঁদা তুলে আর গ্রাণ্ট বাগিয়ে হাসপাতালটাকে তিনিই মন্দদশা থেকে উদ্ধার করেছেন। পদগৌরবে তিনি মহীরুহ সমান, কিন্তু ব্যবহারে তৃণাদপি সুনীচ। অতি অমায়িক মিশুক প্রকৃতির লোক। আজ সন্ধ্যায় তাঁকে দেখা যায় দর্জিপাড়ার মিলাদে অন্তরঙ্গ হয়ে মিশে আছেন; কাল সন্ধ্যায় হরিসভার প্রাঙ্গণে। জুতো জোড়া দরজার বাইরে খুলে রেখে আসতে কখনো ভুল করেন না। কোনো মতেই তাঁর নিষ্ঠার খুঁত ধরা যায় না।

মিষ্টার জেরোম টি এস টেনব্রুক ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের একটি নতুন নক্ষত্র। আর আলোটাও একেবারে নতুন ধরনের। তাছাড়া তিনি একজন ইণ্ডোলজিস্ট। নিউ-ইয়র্কের স্মামসন ইনস্টিটিউটের মুখপত্রে তাঁর গবেষণার বিবরণ নিয়মিতভাবে ছাপা হয়। তাঁর ভারতী বিদ্যার গভীরতা পশ্চিমা পণ্ডিতেরা প্রথম জানতে পারেন সেই বিখ্যাত থীসিস থেকে—ঋগ্বেদের প্যান-থীইজমে কেলটীয় চারণসঙ্গীতের প্রভাব। এই দুরূহ সিদ্ধান্তকে প্রমাণে অনুমানে প্রতিপন্ন করতে হলে যে-পরিমাণ সপ্রতিভ যোগ্যতা থাকা দরকার, টেনব্রুক সাহেবের সে সবই আছে। তিনি দেবনাগরী লিপি পড়তে পারেন, বাংলা লিখতে পারেন ও হিন্দীতে বক্তৃতা দিতে পারেন। তাঁর দাদু ক্যাপ্টেন টেনব্রুক ছিলেন বিখ্যাত পরিব্রাজক মার্ক টোয়েনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ভারতীয় কাল্‌চার সম্বন্ধে নানা নিগূঢ় তথ্য তিনি দাদুর কাছ থেকেই জানতে পেরেছিলেন। আজকাল ইণ্ডিয়াতে একটা জাতিবাদী অনুদারতার মালিন্য দেখা দিয়েছে, নইলে টেনব্রুকের প্রতিভার এই দিকটাও লোকে চোখে দেখতে পেত। জগদীশপুর থেকে বদলী হবার সময় বিদায়-সভায় বক্তৃতাক্রমে তিনি তাঁর মনের কথা অকপটে খুলে বলেছিলেন—আমার বুঝতে ভুল হতে পারে, হয়তো আমার জানার মধ্যে ভুল আছে, কিন্তু ইণ্ডিয়ার আত্মাটিকে আমি একরকম চিনেছি। চিরধবল কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়ার মত ভারতের সেই আত্মাটিকে আমি ভালবাসি।

অনেকদিন আগে রাজগীরের মাঠে একটা পাথরের ধূপদান কুড়িয়ে পেয়ে-

ছিলেন টেনব্রুক। ধূপদানটা একটা শালচে বেলেপাথরের কৌটা পদ্মফুলের মত। স্টুডিয়োতে একটা লম্বা তেপায়া স্ট্যাণ্ডের ওপর ধূপদানটা বসানো থাকে। প্রতি সন্ধ্যায় বেয়ারা এসে ধূপদানের বুকে প্রায় আধমুঠো কালাগুরু পুড়তে দেয়। টেনব্রুক বলেন—এর মধ্যে একটা অদ্ভুত প্রাচ্য সৌগন্ধের জাদু লুকিয়ে আছে।

বিদ্যাপীঠের ছোট ছোট ছেলেরা ফুটবল খেলছিল। আচমকা একটা হুড-খোলা টুরার সড়ক ছেড়ে একেবারে সশব্দে দৌড়ে মাঠের গায়ে লাগলো। দুষ্টু ছেলের মতই উৎসাহে চঞ্চল টেনব্রুক গাড়ি থেকে এক লাফে মাঠে নেমে পড়লেন। ছেলেদের সঙ্গে ফুটবল খেলতে লেগে গেলেন।

খেলার মাস্টার অনাদিবাবুর বুকে দুরু-দুরু শুরু হয়ে গেল। কিছুক্ষণের জন্য হুইসেল বাজানো ভুলে গেলেন। তবু বার বার ডেভিড হেয়ারের কথা স্মরণ করে কোনো মতে নিজেকে ধীরে ধীরে আশ্বস্ত করে আনলেন। আবার আগের মত খেলা জমে উঠলো।

কিন্তু করালীবাবুর ছেলেটা—ঐ বলাই হলো এক নম্বরের বেয়াড়া। বল ছেড়ে দিয়ে যেভাবে পেছন থেকে সাহেবকে লেঙ্গি মারবার চেষ্টা করছে, ঘন ঘন ফাউল হেঁকেও ওকে দুরস্ত করা যাচ্ছে না। অনাদি মাস্টারের মনের শান্তি ক্ষণে-ক্ষণে খুঁচিয়ে নষ্ট করছিল বলাই—হিতাহিত ভাবনা নেই ছেলেটার।

খেলার শেষে টেনব্রুক সাহেব কিন্তু সব ছেলেদের মধ্যে বলাইকেই পিঠ চাপড়ে বাহবা দিয়ে গেলেন। সাহেব চলে যাবার পর অনাদি মাস্টার তবু বলাইকে আর একবার ভাল করে ধমকাতে ছাড়লেন না—ভবিষ্যতে আর কখনও এরকম গোঁয়ারের মত খেলবে না।

অনাদি মাস্টারের মন কেন জানি ভরসা পাচ্ছিল না।

টেনব্রুক সাহেবকে লোকে আরও ভাল করে চিনতে পারলো সেইদিন—দরবার দিবসের অনুষ্ঠানে। ধন্য ধন্য পড়ে গেল। বার লাইব্রেরী ও তালুকদার সমিতির প্রত্যেকটি সভ্য, তাছাড়া যত কেরাণী বেনিয়া পাদরী, সকলেই টেনব্রুক সাহেবের বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ হয়ে ঘরে ফিরে গেলেন।

টেনব্রুক সাহেব তাঁর বক্তৃতায় বলেছিলেন—আমি প্রত্যেকটি সরকারী কর্মচারীকে এবং বিশেষ করে পুলিশকে একটি সত্য স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। সেই সত্য হলো, তাঁরা যেন কখনো না মনে করেন যে, তাঁরা জনসাধারণের ভাগ্যবিধাতা। তাঁরা পাব্লিকের সেবক মাত্র। পুলিশ যেন সর্বদা মনে রাখে যে তারা মস্তিষ্ক নয়—তারা দুটি হাত মাত্র। তাদের কর্তব্য শুধু অর্ডার পালন করা। আজকের সুপ্রভাতে আমার মনে কেন জানি একটা আবছা আশঙ্কা থেকে থেকে উঁকি দিচ্ছে—ভারতের আকাশে অলক্ষ্যে কোথায়ও বোধহয় এক টুকরো অবাঞ্ছিত বেদনার মেঘ ঘনিয়ে উঠছে। বোধহয় একটা পরীক্ষার দিন এগিয়ে আসছে। আমাদের এই ছোট সুখী সহরেও ঝড় দেখা দিতে পারে। সেই

পরীক্ষায় পাব্লিক ও গবর্ণমেন্টের সম্পর্ক যেন অনর্থক তিক্ত না হয়ে ওঠে। সেইজন্য আমি আগে থেকেই সবার আগে পুলিশকে তার কর্তব্য সম্বন্ধে এই সতর্কবাণী শুনিয়ে দিতে চাই। পুলিশ যদি আইনের মাত্রা লঙ্ঘন করে, তবে সেটাও রাজদ্রোহ বলে গণ্য করতে গবর্ণমেন্ট বাধ্য হবে, তার শাস্তিও আছে।'

বক্তৃতার সময় সকলেই একটা তীব্র কৌতূহল ও ঐতিহাসিক প্রতিশোধের তৃপ্তি নিয়ে ডি-এস-পি রায়বাহাদুর জানকীপ্রসাদের দিকে তাকিয়ে দেখছিল। পুলিশ-প্রধান জানকীপ্রসাদের মুখে কিন্তু কোনো ভাববৈকল্য দেখা দেয় না। লড়াইয়ের ঘোড়ার মত তাঁর কপালের মোটামোটা শিরাগুলি এক অবধারিত আশ্বাসে শান্ত গর্বে দপ দপ করছিল—তেমনি নির্বিকার, তেমনি স্পষ্ট।

বিদ্যাপীঠের খেলার মাঠের মত সেখপুরার জীবন হাসিখুশিতে চঞ্চল হয়েছিল। টেনব্রুক সাহেব রোজ না হোক, সপ্তাহে তিনটি দিন অন্তত খেলতে আসেন। অনাদি মাস্টার একটা আশঙ্কা থেকে রেহাই পেয়েছেন। বলাই আর টেনব্রুক সাহেব একই সাইডে খেলে। দু'জনের মধ্যে আর সংঘর্ষের কোনো অবকাশ নেই। ছেলেগুলি সত্যি সত্যি খেলার ব্যাপারে যেন টেনব্রুকের ন্যাওটা হয়ে উঠেছিল। প্রতি বৈকালে ওরা সাগ্রহ প্রতীক্ষায় সাহেবের গাড়ির শব্দের জন্য উৎকর্ণ হয়ে থাকে।

তবু মেঘ দেখা দিল। সেখপুরা শহরকে সত্যিই যেন একটা ঝড়ের আবেগ চারদিক থেকে ঘিরে ধরেছে। লোকাল বোর্ডের একুশ জন সদস্য ইস্তফা দিল। তিনটে দিন হরতাল হলো। রাজগঞ্জ কোলিয়ারিতে শুরু হল ধর্মঘট। জৈন ধর্মশালার আঙ্গিনায় একটা জনসভাও হয়ে গেল। একটা হাজার-মানুষের শোভাযাত্রা স্বরাজ পতাকা নিয়ে শহর প্রদক্ষিণ করে গেল।

মিস্টার টেনব্রুক অবিচল ছিলেন। একটিও লোক গ্রেপ্তার হলো না, একশো চুয়াল্লিশ জারি করে কোনো ঢোলের শব্দ বাজলো না। পুলিশ শুধু সেজেগুজে কোতোয়ালীতে বসে থাকে। বাইরে যাবার কোনো প্রয়োজন হয় না—টেনব্রুকের কড়া নির্দেশ।

সূর্যকুণ্ডের জলের মত সেখপুরা যেন তিনটে মাস ধরে উত্তেজনায় ফুটতে লাগলো। তার মধ্যে মিস্টার টেনব্রুক শুধু একটি কাজ করলেন; দিকে দিকে ইস্তাহার ছড়িয়ে দিলেন—"আমার প্রিয় সেখপুরার পাব্লিকের কাছে এই আবেদন করতে চাই যে, যে কোনো বিবাদ বা প্রতিবাদ হোক—আলোচনা করে, তার নিষ্পত্তি হওয়া বাঞ্ছনীয়। সভ্যতার চরম উন্নতি হলো ডেমোক্রেসী, ডেমোক্রেসীর প্রাণ হলো ডিসিপ্লিন। সেই ডিসিপ্লিন যেন নষ্ট না হয়।"

ঘটনাগুলি যেন নিজের উত্তেজনাতে অবসন্ন হয়ে ক্রমে থিতিয়ে এল। কোথাও প্রতিহত হলো না বলেই বোধহয় ফুরিয়ে গেল। টেনব্রুক তাঁর নৈতিক

এক্সপেরিমেন্টের এই অভাবিত সাফল্যে খুশিতে বিভোর হয়ে রইলেন। শহরের নানা সম্প্রদায়ের দশজন বেসরকারী এবং পাঁচজন সরকারী প্রধানকে ডেকে নিয়ে শান্তি কমিটি করলেন। কে যেন পরামর্শ দিল, ডি-এস-পিকে কমিটির মধ্যে গ্রহণ করা হোক। শুদ্ধাদর্শী টেনব্রুক শুচিবাতিকের মত নাক কুঁচকে আপত্তি জানালেন—না, কোনো মতেই নয়।

শুধু থামছে না প্রভাতফেরীর গান। ঝড়টা যেন পালিয়ে গেছে শুধু ভৈরবী সুরের একটা আক্রোশ রেখে দিয়ে। সেখপুরার নিথর সুপ্তির মধ্যে প্রতিদিন শেষ রাত্রে কারা যেন পথে পথে গান গেয়ে চলে যায়। টেনব্রুক দিন গুনছিলেন, এই চৌরচপলতাও ক্রমে শান্ত হয়ে আসবে।

অনেক দিন গোনা হয়ে গেল। টেনব্রুক তবু ধৈর্য ও বিশ্বাসে অটল ছিলেন। শান্তিকমিটি কত গোপন খবর এনে দিল, তবু প্রভাতফেরীর ওই রহস্যটা আজও ঘুচলো না। কেউ বলতে পারে না কারা গান গায়, কোথা থেকে আসে এবং কোথায় চলে যায়। মাঝরাত্রে শহরের সব পাড়ার কত ছেলেবুড়ো উঠে বসে থাকে। প্রতীক্ষায় নিঝুম মুহূর্তগুলি পার হতে থাকে। হতাশ হয়ে ভাবে—আজ বুঝি আর গানটা এল না। সেই আনমনা অবকাশের মধ্যে চকিতে বাইরের পথে গানের শব্দ উতরোল হয়ে ওঠে। দরজা খুলে বাইরে আসতে আসতেই মিলিয়ে যায়—কাউকে দেখা যায় না।

এ গান কখনও বন্ধ হবে না। শহরে একটা কাহিনী ছড়িয়ে পড়েছে—এই গয়ারোড ধরে যদি মাইল খানেক পশ্চিমে এগিয়ে যাও, তবে প্রথমে পড়বে ডুমরিচকের ডাকবাংলো। সেখান থেকে ডাইনে বেঁকে আরও পাঁচ ক্রোশ। পুরনো কারবালা পার হয়ে একটা বহেড়ার জঙ্গল, তার উত্তর ঘেঁষে একটা নদী। নদীর একপাশে একটা প্রকাণ্ড পিপুল গাছ হেলে আছে। অন্য পাশে পি-ডব্লু-ডির সড়ক।

হ্যাঁ আছে। সবাই জানে, সার্ভিস বাসগুলি গিরিডির পথে মোড় ফেরবার আগে একটু জিরিয়ে নেয়—রেডিয়েটারে নতুন জল ঢালে। একটা চৌকীদারী ফাঁড়ি আছে সেখানে। পিপুলতলার একটা গাঁথুনির ওপর দ্রাঘিমার নম্বর লেখা আছে।

শোকাবহ বেদনার কাহিনীটা আরও করুণ হয়ে ছড়িয়ে পড়ে—সেই সন সাতান্নর গদরে ঠিক ঐ জায়গাটিতে একশো জন ছত্রী সেপাইয়ের প্রাণ গিয়েছিল। এক কার্নাইল সাহেব ঐ পিপুলতলায় তোপ বসিয়ে বন্দী ছত্রীদের উড়িয়ে দিয়েছিলেন।

আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে কাহিনীটা সবার কানে কানে চুপি চুপি ফিস্‌ফিস্ করে যায়—গানটা সত্যিই কোনো মানুষের গলার গান নয়—প্রভাতফেরী-টেরী নয়। একটা শব্দমরীচিকা মাত্র। গয়ারোডের দিক থেকেই শব্দটা প্রথম শোনা

যায়। সারারাত ধরে এগিয়ে আসে, তারপর শহরে ঢোকে এবং ভোর হতে না হতেই সরে পড়ে।

মিস্টার টেনব্রুকও কাহিনীটা শুনলেন। বিভ্রান্ত ও সন্ত্রস্ত শান্তি কমিটিকে তিনিই আশ্বাস দিয়ে জানালেন—ঘাবড়াবার কিছু নেই। এইসব প্রেতরাগিণী ও কিংবদন্তীর সঙ্গে লড়বার কায়দাও আমি জানি।

অঘ্রাণের রাত্রি ভোর হয়ে আসে। মোড়ের মাথায় মিউনিসিপ্যাল ল্যাম্প-পোস্টের মাথাটা তখনো জ্বলছে। শিশির-ভেজা সড়কটা নেতিয়ে পড়ে আছে অলসভাবে। শালের ডালপালাগুলি এক একটা কুয়াসার স্তবক আঁকড়ে নিঝুম হয়ে আছে। সেই ফিকে অন্ধকার আর মূক নিসর্গের মাঝখানে কাছারী রোডের ধারে একটি গাছতলায় মিস্টার টেনব্রুক যেন গা-ঢাকা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন—এক অবাস্তব দেশের সেনাবাহিনীর সতর্ক শান্ত্রীর মত।

এতক্ষণে শুনতে পাওয়া গেল। মন্থর বাতাসের গায়ে দূরাগত সেই অদ্ভুত সুরের শিহর এসে লাগছে। গানের ভাষা স্পষ্ট বোঝা যায় না। ছোট ছোট শব্দময় স্রোত এক সঙ্গে মিশে গিয়ে যেন এক সুরপ্রপাত সৃষ্টি করেছে। তারা এগিয়ে আসছে।

নয়া জমানার সূর্য উঠেছে। জাগো আমার হিন্দুস্থানী ভাই আর বহিন। জেগে উঠে এই নতুন রশ্মি সাগ্রহে পান কর।

গাইতে গাইতে প্রভাতফেরীর দলটা সামনে এসে পড়লো। ছোট ছোট কতগুলি গীতপ্রাণ অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি। চেনবার জো নেই। মিস্টার টেনব্রুক স্তব্ধ হয়ে নিশ্বাস রুখে শুনছিলেন। কতগুলি কচি কিশোর মানুষের মিলিত কণ্ঠস্বর—তার হর্ষ উল্লাস আক্ষেপের প্রত্যেকটি ধ্বনি তাঁর পরিচিত। টেনব্রুকের চোয়াল দুটো রুদ্ধ উত্তেজনায় নিঃশব্দে কঠিন হয়ে উঠতে থাকে।

আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনলেন টেনব্রুক। পরিশ্রান্ত গানের সুরটা যেন এপাড়া-ওপাড়া ছুঁয়ে এলোপাথাড়ি দৌড়ে চলে যাচ্ছে। মাঠের কাছাকাছি গিয়ে আর একবার বিজয় প্রসাদের মত উদ্দাম হয়ে উঠলো, তারপরেই আকস্মিক একটা বিরাম। কিছুই শোনা যায় না। অনেকক্ষণ পরে আবার গুমরে উঠলো—একেবারে অন্যদিকে। বোধহয় পশ্চিমের ধানক্ষেতের ওপর দিয়ে রেললাইন ডিঙিয়ে দর্জিপাড়ার দিকে ছুটে চলেছে। চটুল ঘূর্ণি বাতাসের মত গানটা উড়ে যাচ্ছে : .

গল্প আছে আওরঙ্গজেব অক্ষয় বটের শেকড় তুলে ফেলে তাতে গরম সীসা ঢেলে দিয়েছিলেন, যেন ভবিষ্যতে কোনদিন আর চারা গজিয়ে না ওঠে। একেই বোধহয় আমূল চিকিৎসা বলে।

টেনব্রুক বোধহয় গল্পটা জানতেন। বিকালে বিদ্যাপীঠের ছুটির পর ছাত্রেরা

কেউ বাড়ি ফিরতে পারেনি। স্বয়ং টেনব্রুক উপস্থিত থেকে ছাত্রদের একটা শোভাযাত্রা রওনা করে দিলেন। রাত দশটা পর্যন্ত শহরের সর্বত্র একটা শোভাযাত্রা ঘুরবে। ফিরে বিদ্যাপীঠে এসেই শেষ হবে। তারপর খাওয়া-দাওয়া হবে। টেনব্রুক জিলিপি কেনবার জন্য দশটি টাকা দিলেন।

প্রায় একশো ছাত্রের পুরোভাগে অগ্রনায়কের মত একটু এগিয়ে দাঁড়িয়েছিল বলাই। তাকেই শোভাযাত্রা চালিয়ে আর গাইয়ে নিয়ে যাবার ভার দেওয়া হয়েছে! টেনব্রুক সাহেবের নির্দেশ।

বলাইয়ের মাথাটা সামনের দিকে ভাঙা গাছের ডালের মত ঝুঁকেছিল। মাটির দিকে একটা উদ্দেশ্যহীন দৃষ্টি নিয়ে দেখছিল বলাই। ওর সমস্ত দুরন্তপনা এক চরম অপমানের আঘাতে যেন অসাড় হয়ে গেছে। আসন্ন মূর্ছার সময় রোগীকে যেন জোর করে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে।

গানটা টেনব্রুকের রচনা। নামতা পড়ার ভঙ্গীতে বলাই সুর করে গানের পদটি গাইলো—'আমি যীশুর ছোট মেষ'!

শোভাযাত্রী ছেলেরা বিষন্ন পাখির ঝাঁকের মত কিচির মিচির করে ধুয়া ধরে গাইলো—'আমি যীশুর ছোট মেষ।'

যেন জিভে কামড় পড়েছে, বলাই হঠাৎ আরও জোরে বিকৃত স্বরে চেঁচিয়ে উঠলো—'প্রতিদিন মোর সুখ অশেষ—'

ছেলের দল প্রতিধ্বনি করলো—'প্রতিদিন মোর সুখ অশেষ'।

শোভাযাত্রা রওনা হলো। হিতৈষী অভিভাবকের মত মনের স্নেহ মনেই গোপন রেখে, শাসনের দোর্দণ্ড বিগ্রহের ভঙ্গীতে টেনব্রুক কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে দেখলেন, বাংলোয় চলে গেলেন। তিনি জানলেন, রাত্রি দশটা পর্যন্ত এইভাবে সুপথে চলে ছেলেগুলি ক্লান্ত হয়ে পড়বে—বিপথে যাবার উৎসাহও নিভে যাবে তাছাড়া দশ টাকার ঘুমপাড়ানী মিষ্টির ব্যবস্থাও করে দিয়েছেন। আর ভাবনা নেই। টেনব্রুক নিশ্চিন্ত হলেন।

সন্ধ্যা হয়েছে। ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারখানা টেবিলের ওপর রাখা ছিল। ইতো-লজিস্ট টেনব্রুক আজ সেখপুরার প্রস্তরহস্তের বুক চিরে খানাতল্লাসী করবেন। ঐ প্রতিহিংসাপরায়ণ কিংবদন্তীটা ভয়াবহ ব্যাধির মত সারা সেখপুরার নাগরিক বুদ্ধি বিষাক্ত করে তুলেছে। এর পেছনে কোনো সত্যের ভিত্তি আছে কি?

গেজেটিয়ার হাতড়ে হাতড়ে টেনব্রুক এক জায়গায় এসে বিস্ময়ে চমকে উঠলেন। সত্যিই যে লেখা আছে ছাপার অক্ষরে—ডুমরিচকের ডাকবাংলো থেকে এগার মাইল দূরে যে পিপুল গাছের তলায় স্থানীয় দ্রাঘিমারেখার পরিচয় লেখা আছে, সেখানে একদিন কোম্পানী ফৌজের কামানের বেদী ছিল। স্থানীয় লোকেরা বলে, মিউটিনির সময় ঐখানে সেপাই বন্দীদের প্রাণদণ্ড হয়েছিল।

প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের কোন্ গবেট সার্ভেয়ার এই ষাঁড়-মোরগ গল্পটি সরকারী গ্রন্থের পাতায় ফেঁদে গেছেন! মিস্টার টেনব্রুক মনে মনে সেই মূঢ় পণ্ডিতের বুদ্ধিকে লিঞ্চ করলেন। ধিক্কার দিলেন—এই সব রন্ধ্র দিয়েই একদিন শনি ঢোকে এবং হয়েছেও তাই। জন কোম্পানীর বেনেবুদ্ধি দিয়ে বিংশ শতাব্দীর কলোনি শাসন চলে না। চাই আমূল চিকিৎসা। ইণ্ডোলজিস্ট টেনব্রক তাঁর প্রতিভার ছুরিকে শানিয়ে নিলেন।

নতুন করে প্যারা লিখলেন টেনব্রুক।—'ডুমরিচক ডাকবাংলো থেকে এগার মাইল দূরে, নদীর ধারে, পিপুলগাছের তলায় যেখানে দ্রাঘিমারেখার পরিচয় লেখা রয়েছে, সেখানে (প্রথম পৌরাণিক যুগে—খৃষ্ট মৃত্যুর পরে পঞ্চম শতকে) ব্রহ্মদত্ত নামে এক ঋষির আশ্রম ছিল…

হঠাৎ একবার কলম থামালেন টেনব্রুক। ভাবতে ভাবতে ভুরু দুটো কেঁচোর মত পাকিয়ে উঠলো। কদর্য একটা কুহক যেন ছোট ছায়ামূর্তি ধরে তাঁর দৃষ্টিপথ জুড়ে নেচে বেড়াচ্ছে। এই মূর্তিটাকে চিনতে পারা যায়—গান্ধী গান্ধী গান্ধী। সবাই তাকে বলে গান্ধী। কে এই গান্ধী? এই অশান্ত অবাধ্য দুষ্টু ফকীর গান্ধী? কী ভেবেছে সে?

দাঁতে দাঁত চেপে শক্ত করে কলমটা আবার তুলে ধরলেন টেনব্রুক। যেন একটা প্রেরণার আবেশে লিখে ফেললেন—'এক দুর্দান্ত পাপী কিরাতের দৌরাত্ম্যে রাজ্যের সুখ শান্তি নষ্ট হতে বসেছিল। ক্ষত্রিয় রাজা দেবপ্রিয়ের সেবায় ও প্রার্থনায় তুষ্ট হয়ে ঋষি ব্রহ্মদত্ত সেই কিরাতকে অভিশাপ দিয়ে ভস্ম করে ফেলেন।'

টাইপরাইটার মেসিনটাকে সাগ্রহে বুকের কাছে টেনে নিলেন টেনব্রুক। নতুন একটি কাগজের স্লিপের ওপর এই ঐতিহাসিক সত্যটিকে টাইপ করে সাজালেন। পুরনো প্যারাগ্রাফের ওপর খাপে খাপে মিলিয়ে আঠা দিয়ে সেঁটে দিলেন। চেপে চেপে বসিয়ে দিলেন, চার পাশ থেকে দেখলেন, যেন কোথাও কোনো ফাঁক না থাকে।

এই সামান্য কাজটুকু করতেই হাঁপিয়ে উঠেছিলেন টেনব্রুক। ক্ষণে ক্ষণে উত্তেজিত হয়ে পড়ছিলেন। একটা বাচাল ঝর্ণার মুখে ..ন পাথর চাপা দিচ্ছেন। আশ্বস্ত হলেন, আর কোন ফাঁক নেই।

বাকী ..ইল আ..কের রাতটা। তখন সন্ধে পার হয়ে গেছে। এক পেয়ালা কফি খেয়ে পরিশ্রান্ত টেনব্রুক ঘরের ভেতর কিছুক্ষণ পাইচারী করে নিলেন। তারপর ল্যাম্পের ওপর নীল কাচের ঘেরাটোপ টেনে দিয়ে পড়তে বসলেন। সার্থক আনন্দের আরামে সোফার ওপর শরীর এলিয়ে দিলেন।

বাইরের শব্দহীন অন্ধকারটা তখন জমাট বেঁধে গেছে—একটা শোকাচ্ছন্ন রাত্রির হৃদ্‌পিণ্ডের মত। আমবাগানের ভেতর দিয়ে ছাত্রদের শোভাযাত্রা ফিরছে এতক্ষণে। একশত ক্লান্ত ভাঙা-গলার একটা বিকৃত গানের শব্দ আসছে। ঠিক

শব্দ নয়—শব্দের রুষ্ট নিশ্বাস। একটা আহত সর্পযূথ যেন বিষদাঁত নতুন করে ঘষে নেবার জন্য আড়াল দিয়ে সরে পড়ছে।

হঠাৎ শিউরে উঠলেন টেনক্রুক। ভারতের আত্মার ছবিটা টেনক্রুকের মনের ভেতর হঠাৎ ঘোলা হয়ে গেল—কাঞ্চনজঙ্ঘার চিরধবল চূড়ার মত নয়, বলাইয়ের মুখটার মত বর্ণচোরা হিংসুক ও ভীরু।

টেনক্রুক খোলা জানালার দিকে উদ্‌ভ্রান্তের মত কিছুক্ষণ নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে রইলেন। একটা নিষ্ঠুর নৈরাশ্য চিন্তার শিরায় শিরায় শিউরে উঠতে লাগলো—না, ওরা মানবে না। আবার ওরা আসবে। আজই রাত্রিশেষে—একটা প্রেতের দল, বায়ুভূত নিরালম্ব ছোট ছোট মসীমূর্তি—শয়তানী আনন্দে অপমৃত্যুর কোরাস গাইতে গাইতে আবার আসবে—দল বেঁধে—কাতারে কাতারে।

রাজগীরের ধূপদানের বুকটা তখন প্রবলভাবে পুড়ে চলেছে। কুণ্ডলী কুণ্ডলী ধোঁয়া জানালার গরাদের ফাঁক দিয়ে অবলীল স্বাচ্ছন্দ্যে বাইরে উড়ে যাচ্ছে। টেনক্রুকের মাথার ভেতর একটা বোবা বিভীষিকা ছটফট করে।

অসহ উদ্বেগে টেনক্রুক টেবিলের ওপর ঘণ্টি ঠুকতে লাগলেন। বেয়ারাটা তন্দ্রা ছেড়ে ব্যস্ত হয়ে দৌড়ে এসে ডাকলো—হুজুর!

টেনক্রুকের সারা মুখে একটা রক্তাভ জ্বালার দীপ্তি। গলা ছাড়িয়ে অস্বাভাবিক রকম স্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন—জলদি দৌড়ে যাও, ডি-এস-পি সাহেবকে সেলাম দাও! সুবেদার মেজরকে বোলাও। জলদি কর। আজ রাত্রে ইস্টার্ণ রাইফেলস্ ঘুমোতে পারবে না। সহরটাকে কর্ডন দিয়ে রাখ। সমস্ত রাত পাহারা দিতে হবে। শিকারীর মত তাড়া করে আজ ওদের ধরে ফেলতে হবে। চরম শিক্ষা শিখিয়ে দিতে হবে আজ।

ডেমোক্রেসীর এই সঙ্কটের শেষ ঘটনা হলো সম্রাট বনাম বলাইয়ের মোকদ্দমা। তার বিবরণ জানবার উপায় নেই। কে ঢুকবে আদালত এলাকায়। যে-ভয়ানক লাঠি আর লালপাগড়ীর আস্ফালন। বন্দীবাহী মোটর লরিটা থেকে নামবার সময় দূর থেকে বলাইকে চকিতে একটুখানি দেখতে পাওয়া যায় —মাথায় ব্যাণ্ডেজ, কোমরে দড়ি, হাতে হাতকড়া। ডি-এস-পি জানকীপ্রসাদের মূর্তিটাই সবচেয়ে স্পষ্ট হয়ে চোখে পড়ে—আদালতের উঁচু বারান্দার ওপর টান হয়ে দাঁড়িয়ে বেল্টের ওপর হাত বোলান, কপালের ওপর মোটা শিরাগুলি অশান্ত গর্বে দপদপ করে ফুলে ওঠে, আর ফটকের বাইরে ভিড়ের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ গর্জন করে ওঠেন—ডিসপার্স!

তারপরেই ফটকের পুলিশ পিকেটের দিকে তাকিয়ে থাবা তুলে অর্ডার হাঁকেন—চার্জ!

পারমিতা জানে, আর ভাবনা করবার কোন মানে হয় না।

আজ না হয় কাল, না হয় তো আর একটি বা দু'টি মাসের মধ্যে এই বাড়ির আসল মানুষটি পারমিতাকে নাম ধরে সেই সুরে ডাক দিয়ে ফেলবে, যে সুরে ডাক দিলে আর কোন সন্দেহ থাকে না যে, কেন ও কিসের জন্য ডাকবার দরকার হয়েছে।

এই বাড়ি হলো সেই মনোময় মজুমদারের বাড়ি, অবাঙালীর দেশে বিপুল ও বিরাট ব্যবসায়ের কৃতিত্বে যিনি বিখ্যাত হয়েছেন। যে বাঙালী গোয়ালিয়র বেড়াতে গিয়েছেন, তিনি দেখেছেন এবং দেখে খুশি হয়েছেন যে, গোয়ালিয়র স্টেশন থেকে লিটি লস্করে যাবার পথে যতগুলি সুন্দর বাড়ি দেখা যায়, তার মধ্যে এই বাড়িটিই সবচেয়ে বেশি সুন্দর, যার ফটকের গায়ে কুচকুচে কালো কষ্টি পাথরের ফলকের উপর সোনালী অক্ষরে লেখা আছে, মজুমদার হাউস।

মজুমদার? মজুমদার তো মারাঠী নামেরও পদবী হতে পারে। না, তা নয়, একটু খোঁজ নিয়েই তিনি জানতে পেরেছেন, এই বাড়ি হলো বাঙালী মনোময় মজুমদারের বাড়ি। ভদ্রলোকের বয়সও বেশি নয়, চল্লিশ পার হয়ে বড় জোর বেয়াল্লিশ কিংবা তেতাল্লিশ হয়েছে। ভদ্রলোক খুব শিক্ষিত। পাঁচ বছর গ্লাসগোতে ছিলেন, নানারকম কলকারখানার কাজ শিখে এসেছেন। তা ছাড়া, ঝাঁসিতে পৈতৃক ভূসম্পত্তি যেটা ছিল, তার আয়ও মানুষকে চিরকাল বড়লোক করে রাখবার মত আয়। যাই হোক, পিতার মৃত্যুর পর মনোময় মজুমদার সেই পৈতৃক ভূসম্পত্তির উপর আর কোন মোহ রাখেননি। সব বেচে দিয়ে যে পুঁজি হলো তাই দিয়ে একটা হোসিয়ারি, একটা সুগার মিল আর একটা ঢালাই কারখানা গড়ে তুললেন।

মজুমদার হাউসের লনের উপর দশ বছর বয়সের যে ফুটফুটে মেয়েটিকে সকাল-বিকেল ছুটোছুটি করতে দেখা যায়, সেটি মনোময় মজুমদারেরই মেয়ে। এই মেয়ে ছাড়া এবাড়িতে আপনজন বলতে মনোময়ের আর কেউ নেই। একজন যিনি ছিলেন, তিনি পাঁচ বছর আগে মারা গিয়েছেন। এই মণ্টু, আজ যার বয়স দশ বছর, সে সেদিন পাঁচ বছর বয়সের বুদ্ধিতে মরা মাকে ঘুমন্ত মা মনে করে যখন বার বার ডেকে ডেকে মায়ের ঘুম ভাঙ্গাবার চেষ্টা করছিল, ঠিক সেই সময়ে সেদিন সাত দিনের শিকারসফর শেষ করে, গাড়ির কেরিয়ারে দশটা ময়ূর আর একটা সম্বর বোঝাই করে বাড়ি ফিরেছিল মনোময়।

খুবই আশ্চর্য হয়েছিল, আর দুঃখিত হয়েছিল মনোময়। মনেও পড়েছিল মনোময়ের, মনোময়কে শিকারীর সাজ পরতে দেখে কি যেন বলবার জন্য কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল মণ্টুর মা। কিন্তু কিছুই বলেনি। কি অদ্ভুত কাণ্ড, সাতদিন

আগে যে-মানুষটার সামান্য একটু জ্বর হয়েছিল বলে শুনতে পেয়েছিল মনোময়, সেই মানুষটা আজ একেবারে চুপ !

কিন্তু অনেকেই শুনে আশ্চর্য হয়েছিল, সেদিন এমন একটা আঘাতের দিনেও কারবারের কর্তব্য ভুলে যায়নি মনোময়। সেদিনও ঠিক সন্ধ্যা হতেই টেলিফোনে তিন কারখানার তিন ম্যানেজারকে ডেকে পাঠিয়েছিল, নতুন অর্ডারের ফাইল-গুলিও দেখেছিল, আর, আরও যা বলবার ছিল সবই বলেছিল।

বিপত্নীক মনোময় আর বিয়ে করেনি। বিপত্নীক হবার পর এই পাঁচটা বছরের মধ্যে জীবনে কোন শূন্যতা বোধ করেছে কি না মনোময়, তাও বোঝা যায় না। মাঝে ঢোলপুর থেকে ব্যানার্জিবাবু একদিন এসে বলেছিলেন—এরকম একলাটি হয়ে তোমার পড়ে থাকা আর ভাল দেখায় না মনোময়।

—আমি তো খুব ভাল দেখছি।

—তার মানে ?

—আমি নিজেকে একটুও একলাটি বোধ করি না।

—তার মানেও বুঝলাম না।

—তার মানে হলো, আবার একটা বিয়ে করবার কথা ভাববারই সময় নেই, দরকারও নেই।

মজুমদার হাউসের ড্রইংরুমে বসে মনোময়ের এই কথার উত্তর দিতে গিয়েই যাকে দেখে চমকে উঠেছিলেন ব্যানার্জিবাবু, সে হলো এই পারমিতা। মণ্টুর হাত ধরে লনের উপর ঘুরে বেড়াচ্ছে এক তরুণী, দেখে বিধবা বলেই মনে হয়। সাদা ধবধবে থানের সাজ, সিঁথিটা শূন্য, হাতে ও গলায় সোনাদানার কোন চিহ্নও নেই। পায়ে একজোড়া চটি, তাও সাদা।

মনোময় কিছু না বললেও, বোধহয় কল্পনায় বুঝে নিয়েছিলেন ব্যানার্জিবাবু, না, সত্যিই মনোময়ের বিয়ে করবার দরকার নেই।

কী চমৎকার দেখতে এই মহিলা ! ও চেহারাতে রঙীন শাড়ির সাজ আর সোনার গয়নার কোন দরকারই হয় না। ফোটা টগরের সাদার মধ্যে একটা রঙীন প্রজাপতির শরীর পড়ে থাকলে সে প্রজাপতিকে যেমন দেখায়, মহিলাকে প্রায় সেইরকমই দেখাচ্ছে। মণ্টুর সঙ্গে কথা বলতে বলতে হেসে উঠেছে মহিলা, হেসে ফেলতে গিয়েই দুলে উঠেছে মাথাটা ; সঙ্গে সঙ্গে মস্ত বড একটা ফাঁপানো খোঁপার ভার ভেঙ্গে গিয়ে চিকন কালো চুলের গোছা খুলে যাচ্ছে। দু'হাত দিয়ে চুলের গোছা তুলে আবার খোঁপা বাঁধছে মহিলা। হাত দুটিও একেবারে নিটোল, আর খোঁপা চেপে ধরবার ভঙ্গিটিও ঠিক খাজুরাহোর মন্দিরের সেই পাথুরে অপ্সরাটির মত।

—উনি কে ? একটু কুণ্ঠিতভাবে প্রশ্ন করেছিলেন ব্যানার্জিবাবু।

—কে ? কার কথা বলছেন ?

—ঐ যে, আপনার মেয়েটির হাত ধরে ওখানে…।

—ওঃ, পারমিতার কথা বলছেন ? পারমিতা হলো মণ্টুর নাচের টিচার।

—কিসের টিচার ? একটু আতঙ্কিত হয়ে প্রশ্ন করেছিলেন ব্যানার্জিবাবু।

—নাচের, নাচের।

—আচ্ছা, আমি এখন উঠি। বলতে বলতে চেয়ার থেকে উঠে তখনই চলে গেলেন ব্যানার্জিবাবু।

দু'বছর আগে এই বাড়িতে এসে ব্যানার্জিবাবু কল্পনাতে যে বিস্ময় স্বীকার করে নিয়ে চলে গিয়েছিলেন, তার কোন সংবাদ রাখে না পারমিতা। জানেও না পারমিতা, কি ধারণা নিয়ে চলে গিয়েছিলেন ব্যানার্জিবাবু। জানলে অবশ্য পারমিতা মনে মনে ব্যানার্জিবাবুর ধারণাকে আজ ধন্যবাদ না দিয়ে পারতো না। ঠিকই তো আমি থাকতে মনোময় মজুমদারের জীবন একলাটি হয়ে যাবে কেন।

কিন্তু ব্যানার্জিবাবুর ধারণার মধ্যে একটা ভুলও আছে। তিনি যতটা হয়ে গিয়েছে বলে মনে করেছেন, ঠিক ততটা আজও সত্য হয়ে ওঠেনি। আজও ডাক আসেনি। মনোময় আজও তার কারখানার কাজ আর শিকারের সাধ নিয়ে ব্যস্ত। কিন্তু সে ডাক আসতে আর কতই বা দেরি হতে পারে ?

মনোময়ের এই বাড়ির সব শূন্যতাকে ভালবাসায় ভরে দিয়েছে যে পারমিতা, তার আশার হিসাবেও বা ভুল হবে কেন ? ঠিক কথা, মণ্টু তার মা হারাবার দুঃখ এই দু'বছরের মধ্যেই ভুলে গিয়েছে। বাড়ির চাকর মালী বেয়ারা আর খানসামাও এখন সাবধান হয়ে গিয়েছে। যে পারমিতা দেবীকে একদিন তারা নেহাৎই নাচের মাস্টারণী বলে মনে করেছিল, আজ তারা তাকেই বেশ একটু ভীতভাবে দেবীজী বলে ডাকে। মণ্টু ডাকে—পারু মাসী। আজ আর খানসামার কোন সাধ্যি নেই যে, বাজার সরকার গণেশবাবুর কাছ থেকে এক সের ঘি-এর দাম নিয়ে গিয়ে আধ সের ঘি নিয়ে আসে। গণেশবাবুর কাছেও মাঝে মাঝে কৈফিয়ৎ চায় পারমিতা—কুকুরের জন্যে ওমাসে যদি আশি টাকার মাংসের বিল হয়ে থাকে, তবে এমাসে একশো কুড়ি টাকার বিল হয় কেন ? বাগানের মালী সারাটা বিকেল ঘুমিয়ে পড়ে থাকবার আর সুযোগ পায় না। যে চাকরটা এত বড় বারান্দার উপর শুধু একটু ঝাড়ু বুলিয়ে কাজ সেরে দিত, তাকে আজ দু'বেলা বারান্দা মুছতে হয়, যতক্ষণ না বারান্দার মোজেয়িক আয়নার মত চকচকে হয়ে হেসে ওঠে।

এর মধ্যে শুধু একটা কঠোর নামের ডাক, যে নাম পারমিতার জীবনে আজ নিতান্ত অবান্তর হয়ে গিয়েছে, সেই নাম ধরে ডাক দিয়ে মাঝে মাঝে কথা বলে যান এমন এক ভদ্রলোক, যাকে ভদ্রলোক বলে মনে করাই ভুল। লোকটার নাম হর্ষনাথ; সাজ পোশাক দেখলে মারাঠী বলেই মনে হবে, কিন্তু ভাষা শুনলে ধরা পড়ে যায় যে, লোকটা নিতান্ত বাঙ্গালী। পারমিতাও জানে, লোকটা সিটির

জয়াস্ত্রী চকের কাছাকাছি কোন্ একটা মহল্লার একটা গলিতে থাকে। দারোয়ান বলে, লোকটা নাকি কোন্ একটা অনাথ স্কুলে মাস্টারী করে।

কে জানে কেমন মাস্টারী করে লোকটা ? কিন্তু কোন সন্দেহ নেই যে, সে মাস্টারীতে লোকটার পক্ষে মানুষ হয়ে থাকবার মত ভাত-কাপড় হয় না। আগে তো প্রায় রোজই দুপুরে এই মজুমদার হাউসের কিচেনের কাছে এসে খানসামাকে ডাক দিত হর্ষনাথ—ভুলে যেও না খানসামা, আজ দুপুরে আমি এখানেই আছি। দেখতেও পেত পারমিতা, লোকটা কিচেনের বারান্দার উপর দিব্যি জুত করে বসে রুটি মাংস খেয়ে চলে গেল। এমন কি মাঝে মাঝে পেটুকে লোভে বেহায়া হয়ে প্রশ্নও করতো—আজ ক্যা রায়তা বনায়া নেহি খানসামা ?

—হ্যাঁ, বনায়া।

—তবে দিচ্ছ না কেন ?

বড় একটা পাথরের বাটি ভরে রায়তা নিয়ে হর্ষনাথের পাতের কাছে এগিয়ে দিত খানসামা ; আর হর্ষনাথও খুশিতে ধন্য হয়ে সবটা রায়তা চেটেপুটে খেয়ে ফেলতো।

কিন্তু সেদিন আর নেই। আর রোজ দুপুরে মজুমদার হাউসের অতিথি হতে পারে না, রোজ আসেও না হর্ষনাথ। পারমিতাই নিয়ম করে দিয়েছে। রোজ নয়, সপ্তাহে বড় জোর একদিন, শুধু রবিবারে যদি দুপুরের খাওয়া খেতে হর্ষনাথ এখানে আসে, তবে খাবে। খানসামাকে শাসিয়ে দিতেও ভুলে যায়নি পারমিতা —এই বাড়ি দানছত্র নেহি হ্যায় খানসামা, সাবধান।

এই হর্ষনাথই মাঝে মাঝে, এবং কথা বলবার দরকার না থাকলেও পারমিতার কাছে এসে কথা বলে—একবার সময় করে নিয়ে মোতিমহল প্যালেসটা দেখে এলে পারেন মিসেস রায়।

মিসেস রায়! নামটা যেন পারমিতার জীবনের স্মৃতিটাকে একটা খোঁচা দিয়ে বিরক্ত করে তোলে। পারমিতার যে পরিচয় এই দু'বছরে প্রায় নীরব হয়ে গিয়েছে এবং আর কয়েকদিন পরে একেবারে নীরব হয়ে যাবে, সেই পরিচয় শুধু এই হর্ষনাথ নামে লোকটার সম্ভাষণে মুখরিত হয়ে ওঠে। মুখে কিছু না বললেও, পারমিতার মন ক্ষুব্ধ হয়ে হর্ষনাথের মূর্খতাকে নীরবে ধিক্কার দেয়। কি আশ্চর্য, মূর্খতাও এত অন্ধ হতে পারে ? লোকটা কি দেখতে পায় না যে, পারমিতা আজ এই বাড়ির জীবনের কর্ত্রী ? মনোময় মজুমদারও যে এই বাড়িতে পারমিতার সর্বময় প্রতিষ্ঠা স্বীকার করে নিয়েছে। এখনও বুঝতে ভুল করে কেন হর্ষনাথ, পারমিতার এই যে সাদা সাজ, সে সাজ শুধু মনোময়ের কাছ থেকে একটি শুভ আহ্বানের অপেক্ষায় আছে। সে আহ্বান আসতে আর দেরিও নেই ; তারপর এই সাদা এখানেই একটি উৎসবের আশীর্বাদে রঙীন হয়ে যাবে।

মিসেস রায় বলে ডাকলে সে অতীতের ছবি মনে পড়ে যায়, যে অতীতের জন্য আর দুঃখ করে লাভ নেই। সে অতীতের কথা ভেবে আর লজ্জা করবারও

কোন মানে হয় না। মনটা যখন নতুন করে একজনের কাছে চলেই গিয়েছে, তখন আর মনের সঙ্গে ঝগড়া করে লাভ কি? পারমিতাও কি ছাই ভাবতে পেরেছিল যে, এক ভদ্রলোকের মেয়েকে নাচ শেখাতে এসে তিরিশ বছর বয়সের একটা শক্ত সাবধানী বিধবা মনও এমন কাণ্ড করে বসবে?

সে অতীতের ছবিটা মনে পড়ে গেলে বুকের ভিতরে আজও একটা ছায়াময় ভাব যেন ছমছম করে। কী ভয়ানক সেদিনের সেই শূন্যতা, কী করুণ সেদিনের পারমিতার সেই কান্না, আর কী দুঃসহ সেই অসহায়তা!

চাঁদিবাজারের ভিতরে একটা সরু রাস্তার ধারে বাঙালী ফটোওয়ালা রায়বাবুর যে ছোট একটি স্টুডিও ছিল, সে কথা চাঁদিবাজারের লোক এতদিনে হয়তো ভুলেই গিয়েছে। ফটোওয়ালা রায়বাবু যেদিন হঠাৎ দু'বার রক্তবমি করে মরে গেলেন, সেদিনের স্মৃতিও বোধহয় আজ চাঁদিবাজারের মানুষের মন থেকে মুছে গিয়েছে। কি উপায় হবে রায়বাবুর বউটার? উদ্বিগ্ন হয়ে সেদিন এই কথাই ভেবেছিলেন প্রফেসর ক্ষিতীশ দত্তের মা আর সার্জন পি ভটচাযের স্ত্রী।

পারমিতার তিন কুলের এমন কেউ নেই যাকে আপনজন বলে মনে করে তার কাছে চলে যাওয়া যায়।—একেবারে অনাথ, কী কপাল করেছিল গো মেয়ে! আক্ষেপ করেছিলেন ক্ষিতীশ দত্তের মা। কিন্তু আশ্বাস দিয়েছিলেন পি ভটচাযের স্ত্রী—দেখি, ওরা থাকতে, এতগুলি বাঙালী থাকতেও এই বিভূঁয়ে একটা বাঙালী মেয়ের কোন গতি করা যাবে না?

কি গতি হবে? কেমন করেই বা হবে? এই মেয়ের নামটাই শুধু গালভরা একটা নাম, কোন গুণের বালাই নেই। লেখাপড়া জানে না বললেই চলে। না জানে সেলাই, না জানে গান। রাঁধুনি খাটবার মত গতরও করেনি; ওরকম বুলবুলের মত নরম ছাঁদের একটা শরীর নিয়ে রাঁধুনি খাটা চলে না। তা ছাড়া, পি ভটচাযের স্ত্রীর অভিমতও এই যে, বেচারাকে যদি রাঁধুনি খেটে পেটের ভাত যোগাড় করতে হয়, তবে গতি আর কি হলো? ওটা তো অগতি, শাস্তি।

হ্যাঁ, জেনে খুশি হলেন পি ভটচাযের স্ত্রী, যেদিন পারমিতা নিজেই ভয়ে ভয়ে, কুণ্ঠিত হয়ে, লজ্জায় মুখ লাল করে বলে ফেললো—আমি নাচ জানি!

—নাচ? বেশ তো! একটি ছোট মেয়েকে নাচ শেখাতে পারবে?

—পারবো।

সেদিনই সার্জন পি ভটচায মজুমদার হাউসে এসেছিলেন, আর মনোময়ও প্রস্তাব শুনে এককথায় রাজি হয়ে বলেছিলেন—বেশ তো, মণ্টুর একজন নাচের টিচার থাকবে, ভালই হবে।

পারমিতার জীবনে দু'বছর আগের পাওয়া সেই নাচের চাকরি আজ আর চাকরি নয়। ঠিকই, প্রথম এসে রোজই দু'বেলা মণ্টুকে নিয়ে হলঘরের ভিতরে এসে দাঁড়াতে হতো, দরজার পর্দাগুলো ভাল করে টেনে দিতে হতো, আর গ্রামোফোনে পর-পর বাজনার রেকর্ড বাজাতে হতো। সেই বাজনার তালের

সঙ্গে হিন্দোলিত হয়ে পারমিতার সুঠাম শরীরের ছাঁদগুলিও বিভোর হয়ে নাচতো। মুগ্ধ হয়ে চেঁচিয়ে উঠতো মণ্টু—

তুমি কী সুন্দর নাচতে পার পারুমাসী।

—তোমাকেও এ-রকম সুন্দর নাচতে হবে হেসে হেসে জবাব দিত পারমিতা।

কিন্তু আজ আর মণ্টুকে দেখে নাচ শেখাবার দায় পারমিতার মনেও পড়ে কি না সন্দেহ। মণ্টুকে দেখলে বরং সন্দেহ করে পার্মি-তা, আজও বোধহয় দুধ খেতে ভুলে গিয়ে শুধু খেলা নিয়ে ব্যস্ত আছে মেয়েটা, তা না হলে মুখটা এরকম শুকনো দেখাবে কেন?

ধমক খায় মণ্টু—খেলা করতে তো কোনদিন ভুল হয় না, তবে দুধ খেতে ভুল হয় কেন?

মণ্টুকে পড়াবার জন্য যে মাস্টার রাখা হয়েছে, সে মাস্টারকে ছাড়িয়ে দিতে হবে বলে ঠিক করে ফেলেছে পারমিতা। মাস্টার ভদ্রলোক যদি সাতদিনের মধ্যে তিনদিন কামাই করে, আর এই তিনদিনও যদি মণ্টুর কাছে শুধু ভূতের গল্প বলে, তবে মেয়েটা যে নিরেট একটা মুখ্খু হয়ে যাবে। মাস্টারকেও একদিন স্পষ্টভাষায় জানিয়ে দিয়েছে পারমিতা—পড়াবার নাম করে এরকম ফাঁকি আর চলবে না।

একদিন মাথার ব্যথার জন্য সারারাত ঘুম হয়নি মণ্টুর; তাই পারমিতারও সারারাত ঘুম হয়নি। সকাল হতেই বেয়ারাকে দু'বার সিটিতে পাঠিয়ে ডাক্তার ডেকেছে পারমিতা। ওষুধ খেয়ে আর একটা লম্বা ঘুম দিয়ে দুপুরবেলা মণ্টুর মাথা ব্যথা যখন সেরে গেল, তখন স্নান করতে আর ভাত মুখে দিতে পেরেছিল পারমিতা!

মাঝেমাঝে এই মণ্টুই অদ্ভুত একটা কথা বলে পারমিতাকে ভাবিয়ে তোলে, কিন্তু পরমুহূর্তে ভাবনা ভুলে গিয়ে হেসে ফেলে পারমিতা।

—তোমার স্বামী কোথায় পারুমাসী?

—হারিয়ে গেছে।

—আবার পাবে তো?

—অ্যাঁ?—চমকে ওঠে পারমিতা। চোখের চাহনি গম্ভীর হয়ে যায়। কিন্তু পরক্ষণেই হেসে ফেলে পারমিতা—কপালে থাকলে পাব।

মণ্টুও যেন ধৈর্য হারিয়ে আর গাল ফুলিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে।—না, আর দেরি হলে চলবে না পারুমাসী। শীগগির পাওয়া চাই।

পারমিতার বুকের ভিতরে গোপন করা একটা মায়াময় সান্ত্বনাও হেসে ওঠে—শিগগিরই পাবে, মনোময় মজুমদার অন্ধ নয়।

সবই যে জানে মনোময়। এই বাড়ির সব বাজে খরচ শক্ত হাতে দমিয়ে দিয়েছে পারমিতা, এ খবর মনোময়ের অজানা নয়। মণ্টুর পুরনো মাস্টারকে

ছাড়িয়ে দিয়ে নতুন মাস্টার রাখা হয়েছে। এত বড বাড়ির কোন বারান্দার কোণে এক কণা ধুলোও আজ জমে থাকতে পারে না। পারমিতার শাসনে সব ঝকঝক তকতক করছে। নিশ্চয় শুনে খুশি হয়েছে, দেখেও খুশি হয়েছে মনোময়। তাই যদি না হতো, তবে কি এতদিনের মধ্যে একটি দিনও পারমিতার কাছে এসে আপত্তি জানিয়ে যেত না মনোময়—এই বাড়ির ভাল করবার জন্য তোমাকে এত ব্যস্ত হতে কে বলেছে ?

না, কোনদিন ভুলেও এরকম কথা বলেনি মনোময়। পারমিতার ইচ্ছার কাছে এই বাড়ির সব যত্নের দায় ছেড়ে দিয়েছে মনোময়। আর, নিশ্চয় সেই জন্যেই এত নিশ্চিন্ত হয়ে সপ্তাহে তিনদিন শিকারের আমোদ নিয়ে বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াতে পারে ভদ্রলোক।

কারবার আর শিকার; শিকার আর কারবার। দেখে মনে হয়, এই দুটি ছাড়া ভদ্রলোকের জীবনে আর কোন সাধ নেই। এমনই ব্যস্ততা যে, মণ্টুর মা পাঁচটা বছর এ বাড়িতে বেঁচে ছিল কি করে ?

সন্দেহ হয়, মণ্টুর মা বোধহয় ভুল করে মনোময়ের জীবনটাকে এরকম একটা ঘরছাড়া ব্যস্ততার জীবন করে তুলেছিল। নিশ্চয় চাকর খানসামার হাতে মনোময়ের সব যত্নের দায় ছেড়ে দিয়েছিল সেই মহিলা। নইলে শিকার থেকে ফিরে এসে ক্লান্ত হয়ে পাখার নিচে কোচের উপর বসে, চা-এর জন্যে আজও খানসামাকে কেন ডাক দেয় ভদ্রলোক ? ভদ্রলোকের কি মনেও হয় না যে এমন সময় খানসামার হাতের চা কারও তৃষ্ণার শান্তি হতে পারে না।

চা-এর জন্য পারমিতাকে কাছে ডাকে না মনোময়, হয়তো এটা মনোময়ের পুরনো অভ্যাসের ভুল। কিন্তু পারমিতা ভুল করে না। নিজেই কিচেনে গিয়ে নিজের হাতে চা তৈরি করে; খানসামা শুধু সেই চা তুলে নিয়ে গিয়ে মনোময়ের কাছে রেখে দেয়। কতবার দেখতেও পেয়েছে পারমিতা, তার এই ব্যস্ততার ছবিটাও মনোময়ের চোখে ধরা পড়ে গিয়েছে। কোচের উপর বসে সোজা কিচেনের দিকে তাকিয়ে পারমিতার গৃহিনীপনার মূর্তিটাকে দেখেছে মনোময়।

তবে আর দেরি কেন ? পারমিতাকে নিজের থেকে ডাক দিয়ে কাছে আসতে বলতে আজ তো কোন কুণ্ঠা থাকবার কথা নয়।

ভুলতে পারে না পারমিতা, শিকার থেকে ফিরে আসা মনোময়ের ক্লান্ত চেহারাটাও কেমন ঝলমল করে, মুখের উপর একটা লালচে আভা টলমল করে। এমন রূপবান পুরুষ লাখে একজন মেলে কি না সন্দেহ। চোখ দুটোও সুন্দর—সত্যিই ভ্রমরকালো চোখ।

অনুভব করতে পারে পারমিতা, তার বুকের ভিতরেও যেন একটা গর্বের বাতাস থমথম করছে। এ হেন মানুষের একটা সুন্দর জীবন পারমিতার বুকের কাছে প্রায় ধরা দিয়ে ফেলেছে।

তাই মাঝে মাঝে মনটা চঞ্চল হয়ে ওঠে, আর দেরি কেন ? কবে আসবে

ডাক ? একটা মিথ্যা আড়াল আজও দুজনের মাঝে সত্য হয়ে থাকে কেন ?

মণ্টু মাঝেমাঝে বাইরে বেড়াতে যাবার বায়না ধরে। মণ্টুর এই বায়নার কথা শুনলেই পারমিতার মন একটু বিরক্ত হয়ে ওঠে। বেড়াতে যেতে যে পারমিতার খুব অনিচ্ছা, তা নয়। কিন্তু বেড়াতে যাবার ব্যবস্থা করবার জন্য যে লোকটাকে খবর দিতে হবে, সেই লোকটা হল সেই বেহায়াটা, হর্ষনাথ, সেই একগুঁয়ে মূর্খটা, যে আজও পারমিতাকে মিসেস রায় বলে ডাকে।

হর্ষনাথকে এই বাড়ির ফটকে দেখতে পাওয়া মাত্র দারোয়ানও বিরক্ত হয়ে বলে ওঠে—ব্যস্, পঁহুছ গিয়া খুসামোদকা টাট্টু।

মিথ্যে বলেনি দারোয়ান ; মনোময় মজুমদারকে সর্বক্ষণ চাটু কথায় তুষ্ট করাই হর্ষনাথের একমাত্র কাজ। হর্ষনাথ অবশ্য লোকের কাছে বলে—আমি হলাম মিষ্টার মজুমদারের শিকারের ম্যানেজার।

হর্ষনাথের এই কথাটা অবশ্য খুব মিথ্যে কথা নয়। মনোময়ের শিকারের জন্য দরকারের সব সাজসরঞ্জাম যোগাড় করে রাখা, তাঁবু সেলাই-এর তদারক করা থেকে শুরু করে টোটা কিনে নিয়ে আসা, জঙ্গলে গিয়ে মাচান বেঁধে দিয়ে আসা, হাঁকোয়া কুলি যোগাড় করা, সবই হর্ষনাথের কাজ। এর জন্য খুশি হয়ে পকেট থেকে যা বের করে হর্ষনাথের হাতে ধরিয়ে দেয় মনোময়, তাতেই খুশি হর্ষনাথ। খানসামা বলে—তাতেই ওর পেট চলে যায়, মাস্টারীতে কিছুই হয় না।

মনোময়ের সামনে দাঁড়িয়ে অবিরাম স্যার-স্যার ধ্বনি, খোসামদের আবেগে সব সময় একটু কুঁজো হয়ে থাকা আর হাত কচলানো, দুর্বল লোভের প্রাণীর মত যার চরিত্র, সেই হর্ষনাথ পারমিতার সঙ্গেও কথা বলতে গিয়ে যেন মহাসম্ভ্রমে কুঁজো হয়ে যায়।—আপনি আজ্ঞে, যখনই আমাকে ডাকবেন আজ্ঞে, তখনই আমি হাজির হব।

বেড়াতে যাবার দরকার ছাড়া আর কোন দরকারে এই লোকটাকে ডাকবার দরকার হয় না। একবার নয়, অনেকবার বেড়াতে যেতে হয়েছে। কখনও সুহানিয়া মন্দির, কখনও ফোর্ট, কখনও বা জয়বিলাস প্যালেসের বাগান। গাড়ির পিছনের সীটে বসে পারমিতা আর মণ্টু, সামনের সীটে ড্রাইভারের পাশে হর্ষনাথ। কিন্তু লোকটা সারাটা পথ মুখ ফিরিয়ে প্রায় হাঁ করে পিছনের সীটের পারমিতার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে আর কথা বলে। বিশ্রী একটা অস্বস্তি বোধ করে পারমিতা, আর সেই অস্বস্তি সহ্য করতে গিয়ে বিরক্ত হয়ে ওঠে।

কিন্তু সেই বিরক্তি মন থেকে মুছে ফেলতে দেরী হয় না। হর্ষনাথের এই চাহনি নিতান্ত এক হতভম্ব দীনতার চাহনি। পারমিতার মুখটাকে চোখ ভরে দেখবার জন্যে ইচ্ছে করে এরকম বেহায়াপনা বোধহয় করে বেচারা। এত বড় মতলব মনের ভিতর পুষে রাখবার সাহসই ওর থাকতে পারে না। তাই, আর রাগ না করে মুখ ফিরিয়ে মাঝে মাঝে হাসি লুকোবার চেষ্টা করে পারমিতা।

সেদিনটা আষাঢ় মাসের একটা দিন, শিকারের সফর শেষ করে বাড়ি ফিরেছে মনোময়। পারমিতাও একটা স্বস্তির হাঁপ ছেড়েছে। বর্ষা নামতে আর দেরি নেই; মনোময়ের শিকার সফর এইবার স্থগিত থাকবে, অন্তত তিনটে মাস। সময় পাবে মনোময়, পারমিতার দিকে অপলক চোখ নিয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকবার সুযোগ পাবে। তারপর?

ভাবতে গিয়ে আয়নার কাছ থেকে সরে যায় পারমিতা, নিজের মুখের অদ্ভুত ছবিটা দেখে আর লজ্জা পেতে চায় না। যেন একটা রক্তাভ আশার ঝড় কোথা থেকে ছুটে এসে পারমিতার মুখটাকে রাঙিয়ে নিয়েছে বুকের ভিতরে একটা গুঞ্জরণ, আর দেরি নয়, বোধহয় আজই, এখনই, ঐ ড্রইংরুমের নিভৃত হতে একটি ব্যাকুল সমাদরের ডাক ছুটে আসবে—একবার এখানে এসে একটা কথা শুনে যাও পারমিতা।

না, কোন আপত্তি করবে না পারমিতা। বরং মাথা হেঁট করে চোখের চাহনির অভিমান লুকিয়ে রেখে বলে দিতে পারবে পারমিতা—সব বুঝেও মিছে এত দেরি করলে কেন?

দেখতে পায় পারমিতা, শিকার থেকে ফিরে আসা যত আয়োজনের সামগ্রী বারান্দার কাছে স্তূপ হয়ে পড়ে আছে। তাঁবু, দড়ি, কুড়ুল, ক্যামেরা, বাইনাকুলার, বন্দুক, রাইফেল, বুলেটের মালা আর খাটিয়া। ফিকা সবুজ বুশ জ্যাকেট গায়ে মনোময় পা ছড়িয়ে একটা চেয়ারের উপর বসে আছে। কাছেই আর একটা স্তূপ, বড় বড় বাঁকানো শিং-এর পালকের আর রোঁয়ার ছোট একটা পাহাড়। একটা চৌশিঙ্গা, এক গাদা হাঁস, এক জোড়া কৃষ্ণসার আর চারটে কাকর হরিণের নিষ্প্রাণ চেহারা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আছে। সেই দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে আছে মনোময়। দু'পায়ের ভারী ভারী হব-নেল বুট যেন একটা প্রাণহরণ জয়ের উল্লাসে দুলছে।

এ সময়ে বাইরে বেড়াতে যেতে ইচ্ছে করে না, এখন যে মনোময়ের জন্য নিজের হাতে চা তৈরী করবার সময়; কিন্তু বায়না ধরেছে মণ্টু আর বেড়াতে যাবার সময় যে লোকটা সঙ্গে যায় সেই হর্ষনাথও আছে; ঐ যে গদগদভাবে কুঁজোটি হয়ে মনোময়ের চোখের সামনে ঘুরঘুর করছে হর্ষনাথ।

মণ্টুর ব্যস্ততার হাঁকডাক শুনে ড্রাইভারও গ্যারেজ থেকে গাড়ি বের করে তৈরী হয়। হর্ষনাথও গাড়ির কাছে এগিয়ে যেয়ে তেমনি এক জোড়া বেহায়া চোখের চাহনি নিয়ে বারন্দার দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর রওনা হয়ে যেতে আর দেরি হয় না। দেরি করতে চায় না পারমিতা, বরং একটু তাড়াতাড়ি করতে চায়; যেন আজকের আষাঢ়ে সন্ধ্যার কোন মেঘ আকাশের তারা ঢেকে ফেলবার আগেই ফিরে আসতে পারে পারমিতা।

ফোর্ট পর্যন্ত এসেও মণ্টুর বেড়াবার সাধ মেটে না। ফোর্টের ভিতরে ঢুকে বাদলমহল দেখতে চায় মণ্টু। তা ছাড়া একটা মন্দির আছে, যার নামে মজার

গল্প শুনেছে মণ্টু, সাস-বহু অর্থাৎ শাশুড়ী-বউ মন্দির, সে মন্দির চোখে না দেখে মণ্টুর সাধ আর শান্ত হবে না।

হর্ষনাথ বলে—সব দেখাবো, সব দেখাবো। আপনিও দেখুন মিসেস রায়।

কি ছাই দেখবে পারমিতা? ফোর্টের ভিতরে ঢুকেও আনমনার মত হাঁটতে থাকে পারমিতা মাঝে মাঝে চমকে উঠতেও হয়, কারণ হর্ষনাথের তোষামুদের গলার স্বর যেন বর্বর আনন্দে মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে ওঠে।—এই তো বাদলমহল, কী প্রকাণ্ড, কী আশ্চর্য; কী অদ্ভুত একটা…।

মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকায় পারমিতা। আনমনার মত পথ চলতে থাকে।

—ঐ যে চলুন আলমগিরি গেট পার হয়ে আর একটু এগিয়ে যাই। যেন ফুরফুরে বৈকালী বাতাসের ছোট একটা ঝড়ের উৎসাহ এক দমে বুকের ভিতর টেনে নিয়ে আর ছটফট করে হাঁকডাক করতে থাকে হর্ষনাথ।

মণ্টু প্রায় ছুটে ছুটে এগিয়ে যেতে থাকে। আর পারমিতার আনমনা উদাসীনতা হঠাৎ যেন ভয় পেয়ে চমকে ওঠে। সত্যিই পারমিতার গা সিরসির করে উঠেছে। পারমিতার একেবারে কাছে এসে, পারমিতার মুখের দিকে তাকিয়ে, পারমিতার পাশে পাশে হেঁটে চলেছে হর্ষনাথ।

হর্ষনাথ বলে—এর নাম হিন্দোলা গেট আর এই মহলটা হলো গুজরি মহল। সে গল্প আপনিও বোধহয় শুনেছেন মিসেস রায়, রাজা মানসিংহ এক সুন্দরী রাখালী মেয়েকে…।

—চুপ করুন। বলতে গিয়ে পারমিতার চোখে ছোট্ট একটি ভ্রূকুটি কেঁপে ওঠে।

কিন্তু কি আশ্চর্য, হর্ষনাথের বেহায়া চোখের চাহনি ঝিকঝিক করে হাসছে। পারমিতার মনে হয়, নির্জন হিন্দোল গেটের চারদিকের নীরবতাও যেন চক্রান্ত করে হর্ষনাথের হাসিটাকে থরথর করে কাঁপাচ্ছে।

হঠাৎ যেন রহস্যময় একটা আবেশে বিনীত হয়ে আর কুণ্ঠিতভাবে হর্ষনাথ বলে—আমি একটা কথা বলতে চাই।

পারমিতা—কি কথা?

হর্ষনাথ—আপনি যেমন বিধবা আমিও তেমনি বিপত্নীক।

দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে হর্ষনাথের দিকে একটা কঠোর দৃষ্টি হানে পারমিতা; যেন এই নির্জনতার বেহায়া আকাঙ্খার করুণ দুঃসাহস এখনই ভস্ম করে দিতে চায়। কিন্তু পরক্ষণেই শান্ত হয়ে যায়, একটা ভ্রূক্ষেপও আর করে না পারমিতা। মুখ ফিরিয়ে আর চেঁচিয়ে ডাক দেয়—মণ্টু।

ছুটতে ছুটতে ফিরে আসে মণ্টু।

পারমিতা বলে—চল, এবার বাড়ি ফিরে যাই।

আষাঢ়ে সন্ধ্যার মেঘ আকাশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়েনি। আকাশের তারা দেখা

যায়। আর দেখা যায় এবং দেখতে পেয়ে পারমিতার চোখের আশা জ্বল জ্বল করতে থাকে, মনোময়ের ঘরের ভিতর থেকে যেন রঙীন জোৎস্না উথলে উঠে দরজার পর্দার ফাঁক দিয়ে বাইরে গড়িয়ে পড়েছে। গ্রামোফোনে মিষ্টি সুরের বাজনার রেকর্ড বাজছে। সত্যি যে মনোময়ের ঘরে একজনকে কাছে ডেকে আপন করে নেবার উৎসব জেগে উঠেছে! এই দু'বছরের মধ্যে মনোময়ের ঘরে এমন আলো আর এমন সুরের মেলা জেগে উঠতে কখনও দেখেনি পারমিতা।

কি আশ্চর্য, সারা শরীরটা লজ্জা পেয়ে আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছে। প্রাণটাকেই কত ভার-ভার মনে হয়। ডাক শোনবার পর, সত্যিই যেতে পারবে তো পারমিতা? চোখ দুটো মিছে জলে ভরে গিয়ে একটা যা-তা কাণ্ড বাধিয়ে ফেলবে না তো?

বেয়ারা এসে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ডাক দেয়—দেবীজী!

—কি?

—সাহেব আপসে বাত করেঙ্গে।

—আচ্ছা।

চলে যায় বেয়ারা। তারপর আর কয়েকটি মুহূর্ত মাত্র। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে, নিজের মুখের ছবির দিকে তাকিয়ে, বুকের ভিতরের উতলা বাতাসটাকে চেপে দিতে যতটুকু সময় লাগে, শুধু ততক্ষণ, তারপর আলোছায়ার ভিতর দিয়ে ফুলের টবের পাশ কাটিয়ে আস্তেআস্তে হেঁটে, একটা মুগ্ধ সত্তার ভার কোনমতে টেনে নিয়ে মনোময়ের দরজার কাছে দাঁড়ায় পারমিতা। আস্তে একটা হাঁপ ছেড়ে নিয়ে ঘরের ভিতর ঢোকে।

—এ কি? পারমিতার বুকের ভিতর থেকে যেন একটা নিষ্ঠুর বিস্ময়ের আক্ষেপ আর্তনাদ হয়ে বেজে ওঠে। ঘরের ভিতরে শুধু মনোময় নয় আরও তিনজন বসে আছেন। এমন কি বেহায়া হর্ষনাথও মোসাহেবী সুখের পুতুলের মত চুপ করে ঘরের এক কোণে একটা টেবিল ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে। টেবিলের উপর গ্রামোফোন। হ্যাঁ বুঝতে পারা যায়, একটা কাজের ভারও নিয়েছে হর্ষনাথ। এই ঘরের উৎসবকে মাতিয়ে দেবার জন্য হর্ষনাথ গ্রামোফোনে বাজনার রেকর্ড বাজাচ্ছে।

মনোময় ডাকে—পারমিতা।

পারমিতা বিড়বিড় করে কথা বলে—বলুন।

মনোময়—তুমি তো ভাল নাচ জান শুনেছি।

পারমিতা—কি বললেন?

মনোময়—আস্তে, ওভাবে বলো না। আমাকে প্রশ্ন করবার কোন দরকার নেই। কথা হচ্ছে, আমার এই গেস্ট, এই তিন বন্ধুকে তোমার নাচ দেখিয়ে খুশি করে দাও।

—কি অদ্ভুত কথা বলছেন আপনি? আমাকে এসব কথা বলা কি…।

—আস্তে! কথা বলতে হলে আস্তে বল। মনোময়ও গম্ভীর স্বরে ও আস্তে

আস্তে কাটা-কাটা ভঙ্গীতে মুখের ভাষাটাকে যেন শক্ত চাবুকের মত আছড়ে দিয়ে কথা বলে।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে পারমিতা। স্বপনের খেলাঘর একটা প্রচণ্ড হিংস্রতার গর্জনে আর লাথির আঘাতে চুরমার হয়ে যাচ্ছে, যেন তারই শব্দ শুনছে পারমিতা। ভালবাসার ভ্রমর কালো দুটি চক্ষু নয়, ঘুটঘুটে অন্ধকারের মত কালো দুটো হুকুমের চোখ অচঞ্চল হয়ে শুধু বাধ্যতার একটা দাসীর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

গেলাস হাতে নিয়ে আর চোখ-মুখ লাল করে বসে আছেন যে গেস্ট, সেই গেস্ট পারমিতার সাদা থানের শাড়ির দিকে তাকিয়ে হঠাৎ ঘাড় দুলিয়ে হেসে ওঠেন—এই কি নাচের ড্রেস?

আর একজন গেস্ট প্রায় চেঁচিয়ে ওঠেন—ড্রেস-ফ্রেস না থাকলেই ভাল।

মনোময় বলে—ঠিক কথা। হ্যাঁ, শুনলে তো? এখন ডু ইওর ডিউটি।

—তার মানে? মনোময়ের মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে গিয়ে পারমিতার চোখের চাহনি যেন একটা জ্বালায় পুড়ে পুড়ে ভস্ম ছুঁড়তে থাকে।

মনোময়—আস্তে! চেঁচিয়ে কথা বলো না। এঁরা যা বলছেন, শোন।

বিলিতী বাজনার যে রেকর্ডটা এতক্ষণ বাজছিল, সেটা বেজে বেজে নীরব হয়ে গিয়েছে। অন্য একটা রেকর্ড হাতে তুলে নিয়েছে হর্ষনাথ। কিন্তু কেমন যেন হয়ে গিয়েছে মোসাহেব হর্ষনাথের চেহারাটাই। মনে হয় যেন ঢোক গিলে গিলে একটা আর্তনাদ কোনমতে চেপে রাখতে চেষ্টা করছে হর্ষনাথ।

তামাকের পাইপটা দাঁতে চেপে ধরে একজন গেস্ট হর্ষনাথের দিকে তাকিয়ে ধোঁয়া ছাড়ে—পাঞ্জাবী ঢোলক গীত কিংবা কাজরী গানের রেকর্ড থাকে তো বাজাও। ঢোলক-গীত ড্যান্সকো বহুত ফুর্তি দেতা হ্যায়।

আর একবার যেন শেষবারের মত মনোময় মজুমদারের ঘুটঘুটে কালো চোখের দিকে তাকিয়ে সে চোখের ইচ্ছাটাকে বুঝতে চেষ্টা করে পারমিতা। না, আর বুঝতে অসুবিধা নেই। লাখ টাকার মানুষ মনোময় মজুমদার, ওস্তাদ শিকারী মনোময় মজুমদারের চোখ একটা বুনো হরিণীর শরীরের সুঠাম মাংসলতার রূপ দেখবার জন্য উগ্র হয়ে তাকিয়ে আছে।

আস্তে আস্তে মুখ ফিরিয়ে ঘরের এক কোণে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা হর্ষনাথের মুখের দিকে তাকায় পারমিতা। এখনও কেমন চুপটি করে এক হাতে একটা রেকর্ড নিয়ে, মোসাহেবী দুর্বল মেরুদণ্ডটাকে তেমনই কুঁজো করে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। ছিঃ, পৃথিবীতে বুঝি মানুষ নামের কতকগুলি চেহারা আছে, মানুষ নেই।

যেন একটা আশার হৃদয় যাচাই করে দেখবার জন্য পারমিতার চোখ দুটো একটা ধূর্ত চক্রান্তের জ্বালায় জলজল করে।—বেশ, যা বলছেন তাই হবে। মনোময়ের মুখের দিকে তীব্রভাবে তাকিয়ে কথাগুলি বলে নিয়েই মুখ ফিরিয়ে

নেয় পারমিতা। পারমিতার চোখের চাহনি এবার হর্ষনাথের দিকে তাকিয়ে তার স্তব্ধ চেহারাটার উপর যেন অভিশাপের জ্বালাময় ভস্ম ছুঁড়তে থাকে।

কিন্তু হঠাৎ একটা রুদ্র রুষ্ট আপত্তির শব্দ এই ঘরের মেঝের উপর আছাড় খেয়ে চমকে ওঠে। হর্ষনাথের হাত থেকে রেকর্ডটা কি হঠাৎ পড়ে গেল ? কিংবা ইচ্ছে করেই ঘরের মেঝের উপর রেকর্ডটাকে আছড়ে দিয়েছে হর্ষনাথ ?

তাই তো, হর্ষনাথ যে থরথর করে কাঁপছে, আর পারমিতার মুখের দিকে যেন অগ্নিময় একটা বোবা ধিক্কার বর্ষণ করছে। পারমিতার মুখটা যেন একটা দুঃসহ ঘৃণার ছবির মত হর্ষনাথের চাহনিকে অপমান করছে। আর বোধহয় সহ্য করতে পারবে না, আর দেরিও করে না হর্ষনাথ। দু'হাত দিয়ে চোখ ঢেকে ঘর ছেড়ে বের হয়ে যায়।

পাথরের উপর অবাধ আবেগে লুটিয়ে পড়া ঝরণার উল্লাসের মত কলকল করে হেসে ওঠে পারমিতা। মজুমদার হাউসের দু'বছরের একটা বঞ্চক বিদ্রূপকে যেন ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে চেঁচিয়ে ডাক দেয়—হর্ষবাবু।

ঘর ছেড়ে পারমিতাও ছুটে বের হয়ে যায়।—হর্ষবাবু একটু দাঁড়ান।

দাঁড়ায় হর্ষনাথ। বাইরের বারান্দার উপর ছায়াময় চেহারাটা হঠাৎ বিস্ময়ে কঠিন কালো পাথরের মূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে।

মনোময় মজুমদারের শান্ত চেহারাটাও হঠাৎ বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ হয়ে বাইরে ছুটে আসে। রুক্ষস্বরে চেঁচিয়ে ওঠে মনোময়—একি ? তুমি কোথায় চললে ?

পারমিতা—আস্তে ! ওভাবে প্রশ্ন করবেন না।

—কি বললে ? মনোময় আবার চেঁচিয়ে ওঠে !

পারমিতা বলে—চুপ, কথা বলতে হয় তো আস্তে বলুন। হ্যাঁ আমার একটা কথা ছিল···।

মনোময়—কি ?

পারমিতা—মণ্টু যদি জিজ্ঞেস করে পারুমাসী কোথায় গেল, তবে বলে দেবেন···।

ভ্রূকুটি করে মনোময়—কি বলবো ?

পারমিতা—বলে দেবেন, পারুমাসী এতদিনে আবার স্বামীকে পেয়ে স্বামীর কাছে চলে গিয়েছে।

দেবতারে প্রিয় করি

সংসারের উপর রাগ করে নয়, বিরক্ত হয়েও নয়, সংসারকে চিনতে পেরেছেন বলেই এইবার একটু সাবধান হয়েছেন সনাতনবাবু। সংসার যেন আর মন কেড়ে না নেয়। এই মাত্র। সাবধান হবার মত বয়স হয়েছে সনাতনবাবুর, সময়ও হয়েছে।

আর কেন এত মায়া, এত উদ্বেগ আর এত চিন্তা? সংসারের জন্য অনেক খেটেছেন, চোখের জলও ফেলতে হয়েছে অনেক, কিন্তু আর নয়। সনাতনবাবু এইবার একটু আলগা হয়ে থাকতে চান। কাজের জীবনের স্বেদ ক্লান্তি ও চঞ্চলতা থেকে রেহাই পেয়েছেন এতদিনে। এখন শুধু খেয়াঘাটের মাটিতে দাঁড়িয়ে বেলা-শেষের আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকা এক প্রতীক্ষার জীবন, যতদিন না সেই ডাক আসে আর চলে যেতে হয়।

কিন্তু এই প্রতীক্ষার শান্তি যেন ক্ষুণ্ণ না হয়, তাই সাবধান হয়েছেন সনাতনবাবু। এতদিন ধরে অনেক শ্রান্ত ও ক্লান্ত হয়েছেন তিনি, এইবার শুধু শান্ত হতে চান।

জীবনে শোকের আঘাত পেতে হয়েছে অনেকবার। তিন ছেলে ও দুই মেয়ের মধ্যে বেঁচে আছে শুধু একজন, একটি ছেলে। সেই সব দুঃসহ বেদনার দিনে সনাতনবাবুর সিক্ত চক্ষুর বেদনাকে সান্ত্বনা দিয়ে শান্ত করার জন্য নিজের চোখে জল নিয়ে যিনি সামনে এসে দাঁড়াতেন. তিনিও আজ আর নেই। অনেক মায়া আর যত্নে একটি মাত্র ছেলেকে বড় করে দিয়ে সনাতনবাবুর স্ত্রী সব মায়ার ধরাছোঁয়ার অতীত হয়ে গিয়েছেন অনেকদিন আগেই।

একটিমাত্র ছেলে হরেন, সে ছেলে এখন বড় হয়েছে, নানা বিদ্যার ডিগ্রী লাভ করেছে, এখন এক ভাল কলেজে অধ্যাপনা করছে, এবং মাইনে পাচ্ছে ভালই। সুতরাং, অর্থচিন্তার বন্ধন থেকে সনাতনবাবু এইবার মুক্ত হতে পেরেছেন। পঁয়ত্রিশ বছর ধরে এক ক্ষান্তিহীন খাটুনির চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করে এইবার সনাতনবাবু চিন্তা করতে পারছেন তাঁরই কথা, জীবনের এই অবসরটুকু যাঁর চিন্তায় উৎসর্গ করে দিতে পারলে শান্ত হয় জীবন।

সংসারের প্রতি তাঁর একটি যে কর্তব্য ছিল, তাও চুকিয়ে দিয়েছেন সনাতন-বাবু। হরেনের বিয়ে দিয়েছেন। পুত্রবধূ কমলাও সত্যিই গৃহলক্ষ্মী। সুতরাং সনাতনবাবুর মনে এখন আর কোন আক্ষেপও নেই। সংসারকে তুচ্ছ করেননি, সংসারের সঙ্গে বিরোধও করেননি, বরং সংসারকে বেশ সুখী করে দিয়ে সব কর্তব্য আর দায় বুঝিয়ে দিয়ে তিনি নিজে এইবার ছুটি নিয়েছেন।

এখন তাঁর হাতের কাছে শ্রীমদ্ভাগবত আর চোখের সম্মুখে দেয়ালের গায়ে টাঙানো ছবিতে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী শ্রীবিষ্ণু। আর, মনের মধ্যে এই মূর্তিরই ধ্যান। চুলচেরা বিচার প্রশ্ন আর তর্ক নিয়ে তত্ত্বের ভীড়ের মধ্যে ঢুকবার জন্য আর কোন আগ্রহ নেই সনাতনবাবুর। তিনি সরল বিশ্বাসের মানুষ। এতদিন ধরে জীবনের প্রত্যেক আপদে ও আঘাতে হঠাৎ যাঁকে একটি নাম ধরে ডেকে উঠতেন, আজ এই অবসরের জীবনে তাঁকেই সারাক্ষণ ধরে এবং সারা মন দিয়ে সেই নামেই ডাকছেন সনাতনবাবু। নারায়ণ! নারায়ণ! আগে মাঝে মাঝে শুধু বেদনার মধ্যে যাঁকে ডাকতেন, আজ এই অবসরসময় জীবনের শান্তির মধ্যে তাঁকেই ডেকে-ডেকে আরও বড় শান্তির স্বাদ মনেপ্রাণে পেতে চাইছেন।

নিজের সংসার প্রিয় ছিল এতদিন, এইবার দেবতাকে প্রিয় করবার দিন এসেছে। তাই সংসারের কোন মায়ায় নিজেকে জড়িয়ে ফেলতে আর চান না সনাতনবাবু। এই গৃহে আজও কলরব আছে, ভাবনা আছে, হাসির উচ্ছ্বাস আর অভিমানও আছে। ছেলের বিয়ে দেবার পর থেকে এই গৃহেরই মধ্যে সাংসারিক মায়াগুলি যেন আরও নতুন করে জেগে উঠেছে। উঠুক, থাকুক, ভালই, কিন্তু সনাতনবাবু এই ভালর ভাবনা, চঞ্চলতা ও মোহ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন।

হরেনও গৃহজীবনের কোন সমস্যা ও দুশ্চিন্তার মধ্যে সনাতনবাবুকে ডেকে আনে না। পিতার অবসর জীবনের শান্তিকে বিচলিত করতে চায় না। কমলাও শ্বশুরের এই শান্তির আগ্রহকে শ্রদ্ধা করেই চলে। ধ্যান পূজা জপ আর দেবতার চিন্তা নিয়ে বাড়ির এক নিভৃতে শান্ত হয়ে রয়েছেন। বুড়োমানুষ, থাকুন না, তাঁকে আর সংসারের ভালমন্দের চিন্তার মধ্যে টেনে এনে লাভ কি? যেমন হরেন, তেমনি কমলা, দুজনেই সারাক্ষণ সর্তক থাকে, সনাতনবাবুর এই নির্লিপ্ত জীবনের শান্তি যেন তাদের কোনো আচরণের ভুলে ক্ষুণ্ণ না হয়। সনাতনবাবুর জন্য ফুল গঙ্গাজল আর আসন ঠিক সময়ে ঠিক জায়গাতেই সাজানো থাকে। আত্মীয় কুটুম্ব যারা আসেন, তাঁদের অনেকেই জায়গা-জমি চালের দর আর চা-বাগানের শেয়ারের কথা বলতে ভালবাসেন। কিন্তু হরেন আর কমলা সাবধানে থাকে, অভ্যাগতদের স্মরণ করিয়ে দিতে ভোলে না—বাবার কাছে গিয়ে ওসব কথা আর আলোচনা করবেন না। উনি ওঁর নারায়ণ নিয়ে শান্তিতে আছেন, শান্তিতে থাকতে দিন।

ঘরের মধ্যে ঝি-চাকরকেও কথাবার্তার স্বর মৃদু করে রাখতে হয়। যেন কোন সোরগোল না হয়। আজেবাজে ভিখিরীর দল এসে চিৎকার করে ওদিকের দরজার কাছে; এদিকে সনাতনবাবুর ঘরের দরজার কাছে শুধু একজন বৈরাগী ভিখিরী আসবার সুযোগ পায়। বিষ্ণুনাম গান করে চলে যায় সেই বৈরাগী।

এই বাড়ির বাতাসে নবজাত প্রাণের কান্না বেজে উঠল একদিন। সনাতনবাবু তখন পুজোয় বসেছেন মাত্র এবং কান্নার স্বর তাঁর কানে এসে পৌঁছতেই তাঁর শান্ত চক্ষুর তারকা হঠাৎ একটু চমকেও উঠলো? নারায়ণ! নারায়ণ! প্রিয় দেবতার নাম উচ্চারণ করে এবং বিষ্ণুমূর্তি স্মরণ করে শান্তমনে পূজা সমাপন করলেন সনাতনবাবু।

বাড়ির বাতাসকে হঠাৎ ধ্বনিময় করেছিল যার কান্না, তাকে চোখ মেলে দেখলেনও সনাতনবাবু। ফুলের মত একটা কচি মানুষের টুকটুকে দেহ তোয়ালে দিয়ে জড়িয়ে নিয়ে ধাই হাসিমুখে সনাতনবাবুর সামনে এসে দাঁড়ালো, আর বললো—নাতিকে দেখুন। দেখলেন সনাতনবাবু, তার পরেই নারায়ণের মূর্তি স্মরণ করে চোখ বন্ধ করলেন।

কয়েক মাস পরে এই বাড়ির মধ্যে একদিন একটু সোরগোলের সাড়া শুনতে পেয়ে হঠাৎ একটা কৌতূহল যেন ব্যস্ত হয়ে উঠলো সনাতনবাবুর মনে। একটা উৎসবের মুখরতার মত সেই সোরগোলের অর্থ কল্পনাতে তিনি সহজেই বুঝে নিলেন, এবং তারপরেই হরেন ও কমলাকে ডাক দিয়ে বললেন—ওর নাম রাখ নারায়ণ।

তবে কি সংসারের জন্য আবার কোন আগ্রহ দেখা দিল সনাতনবাবুর মনে? না, হরেন আর কমলা বুঝতে পারে যে, এই সংসারের একটা নতুন মানুষের নামকে দেবতার কথা স্মরণ করিয়ে দেবার একটা ডাক করে রেখে দিলেন সনাতনবাবু। নাতিকে কেউ নাম ধরে ডাকলেই নাতির দাদুর মনে তাঁর প্রিয় দেবতার মূর্তি জেগে উঠবে। তাই এই নির্দেশ।

সনাতনবাবুর নির্দেশই সবাই মেনে নিল। তাঁর নাতির নাম রাখা হলো নারায়ণ। ঘরের ভিতরে ফিরে গিয়ে হরেন কমলাকে হেসে হেসে বলে—ভালই হলো, ছেলেকে যদি চিৎকার করে ডাক, তবুও বাবার মনে শান্তি নষ্ট হবে না।

কমলাও হাসে—ভালই হলো।

হ্যাঁ, ভালই হলো। সনাতনবাবুর নাতি বড় হয়ে উঠতে থাকে, আর সেই সঙ্গে বড় হতে থাকে নাতির দুষ্টুমি ও চাঞ্চল্য। কিন্তু নাতির এই দুষ্টুমি ও চাঞ্চল্যর কিছুই দেখতে পান না সনাতনবাবু। সনাতনবাবুর নিভৃতের শান্তি যেন দুরন্ত ছেলের উপদ্রবে ক্ষুণ্ণ না হয়, সেদিকে লক্ষ্য আছে হরেনের ও কমলার। এই বাড়ির ঐ দুরন্ত একটি মায়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার জন্য কোন আগ্রহও নেই সনাতন বাবুর মনে। নাতিকে দেখতে চান না সনাতনবাবু, দেখতে পানও না, শুধু শুনতে পান। এই বাড়ির এতদিনের শান্ত বাতাসে একটা ডাক ছুটোছুটি করছে। ও নারায়ণ! ওরে নারায়ণ! কখনো হরেন, কখনো কমলা, কখনো বা ঝি-চাকর, দুরন্ত ছেলেকে খুঁজে খুঁজে ডাকতে থাকে। বাগানের এক কোণে ছোট বকুলের কাছ থেকে ধুলোখেলা ছেড়ে দিয়ে ছুটে আসে নারায়ণ।

কদাচিৎ কখনো নাতিকে চোখে দেখতে পান সনাতনবাবু, যখন ঐ ছোট বকুলের কাছে ধুলো খেলতে আসে নারায়ণ, তখন। বারান্দার উপর একটি চেয়ারে জপের মালা হাতে নিয়ে বসে থাকেন সনাতনবাবু, আর ছোট বকুলের ছায়ার দিকে হঠাৎ চোখ পড়তেই দেখতে পান, দু'হাতে ধুলো ঘাটছে তিন বছর বয়সের একটা মানুষ। একবার তাকিয়েই চোখ বন্ধ করেন সনাতনবাবু, অথবা ভাগবতের পাতা খুলে পড়তে থাকেন। ডাক শোনা যায়,—নারায়ণ, নারায়ণ। ঝি চেঁচিয়ে ডাকছে। সনাতনবাবুর মনে মূর্তি জাগে, প্রিয় দেবতার মূর্তি।

আরও শান্ত এবং আরও প্রসন্ন হয় সনাতনবাবুর চোখের দৃষ্টি। বিষ্ণুধ্যানের স্তোত্র মনের মধ্যে মৃদু গুঞ্জরণ করে বেড়ায়। দেবতার মূর্তি ফুটে উঠেছে সনাতন-বাবুর মনের গভীরের এক আকাশে। কি নয়নাভিরাম সেই মূর্তি! শঙ্খ চক্র

গদা ও পদ্ম, বৈজয়ন্তী মাল্য ও কৌস্তুভ মণি, কিরীটে ও কুণ্ডলে শোভিত দেবতা। জ্ঞানীরা বলেন এবং সাধকেরা তো দেখতেই পান, এই সুন্দর পীতাম্বর দেবতার ভ্রূপল্লবের শিহরে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের রহস্য শিহরিত হয়।

আর একদিন, সেদিনও সবেমাত্র পুজোয় বসেছেন সনাতনবাবু। এই বাড়ির বাতাসে বেজে উঠলো সেই ডাক—নারায়ণ নারায়ণ। সোরগোলও শোনা যায়। অনেক পায়ের শব্দও ছুটাছুটি করছে। কিন্তু সকল শব্দ ছাপিয়ে শুধু একটি ডাক বাজছে—নারায়ণ, নারায়ণ। কী তীব্র, কী করুণ, বুকের পাজর চূর্ণ করা সেই ডাক। যেন কেউ একটা হিংস্র কামড দিয়ে ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ঐ সংসারটার সবচেয়ে বড লোভের আদরের আর মায়ার কোন জিনিসকে। হঠাৎ মনে পডে সনাতনবাবুর, ঠিকই তো, অনেকদিন হলো ঐ বকুলের ছায়ার কাছে সেই ছোট্ট মানুষটাকে ধুলো খেলতে আর দেখা যায়নি! সত্যিই কি ধুলোখেলার সেই মানুষটাই চলে যাচ্ছে?

সত্যিই তাই, বুঝতে দেরী হয়নি সনাতনবাবুর। শোকাহত এক সংসারের বিলাপ বাতাস মথিত করছে। তার মধ্যে শুধু আছাড় খেয়ে বাজছে সনাতন-বাবুরই দেবতার নাম—নারায়ণ, নারায়ণ। চিৎকার করে নাম ধরে ডাকছে আর আকুল হয়ে কাঁদছে বাডির ভেতরের মানুষগুলি!

শুধু একবার মাত্র শিউরে ওঠে সনাতনবাবুর পূজার হাত, চোখের তারা এক মুহূর্তের মত শুধু একটু কঠিন হয়ে ওঠে। কিন্তু পরমুহূর্তে, এই বাডির আহত বাতাসের গ্রাস থেকে নিজের মনটাকে ছিন্ন করে এক ভিন্ন আকাশের কোলের উপর নিক্ষেপ করেন সনাতনবাবু। দেখতে পান,—শঙ্খ চক্র গদা ও পদ্ম নিয়ে উজ্জ্বল অদ্ভুত ও সুন্দর এক মূর্তি যেন তাঁর বুকের কাছে আপন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শান্ত মনে পূজা করতে থাকেন সনাতনবাবু। ধীরে স্বরে স্তব আবৃত্তি করতে করতে অদ্ভুত এক শান্তির গভীরে মনটাকে ডুবিয়ে দিতে থাকেন। বাড়ির আহত বাতাসও সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত হাঁপিয়ে ক্লান্ত হয়ে শেষে ঘুমিয়ে পডে আর নীরব হয়ে যায়।

ব্যথাহত সংসারের পাশেই যেন ব্যথার অতীত এক শান্তির ঠাঁই পেয়ে গিয়েছেন সনাতনবাবু। আকাশে সেই রকমই আলো জাগে সকালবেলায়, আর শালিক লাফালাফি করে বকুলের পাতার আড়ালে। সেই বৈরাগী ভিখারী আসে, আর বিষ্ণুনাম গান করে চলে যায়। পূজার ফুল গঙ্গাজল আর আসন ঠিক সময়ে ঠিক জায়গাতেই সাজানো থাকে। হাতের কাছে ভাগবত, আর চোখের সামনে দেয়ালের গায় রঙীন ছবির শ্রীবিষ্ণু।

কিন্তু হঠাৎ একদিন ব্যস্তভাবে ডেকে উঠলেন সনাতনবাবু—বউমা, বউমা।

কমলা কাছে এসে দাঁড়ায়। সনাতনবাবু বলেন—না, কিছু না।

আবার একদিন, এবং তারপর থেকে প্রায়ই হঠাৎ ডেকে ওঠেন সনাতন-

বাবু।—ও হরেন, ও বউমা। হরেন আসে, কমলাও আসে। কিন্তু সনাতনবাবু বলতে পারেন না, কি হয়েছে তাঁর, আর কেনই বা ডাকছেন।

বারান্দার চেয়ারের উপর বসে আর জপের মালা হাতে নিয়ে তেমনি বসে থাকেন সনাতনবাবু। নারায়ণ, নারায়ণ—চোখ বন্ধ করে নাম উচ্চারণ করা মাত্র চোখ মেলে তাকিয়ে ফেলেন। দেবতার মূর্তি স্মরণ করতে গিয়ে বোধহয় বার বার বাধা পাচ্ছেন সনাতনবাবু।

ছটফট করেন সনাতনবাবু; যেন তাঁর প্রিয় দেবতার মূর্তি ঐ ডাক শুনেই দূরে পালিয়ে গিয়ে কোথাও লুকিয়ে পড়েছে, খুঁজে পাচ্ছেন না সনাতনবাবু। কই সেই শঙ্খ চক্র গদা আর পদ্ম? সেই বৈজয়ন্তী মালা আর কৌস্তুভ মণিহার? কি হলো? কি হলো? জলভরা মেঘের বেদনার মত কি যেন একটা বেদনার ছায়া এসে ঝাপসা করে দিচ্ছে তার চোখের দৃষ্টি। দেখতে পাচ্ছেন না দেবতার মূর্তিকে? ঐ নামে দেবতাকে ডাকতে গিয়ে তিন বছর বয়সের একটা মানুষের মূর্তি শুধু মনের মধ্যে জেগে উঠছে। ঐ নাম, ঐ প্রিয় দেবতার নাম যেন একটা আঘাত, তাই বার বার সেই আঘাতে চোখ খুলে যায় সনাতনবাবুর আর দেখতে পান শুধু...ঐ যে, ও কে? কে রে তুই? চেঁচিয়ে ওঠেন সমাতনবাবু—বউমা শিগ্‌গির এস।

কমলা কাছে এসে দাঁড়ায়। সনাতনবাবুর শান্ত উদাস দুই চক্ষু কাঁপতে থাকে। তারপর বলেন—আমার এ কি হলো বউমা?

কমলা বিস্মিত হয়—কি হলো বাবা।

সনাতনবাবু বলেন—দেবতার নাম উচ্চারণ করলেই এ কি দেখতে পাচ্ছি বউমা। এ যে সহ্য করতে পারছি না।

কমলা ভয় পেয়ে প্রশ্ন করে—কি দেখছেন?

ছোট বকুলের ছায়ার দিকে তাকিয়ে সনাতনবাবু বলেন—ঐ যে ওখানে।

কমলা বলে—ওখানে তো কেউ নেই।

সনাতনবাবু তবু অপলক চোখে ছোট বকুলের ছায়ার দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলেন—তুমি ঠিক বুঝতে পারলে না বউমা।

চমকে ওঠে কমলা, সেই মুহূর্তে বুঝতে পারে, আর বুঝতে পেরেই অন্য দিকে চোখ ঘুরিয়ে নেয়। আর সনাতনবাবু, যিনি এত বোঝেন, তিনি অবুঝের মত ছোট বকুলের ছায়ার দিকে লোভীর মত, পিপাসীর মত তাকিয়ে থাকেন। নারায়ণ নারায়ণ নারায়ণ! প্রিয় দেবতার নাম উচ্চারণ করা মাত্র দেবতার মূর্তি যেন ঐখানেই কোথাও লুকিয়ে পড়েছে।

না, ঠিক লুকিয়ে পড়ে না। তাই ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন সনাতন বাবু। আর বোধহয় দেখতেও পান, তাঁর প্রিয় দেবতা শঙ্খ চক্র গদা ও পদ্ম হারিয়ে সংসারের একটা তিন বছর বয়সের শিশু হয়ে ছোট বকুলের ছায়ায় বসে ধুলো ঘাঁটছে।

শুক্লাভিসার

কলের চিমনি কলোনি আর চওল নিয়ে বোম্বাইয়ের দাদার। ঘাটি মজুরদের দেখলে মনে হয়, ওরা যেন একটা ছত্রভঙ্গ বিলদার পল্টনের লোক—বেঁটেখাট শক্ত কালো কাজে-ছেঁচা শরীর। ওদেরই পূর্বপুরুষ একদিন মহারাজা শিবাজীর সহায় থেকে রাজ্য ও রাজা ভেঙেছে ও গড়েছে, পেশোয়াদের মুলক্‌গিরি সার্থক করেছে। আজ আবার ওদেরই শ্রমের স্বেদ স্বাতীজলের মত বোম্বাইয়া বেনি-য়াদের ভাগ্যের ঝিনুকে মুক্তা ফলিয়ে রাখছে।

ওদের মধ্যে অনেকে দেবল ত্রিপাঠীকে চেনে, মান্য করে, আর গুরুজী বলে ডাকে। শুধু গুরুজী বললেই ওরা সব পরিচয় বুঝে ফেলে। দেবল ত্রিপাঠীর বাড়ি যে দূর জব্বলপুরের কাছে কোন একটা গাঁয়ে, আর তার বাবা যে একজন সেকেলে জায়গীরদার—এত সব কুলমানের খবর তারা রাখে না। ত্রিপাঠীকে আজ প্রায় আড়াই বছর ধরে তারা এইভাবেই দেখে আসছে; মাথায় বড় বড় চুল, ঢিলে পায়জামা আর গায়ে আঁটসাট চোগা। সুগঠন ফর্সা চেহারার এই নওজোয়ানকে তারা প্রায়ই ঘুরতে দেখে—হাতে একটা ঝোলা, তার মধ্যে বই কাগজপত্র ইস্তাহার ও আরও কত কী যে থাকে কে জানে! মজুর এলাকায় আজ যে এগারোটা স্কুল চলছে, তা সবই একা ত্রিপাঠীর কায়পাত মেহন্নতের ফল। আরও কত হবে।

রাত-বেরাতে হঠাৎ হয়তো নতুন মহল্লার কোনো চওলের আঙিনায় এসে দাঁড়িয়ে থাকে ত্রিপাঠী। এদিক ওদিক জোড়া জোড়া তাড়িকষা লাল চোখের সন্দিগ্ধ দৃষ্টি জ্বলতে থাকে। আচম্বিতে একটি ঘাটি যুবকের ক্রুদ্ধ মূর্তি পথ রুখে দাঁড়ায়, পেছন থেকে নিঃশব্দে আরও পাঁচ সাতজন ঘিরে ধরে। এক-আধটা লোহার ডাণ্ডাও থাকে কারও হাতে।

ক্রুদ্ধ মূর্তিটা দাঁতে দাঁত চিবিয়ে প্রশ্ন করে—কুঠে ঘর?

ত্রিপাঠী অলক্ষ্যে মুচকে হেসে জবাব দেয়—হিন্দুস্তান।

সন্দেহ আরও শাণিত হয়ে ওঠে। নাসিক নয়, সুরট নয়, সাতরা পুনা নয়, কাথিয়াবাড় নয়—হিন্দুস্তান?

আবার প্রশ্ন করে—তোমাচা নাম?

ত্রিপাঠী উত্তর দেয়—গুরুজী।

গুরুজী! সঙ্গে সঙ্গে সবাই মাথা ঝুঁকিয়ে অভিবাদন জানায়। কতদিন ধরে তারা আশাপথ চেয়ে আছে, কবে গুরুজী এই দিকে আসবে। এতদিন শুধু নামই শুনে এসেছে তারা। গুরুজী এলেই একটা স্কুল খুলে যাবে, তাছাড়া আরও কত নতুন কথা শোনাবে গুরুজী, অন্য পাড়ায় সবাই শুনেছে। সেই ধুলোর ওপর বসে পড়ে সবাই। হাঁক ডাকে আরও কত লোক চলে আসে।

ত্রিপাঠীর কাজ আরম্ভ হয়ে যায়। মজুরেরা নতুন কথা শোনে। গুরুজীর

কথাগুলির পেছনে যেন এক সুদিনের সূর্য কিরণজাল গুটিয়ে স্থির হয়ে রয়েছে। গুরুজীর কথামত সাহসে ও প্রতিজ্ঞায় একবার দল বেঁধে উঠে দাঁড়ালেই যেন সেই সূর্য দেখা যাবে। কিন্তু সব কাজের আগে একটা স্কুল খুলে যায়! সবাই শিখবে—বাপ ছেলে নাতি কেউ বাদ যাবে না।

বরুত্রীর সঙ্গে দেবল ত্রিপাঠীর দেখা হয়েছিল আকস্মিকভাবে।

জানকী বাই ধর্মশালার একটি কুঠুরীর চৌকাঠের ওপর বসে একা-একা কাঁদছিল বরুত্রী। একে বাংলাদেশের বিধবা, তায় বয়স অল্প, তায় বিদেশ। দেশে তিন কুলের কোনো সংসারে দুটো সম্মানের ভাত কপালে জোটেনি বলেই একটা অনির্দেশ ভরসায় ঝাঁপ দিয়ে চলে এসেছে দূর বোম্বাই শহরে, চাকরী পাবে বলে।

ত্রিপাঠীর মত চলতি হাওয়ার পথিক যারা, ধর্মশালা তাদের কাছে একটা ঝড়ের রাতের আশ্রয়। ত্রিপাঠী সেদিন ধর্মশালাতেই ছিল। বরুত্রীর কাণ্ড দেখে জিজ্ঞাসা করলো—কাঁদছেন কেন?

বরুত্রী—চাকরী খুঁজতে এসেছিলাম, কিন্তু দেখছি চাকরী পাওয়া যাবে না।

ত্রিপাঠী হেসে ফেললো—চাকরীর জন্য কান্না? আচ্ছা কালই আপনাকে চাকরী জুটিয়ে দেব।

ঠিক পরের দিন এসে ত্রিপাঠী বরুত্রীকে ধর্মশালা থেকে নিয়ে গেল। শেঠ গোকুলদাস ফণ্ডের কর্তাদের ধরাধরি করে প্যারেলে একটা হরিজন মেয়েদের স্কুল খোলবার ব্যবস্থা করে ফেললো ত্রিপাঠী, এক রাত্রির মধ্যেই। বরুত্রী কাজ পেয়ে গেল, হরিজন মেয়ে-স্কুলের শিক্ষয়িত্রী।

ত্রিপাঠী বলে গেল—এখন শুধু হাইজিন, সেলাই আর ড্রিল শেখাবেন। হিন্দীটা আগে ভাল করে শিখে নিন আমার কাছে, আর সামান্য একটু মারাঠি। মাত্র তিনটি মাস প্রতিদিন এক ঘণ্টা করে আমি আপনাকে হিন্দী শেখাবার জন্য সময় নষ্ট করবো। এর বেশি আর এক ঘণ্টাও নয়।

ত্রিপাঠীকে অগত্যা বরুত্রীর গুরুজী হতে হলো। এই তিন মাসের মধ্যে বরুত্রী ত্রিপাঠীকে একরকম চিনেছে। এটা ঠিক দাদারের মজুরদের মতন করে চেনা নয়। এমন একজন স্বার্থহীন হিতব্রত কর্মীর ওপর শ্রদ্ধা না এসে পারে না; বরুত্রী ত্রিপাঠীকে শ্রদ্ধা করে। অচেনা জনতার মাঝখানে একটা দরদী হৃদয়ের সান্নিধ্যে এত সুলভ হলে কে না অন্তরঙ্গ হতে চায়? কিন্তু কী আশ্চর্য, এইটুকুতেই বরুত্রী তার অন্তরের অঙ্গনে যেন এক প্রীতমের আওন-কি-আওয়াজ শুনতে পায়। একটি সুন্দর মুখের টানে তার চোখের চাহনি লজ্জায় বিপন্ন হতে থাকে। কিন্তু এই পর্যন্ত।

একটা পশমী কাপড়ের টুপির ওপর লাল সুতো দিয়ে জোড়া-হরিণের নক্সা তুলে রেখেছিল বরুত্রী। তিনমাসের শেষে শেষ-পড়ার দিন বরুত্রী সাহস করে ত্রিপাঠীকে উপহারটা দিয়েই ফেললো। বরুত্রীর মনে যাই থাক, মুখে বললো—

গুরুদক্ষিণা দিলাম।

কিন্তু উপহারটা শুধু মাথায় উঠেই রইল বোধহয়। ত্রিপাঠীর মনের ভেতর পৌঁছয়নি। পৌঁছলে তার সাড়া ফুটে উঠতো নিশ্চয়, মুখের ভাবে একটু রক্তাভ বিড়ম্বনার ছায়া, একটু সলজ্জ হাসি। কিন্তু কই? টুপিটা মাথায় দিয়ে ত্রিপাঠী বললো—বাঃ, বেশ জিনিসটি।

বিদায় নেবার সময় ত্রিপাঠী বলে গেল—এবার তুমি নিজেই নিজেকে ট্রেনিং দাও বরুত্রী। প্রথমে ভুলে যাও যে তুমি শুধু চাকরী করছো। যে কাজ নিলে তাকে ভালবাসতে শেখ। তাহলে এর মধ্যে তুমি জীবন খুঁজে পাবে, নইলে চিরকাল একাজ তোমার কাছে মাত্র একটা জীবিকা হয়ে থাকবে।

ত্রিপাঠীর কথায় বরুত্রীর মেয়েলী প্রত্যয়ে হঠাৎ একটা রূঢ় আঘাত লাগে। বাঙালী মেয়ের মনের আলপনার রং সাতশো মাইল দূরের মহাকোশলের একটি ছেলের চোখে ধরা পড়ে গেছে কত সহজে। কিন্তু কেজো-জীবনে এসবের কোনো প্রয়োজন নেই। তাই বোধহয় সতর্কবাণী।

যথা নিযুক্তহস্মি। স্কুলটাই সর্বস্ব হয়ে উঠলো বরুত্রীর। যত অভাগার ঠাঁই থেকে কতগুলি নোংরা মহরের মেয়ে কুড়িয়ে এনে স্কুল গড়া হয়েছে। এদেরই লেখাপড়া শেখাতে হবে। বাঁধাকাজের একঘেয়ে রুক্ষতা, হেলাফেলা দিনযাপনের গ্লানি মুছে গেল বরুত্রীর। অদ্ভুত এক তৃপ্তির স্বাদে কাজের মুহূর্তগুলি মিষ্টি হয়ে উঠেছে। ছোট ছোট মহরের মেয়েগুলি, এরই মধ্যে স্থর মিলিয়ে 'জন-গণ-মন' গাইতে শিখেছে। কত বাধ্য! ঠিক নিয়মমত সপ্তাহে শনি-মঙ্গলে ফ্রকগুলি কেচে নিতে ভুল করে না। সেদিন সেই একেবারে অপোগণ্ড ভাঙ্গি মেয়েটা বরুত্রীর ধমক খেয়ে যেভাবে অভিমানে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো, বরুত্রী আর চুপ করে থাকতে পারলো না। সান্ত্বনা দিতে গিয়ে মেয়েটাকে কোলের ওপর তুলে জড়িয়ে ধরলো। প্রসূতি মাতার পুলকের মত আবেগের ছোঁয়া লেগে বরুত্রীর দেহমন শিউরে ওঠে। যেন এক শিশু মহাজাতির স্পর্শ। যেন বরুত্রীর মন আর প্রাণের সকল ক্ষুদ্রত্বের বদ্ধ দুয়ার খুলে যায়—ঘরে যেন নতুন আলো আসে।

ত্রিপাঠীর সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা হয়। গল্পে আর কথায় দুজনের মন উৎসাহে অস্থির হতে থাকে। বরুত্রীর মনে পড়ে যায়, সেই টুপি উপহার দেবার প্রগল্‌ভতা। তার মধ্যে যেন ঘুষ দেবার মত একটা দীনতা ছিল! ত্রিপাঠীকে কত সস্তা চরিত্রের লোক মনে করেছিল বরুত্রী। কী মতিচ্ছন্নতা হয়েছিল তার!

কিন্তু তবুও, আর একটু পরেই ত্রিপাঠী চলে যাবে! বড় একা ও ফাঁকা মনে হবে। বরুত্রীর সকল ভাবনা বিষন্ন তন্দ্রার মত বাকী অবসরটুকু অর্থহীন করে দেয়।

এক-এক দিন ত্রিপাঠী এসে বরুত্রীকে বেড়াতে নিয়ে যায়। মহলছ্‌মীর তালের সারির ছায়ায় শুক্লা সন্ধ্যায় বালিয়াড়ীর ওপর দুজন হেঁটে ফিরতে থাকে। বরুত্রীর মনে হয়, অস্থির জীবনের নক্ষত্রগুলোকে এক সঙ্কল্পের ছায়াপথে তারা

দুজনে যেন পাশাপাশি চলেছে। জাতি কুল ভাষা পরিচ্ছদ প্রদেশ—সব ভেদ যেন এখানেই খারিজ হয়ে গেছে। এখানে আপনা হতেই হাতে বরমাল্য উঠে আসে। সকল কুলজী বিচার এখানে মিথ্যে হয়ে যায়।

বরুত্রী বলে—আমাকে তোমার সঙ্গে রাখ দেবল। আরও কাজ দাও আমাকে। তুমি একা কত কাজ করছো, আমি কিছুই জানতে পারি না। কিছুই বল না আমাকে।

ত্রিপাঠী কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর বলে—আর একটু ভেবে বলো বরুত্রী। এত তাড়াতাড়ি ওকথা বলতে নেই। ভুল হতে পারে।

বরুত্রী ত্রিপাঠীকে ভালবেসে ফেলেছে; অস্বীকার করলে মিথ্যা হয়। সংকল্প—এ যুগের নরনারীর মিলনে প্রণয়ে এই এক নতুন রাখী। সংকল্পে যারা এক হতে পেরেছে, জীবনে তাদের এক হয়ে যেতে দোষ কি?

তবু মনে হয়, এই রাখীর সূত্রে কোথায় যেন একটা পাক আলগা হয়ে রয়েছে। তাই টানে জোর হয় না। বরুত্রী বুঝতে পারে, একে ঠিক পাশাপাশি চলা বলে না। ত্রিপাঠী চলেছে আগে আগে, বরুত্রী তার পেছনে। মাঝে বেশ খানিকটা মহত্ত্বের ব্যবধান। বড় বেশি তীক্ষ্ণ উদার উঁচু-মাথার মহত্ত্ব। তিল-মাত্র হৃদয়ের তাপ নেই।

একটি বছরও পার হয়নি, পুষ্কর মিত্রকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে—বরুত্রীর সঙ্গে মহরপাড়া আর ভাঙ্গিদের বস্তিতে মাঝে মাঝে ঘুরে বেড়ায়। পুষ্কর বলে—আমার বাপ বড়লোক, কিন্তু আমি ছোটলোক। আমিও আমার ভবিষ্যৎ ঠিক করে ফেলেছি বরুত্রী। আমিও একটা হরিজন স্কুল খুলবো।

পুষ্করের কথা বলার ভঙ্গীতে একটু বেশি উচ্ছ্বাস থাকলেও বরুত্রী ওর আন্তরিকতাটুকু সন্দেহ করে না। খুশি হয়। স্টীভেডর মিত্র এণ্ড কোম্পানীর মালিক শ্রীকান্ত মিত্রের একমাত্র ছেলে পুষ্কর। জুহুতে এক পাহাড়ী টিপির ওপর পালেৎসা ঢঙে এমন একখানা বাড়ি, তবু এই প্রচণ্ড বনেদী বিত্তের ছলনা পুষ্করকে আটকে রাখতে পারেনি। সে নিজেই বলে—এটা ঠিক জেন বরুত্রী, ঘরে বসে বাপের দৌলত ফুঁকে জীবনটা পার করে দেব, সে পাত্র আমি নই। তার চেয়ে একবেলা দুটো বাজ্‌রার রুটি চিবিয়ে দেশের গরীবের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে থাকবো। আমি তোমারই মত সেবার ব্রতে নেমে আসতে চাই।

বরুত্রী হেসে ফেলে—নেমে আসতে চাই? সে কি? বল, উঠে আসতে চাই।

পুষ্কর—এরকম ব্যাকরণের ভুল ধরলেই গেছি। তোমাদের কাজ করতে গিয়ে কোথায় কবে পান থেকে চুনটি খসবে, আর তোমরা সবাই তখন—

বরুত্রী—তোমাদের কাজে মানে? বল আমাদের কাজে।

পুষ্কর কাঁচুমাচু হয়ে বলে—আমার ভুল হয়ে যাচ্ছে বরুত্রী, আরও হয়তো হবে। তুমি শুধরে নিও।

পুষ্করের এই ধরনের কথাতে বেশি বিচলিত হয়ে পড়ে বরুত্রী। অবুঝ আদুরে ছেলের যেমন পাত্রাপাত্র জ্ঞান নেই, হঠাৎ বায়না ধরে বসে; পুষ্করের কথাগুলি সেই ধরনের। কথায় কথায় সে নিজেকে বরুত্রীর সদিচ্ছার ওপর সঁপে দিতে চায়। বরুত্রীর চিত্ত ঘিরে একটা যে সতর্ক বেড়ার আঁটুনি আছে, তার মধ্যেও কোথাও দুর্বলতার ফাঁক আছে নিশ্চয়। নইলে পুষ্কর বরুত্রীর কাছে এতটা প্রশ্রয় কখনই পেত না।

ভোর রাত্রে উঠে এক-একদিন পুষ্কর আর বরুত্রী বস্তির পোয়াতি মেয়ে আর শিশুদের স্বাস্থ্যের রিপোর্ট নিতে বার হয়। পথে যেতে দেখা যায়, মহাজনদের দালানের অলিন্দের নীচে কয়েকটা বুড়ো-হাবড়া মুটে আর ভিখিরী ছেলেমেয়ে উবু হয়ে বসে পথের ধুলো হাতড়াচ্ছে। পোষা পায়রার উচ্ছিষ্ট ছোলার দানা খুঁজছে তারা। পুষ্করের মুখ ভয়ে বিবর্ণ হয়ে যায়। জিজ্ঞাসা করে—তুমি কি সত্যিই বিশ্বাস কর বরুত্রী, এই সব দুঃখ দূর করা সম্ভব? এ কী চারটিখানি কথা? দু'চারটে স্কুল করে লেখাপড়া শেখালেই যে কী হাতিঘোড়া লাভ হবে বুঝি না।

ফেরবার পথে ট্রাম থেকে নেমে বাইকুলা পুল ছাড়িয়ে একটা মুচিদের বস্তির ভেতর ঢোকে বরুত্রী। পুষ্করের মনের প্রসন্নতার ওপর চকিতে একটা ফাঁড়া ঘনিয়ে আসে। রুমাল বার করে বারবার নাক মোছে, ফ্যালফ্যাল করে চারদিকে তাকায়।

বস্তি থেকে যখন দুজনে বেরিয়ে আসে, তখন মাথার ওপর রোদ চন্‌চন্‌ করে। পুষ্কর এইবার বরুত্রীকে অনুরোধ না করে পারে না—একটা কাফেতে ঢুকে কিছুক্ষণ জিরিয়ে নিলে ভাল হতো না কি বরুত্রী? না হয় সামনের ঐ হিন্দু বিশ্রান্তি গৃহেই গিয়ে বসি; একটু সামান্য সরবৎ টরবৎ···

বরুত্রী হেসে ফেলে আর অনুযোগ করে—ওসব বদভ্যাস ছাড় এবার।

বরুত্রীর স্কুলঘরে সেদিন পুষ্কর বসে গল্প করছিল। ঘরে ঢুকলো ত্রিপাঠী।

—এটা আবার কে রে বাবা? পুষ্কর কথাটা উচ্চারণ করেই বরুত্রীর দিকে জিজ্ঞাসুভাবে তাকিয়ে রইল। বরুত্রীর দৃষ্টিতে ভর্ৎসনার খরবিদ্যুৎ যেন পুষ্করকে সাবধান করে দিল। বাচালতা সংযত করে নিল পুষ্কর।

ত্রিপাঠীর সঙ্গে পুষ্করের আলাপ আলোচনা হলো অনেকক্ষণ। এই প্রসন্ন সময়টুকুর মধ্যেই বার বার পুষ্করের মনস্কতা ভেঙ্গে যাচ্ছিল। ত্রিপাঠীর সম্পর্কে বরুত্রীর আচরণ—দুর্ভেদ্য হেঁয়ালীর মত হতবুদ্ধি করে দিচ্ছিল তাকে। ত্রিপাঠী চলে গেলে পুষ্কর সোজাসুজি কথাটা না বলে আর পারলো না—তুমি যে ত্রিপাঠীর কাছে কৃতজ্ঞতায় বাঁধা পড়ে গেছ বরুত্রী। এই সামান্য চাকরীটার জন্যে তো?

বরুত্রী—বড় খারাপ ভাবে কথাগুলি বলছো পুষ্কর। এরকম বলো না।

পুষ্কর চলে যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালো। বরুত্রী দেখলো, পুষ্করের দু'চোখের কোণ সজল হয়ে উঠেছে। মুখটা হৃতাশ্রয় মানুষের মত বেদনায় করুণ।

—এ-কী ? ছি-ছি, আমাকে এভাবে বিপদে ফেল না পুষ্কর। বরুত্রী একটা অস্বস্তিতে ছটফট করে প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে। পুষ্করের হাতটা ধরে জোর করে বসিয়ে দেয় ; শেষে অভিভাবকের মত স্পর্ধিত শাসনের সুরে যেন ধমক দিয়ে ওঠে—অবাধ্য হয়ো না। বসো।

পুষ্করের বুদ্ধিতে কোন্ রন্ধ্রে যেন এক শনি ঢুকেছে। কোথা থেকে এক প্রচণ্ড বাঙালিয়ানার দর্প এসে পুষ্করের মেজাজ ঝলসে দিয়েছে। সে বলে—পলিটিক্স আর কালচারে আমি আগে বাঙালী, পরে অন্য কিছু. তুমিও তাই বরুত্রী, তবু মুখে সেটা মানতে চাও না।

কখনও বলে—ত্রিপাঠীর মধ্যে কেমন একটা কাটখোট্টাই ভাব আছে। নয় কি বরুত্রী ?

বরুত্রীর অন্তরাত্মা যেন একটা অশুচি হাতের ধাক্কা খেয়ে চমকে ওঠে।

পুষ্কর তবু বলে যায়—শত হোক, ওদের সঙ্গে শুধু কথা বলা যায়। মেলামেশা যায় না।

পুষ্করের সর্বশেষ অনুরোধ—তুমি বেঙ্গলে ফিরে চল বরুত্রী। সেখানে অজস্র হরিজন পাওয়া যাবে। আমাদের কাজের কোনো অভাব হবে না।

বরুত্রীর মনের ভেতর প্রতিবাদ আর আত্মগ্লানির ঝড উদ্বেল হয়ে উঠতে থাকে। পুষ্কর তার নিরর্গল মনের সাধ অকপটভাবে বলে যা। কিন্তু কথাগুলি যেন ভয়ানক এক মন্দাহিংসার বাচালতা। শুনে স্তব্ধ হয়ে থাকে বরুত্রী।

অনেকক্ষণ পরে শুনতে পায়, পুষ্কর বলেই চলেছে—তোমার হাতে আমি নিজেকে ছেড়ে দিয়েছি। তোমার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা। শুধু একটি প্রতিশ্রুতি দিও বরুত্রী ; তোমাকে আপন করে নেবার মত যোগ্যতা যেন আমি পাই। যেদিন পাব, সেদিন তুমি দূরে সরে থাকতে পারবে না।

চমকে ওঠে বরুত্রী। দুর্বলতা চরম হয়ে ওঠে। পুষ্কর যেন জোর করে তার জায়গা করে নিচ্ছে। পুষ্করের আত্মনিবেদনের দুঃসাহস ঠেকিয়ে রাখার মত শক্তি কুলিয়ে উঠতে পারে না বরুত্রী। আর স্পষ্ট করে বলতে কিছু বাকী নেই, পুষ্কর কি চায় ? পুষ্করের এই হরিজন সেবার উৎসাহ একটা কপট তপস্যা মাত্র। মনের দিক থেকে তার অনুমাত্র তাগিদ নেই, তবু ভালবাসার দায়ে আগুন ছুঁয়েছে পুষ্কর।

পুষ্করের বাঙালিয়ানা। ভূ-ভারতের পথের ভিড থেকে সঙ্গহারা করে সে বরুত্রীকে এই নেপথ্যে নিয়ে যেতে চায়। ভীরু মাকডসার মত পুষ্কর যেন এক কোন জাল পেতে বসে আছে। সেখানে বরুত্রীকে একবার যদি পাওয়া যায়, অমনি তাকে আপন বৃত্তের মধ্যে লুফে নেবে পুষ্কর।

বাপের দৌলত। এই রূপোর পাহাডের ওপর বসে থাকলে বরুত্রী দূরেই সরে থাকবে। এমন দৌলতে কোন প্রয়োজন নেই পুষ্করের। সব বঞ্চনা নিন্দা ত্যাগ

ও ক্লেশের কাঁটাভরা পথের সর্ত সে মেনে নিয়েছে। সে পৌছতে চায় বরুত্রীর কাছে। বরুত্রীই ওর কাছে একমাত্র সত্য।

ভাবতে গিয়ে, নতুন এক প্রত্যয়ের মদিরতা বরুত্রীর সকল বিচার আচ্ছন্ন করে ফেলে। আগে ভালবাসতে হয়—তবেই সঙ্কল্পে সমান হওয়া যায়। মিলনেই সব সহজ হয়ে যায়। ভিন্নপথের ধাঁধা ঘুচে যায়। পুষ্কর তাই এগিয়ে আসছে। না এসে উপায় নেই। ভালবাসা ঠিক থাকলে, এক ব্রতে তাদের মিলতেই হবে। এ রাখীর কোনো সুতো আলগা রাখেনি পুষ্কর। শত কামনার গিঁট দিয়ে শক্ত করে বাঁধা। আপনা থেকেই গলায় তুলে নিতে ইচ্ছে করে।

পুষ্করের মুখের দিকে তাকিয়ে বরুত্রীর বড় বড় চোখ দুটি যেন আবেশে টলমল করে। কয়েকটি মুহূর্ত যেন মনের শাসন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়! বরুত্রীর মাথাটা পুষ্করের কাঁধের কাছে ঝুঁকে থাকে। খোঁপা থেকে কাঁটাগুলি এক-এক করে খুলে নামিয়ে রাখতে থাকে পুষ্কর। ভারনম্র তরুশাখা থেকে পুষ্কর যেন এক-একটি ফুল তুলছে।

বরুত্রী হঠাৎ একটা ঠেলা দিয়ে ধড়ফড় করে ওঠে, দূরে সরে গিয়ে বসে—অত্যাচার করো না পুষ্কর। আজকের মত দয়া করে একটু বাইরে যাও। এখানে থেক না।

দেবল ত্রিপাঠী এসে বললো—কিছুদিনের মত বাইরে চলে যাচ্ছি বলেই দেখা করতে এলাম। একটা কথা বলি, কিছু মনে করো না! পুষ্কর মিত্র ভালোমানুষ সন্দেহ নেই, কিন্তু সে একজন এডভেঞ্চারার মাত্র। আমার ভয় হয়, তুমি ভুল করছো বরুত্রী।

বরুত্রী চুপ করে থাকে। মনে মনে বলে—হ্যাঁ, আমার ভুল হতে পারে। কিন্তু তুমি স্বয়ং কি? শত নিরীহতায় তুমি অপরাধী। তুমি সোনার গাছ—নিষ্ফল শুচিতায় শুধু স্থির হয়ে আছো। তোমার ছায়া হয় না। তুমি শুধু বুদ্ধিমান। তুমি হৃদয়ের দাম বুঝবে না কোনদিন। মনের প্রতিবাদ চাপতে গিয়ে বরুত্রীর দৃষ্টি আনত হয়ে আসে।

ত্রিপাঠী বলল—ফিরে এসে হয়তো দেখবো, তোমরা দুজনে বিবাহিত জীবনে সুখী হয়ে রয়েছ। ভালই হবে। আমারও তাই ইচ্ছে। তবে স্কুলটা যেন ঠিক থাকে বরুত্রী।

একথা বলতে ত্রিপাঠীর গলার স্বর একবারও কেঁপে উঠলো না। গুরুজীর আসনে বসে ত্রিপাঠী তাকে আজ বেশ একটু হীন করে দেখছে—স্কুলের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশঙ্কা করছে। যাক, এই ভুলের আবরণ ঘুচাতে কতক্ষণ? বরুত্রী মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে—ত্রিপাঠী ফিরে এসেই দেখবে স্কুলের কতটা উন্নতি হয়েছে। আরও দেখবে, এক দুর্বাধ্য এডভেঞ্চারারকে বশ করে সে কিভাবে তাকে জাতি-সেবার ব্রতে দীক্ষিত করে নিয়েছে। ত্রিপাঠী বুঝবে—গুরুজীদেরও ভুল হতে

পারে। আরও বুঝবে, পৃথিবীর বরুত্রীরা ভূয়ো নয়।

ত্রিপাঠিকে বিদায় দিতে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে এল বরুত্রী। সামনের গলিটা বড অন্ধকার। একটা কেরোসিনের বাতি জ্বালিয়ে দরজার কাছে রাখলো। ত্রিপাঠী পথে পা দিতে, বরুত্রী আঁচলসুদ্ধ হাত দুটো তুলে কপালে ঠেকালো—নমস্তে।—স্পষ্ট উচ্চারিত হলো না। বরুত্রী মাথাটা অলসভাবে জোডহাতের ওপর ঝুঁকে পডে রইল কিছুক্ষণ।

ত্রিপাঠি চলে গেছে। বরুত্রীর কাজের প্রেরণা তবু প্রদীপের মত জ্বলতে থাকে। কোন ফাঁকি, কোনো শৈথিল্য, কোন অবসাদ তিলেকের জন্য তাকে বিভ্রান্ত করে না।

নিরাতঙ্ক আনন্দে মজে আছে পুষ্কর। মনে মনে হাঁপ ছাডে, বর্গীর উপদ্রব যেন শান্ত হলো এতদিনে। সারা বাংলায় পৌরুষকে অপমান করার জন্যই যেন ত্রিপাঠী তৈরী হয়েছিল। একজাতি আর মহাজাতি! ওসব ফাঁকা বুলি কংগ্রেসের বৈঠকী প্রস্তাবেই ভাল শোনায়।

পুষ্কর আর বরুত্রীর বিয়ে এখনও হয়নি। যে কোনো দিন হয়ে যেতে পারে। বেঙ্গল ক্লাবের গল্পগুজব ছ'মাস ধরে এই প্রসঙ্গের গন্ধে ও আমোদে ভন্‌ভন্ করছে—হরিজন মেয়েস্কুলের এক বিধবা মাস্টারণীর পাল্লায় পডেছে টাকার কুমীর শ্রীকান্ত মিত্রের একমাত্র ছেলে পুষ্কর। শ্রীকান্ত মিত্রও শক্ত ...াক। স্পষ্ট ভাষায় প্রতিজ্ঞা শুনিয়ে দিয়েছেন, যদি এই বিয়ে হয়, তাহলে পুষ্কর মিত্রকে একটি কাণাকডিও ছুঁতে হবে না। ফুলের টবগুলি পর্যন্ত দান-খয়রাতের জন্য লিখে দিয়ে যাবেন।

পুষ্কর মিত্র ঘাবডে যাবার ছেলে নয়। সে নিজের পথ করে নিতে জানে এবং করেও নিয়েছে। সে-কথাই জানাবার জন্য সেদিন বৈকালে স্কুল ঘরে আচম্বিতে এসে বরুত্রীর কাজে বাধা দিল—ওসব ঠেলে সরিয়ে রাখ এখন। বাইরে ঘুরে আসি চল। অনেক কথা আছে।

বিরক্তি ও অনিচ্ছা চেপে রেখে বরুত্রীকে যেতে হলো পুষ্করের সঙ্গে। পথে তিনবার ট্রাম-বাস বদল করে মেরিন লাইন পৌছানো পর্যন্ত বরুত্রী একটা সংশয় নিয়ে পুষ্করের হাবভাব আচরণ লক্ষ্য করে। কোথায় যেন তালভঙ্গ হয়েছে মনে হচ্ছে। অন্যদিনের তুলনায় বেশ একটু বিসদৃশ।

মেরিন-লাইনের নতুন পোস্তার ওপর দুজনে পাশাপাশি বসে রইল অনেকক্ষণ। পেছনে পিচ্ছিল পিচের নদীর মত কুইন্‌স্ রোড ছাপিয়ে দলে দলে লোক বেডাতে আসছে। সূর্য ডুবছে, কাদাটে আরব সমুদ্রের জলে গুলালী আলোকের চূর্ণ ছড়িয়ে পড়েছে। একটা পার্শী ঠাকুর্দা নাতিনাতনীর সঙ্গে ভেজা বালি দিয়ে একটা নকল গেট-অব ইণ্ডিয়া তৈরী করে হাসছেন খেলছেন। অন্ধকার ঘনিয়ে উঠতেই তারা চলে গেল। দূরে রাতের মালাবার হিল—আকাশ থেকে যেন

একটা দীপান্বিতা মেঘপুরী সমুদ্রের জলের ওপর ঝুলছে।

পুষ্কর বলে—যে কাজটা পেয়েছি, তাতে আমিই প্রথম বাঙালী। প্রথম ইণ্ডিয়ান বলতে পার। কোন মেডোকে আজ পর্যন্ত এই পোস্ট দেওয়া হয়নি।

গায়ে আধময়লা একটা খদ্দরের শাড়ি, পায়ে নিজের হাতে তৈরী এক জোড়া রঙীন বেতের স্যাণ্ডেল—তাও ছিঁড়ে গেছে। প্রকাণ্ড রুক্ষ খোঁপাটা ঘাড়ের ওপর হেলে পড়েছে। বরুত্রী নিষ্কম্প দৃষ্টি তুলে তার পাশের প্রসন্নভাগ্য এই পুরুষটির মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

পুষ্কর বলে—ভারতবর্ষের এই প্রথম একটি আসমানী ফৌজ তৈরী হলো। এক বছর প্রবেশনার হয়ে কাজ করবো, তার পরেই অফিসার করে দেবে। যতদিন না পারমানেণ্ট হই বরুত্রী, ততদিন তোমাকে একটু ধৈর্য ধরে থাকতে হবে। তারপরই এসে তোমায় নিয়ে যাব।

বরুত্রীর সকল বোধ বিচার আর অনুভবের স্নায়ুজাল যেন নিদারুণ এক অর্থহীনতার ছিঁড়ে পড়ে যাচ্ছিল।

বরুত্রী—নিয়ে যাবে? কোথায়?

পুষ্কর—আলমোড়া। ছোট একটি বাংলো ভাড়া করবো, সেইখানে তুমিই গিয়ে আমার সংসার সাজিয়ে বসবে।

বরুত্রীর সম্বিৎ যেন অনড় পাথরের মত স্তব্ধ হয়ে যায়। পুষ্কর উৎসাহিত হয়ে বলে—তোমার ভাগ্যের জোরেই এত ভাল কাজটা পেয়ে গেলাম। এইবার তোমার ঐ নেংরা চাকরীর দুঃখ দূর হবে। শুনে তুমি খুশি হচ্ছো না বরুত্রী?

বরুত্রী তার মাথার জ্বালা দূর করার জন্যই বোধহয় একবার মুখ ফিরিয়ে তাকালো। মনের ভেতর একটা চরম ব্যর্থতার জ্বালার হলকা ছুটছিল। বরুত্রী বললো—বুঝেছি, তুমি সেপাই হতে চলেছ। এতদিনের মনের মত আদর্শ খুঁজে পেয়েছে।

পুষ্কর—তুমি রাগ করছো। মস্ত ভুল করছো বরুত্রী। আর দুটি মাস মাত্র এখানে আছি। আর্যসমাজের শাস্ত্রী মশায়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। বিয়ের ব্যবস্থা ঠিক করে এসেছি।

বরুত্রী ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছিল। মেরিন-লাইন স্টেশনে একটা লোকাল ট্রেন আসবার সিগন্যাল পড়েছে। বরুত্রী খোঁপাটা এঁটে নিয়ে তাড়াতাড়ি পা ফেলে এগিয়ে গেল। পুষ্কর একা বসে রইল অনেকক্ষণ। কী রকম একটা বিশ্বাস ছিল, বরুত্রী একটু শান্ত হয়েই আবার ফিরে আসবে। এসেই আবার ডাকবে। এর আগে কতবার তো এমনি করে ডেকেছে।

কঠিন ধৈর্যে দিন গুনে গুনে দুটো মাস প্রায় শেষ হতে চললো। পুষ্কর এসে বললো—আমার সময় হয়ে এল বরুত্রী।

বরুত্রী—তুমি যেতে পারবে না।

পুষ্কর—কেন ?

—তোমাকে হরিজন স্কুলে কাজ করতে হবে।

—আমি বলছি, তোমাকে স্কুল ছাড়তে হবে।

—অসম্ভব। আমার জীবনের একটা তৃপ্তি আমি মিথ্যে করে দিতে পারি না। স্কুলের মেয়েদের ছাড়া পৃথিবীর কোনো আলমোড়ার বাংলো আমার ভালো লাগবে না।

—চিনতে পারলাম তোমাকে। আমি এবার বিদায় হই।

—ভুলে যাচ্ছ পুষ্কর, তোমার চলে যাবার অধিকার নেই। মনে করে দেখ, শিগগিরই কে আসবে আমার কাছে। সে যখন আসবে, তার ভার নেবে কে ?

—ভয় দেখিও না বরুত্রী। তুমিই তো তাকে তোমার হরিঘোষের গোয়ালের একটা পশু করে রাখতে চাও। আমি চাইছিলাম তাকে মানুষের ঘরে তুলে নিয়ে যেতে।

পুষ্কর তার সকল ব্যর্থ আগ্রহের জ্বালা সম্বরণ করে শেষে মিনতি করে—তুমি এসব ছেড়ে আমার সঙ্গে চলে এস, বোকামি করো না, বরুত্রী লক্ষ্মী···

বরুত্রী বললো—না, পারবো না।

পুষ্কর—আচ্ছা, যাই।

জামিনে ছাড়া পেয়ে যেরোডা জেলহাজত থেকে একবার দেওঘাই আসতে হলো ত্রিপাঠীকে। স্কুলঘরের টিনের দরজায় টোকা দিয়ে ডাকলো—বরুত্রী !

সাড়া না পেয়ে আবার ডাকলো—পুষ্করবাবু !

দরজা খুলে গেল। ত্রিপাঠী হাসিখুশির ফোয়ারার মত ঘরে ঢুকেই বরুত্রীর দিকে তাকিয়ে বললো—কী সৌভাগ্যবতী ? কী খবর তোমাদের বল। পুষ্করবাবু কোথায় ?

বরুত্রী—আলমোড়া গিয়েছেন। ভাল সরকারী চাকরী পেয়েছেন।

ত্রিপাঠীর চোখে পড়লো, বরুত্রীর চোখ মুখ ফোলা ফোলা। গলার স্বর ভাঙা ভাঙা। একটা কান্নার বর্ষা যেন শরীরের ওপর দিয়ে পার হয়ে গেছে। ছেলেমানুষের মত দুরন্ত কৌতূহল আর দরদ নিয়ে ত্রিপাঠী বরুত্রীর কাছে এগিয়ে এসে দাঁড়ায়—সব খুলে বল বরুত্রী। কিছু লুকোতে পারবে না আমার কাছে। আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছে।

বরুত্রী সব দ্বিধাসঙ্কোচ দূরে ঠেলে ফেলে প্রস্তুত হয়ে নেয়। আজ যেন তার মানত শেষ হবার দিন। বিগ্রহের সম্মুখে দাঁড়িয়ে সব প্রমাদ পতনের স্বীকৃতি শুনিয়ে যাবে।

কাহিনী শেষ করতে বরুত্রীর মাত্র দশটি মিনিট সময় লাগলো। ত্রিপাঠীর মুগ্ধ মুখের দীপ্তি ধীরে ধীরে রঙীন হয়ে উঠতে থাকে।

বরুত্রী বলে—পুষ্কর আমার মনের একটি সত্যি কথা জানতে পারলো না—

তাকে আমি আজ শ্রদ্ধা করি। সে সাহসী ও শক্ত মানুষ ; তার আদর্শে সে ঠিক আছে। আমিই তাকে ভুল বুঝেছিলাম।

ছোট ছোট নিরভিমান ঢেউয়ের মত বরুত্রীর কথাগুলি যেন একটি সমাপ্তির কিনারায় এসে ভেঙে পড়ছে। ত্রিপাঠী চঞ্চল হয়ে উঠলো। তাকিয়ে রইল বরুত্রীর মুখের দিকে। পাথর ছড়ানো কাজের পথে এতদিনে যেন একটি স্ফটিক আবিষ্কার করেছে ত্রিপাঠী। দুরন্ত লোভীর মত দৃষ্টিটা চক্‌চক্ করছিল ত্রিপাঠীর।

বরুত্রী—যাবার আগে গুরুনিন্দা আর করবো না, তাই আর একটি কথা আমার বলা হলো না। শুধু অপেক্ষায় ছিলাম, এইবার আমাকে বিদায় দেবার ব্যবস্থা করুন। স্কুলের জন্য অন্য লোক দেখুন।

ত্রিপাঠী—কেন ?

বরুত্রী—বলেছি তো আমার জীবনে দুর্নামের দাগ লেগেছে। স্কুলের সম্মান আগে বাঁচাতে হবে।

ত্রিপাঠী—হ্যাঁ, বাঁচাতে হবে। আমি আর তুমি দুজনে মিলে বাঁচাবো।

বরুত্রী—দুজনে মিলে ?

ত্রিপাঠি—হ্যাঁ গো সাহেবা। আমি মহাপুরুষ নই। আমি কাজের মানুষ। দুজনে মিলে কাজ করতে জানি।

উতলা আকাঙ্খার দুটি পুরুষবাহু বরুত্রীকে চকিতে বুকের উপর টেনে নিয়ে সাপটে ধরলো। বরুত্রী যেন আনন্দে ফুঁপিয়ে উঠলো—এ কী করছো, দেবল ?

ত্রিপাঠী—তোমাদের দুজনকে চুমো খাচ্ছি।

হেঁয়ালির মত শোনালো। বরুত্রী জিজ্ঞেস করলো—দুজনকে ? তার মানে ? শীগ্‌গির বল দেবল, আমার ভয় করছে।

ত্রিপাঠি—হ্যাঁ, দুজনকে, তোমাকে আর···

বরুত্রী—আর কাকে ?

ত্রিপাঠি—আমার ছেলেকে।

স্ব র্গ হ তে বি দা য়

যদি এখান থেকে কেউ একজন আজ ধানবাদের হীরাপুরে গিয়ে প্রশান্ত রায়ের বাড়িটার দিকে তাকায়, তবে সে নিশ্চয় খুব আশ্চর্য হবে। ওই বাড়িটা কিন্তু এই আশ্চর্যের আসল কারণ নয়। ওরকম শৌখীন ও সুন্দর চেহারার বাড়ি এখানে দমদমের এই মোতিঝিলেও অনেক আছে। আশ্চর্য হবার আসল কারণ হলো, অরুণা।

আশ্চর্য হবারই কথা। দমদমের মোতিঝিলের একটা ছন্নছাড়া পাড়ার একটা সরু ও ময়লা চেহারার সড়কের পাশে নিতান্ত দীনহীন একটা চল্লিশ টাকার ভাড়াবাড়িতে যিনি থাকেন, সেই হিতেশবাবু নামে সামান্য এক কেরানী-বাপের

মেয়ে অরুণা হীরাপুরের ওই বাড়িতে চিরকালের জীবনের ঠাঁই পেয়ে গিয়েছে। প্রশান্ত রায়ের স্ত্রী অরুণা। সেই প্রশান্ত রায়, ধানবাদের এদিকে আর ওদিকে যাঁর চারটি কোলিয়ারি আছে।

প্রশান্ত রায়ের এই বাড়ির গ্যারেজে তিনটে গাড়ি। বাড়ির চারদিকে পাম, ভিতরের লনের চারদিকে ঝাউ। এ বাড়ির বারান্দার দেয়ালের কলিং-বেলের বোতাম টিপলে চমৎকার সেতারের ঝংকারের মত একটা সুরেলা শব্দ বেজে ওঠে, সে শব্দে ওই শান্ত ও নীরব বাড়ির সব বাতাসও যেন ঝংকার দিয়ে হেসে ওঠে।

অরুণাকে দেখা যায়, সকালবেলায় বাড়ির পেছনের দিকের আর বিকাল-বেলায় সামনের দিকের লনের সবুজ ঘাসের উপর লালরঙা বেতের চেয়ারের ওপর চুপ করে বসে আছে। প্রশান্ত রায়ের এই বাড়ির নতুন একটি শোভা এই অরুণা। বর্ষার সকালে ও বিকালে, লনের চারদিকের ঝাউয়ের মাথার উপর যখন ঝুরু-ঝুরু বৃষ্টি ঝরে পড়ে, দূরের পাহাড়ের মাথার উপর কালো মেঘের বুকে বিদ্যুতের ঝিলিক ছটফটিয়ে ওঠে, আর বাগানের ভেজা গোলাপের গন্ধে বাতাস ভরে যায়, তখন দেখা যায়, উপরতলার একটি জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আকা-শের দিকে তাকিয়ে আছে অরুণা।

কেউ কি কখনও স্বপ্নেও কল্পনা করতে পেরেছিল যে, প্রশান্ত রায়ের মত মানুষের সঙ্গে অরুণার মত মেয়ের বিয়ে হতে পারে? না, কেউ কল্পনা করেনি, কেউ ভাবতেও পারেনি যে, একালের একটা ফাল্গুন মাসে সত্যিই সেকালের রূপ-কথার একটা গল্প একেবারে শাঁখ-সানাই বাজিয়ে আর উৎসব করে মানুষের জীবনের সত্য হয়ে উঠতে পারে। প্রশান্ত রায় এম-এ পাস করবার পর একটা বছর ইওরোপে ঘুরে বেড়িয়েছিল। আর, অরুণা পাটনাতে ওর মামার বাড়িতে থেকে তিনটি বছর পড়াশুনা করে, আর ক্লাস নাইন থেকে ক্লাস টেনে উঠতে না পেরে আবার মোতিঝিলের বাড়িতেই ফিরে এসেছিল। প্রশান্ত রায়ের এই বাড়ির গ্যারেজের ঘরের জানালাতেও সিল্কের পর্দা। আর অরুণা তার জীবনে প্রথম যেদিন সিল্কের শাড়ি পরেছে, সেটা হলো বিয়ের দিন। ঠিক দিন নয়, রাত্রি। ফাল্গুন মাসের সুন্দর একটি রাত্রি। সে রাত্রে মোতিঝিলের সরকার-বাবুদের বাগানে একটা কোকিল কী অদ্ভুত মিষ্টি স্বরে ডেকে ডেকে সকলকে আশ্চর্য করে দিয়েছিল।

ঘটনাটা যেন হঠাৎ মেঘ-ভাঙা চাঁদের আলোর ঝলকের মত একটা ব্যাপার। গরীব বাপ-মা ভেবে ভেবে কোন উপায়ই খুঁজে পাচ্ছেন না, কী করে মেয়ের বিয়ে হবে? কিন্তু কী আশ্চর্য, হিতেশবাবুর পিসতুতো দাদা রাজেনবাবুর বাড়িতে অরুণাকে দেখতে পেয়ে প্রশান্ত কী যে স্বপ্ন দেখে ফেললো, কে জানে। হিতেশ-বাবুর ওই রাজেনদার কাছে লজ্জিতভাবে হেসে হেসে প্রশান্ত নিজেই কথাটা বলেছিল—আপনারা থাকতে আজও আমার বিয়ে হলো না, এটা কী ব্যাপার

ছোটকাকা ?

রাজেনবাবুর জ্ঞাতি-ভাই মাধব রায়ের ছেলে প্রশান্ত। কলকাতার অ্যাডভোকেট রাজেনবাবুরও ঝরিয়ায় প্রায় দশটা কোলিয়ারির শেয়ার আছে। মাধব রায় আজ আর নেই ; মাধবের স্ত্রী শান্তিলতাও নেই। বাপের এক ছেলে প্রশান্ত আজ এত সম্পত্তির স্বত্ব নিয়েও, বয়সে আর শিক্ষায় এত যোগ্য হয়েও হীরাপুরের ওই সুন্দর প্রকাণ্ড বাড়িতে নিতান্ত একলা হয়ে পড়ে আছে, এটা রাজেনবাবুর জানা ছিল না। মাধব রায় মারা যাবার পর এই সাত বছরের মধ্যেও প্রশান্ত রায়ের জীবনের কোন খবর জানতে পারেননি রাজেনবাবু। জানবার তেমন কোন দায়িত্বও ছিল না। খুবই দূর-সম্পর্কের ; নিতান্ত জ্ঞাতিভাই সম্পর্কের মাধব রায়ের সঙ্গে আট বছর আগে আসানসোলের স্টেশনে একবার দেখা হয়েছিল, জানা-শোনার ইতিহাস সেখানেই শেষ।

বলেছিল প্রশান্ত—আমাকে দেখে আপনি যা মনে করছেন, আমি কিন্তু তা নই, ছোটকাকা। আমি সাহেবী মেজাজের মানুষ নই, নিজেকে একটা কোলকিং বলেও মনে করি না।

রাজেনবাবু হাসেন—সে তো খুব ভাল কথা।

প্রশান্ত—হ্যাঁ ছোটকাকা ; এমন কি বি-এ এম-এ পাশ-টাশের ওপরেও আমার কোন শ্রদ্ধা নেই।

রাজেনবাবু—কিন্তু তাই বলে তো তুমি নিতান্ত স্কুলে-পড়া একটা যেমন-তেমন মেয়েকে বিয়ে করতে পারবে না। অথচ···

প্রশান্ত—খুব পারি। আমার ইচ্ছাও তাই।

রাজেনবাবু—কিন্তু খুব গরীবঘরের মেয়ে হলে তো চলবে না।

প্রশান্ত—খুব চলবে।

শুনে একটু আশ্চর্য হয়েছিলেন রাজেনবাবু—আমি সত্যিই তোমাকে দেখে বুঝতে পারিনি প্রশান্ত, সত্যিই যে তুমি একটা লিবারাল মন নিয়ে···

বাধা দেয় প্রশান্ত—লিবারাল নয় ছোটকাকা ; বলুন, খাঁটি অর্থোডক্স মন।

রাজেনবাবু—হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই না হয় হলো। সেটাও তো বেশ একটু আশ্চর্যের ব্যাপার।

রাজেনবাবুর স্ত্রী মহামায়া খুব খুশি হয়ে তখনই চেঁচিয়ে উঠেছিলেন—তবে তো অরুণার সঙ্গেই তোমার বিয়ে হতে পারে।

প্রশান্ত—নিশ্চয় হতে পারে, আমার কোন আপত্তি নেই, ছোটকাকিমা।

ছোটকাকিমার কাছেই সব শুনতে পেল প্রশান্ত। গরীবের মেয়ে অরুণা। বিদ্যে ক্লাস নাইন পর্যন্ত। কোনরকম স্টাইল ফাইল জানেও না, বোঝেও না। তার উপর যেমন মুখচোরা, তেমনই লাজুক। অরুণার মা সুনন্দা যখন অকারণে, একেবারে মিছিমিছি, এই এত-লাজুক মেয়েটাকেও বেহায়া বলে ধমক দেয়, তখনও ওই মেয়ে শুধু চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে আর চোখ মোছে। দুঃখকষ্ট কত

হাসিমুখে সহ্য করতে পারে মেয়েটা। পুজোর সময় নিজেই হেসে হেসে হিতেশকে বলে—আমার জন্য শাড়ি কেনবার কোন দরকার নেই বাবা। শুধু মণ্টু আর ছায়ার শাড়ি হলেই হবে।

সত্যিই তো, একটা বাইশ বছর বয়সের মেয়ে, দেখতে এত ভাল, সেই মেয়ে একটা ছাপা শাড়ির তিনটে ছেঁড়া শেলাই করে আর সেই শাড়ি পরেই বিজয়া দশমীর দিনে জেঠাইমা মহামায়াকে প্রণাম করতে আসে। দুঃখকষ্ট সহ্য করবার অদ্ভুত শক্তিও আছে এই মেয়ের মনে। তা না হলে···

মহামায়া বলেন—তুমি যদি সত্যিই রাজী থাক প্রশান্ত, তবে আমি চেষ্টা করে এই ফাল্গুন মাসেই ··

প্রশান্ত বলে—তাই করুন, ছোটকাকিমা।

হিতেশবাবু আর তাঁর স্ত্রী সুনন্দা তো বিশ্বাসই করতে পারেননি, বরং একটা সন্দেহ করে মনে মনে বেশ কষ্ট পেয়েছিলেন, ঠাট্টা করছেন মায়াদি।

মহামায়া রাগ করে বলেছিলেন—এই তো তোমাদের দোষ। তোমরা একটা সৌভাগ্যকে চোখে দেখেও বিশ্বাস করতে পার না, এমনই তোমাদের মনের ছিরি।

এই ভর্ৎসনা যেন মোতিঝিলের ওই ক্ষুদ্র বাড়িটার অবিশ্বাসে ভরা একটা ক্ষুদ্র জীবনের উপর একটা ধিক্কার। চমকে উঠলেন হিতেশবাবু, চমকে উঠলেন সুনন্দা। বিশ্বাসও করলেন, কারণ প্রশান্তের লেখা একটা চিঠিকে দুজনের চোখের সামনে রেখে সব কথা পড়ে শোনালেন মহামায়া—আমি তৈরী হয়েই আছি, ছোটকাকিমা। আপনি শুধু দিনটা আমাকে জানিয়ে দিন।···না, ফটো চাই না! নিজের চোখেই যখন দেখেছি, তখন আর ফটোর দরকার কি?

চুপ চুপ চুপ। হিতেশবাবু আর সুনন্দা, দুজনেই এই সৌভাগ্যের বার্তাটিকে সবরকম মুখরতার ভয় থেকে গোপন করে রাখবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। যেন কেউ জানতে না পায়; এমন কি এত কাছের ওই সরকার বাড়ির গিন্নীও জানতে না পারেন, যদিও তিনি অরুণাকে খুবই ভালবাসেন। অরুণার বিয়ের জন্যেও খুব চিন্তা করেন। এই সেদিনও এসে বলে গিয়েছেন, তোমরা রাজী হও তো বল। আমার মনে হয়, বিনয়ও রাজী আছে।

এটা কিন্তু একেবারে অজানিত একটা নতুন কথা বলেননি সরকার-গিন্নী। হিতেশবাবু আর সুনন্দা, দুজনের কারও বুঝতে বাকি নেই যে, বিনয় রাজী আছে। কিন্তু ··ভাবতে সত্যিই একটু খারাপ লাগে, অরুণা কি এমনই একটা অপাত্রী মেয়ে যে বিনয়ের মত একজন স্কুল-মাস্টার ছাড়া আর কেউ ওকে আপন করে নেবার মত একটা মেয়ে বলে মনে করতে পারবে না? কিন্তু সত্যিই যে পাওয়া গেল না। কত চেষ্টা করা হলো, কত সন্ধান নেওয়া হলো, কত লেখালেখি আর যাওয়া-আসা করা হলো, কিন্তু শুধু মেয়ের সুন্দর মুখ দেখে খুশি হয়ে, আর কোন রকম দাবি-দাওয়া না করে বিয়ে করতে রাজী হয়ে যাবে, এমন

একটি পাত্রও পাওয়া গেল না। হ্যাঁ, মাঝে মাঝে রাজী হবার মত পাত্রের সন্ধান পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তারা কি সত্যিই পাত্র? গরীবের মেয়ে বলেই কি অরুণাকে ওই অদ্ভুত চেহারার বিপত্নীক ভদ্রলোক নরেশ মজুমদারের মত একজন সাব-ওভারশিয়ারের স্ত্রী হতে হবে? তার তুলনায় বিনয় মন্দ কিসের?···প্রশ্নটা হলো বিনয়ের চেয়ে ভাল পাত্র পাওয়া কি একেবারেই অসম্ভব?

বিনয় তো আছেই। এ সত্য জানেন হিতেশবাবু, জানেন সুনন্দা। বিনয় এ-বাড়িতে প্রায়ই আসে। অরুণার সঙ্গে মাঝে মাঝে কথাও বলে বিনয়, যদিও মণ্টু আর ছায়ার সঙ্গে স্কুলের গল্পই বেশি করে বলে আর হাসে বিনয়। এ-বাড়ির সঙ্গে বিনয়ের একটা কুটুম্বিতার সম্পর্কও আছে। বিনয় হলো সুনন্দার এক জেঠতুতো দাদার শালার ছেলে। বিধবা চারুদির বড় ছেলে। চারুদির আর তিনটে ছেলে বয়সে এখনও বেশ ছোট। সরকার-গিন্নীই বলেছেন, বিনয়ের মা চারুদি একবার তাঁর কাছে পঞ্চাশটা টাকা ধার নিয়ে গিয়েছেন। ছেলের পরীক্ষার ফী জমা দিতে হবে, কিছু টাকার দরকার হয়েছিল চারুদির। বিনয়ের যা রোজগার, তাতে তো সব দিকের দাবি মিটতে পারে না, ধার করতেই হয়।

নিজের কানেই শুনেছেন সুনন্দা, একদিন এখানে এসে অরুণাকে চোখে পড়তেই চেঁচিয়ে হেসে উঠেছিল বিনয়—কী? তুমি হঠাৎ এত রোগা হয়ে গেলে কেন?

অরুণা—বাঃ, খুব বললেন! সাবিত্রী এই মাত্র বলে গেল, আমি এই এক মাসের মধ্যে কী ভয়ানক মুটিয়ে উঠেছি। আর আপনি বলছেন···

না, এর চেয়ে বেশি কোন কথা, কিংবা এ-ধরনের ছাড়া অন্য কোন ধরনের কথা বলে না বিনয়। কিন্তু একদিন, সেদিন যখন সরকার বাবুদের বাগানে পুজোর বোধনের ঢাক আর কাঁসর বেশ মত্ত হয়ে বাজতে শুরু করেছে, তখন এ-বাড়ির সামনের রাস্তার এদিকে বিনয় আর অরুণা দু'জনে পাশাপাশি দাঁড়িয়েছিল। বিনয় তাকিয়েছিল সরকার বাবুদের বাগানের আমগাছের দিকে আর অরুণা তাকিয়েছিল অন্যদিকে, সন্তদের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকা একটা রিক্সার দিকে। বুঝতে পেরেছিলেন সুনন্দা, ওরা শুধু কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে। কেউ কোন কথা বলছে না। কিন্তু, কী আশ্চর্য, এ-রকম পনেরো-বিশ মিনিট ধরে দুজনে কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থেকে কেউ একটা কথাও বলে না, কেউ কারও মুখের দিকে তাকায়ও না। এ কী ব্যাপার! অরুণা কি তবে শুনতে পেয়েছে, সরকার-গিন্নী এসে বিনয়ের নাম ধরে যে সব কথা বলেন? শুনে বোধহয় খুশি হয়নি মেয়েটা! অরুণার মনের ভিতর বোধহয় একটা অভিমান মুখভার করে রয়েছে, বিনয় ছাড়া কি আর-কোন আর একটু ভাল পাত্র নেই?

বিয়ের দিনেও পাড়ার মানুষ বুঝতে পারেনি, কার সঙ্গে অরুণার বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের সাত দিন পরে অনেক খবর শুনেও পাড়ার মানুষ বিশ্বাস করতে পারেনি যে, সত্যিই এমন অঘটনও ঘটতে পারে। কিন্তু এক মাস পরে নিত্য-

বাবু যেদিন ধানবাদ থেকে ফিরে এসে সরকার বাবুদের বাড়ির বৈঠকে তাঁর চোখে দেখা অভিজ্ঞতার রিপোর্ট দিলেন, সেদিন পাড়ার মানুষেরা শুনে আশ্চর্য হয়ে গেল, সত্যিই রূপকথা ; এক রাজার কুমার এসে এক বনবালা মেয়েকে বিয়ে করে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়েছে।

বনবালার দুই চোখ কিন্তু তার ওই বুনোঘরের দুয়ার পার হয়ে গাড়িতে চড়বার সময় কান্নার জলে ভেসে গিয়েছিল। কাঁদবেই তো ; শকুন্তলাও কেঁদেছিল। হোক বরের বাড়ি রাজপ্রাসাদ, কিন্তু বাপের বাড়ির ভাঙা বেড়াটির মায়াও যে তার চেয়ে অনেক মিষ্টি। গাড়ির কাছেই দাঁড়িয়ে বিনয় কিন্তু হেসে উঠেছিল— এ কী ? কান্নাটান্না আবার কেন ? কোন মানে হয় না।

হেসে ফেলে অরুণা ! রুমাল দিয়ে চোখদুটো মুছে নিয়েই সবার দিকে তাকায়।

হিতেশবাবু হাসেন—পাগলা মেয়ে। সুনন্দা হাসেন—বোকা মেয়ে। অরুণাকে নিয়ে চলে যাবার আগে গাড়িটাও যেন হর্ন বাজিয়ে হেসে উঠল !

দুই

আজকাল হীরাপুরের বাড়িতে লনের সবুজ ঘাসের উপর লালরঙা বেতের চেয়ারে চুপ করে বসে থাকে যে অরুণা, সে অরুণা কিন্তু সেদিন, যেদিন প্রথম এই বাড়িতে এসে উঠেছিল, দোতলার ঘরে এই জানালার কাছে প্রশান্তর পাশে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিল। দূরের পাহাড়ের আর আকাশের দিকেও তাকিয়েছিল। আর, তার চেয়ে বেশি, বার বার অনেক বার প্রশান্তর মুখের দিকে তাকিয়ে হেসেছিল। অরুণার মুখের সেই হাসি, সত্যি একটি সুখী শোভার হাসি। আশ্চর্য হয়ে-যাওয়া একটা তৃপ্তির হাসি। এই মানুষটি, প্রশান্ত যার নাম, সে আজ অরুণার স্বামী ; ভাবতে গিয়ে অরুণার শুধু বার বার একটি কথাই মনে হয়েছিল, ঠিক কথা, ছায়া যে-গানটা খুব মিষ্টি করে গাইতে পারে, সেটা খুবই সত্যি কথার একটা গান। ছেঁড়া আঁচল ভরে দিলে এমন দানে দানে। ভাগ্য যাকে ভালবাসে, তাকে ঠিক এই রকমের উপহার দেয়।

—সামনে ওটা কাদের বাড়ি ? অরুণার প্রশ্ন শুনে সামনের বাড়িটার দিকে তাকায় প্রশান্ত। জবাবও দেয়—ওটা ইঞ্জিনিয়র মুখার্জীবাবুর বাড়ি।

অরুণা—ওই যে বারান্দায় একেবারে ওদিকে চুপ করে বসে আছেন ভদ্রলোক, উনিই কি···

প্রশান্ত—হ্যাঁ, উনিই মুখার্জী।

অরুণা—কিন্তু···

প্রশান্ত—কি ?

অরুণা—ভদ্রলোক ওরকম ভাবে রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছেন কেন ? কী দেখছেন ভদ্রলোক ?

হেসে ফেলে প্রশান্ত—এখনও দেখতে পাচ্ছেন না। কিন্তু এইবার দেখতে

পাবেন। সময় হয়ে এল।…হ্যাঁ, ওই যে, এসেই গিয়েছে।

এসেছে একটা ট্যাক্সি। সড়কের ধুলো উড়িয়ে আর ছুটে এসে ট্যাক্সিটা ঠিক মুখার্জীর বাড়ির ফটকের সামনে এসে থেমে যায় আর হর্ন বাজায়। ট্যাক্সির ভিতরে বসা এক ভদ্রলোক ব্যস্তভাবে বার বার তাঁর হাত-ঘড়িটার দিকে তাকাতে থাকেন।

মুখার্জীর সেই বাড়ির একটি ঘরের পর্দা সরিয়ে বাইরে বের হয়ে এলেন এক মহিলা।

প্রশান্ত বলে—ইনি ওই মুখার্জীর স্ত্রী, শ্রীযুক্তা লতিকা মুখোপাধ্যায়।

অরুণা যেন অদ্ভুত এক খুশির আবেগে ছটফট করে হাসে।—ঠিক আমাদের পাটনার সরযূ দিদিমণির মতো, ঠিক সেইরকম টানা-টানা চোখ। কিন্তু

অরুণার মুখের সেই ছটফটে হাসিটা হঠাৎ করুণ হয়ে যায়। কিন্তু এই লতিকাদির মুখটা এত গম্ভীর কেন? আর চোখ দুটোই বা ওরকম করে দপদপে বাতির আলোর মতো হঠাৎ এক একবার জ্বলে উঠছে কেন?

আধ-ময়লা একটা হলদে রঙের ধনেখালি পরেছেন লতিকাদি, আঁচলটার এক জায়গাতে মস্ত বড় একটা ছেঁড়া। কী আশ্চর্য, এলোমেলো করে একটা খোঁপাও বাঁধেননি লতিকাদি, চুলের রাশ ঘাড়ে-পিঠে ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে। যেন একটা ঝড়ের শব্দ শুনে ব্যস্ত হয়ে ঘরের বাইরে ছুটে এসেছেন। যেমন গলাটা, তেমনই হাত দুটোও একেবারে খালি। হাতে সামান্য ছোট্ট একটা ব্যাগও নেই। যেন ইচ্ছে করে অদ্ভুত এক শূন্যতার মূর্তি হয়ে কোথাও চলে যাচ্ছেন লতিকাদি।

ঠিকই, মুখার্জীর বাড়ির ফটক পার হয়ে আর সড়কের উপরে উঠেই গাড়ির দিকে তাকালেন লতিকা। গাড়ির ভিতরে বসে থাকা ভদ্রলোকের দিকে চোখ পড়তেই লতিকার জ্বালাভরা চোখ দুটো একেবারে স্নিগ্ধ হয়ে হেসে উঠল। তার পর আর এক মুহূর্তও দেরি করলেন না লতিকা! গাড়িতে উঠলেন। ছুটে চলে গেল গাড়ি।

প্রশান্ত হাসে—কিছু বুঝতে পারলে, অরুণা?

অরুণা—না।

প্রশান্ত—কিন্তু একটু আশ্চর্য হয়েছ বোধহয়?

অরুণা—হ্যাঁ। যাবার সময় মুখার্জীবাবুর সঙ্গে একটা কথাও বললেন না লতিকাদি। একবার মুখার্জীবাবুর দিকে তাকিয়েও দেখলেন না। এ কী অদ্ভুত কাণ্ড।

প্রশান্ত—অদ্ভুত নয়। যা হবার ছিল, যা হওয়া উচিত ছিল, তাই হয়েছে।

ভয় পেয়ে চমকে ওঠে অরুণা—কী হয়েছে?

প্রশান্ত—এই লতিকা আর এই বাড়িতে ফিরে আসবেন না।

অরুণা—তার মানে?

প্রশান্ত—তার মানে, ওই লতিকাদেবী আর এই মুখার্জীবাবুর কাছে ফিরে

আসবেন না।

অরুণা—কিন্তু মুখার্জীবাবু যে লতিকাদির স্বামী। লতিকাদি আর ফিরে আসবেন না কেন?

প্রশান্ত—এমন স্বামীর কাছে কোন স্ত্রীর ফিরে না আসাই ভাল।

অরুণা—মুখার্জীবাবু কি খুব খারাপ রকমের মানুষ?

প্রশান্ত—নিশ্চয়। ভদ্রলোকের একটা কুৎসিত রোগ আছে। অনেক দিনের রোগ।

অরুণা—কুষ্ঠরোগ?

প্রশান্ত—প্রায় ওই রকমেরই। কাজেই লতিকারও যা করা উচিত ছিল, তাই…।

চেঁচিয়ে ওঠে অরুণা—ছি-ছি, লতিকাদির একটুও উচিত হয়নি। স্বামীর একটা ব্যাধি আছে বলেই তাকে ছেড়ে চলে যাবে স্ত্রী, বাঃ, একেবারে একটা ইয়ে, মেয়েমানুষের প্রাণ নয়।

প্রশান্তর চোখ-মুখ অদ্ভুত এক খুশির উচ্ছ্বাসে হেসে ওঠে।—সবাই তোমার মত প্রাণের মেয়ে নয়।

প্রশান্তর মুখের দিকে তাকিয়ে অরুণার চোখের চাহনি আরও নিবিড় হয়ে যায়। প্রশান্তর গা ঘেঁষে দাঁড়ায় অরুণা।

প্রশান্ত বলে—সেই জন্যেই তো তোমার মতো মেয়েকে বিয়ে করেছি।

মোতিঝিলের সামান্য কেরানীর মেয়ে অরুণার ভাগ্যটাকে যেন প্রশস্তির ভাষা শুনিয়ে হীরাপুরের আকাশ হাসছে! প্রশান্তর হাত ধরে অরুণা। আর ভাবতে গিয়ে আশ্চর্যও হয়, সত্যিই তো, এই হাত ধরতে একটুও ভয় করে না। কত ভালও লাগে। অথচ, বিয়ের আগে আবোল-তাবোল কত কী ছাই বাজে কথা ভেবে মনটা কত ভয়ই না পেয়েছিল।

প্রশান্ত—বলে আমি মুখার্জির মতো একটা বেকুব মানুষ নই, অরুণা। আমি জানি কোন ধরনের মেয়ে স্বামীর ঘরে থাকতে ভালবাসে। বেশি বুদ্ধির মেয়ের সঙ্গে কথা বলা চলে, কিন্তু ঘর করা চলে না। মুখার্জী ওই এম-এ পাস করা ভয়ানক ইনটেলিজেন্ট মেয়ে লতিকাকে বিয়ে করেই ভুল করেছে। তা না হলে… আনমনার মতো কি যেন ভাবছ তুমি?

অরুণা—ভাবছি, লতিকাদি কতদিন আর ফিরে না এসে থাকতে পারবে?

হেসে ফেলে প্রশান্ত—চিরদিন। ওই যে গাড়ির ভিতরে বসেছিলেন এক ভদ্রলোক, মণিভূষণ যার নাম, যে লোকটা রেলওয়ের একটা গার্ড মাত্র, সে লোকটাই যে লতিকার…

অরুণা—ছি-ছি!

প্রশান্ত—ছি-ছি করবার মানে হয় না। ওই গার্ড লোকটা লতিকার জীবনের এককালের একটি বেশ ভাল রকমের চেনা মানুষ। কিন্তু কী অদ্ভুত ব্যাপার…

অরুণা—কি ?

প্রশান্ত—মুখার্জীর সঙ্গে বিয়ের পাঁচ বছর পরে লতিকা আজ ঠিক সেই পুরনো প্রাণের বন্ধুটিকেই ডাক দিয়ে···

অরুণা রাগ করে—থাম তুমি।

প্রশান্ত—বিশ্বাস কর। লতিকা নিজেই চিঠি দিয়ে মণিভূষণকে ডেকেছে। তাই সে এসেছে। লোকটার প্রাণও যেন এই পাঁচ বছর ধরে উপোসী বাঘের মতো চুপ করে আড়ালে ওৎ-পেতে বসেছিল। লতিকার সাড়া পেয়ে এক লাফে বের হয়ে এসেছে।

অরুণা—কিন্তু···

প্রশান্ত—না না, এর মধ্যে কোন কিন্তু-টিন্তু নেই, আমি সব খবর জানি। আর একটা বছর পরে কী ব্যাপার হবে, তাও জানি।

অরুণা চমকে ওঠে—অ্যাঁ ? কি বললে, কি ব্যাপার হবে ?

প্রশান্ত—মণিভূষণের সঙ্গে লতিকার বিয়ে হবে।

—এমন বিয়ে বিয়েই নয়। বলতে গিয়ে ঝিক্ করে জলে ওঠে অরুণার চোখের তারা। এই রকম একটা বিশ্রী ঘেন্নার গল্প না শুনলেই ভাল ছিল। লতিকাদির গায়ের ওই হলদে রঙের ধনেখালি শাড়িটা যেন একটা বিশ্রী ময়লা প্রাণের সাজ। চোখে না দেখতে পেলেই ভাল ছিল।

প্রশান্ত বলে—আচ্ছা, আমি এখন একটু ঘুরে আসি।

অরুণা হাসে—এখনই যাবে ?

প্রশান্ত—হ্যাঁ।

অরুণা—আমি যাব না ?

প্রশান্ত আশ্চর্য হয়—তুমি ? তুমি কোথায় যাবে ?

অরুণা—তোমার সঙ্গে।

প্রশান্ত—আমি তো এখন বীরপুর কোলিয়ারির ক্লাবে যাব। ফিরতে একটু রাত হয়েও যেতে পারে।

অরুণা—কাজ আছে ?

প্রশান্ত হাসে—আছে বইকি। টেবিল-টেনিস খেলাটাও আমার একটা কাজ।

অরুণা হাসতে চেষ্টা করে—কিন্তু আমি ততক্ষণ একা-একা কী করবো বল ?

প্রশান্ত—গান কর।

অরুণা—আমি গান জানি না।

—বই পড়।

—বই পড়তে আমার ভাল লাগে না। তা ছাড়া, তোমার ওই সব ইংরেজী বই পড়ে আমি কিছু বুঝবোও না।

অরুণার মাথা দু'হাতে জড়িয়ে ধরে কথা বলে প্রশান্ত—তবে আরও সুন্দর করে সেজে লনের উপর একটি চেয়ার পেতে বসে থাক। লনের সবুজ ঘাসের

উপর তোমাকে সত্যিই একটি জীবন্ত রঙীন গোলাপ বলে মনে হবে। ঠিক ওই রকম, ওই দেখ।

ঘরের দেয়ালের গায়ে একটি ছবিকে দেখিয়ে দেয় প্রশান্ত। একটি গোলাপের ছবি; গোলাপের রূপ যেন এক তরুণী নারীর মুখশোভার ছবি হয়ে ফুটে রয়েছে।

প্রশান্ত বলে—রোমে থাকবার সময় ওই ছবিটা আমি অনেক টাকা দিয়ে কিনেছিলাম।

হীরাপুরের বাড়ির জীবনের এই প্রথম দিনের যে বিস্ময় মোতিঝিলের মেয়ে অরুণার দুই চোখের উপর ছড়িয়ে পড়েছিল, সে বিস্ময় আজও একটুও নিষ্প্রভ হয়ে যায়নি, যদিও একটানা পুরো একটা বছর পার হয়ে গিয়েছে। এরই মধ্যে তিনবার ধানবাদে এসেছেন মোতিঝিলের নিত্যবাবু, আর নিজের চোখেই দেখে গিয়েছেন, হিতেশবাবুর মেয়ে অরুণা সত্যিই এই চমৎকার ঐশ্বর্যের বাড়িতে সবুজ ঘাসের লনের উপর লালরঙা বেতের চেয়ারে বসে থাকে। বেশ শান্ত হাসি-হাসি মুখ।

অরুণার মুখের ওই শান্ত সুখী হাসি দেখতে পেয়ে সবচেয়ে খুশি হয়েছে যে, সে ওই অরুণারই স্বামী প্রশান্ত। অরুণার মনে ও প্রাণে যেন কোন প্রশ্ন নেই। প্রশান্তর মতো স্বামীকে আর প্রশ্ন করে জানবারই বা কি আছে? যতক্ষণ বাড়িতে থাকে প্রশান্ত, ততক্ষণ অরুণাও যেন একটা তৃপ্ত জীবনের শোভা! প্রশান্ত না ডাকলেও কাছে এসে দাঁড়ায় অরুণা। প্রশান্ত যখন অরুণার একটা হাত ধরে, অরুণা তখন তার অন্য হাতটিকেও প্রশান্তর হাতের কাছে এগিয়ে দেয়। অরুণার চোখে কোন অভিমান প্রখর হয়ে ওঠে না, যদি অনেক রাতে বাড়ি ফিরে আসে প্রশান্ত। বিকাল হতেই হঠাৎ যখন ব্যস্ত হয়ে বাইরে যাবার সাজ পরতে থাকে প্রশান্ত, তখনও অরুণা আর জিজ্ঞাসা করে না, কোথায় যাবে?

হয়তো কোনদিন, যেদিন খুব বেশি ব্যস্ত হয়ে, প্রায় দৌড়ে দৌড়ে গ্যারেজের দিকে ছুটে যায় প্রশান্ত, সেন্টের শিশিটা হাতে নিয়ে ব্যস্তভাবে বাইরে আসে। ডাক দেয়—তোমার রুমালটা দাও একবার।

থমকে দাঁড়ায়, ফিরে এসে অরুণার হাতের কাছে পকেটের রুমালটাকে এগিয়ে দেয় প্রশান্ত। কিন্তু হেসে ফেলে প্রশান্ত, আর বলেও ফেলে—তুমি এরকম দুষ্টুমি করো না, অরুণা।

অরুণা—কি করলাম?

প্রশান্ত হাসে—আমি কিন্তু খুব বোকামানুষ নই, অরুণা। সব বুঝতে পারি।

আশ্চর্য হয় অরুণা—কি বুঝলে?

প্রশান্ত—তুমি আমার দেরি করিয়ে দিতে চাও।

এরপর আর কোন কথা বলে না অরুণা। বুঝতে পারে, ঠিকই বলেছে প্রশান্ত। অরুণা যে সত্যিই চায়, আরও কিছুক্ষণ বাড়িতে থাকুক প্রশান্ত। এই তো সবেমাত্র বিকেল হয়েছে। ফিরবে তো সেই, কে জানে কখন, হয়তো মাঝ-

রাতও পার হয়ে যাবার পর।

এক-একদিন বাইরে বের হয়ে যাবার আগে অরুণাকে একটা অনুরোধের কথা বলে যায় প্রশান্ত।—তুমিও বাইরে একটু-আধটু বেড়িয়ে এলে ভাল করতে অরুণা। ড্রাইভার রামকুমারকে বলো, যেন নতুন টুরারটা বের করে আর তোমাকে এদিক-ওদিক বেড়িয়ে নিয়ে আসে।

হ্যাঁ, মাঝে মাঝে এক-একদিন রামকুমারকে ডাক দেয় অরুণা—চল, একবার ঘুরে আসি।

—কোথায় যাবেন ?

অরুণা—ভাল চা কোথায় পাওয়া যাবে ?

—ভবানী স্টোরে পাবেন।

শুধু মার্কেটের ভবানী স্টোরে নয়, এক-একদিন অনেক দূরে, গোবিন্দপুর পার হয়ে রায়গঞ্জ পর্যন্ত চলে গিয়েছে অরুণা। পরেশনাথের মাথার উপর বিকালের লালচে রোদের আভা কালো হয়ে ওঠবার আগেই হীরাপুরে ফিরে এসেছে।

এই হীরাপুরের এই বাড়ির নিকটের কোন বাড়ি থেকে, কিংবা কোন দূরের বাড়ি থেকে কোনদিন কেউ প্রশান্ত রায়ের স্ত্রী অরুণাকে একবার চোখে দেখে যাবার জন্যেও এল না ; এটা নিশ্চয় খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার। হীরাপুরে কি অরুণার মায়ের বয়সী কোন মহিলাও নেই ? মোতিঝিলের সরকার-গিন্নীর মতো কোন প্রৌঢ়া নেই ? অরুণার মতো বাইশ-তেইশ বছর বয়সের কোন মেয়েও নেই ? নিশ্চয় আছে। তবু কেউ আসে না। আরও আশ্চর্যের কথা, সেজন্য অরুণা যেন একটুও আশ্চর্য বোধ করে না। কোনদিনও সামান্য একটু সন্দেহ নিয়ে প্রশান্তকে জিজ্ঞাসাও করে না, নয়নবাবুর মেয়েরা এই সড়ক দিয়ে যেতে যেতে এ-বাড়ির জানালার দিকে বার বার তাকায়, তবু একবারও আসে না কেন ?

প্রশান্ত কিন্তু অরুণার এই শান্ত প্রসন্ন ও প্রশ্নহীন উদাস মনটাকে বুঝতে পেরে খুশি হয়েছে। প্রশান্ত নিজেই হেসে হেসে বলে—আমি যা আশা করেছিলাম অরুণা, তোমার কাছ থেকে ঠিক তাই পেয়েছি।

অরুণার দুই চোখের শান্ত হাসি-হাসি আভা যেন আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। প্রশান্ত বলে—আজ বাদে কাল, কাল বাদে পরশু, তার পরের দিনটা কিন্তু তোমাকে একটু বেশি একলা হয়ে থাকতে হবে। কাপুর সাহেবের ফ্যামিলির সঙ্গে একদিনের জন্য বেড়াতে বের হব। রাত্রিটাও বাইরে কেটে যাবে। কম দূর নয় তো, সূর্যকুণ্ড। চমৎকার হট-স্প্রিং, কাছেই বেশ নিরিবিলি একটা ডাকবাংলো আছে।

ঠিকই, ঠিক পরশুদিনের পরের দিন, সকালবেলার রোদ যখন পামের মাথায় শিশির-ভেজা পাতার উপর পড়ে ঝিকমিক করে, তখন চটপট সাজ সেরে নিয়ে বের হয় প্রশান্ত, আর দেখতে পেয়ে বেশ একটু আশ্চর্য হয়, খুশিও হয় প্রশান্ত,

এই সকালেই কী সুন্দর সাজ করে, আর চোখে-মুখে অদ্ভুত একটা ঝিকমিকে হাসি ফুটিয়ে বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে অরুণা। রোজ যেমন, আজও তেমন, প্রশান্তের বাইরে বের হয়ে যাবার সময়টা যেন অরুণার প্রাত্যহিক জীবনের একটা উৎসবের লগ্ন। ঠিক এই সময়ে সবচেয়ে সুন্দর সাজ করে অরুণা। মোতিঝিলের কেরানী হিতেশবাবুর মেয়ে বটে, কিন্তু সাজ করবার কাজে এই মেয়েই যেন ঝিকমিকিয়ে রূপ ফুটিয়ে তোলবার একটি পাকা আর্টিস্ট।

না, কোন প্রশ্ন করবার জন্যে নয়, বাধা দেবার জন্যে নয়, অরুণা শুধু দাঁড়িয়ে থাকবার জন্যেই এ রকম চমৎকার একটি মূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

—চলি তবে। বলতে বলতে অরুণাকে পাশ কাটিয়ে চলে যায় প্রশান্ত। অরুণা তেমনই শান্ত ও অবিচলিত একটি মূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

মোতিঝিলের চিঠি আসে।—কবে আসবে? প্রশান্তকে একটু বুঝিয়ে বল, যেন তোমাকে অন্তত এক মাসের জন্য মোতিঝিলে থাকতে দিতে রাজী হয়। তোমার চিঠি পেলেই তোমাকে আনবার জন্য কাউকে পাঠিয়ে দেব।

জবাব দেয় অরুণা—যাবই তো, কিন্তু তোমরা এত তাড়াহুড়ো করো না।

তিন

মোতিঝিলের নিত্যবাবু আরও একবার ধানবাদে এসেছিলেন। হীরাপুরের এই বাড়ির সবুজ ঘাসের লনের দিকে একবার তাকিয়েও গিয়েছেন। কিন্তু এইবার তিনি অরুণাকে দেখতে পাননি। লনের উপর লাল-রঙা বেতের চেয়ার ছিল না, আর হিতেশ কেরানীর মেয়ে অরুণাও লনের এদিকে বা ওদিকে কোথাও ছিল না। দোতলার জানালার পর্দাটা হাওয়া লেগে ফুলে ফাঁক হয়ে রয়েছে। কিন্তু শুধু জানালাটাকে দেখে গিয়েছেন নিত্যবাবু, অরুণাকে দেখতে পাননি।

দেখতে না পাওয়ারই কথা। নিত্যবাবু জানেন না যে, অরুণা আজকাল ঘরের ভিতরে থাকে। ড্রাইভার রাজকুমার নতুন টুরার বের করে অনেকবার বলেছে, হাওয়া খেতে যাবেন নাকি মা? যায়নি অরুণা, বাইরে বেড়াতে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু, এতদিনের সেই অভ্যাসটাকে ছাড়তে পারেনি। প্রশান্ত যখন বাইরে বের হয়, ঠিক তখন, তার মানে ঠিক তার কিছুক্ষণ আগে, চমৎকার সাজ করে ও সুন্দর একটি রূপের মূর্তি হয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকে।

যাবার আগে অরুণাকে দেখতে পেয়ে প্রশান্তর চোখের বিস্ময় শুধু খুশি হয়, চমকে ওঠে না। আজ কিন্তু চমকে ওঠে প্রশান্ত। এ কী মূর্তি ধরেছে অরুণা! এ যে ঠিক একেবারে…

কথা বলতে গিয়ে প্রশান্তর গলার স্বরও যেন চমকে উঠে হেসে ফেলে।—এ কী অরুণা। তুমি হঠাৎ একেবারে নন্দা চৌধুরীর মতো ডবল বেণী দুলিয়ে দুই ভুরু আর চোখের পাতায় কালো পেন্ট করে…কী আশ্চর্য, তুমি কি ওই মহিলাকে কোনদিন দেখেছ?

অরুণা হাসে—দেখেছি। ভবানী স্টোরে চা কিনতে গিয়ে দেখেছি সেদিন। রাজকুমার বললে, ওই মিস সাহেব হলেন বীরপুর কোলিয়ারির সেই চৌধুরী সাহেবের মেয়ে।

চমকে ওঠবারই কথা। অরুণা যেন বর্ণে বর্ণে আর ছন্দে ছন্দে নন্দা চৌধুরীর সাজ আর প্রসাধনের নকল করেছে। খুব পাতলা শিফনের হালকা নীল রঙের শাড়ি পরে নন্দা। অরুণাও তাই পরেছে, আর ঠিক নন্দারই মতো শাড়ির আঁচলটা টেনে শক্ত করে কোমরের উপর এক পাক জড়িয়ে নিয়েছে।

কিন্তু অরুণার মুখের দিকে আর তাকায় না প্রশান্ত। হাতঘড়ির দিকে তাকায়। ব্যস্তভাবে চলেও যায়।

অরুণার এই ফ্যান্সি সাজ কি প্রশান্তর বাইরে যাবার পথ আটক করে প্রশান্তকে ঘরে ধরে রাখবার একটা করুণ আবেদন? না, তা মনে করে না প্রশান্ত। মনে করার কোন মানেও হয় না। কারণ দেখতেই পাচ্ছে প্রশান্ত, কত খুশি আর কত শান্ত হয়ে অরুণার চোখ মুখ হাসছে।

প্রশান্ত বলে—কিন্তু তোমার কি শুধু নন্দা চৌধুরীকেই চোখে পড়ল? পৃথিবীতে এত মেয়ে থাকতে তুমি বেছে বেছে শুধু নন্দার সাজটাই নকল করলে কেন?

অরুণা—নন্দা যে সত্যিই অদ্ভুত।

প্রশান্ত—তার মানে?

অরুণা—অদ্ভুত স্টাইল।

প্রশান্ত এইবার চেঁচিয়ে হেসে ওঠে!—তাই বল! তোমারও তাহলে অদ্ভুত স্টাইল করবার শখ হয়েছে।

আবার একদিন, সেদিন সকালবেলাতেই বের হয়ে যাবার জন্যে যখন সাজ সেরে নিয়ে উপরতলা থেকে নেমে আসে প্রশান্ত, তখন দেখতে পায়, বারান্দার উপর দাঁড়িয়ে আছে অরুণা। দুই চোখ টান করে আর একটু বেশি আশ্চর্য হয়ে অরুণার দিকে তাকিয়ে থাকে প্রশান্ত।—এ কী? তুমি কি কোনদিন ওই মহিলাকেও দেখেছ, আমাদের কাপুর সাহেবের শ্যালিকা সোহিনীকে?

অরুণা হাসে—হ্যাঁ রাজগঞ্জ থেকে বেড়িয়ে ফিরবার সময় দেখেছিলাম। টেনিস ব্যাট হাতে এক মহিলাকে দেখিয়ে দিয়ে রাজকুমার বললে, উনিই হলেন কাপুর সাহেবের আগের মেমসাহেবের বোন।

—তাই বল। প্রশান্তর মনের বিস্ময়টা এইবার যেন হাঁফ ছেড়ে কথা বলে।

সত্যিই আশ্চর্য না হয়ে পারে না প্রশান্ত। ঠিক সোহিনী কাপুরের মতো গোলাপীরঙের চোলি পরেছে অরুণা; মাথার উপর চুড়ো করে খোঁপা বেঁধেছে, আর বেশ টকটকে লাল স্টিক বুলিয়ে ঠোঁট দুটোকেও রঙীন করেছে।

প্রশান্ত হাসে—তুমি কিন্তু সত্যিই আর্টিস্ট। তা না হলে এত চমৎকার একটা নকল···সত্যিই তোমাকে এখন হঠাৎ দেখলে সোহিনী বলে ভুল হতে পারে।

অরুণার চোখের পাতা একটুও কাঁপে না। রঙীন ঠোঁটের হাসিটা একটুও বিচলিত হয় না। চুপ করে দাঁড়িয়ে শুধু দেখতে থাকে, গাড়ির সুইচের চাবি হাতে নিয়ে দোলাতে দোলাতে গ্যারেজের দিকে চলে গেল প্রশান্ত।

এইবার অরুণাও চলে যায়। বারান্দা থেকে সরে গিয়ে ঘরের ভিতরে, তার-পর সিঁড়ি ধরে উঠে উপরতলার একটি ঘরের জানালার কাছে, যে জানালার কাছে দাঁড়ালে হীরাপুরের আকাশটাকে খুব ভাল করে দেখা যায়।

না, আজ আর ইচ্ছে করলেও দূরের ওই পাহাড়তলীর কাছে গিয়ে মাঠের উপর দাঁড়িয়ে আর খোলা আকাশের বাতাস বুকে ভরে নিয়ে ফিরে আসা যাবে না। রাজকুমার নেই; কলকাতায় গিয়েছে ড্রাইভার রাজকুমার, সঙ্গে তার বউকেও নিয়ে গিয়েছে। রাজকুমারের খুড়ো মরেছে, খবর এসেছে।

কিন্তু কই, এখনও তো গাড়ির শব্দ শোনা গেল না। প্রশান্ত কি এখনও গ্যারেজ থেকে গাড়ি বের করেনি? গাড়ি বের করতে কি এক ঘণ্টারও বেশি সময় লাগে? আকাশের দিকে নয়, গ্যারেজের দিকে তাকায় অরুণা।

গ্যারেজের দরজা খোলা। তাই দেখা যায়, গাড়িটার সামনের কাঁচে বাইরের ঝাউয়ের ছোট্ট প্রতিচ্ছবি দুলছে। গ্যারেজের সামনে বা কাছে কেউ নেই। প্রশান্তও নেই।

হীরাপুরের এই বাড়ির আদুরে টেরিয়ার, যার নাম টমাস, সে-ই বা কোথায় গেল? কুকুরটা যে প্রশান্তরই সঙ্গী হয়ে রোজই একই গাড়িতে বাইরে বের হয়ে যায়। প্রশান্তর কাছ-ছাড়া হয়ে যে থাকতেই পারে না টেরিয়ার টমাস।

বাগানের একেবারে ওইদিকে যে দুটি ঘর, ড্রাইভার রাজকুমারের সপরিবারে থাকবার ঘর। ঘরের টালির চালা থেকে একগাদা লতা যেন ছেঁড়া পর্দার মোটা সুতোর মতো ঝুলছে। রাজকুমার ও তার বউ তো এখন কলকাতায়। কিন্তু ওই দুটি ঘরের কোন একটি ঘরে চামেলী নিশ্চয় আছে। রাজকুমারের বড় ভাইয়ের বেটি চামেলী। মেজর গুপ্তের বাড়িতে আয়ার কাজ করে চামেলী। আজ তো রবিবার। হ্যাঁ, সপ্তাহে এই একটি দিন চামেলীকে কাজে বের হতে হয় না। তাই প্রায় সারাটা দিন ঘরে থেকেই গুন্‌গুন করে গান গায়।...কিন্তু, ও কি! কী আশ্চর্য, কুকুর টমাস চুপ করে ওই ঘরের বারান্দার উপর বসে আছে!

হীরাপুরের বাড়ির ঝাউয়ের মাথায় আবার সকালবেলার রোদ হাসে। দুপুর-বেলার গরম বাতাসে আবার গোলাপের গায়ের বাষ্প গন্ধ ছড়ায়। বিকেলের আকাশে সাদা মেঘ ভেসে বেড়ায়। সন্ধ্যা হয়। দুটো-একটা জোনাকি উড়ে এসে লনের ঘাসের উপর বসে আর মিটমিট করে জ্বলে।

জানে না অরুণা কুকুর টমাস কখন ফিরে এসেছে, আর অরুণারই ঘরের ভিতরে ঢুকে লুটোপুটি করে একটা ভিজে রুমালকে মুখে তুলে নিয়ে চলে গিয়েছে। প্রশান্তও জানে না, অরুণা কতক্ষণ ধরে উপরতলার এই ঘরে বিছানার ওপর ওভাবে নিস্পন্দ-শরীর হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে আছে।

কিন্তু সন্ধ্যা হয় যখন, প্রশান্ত যখন বাইরে যাবার সাজে সেজে নিয়ে আর খুব ব্যস্ত হয়ে নীচের তলায় নামে, তখন হঠাৎ চমকে ওঠে আর থমকে দাঁড়ায়। বারান্দার উপর অরুণা দাঁড়িয়ে আছে। অরুণার চোখ দুটো যেন ধিকধিক আলোর মতো জ্বলে জ্বলে হাসছে।

চেঁচিয়ে ওঠে প্রশান্ত—একি ? তোমার আজ হঠাৎ একটা আয়ার মতো সাজ করবার শখ হল কেন ? কী ভেবেছ তুমি ? সত্যি করে বল।

আয়া চামেলী যেমন সাজ করে, ঠিক তেমনি সাজ। বেশ ঝলমলে রঙীন একটা সাটিনের শাড়ি পরেছে অরুণা। খোঁপাতে সাদা ফুলের মালা জড়িয়ে রয়েছে। গলাতে লাল-পাথরের একটা মালাও পরেছে। পাউডার ছিটিয়ে মুখটাকে একেবারে সাদা করে দিয়েছে অরুণা। আর, রেশমী জালির একটা ওড়নাকে এলোমেলো করে গায়ে জড়িয়ে রেখেছে।

প্রশান্ত—বলতেই হবে, তুমি আজ চামেলীর মতো সাজ আর চেহারা ধরলে কেন ? এটাও কি সত্যিই একটা শখ ?

অরুণা—ইচ্ছে।

প্রশান্ত—অদ্ভুত ইচ্ছে। যাক-গে, আমার এখন আর বেশি কথা বলবার সময় নেই। আমার বোধহয় আজ হ্যাঁ, আজ আর বাড়ি ফিরে আসা সম্ভব হবে না। কাপুর সাহেবের ফ্যামিলির সঙ্গে পিকনিকে যাচ্ছি। কম দূর নয় তো হুড্রু। ওই দেখ।

দেয়ালের গায়ে টাঙানো হুড্রু ঝর্ণার ছবিটাকে দেখিয়ে দেয় প্রশান্ত।—দেখছো ? সত্যিই খুব চমৎকার ঝর্ণা। নয় কি ?

হাতঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে নিয়েই ব্যস্তভাবে চলে যায় প্রশান্ত।

দুদিন পরে যখন হীরাপুরের বাড়িতে ফিরে এল প্রশান্ত, তখন মেঘে মেঘে বিকালের আকাশ ভরে গিয়েছে। এসে দেখতে পেয়েছে প্রশান্ত, একেবারে শান্ত ও নিশ্চিন্ত একটি প্রাণের ছবির মতো বিছানার ওপর ঘুমিয়ে পড়ে আছে অরুণা।

সন্ধ্যা হতেই সাজ সেরে নিয়ে আর গাড়ির সুইচের চাবিটাকে দোলাতে দোলাতে উপরতলা থেকে নীচে নেমে আসে প্রশান্ত।

চমকে ওঠে প্রশান্ত—এ কী, অরুণা ?

প্রশান্তর মুখের আর চোখের হাসি আজ সত্যিই যেন ভয়ানক একটা আশ্চর্যের পাথরের উপর আছাড় খেয়ে পড়েছে। কিন্তু হাসতে চেষ্টা করে প্রশান্ত।—কী ব্যাপার, অরুণা ? তুমি যে দেখছি, ঠিক সেই লতিকার মতো সাজ করেছো।

হ্যাঁ, ঠিক সেই লতিকাদির মতো আধময়লা একটা হলদে রঙের ধনেখালি পরেছে অরুণা। উসকো-খুসকো চুলের গোছা ঘাড়ে-পিঠে ছড়িয়ে পড়েছে। অরুণার চোখে ঠিক সেই লতিকার চোখের মতো একটা শান্ত দৃষ্টি। অরুণার

মুখে কোন হাসির ছায়া নেই।

প্রশান্ত হাসে—হ্যাঁ, নকলটা খুবই নিখুঁত হয়েছে, অরুণা। কিন্তু এত ভয়ানক গম্ভীর হবার দরকার ছিল না।

—কেন? হীরাপুরের জীবনে এই প্রথম অরুণার মুখের প্রশ্ন এত তীব্র স্বরে বেজে উঠে।

প্রশান্ত—আমি তো সত্যিই মুখার্জীর মতো একটা কুৎসিত ব্যাধির মানুষ নই। আমার ওপর রাগ করবার সাধ্যি তোমার নেই।

কথা বলে না অরুণা। চুপ করে ফটকের কাছে সড়কটার দিকে তাকিয়ে থাকে।

—কি? কথা বলছো না কেন? চেঁচিয়ে ওঠে প্রশান্ত।

জবাব দেয় না অরুণা। প্রশান্তর চোখের দৃষ্টিটা, সেই সঙ্গে মুখের ভাষাটাও যেন ছটফট করে। তুমি তো সত্যিই সেই লতিকার মতো···

একটা ট্যাক্সি ছুটে এসে ফটকের কাছে দাঁড়ায় আর হর্ণ বাজায়। চমকে ওঠে প্রশান্ত—এ কী? ঠিক সেইরকম একটা ট্যাক্সিও ছুটে এসেছে দেখছি।

ট্যাক্সির ভেতরে বসে আছেন এক ভদ্রলোক। ফটকের সামনেই ল্যাম্প পোস্ট, তাই আলোটা একেবারে ভদ্রলোকের মুখের ওপর পড়েছে।

হেসে উঠেছে অরুণার চোখ দুটোও, ওই আলো যেন অরুণার চোখের উপর পড়েছে।

আর এক মুহূর্তও দেরি করে না অরুণা। ফটকের সেই গাড়িটার দিকে চোখ রেখে এগিয়ে যেতে থাকে। চেঁচিয়ে ওঠে প্রশান্ত—তুমি কি সত্যিই ওই লোকটাকে, ওই বিনয়বাবুকে চিঠি দিয়েছিলে?

জবাব দেয় না অরুণা। প্রশান্ত আবার চেঁচিয়ে ওঠে—কী আশ্চর্য, লতিকার সেই মণিভূষণের মতো ওই বিনয়বাবুও কি তোমার পুরনো চেনা মানুষ? তুমিও কি তবে···

অরুণা জবাব দেয় না। প্রশান্তও শুধু চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে, গাড়িতে উঠে বসল অরুণা। বেশ জোরে হর্ণ বাজিয়ে আর হু হু করে ছুটে চলে গেল গাড়িটা।

সা ধ না মি ছি ল

সারা মন-প্রাণ যখন খুশি হয়ে বিপুল তৃপ্তির হাসি হাসছে, তখন যদি কোন কান্নার শব্দ শুনতে হয়, তবে একটু বিরক্ত না হয়ে পারা যায় না।

কালীচরণও বিরক্ত না হয়ে পারে না। বস্তির ভিতরে ঢুকতেই যেন অনেকগুলি গলার করুণ স্বরে মেশানো একটা করুণ সোরগোল কালীচরণের কান ছুঁয়ে ছুটে চলে গেল। আনমনার মতো হঠাৎ একবার থমকে দাঁড়ায় কালীচরণ। চোখ

দুটো বিরক্ত হয়ে কুঁচকে ওঠে। বুকের ভিতরে যখন একটা তুফানী খুশির সোর-গোল শুনে নিজের ভাগ্যটাকে বার বার বাহবা দিতে ইচ্ছে করছে, তখন বাইরের একটা কান্নার স্বর শুনলে মেজাজ খারাপ হবেই বা না কেন? মনে হয়, ঐ কান্না যেন কালীচরণের জীবনের এত বড একটা আহ্লাদের ঘটনাকে হিংসে করে আর মতলব করে এমন করুণ হয়ে বাজতে শুরু করেছে।

বুঝতে পারা যায়, দূরে যে মেটে ঘরটার দরজার কাছে অনেকগুলি ছোট ছোট আলো ছুটোছুটি করছে, সেখান থেকেই কান্নার ঐ শব্দটা ছুটে আসছে। কিন্তু ঐ ঘর যে পাইপ-মিস্তিরি রমেশের ঘর। কি হলো রমেশের? আজও তো সকালবেলা রমেশকে কাজে বের হতে দেখেছে কালীচরণ। যন্ত্রপাতির ভারে ভারী হয়ে একটা পুরনো চটের থলে রমেশের হাতে ঝুলছে; কে জানে কোন্ বাবুর বাড়িতে জলের কল মেরামত করতে হবে। রোগা শরীরটাকে হনহন করে হাঁটিয়ে নিয়ে সকালবেলা যখন রমেশের প্রায় গা ঘেঁষে চলে গেল কালীচরণ, তখনও তো রমেশকে দেখে অসুস্থ বলে মনে হয়নি।

রমেশই কি তাহলে চিরকালের মতো ছুটি নিল? না, তা তো মনে হয় না। কান্নার একটা শব্দকে যে রমেশেরই কান্নার স্বরের ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে। হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে ওরকম মিহি গলার কান্না রমেশ ছাড়া আর কারও হতে পারে না।

এগিয়ে যায় কালীচরণ। তারপর আর কোন সন্দেহ থাকে না। হ্যাঁ, রমেশেরই অদৃষ্ট কাঁদছে। রমেশের বউ মারা গিয়েছে। কাঁদছে রমেশের বডমেয়ে আরতিটা, কাঁদছে রমেশের ছোট ছোট ছেলেদুটো। মনে হয়, রমেশও এই কিছুক্ষণ আগে ঘরে ফিরেছে, কারণ যন্ত্রপাতির থলেটা রমেশের পাশেই মাটির উপর যেন মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। দুই হাতে কপাল চেপে মিহি গলার কান্না কেঁদে চলেছে রমেশ।

বস্তির মানুষের সংসারে একটা মৃত্যুর ঘটনা অভাবিত অথবা আশ্চর্যের কিছু নয়। এ-ধরনের করুণ কান্না মোটেই নতুন একটা কোন ব্যাপারও নয়। প্রতি-বেশীরা ছুটে এসেছে। কেউ-কেউ সান্ত্বনার কথা বলছে, এবং কেউ-কেউ এরই মধ্যে কাঁচা কাঠের একটা খাটিয়া দড়ির গোছা হাতে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে কালীচরণ। হয় তো আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েই থাকতো, কিন্তু দাঁড়াতে দিল না রমেশের বডমেয়ে আরতিটাই, মেয়েটা কালী-চরণের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে—ওগো কালীকাকা গো, মাকে তোমরা কোথায় নি··চললে গো! আমার যে আর দু'মাস পরে···।

আরতির কান্না হঠাৎ গুমরে উঠেই একেবারে নীরব হয়ে যায়। কি যেন বলতে গিয়ে হঠাৎ চুপ করে গেল আরতি।

আর দু'মাস পরে? কালীচরণের কানের কাছে ফিসফিস করে নিতাই—দুঃখ হবারই কথা। আর দু'মাস পরে মেয়েটার বিয়ে হবে। ব্যবস্থা একরকম ঠিক

হয়েই আছে।

মেয়ের বিয়ে দেখে যেতে পারল না রমেশের বউ। অথচ কত সাধ ছিল; কিন্তু রোগের জ্বালা সে সাধটুকু মিটিয়ে নেবার সময়টুকুও বেচারাকে দিল না। ভাবতে বড় বিশ্রী লাগে। মানুষের এমন দুর্ভাগ্যও হয়।

যাক্, আর কিছুক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে মেয়েটা কালীকাকা গো বলে কেঁদে চেঁচিয়ে আরও কত দুর্ভাগ্যের কথা বলতে থাকবে কে জানে? সরে পড়াই ভালো।

চলে যায় কালীচরণ। বস্তির ভেতর দিয়ে ডাইনে বাঁয়ে বার বার ঘুরে এই-বার এমন একটি ঘরের কাছে গিয়ে দাঁড়াবে কালীচরণ, যে ঘরের অদৃষ্ট আজ হেসে উঠেছে। তার নিজেরই ঘর। ময়দানে সারা সন্ধ্যাটা ঘুরে ফিরে মসলা-মুড়ি বেচে ক্লান্ত হওয়া এই চেহারাটাকে কোনদিন এত খুশিতে ভরে নিয়ে ঘরে ফিরতে পারেনি কালীচরণ। আর কালীচরণের বউ সনাতনীও কোনদিন ভাবতে পারে-নি যে, কালীচরণের খাটুনির জীবন কোনদিন সত্যিই এভাবে হেসে উঠবে।

কালীচরণের এই ঘর চিরকালের ঝগড়ার ঘর। এমন দিন যায়নি, যেদিন স্বামী-স্ত্রীতে অন্তত এক ঘণ্টার মতো একটা ঝগড়ার পালা মুখর না হয়ে উঠেছে। মাগের একটা সামান্য শখ মেটাবার মুরোদ নেই, সে মানুষ কি পুরুষ মানুষ? সনাতনীর অভিযোগের জবাবে কালীচরণ বলতে ছাড়ে না, সামান্য এক জোড়া সোনার দুল কানে দোলাতে পারা গেল না বলে যে মেয়েমানুষ স্বামীকে গঞ্জনা দেয়, সে কি সত্যিই মেয়েমানুষ?

বেশি কিছু নয়, সনাতনীর দাবী সামান্য, শুধু সোনার একজোড়া দুল। এই দাবীর বয়সও প্রায় বিশ বছর। বিয়ের পর স্বামীর ঘর করতে এসে একটা বছরও পার হতে না হতেই ষোল বছর বয়সের সনাতনী সেই যে একদিন লাজুক হাসি হেসে আর কালীচরণের পিঠের উপর মুখটা গুঁজে দিয়ে অনুরোধ করেছিল—দাও না, একজোড়া সোনার দুল গড়িয়ে, এখনই যদি না পরি তবে কবে আর পরবো?

দেব, নিশ্চয় দেব। কথা দিয়েছিল পঁচিশ বছর বয়সের যে যুবক কালীচরণ, সে তার অদৃষ্টের এই বিশ বছরের ইতিহাসে শুধু সেই প্রতিজ্ঞা এড়িয়ে এড়িয়ে চলেছে। একজোড়া সোনার দুল, অন্তত টাকা তিরিশ দরকার। কিন্তু দিতে পারেনি কালীচরণ। অনেক চেষ্টায়, অনেক খেটে আর ভাত-কাপড়ের দাবী অনেক কাটা ছাঁটা করে মাঝে মাঝে বড় জোর দশ বারো টাকা জমেছে; কিন্তু তারপরেই একটা না একটা অঘটন, একটা অসুখ অথবা ভাঙা-ঘরের চালা বা দেয়াল সারাবার দাবী মেটাতেই সে-টাকা ফুরিয়ে গিয়েছে।

মাঝে মাঝে একটু শান্ত স্বরে, চোখে-মুখে সত্যিই অদ্ভুত একটা মায়ার ভাব টেনে নিয়ে সনাতনীকে অনুরোধ করেছে কালীচরণ—আমাকে গঞ্জনা দিয়ে কোন লাভ হবে না সনু, দেবতার কাছে দাবী কর, যেন তোর সোনার দুল হয়। দেবতা

না ইচ্ছে করলে মানুষের কি সাধ্যি যে, সোনা-দানা ঘরে আনতে পারে ?

সনাতনী কালীঘাটে গিয়েছে। কতবার যে গিয়েছে, তার হিসেব সনাতনীও দিতে পারবে না। কালীচরণও বুঝে ফেলেছে, কালীঘাটে গিয়ে দেবীর কাছে কি প্রার্থনা করে এসেছে সনাতনী।

তবুও ঝগড়ার সময় তপ্ত মেজাজের মাথায় সনাতনীকে কতবার শুনিয়ে দিয়েছে কালীচরণ—তোর মত মেয়েমানুষের প্রার্থনা দেবতা শোনে না, কথখনো না।

আজ কিন্তু ঘরের ভিতরে ঢুকেই চেঁচিয়ে উঠতে হবে—শুনেছে, দেবতা তোর প্রার্থনা শুনেছে, সনু।

আজ ময়দানের সন্ধ্যায় আলোছায়ায় ঘুরে ফিরে মসলা-মুড়ি ফেরী করবার সময়, সবুজ ঘাসের উপর একটা চকচকে বস্তু পড়ে থাকতে দেখে টপ করে হাতে তুলে নিয়েছে কালীচরণ। একটা সোনার দুল।

কি আশ্চর্য, হে ভগবান, একি কাণ্ড, সত্যিই যে সোনার একটা দুল। দেবতা যে সত্যিই কালীচরণের এই বিশ-বছরের জীবনের একটা বেদনা মুছে দেবার জন্য এই উপহার ময়দানের ঘাসের উপর রেখে দিয়ে গিয়েছে।

একজোড়া নয়, একটা দুল। কিন্তু সেজন্য কোন আক্ষেপ নেই। দেবতা যখন প্রসন্ন হয়ে একটা জুটিয়ে দিয়েছে, তখন আর একটা জুটে যাবেই। অন্তত আর একটা কেনবার মত টাকা জুটে যাবেই। মাধব স্যাকরাকে বললে ঠিক এই রকম একটি দুল সে দু'দিনে গড়িয়ে দিতে পারবে। দাম ? কত আর দাম ? বড জোর টাকা পনর লাগবে। সে পনর টাকা, কি আর দেবতার কৃপায় জুটে যাবে না ?

ঘরে ঢুকেই পকেট থেকে ছোট একটা কাগজের পুরিয়া বের করে হাঁক ছাড়ে কালীচরণ—বল্ দেখি সনু, এটা কি চীজ।

সনাতনী ভ্রূকুটি করে—তোমার শূলব্যথার ওষুধ, আবার কি ?

—না।

—না তো না ; হাসি দেখলে গা জ্বলে !

কাগজের পুরিয়া খুলে সোনার দুলটা সনাতনীর চোখের সামনে তুলে ধরেই চেঁচিয়ে ওঠে কালীচরণ—দেবতায় পাইয়ে দিলে।

সনাতনী খপ করে দুলটা হাতে তুলে নিয়ে, চোখ মুখ হাসিয়ে আর ছটফট করে চেঁচিয়ে ওঠে।—সে কি গো ?

কালীচরণ—ময়দানে কুড়িয়ে পেলাম।

সনাতনীর চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। অদ্ভুত হাসির শিহর মুখের উপর থরথর করতে থাকে —আর একটা কই ?

কালীচরণ—সেজন্যে ভাবিস না। হয়েই যাবে।

হ্যাঁ, বিশ্বাস করে সনাতনী, দেবতা যখন একটা পাইয়ে দিয়েছে, তখন আর

·একটাও পাইয়ে দেবে।

কালীচরণ—এইবার একটু হাত টেনে খরচ করে, অন্তত পনরটা টাকা জমিয়ে ফেলতেই হবে সনু।

সত্যিই যেন দেবতার আশীর্বাদে নতুন একটা দুঃসাহসের সোনাও পেয়েছে কালীচরণ। কী ভয়ানক খাটুনি, কিন্তু একটুও ভয় করে না কালীচরণ।

সকালে উঠেই মসলা-মুড়ি ফেরি করতে বের হয়ে যায়; ফিরে আসে রাত্রি-বেলা। সনাতনীও মরিয়া হয়ে উঠেছে। সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত শুধু জল খেয়ে পার করে দেয়। কালীচরণ ঘরে ফেরবার পর আধ-হাঁড়ি ভাত দু'জনে ভাগ করে খায়।

টাকাও জমেছে। এক সপ্তাহে তিন টাকা জমে গেল। এক মাসে জমলো প্রায় ন'টাকা। হে ভগবান, আর ছ'টাকা কি আর এক মাসে জমবে না?

মাধব স্যাকরাও বলেছে; হ্যাঁ পনর টাকাতেই ঠিক এরকম এক-আনি সোনার ·একটা দুল হয়ে যাবে।

আরও একটা মাস পার হয়। রাত্রিবেলা ময়দান থেকে যখন ঘরে ফিরে এসে সনাতনীর মুখের দিকে তাকায় কালীচরণ, তখন কিছুক্ষণের জন্য কালী-চরণের দুই চোখ অপলক হয়ে যায়! হাসছে সনাতনী, সেই বিশ বছর আগের আশাময় সুন্দর লাজুক মুখটি হাসছে।

সত্যিই লজ্জিত হয় সনাতনী।—অমন করে কি দেখছো? বয়স হয়েছে, ভুলে যাও কেন?

কালীচরণ—তোর কিন্তু বয়স হয়নি সনু। তোকে আজও ঠিক সেই রকমটি দেখাচ্ছে।

—কি রকমটি?

—সেই যে ষোল বছরের কাঁচা মুখটি। এত বড় কালো খোঁপাটি। নরম নরম গাল দুটি? আর···।

সরে যায় না সনাতনী। রোগা শরীরটাকে, একবেলা ভাত খাওয়ানো সেই শ্রান্ত-ক্লান্ত প্রাণটাকেই যেন ষোল বছর বয়সের তরুণতায় বিহ্বল করে দিয়ে কালীচরণের দু'হাতের ইচ্ছার কাছে সঁপে দেয় সনাতনী। ফিসফিস করে বলে—পনর টাকা জমেছে কিন্তু।

দরজার বাইরে মিস্তিরি রমেশের ডাক শোনা যায়—কালী ঘরে আছ কি?

—হ্যাঁ আছি। সাড়া দেয় কালীচরণ।

মেয়ের বিয়েতে কালীচরণকে নিমন্ত্রণ করতে এসেছে রমেশ মিস্তিরি। কাল সন্ধ্যাতেই বিয়ে। কালীচরণ বলে—হ্যাঁ, নিশ্চয় যাব।

রমেশ বলে—তুমি একা গেলে চলবে না। তোমার ঘরের মানুষটিরও যাওয়া চাই। জানই তো, মা-মরা মেয়ের বিয়ে। ওদের মত দু-চারজন মানুষ কাছে থেকে মেয়েটাকে একটু আদুরে কথা বলে···সত্যিই মায়ের কথা ভেবে মেয়েটা

বড় কাঁদছে হে।

হ্যাঁ, শুনে খুশি হয় কালীচরণ। রমেশকে কথা দে   সনাতনীও রমেশের মেয়ে আরতির বিয়েতে যাবে।

রমেশ চলে যাবার পর কালীচরণ বলে—বেশ হবে সনু, তুই এবার সোনার দুল পরে বিয়ে-বাড়িতে যেতে পারবি। কালই সকালে গিয়ে মাধব স্যাকরাকে ধরবো, যেন চটপট দুলটা গড়ে দেয়, যেন সন্ধ্যা হবার আগেই পেয়ে যাই।

—কই, নতুন দুলটা কেমন হলো দেখি। ঠিক ঠিক মিলে গেছে তো? হাত পাতে সনাতনী।

সন্ধ্যাবেলা মাধব স্যাকরার কাছ থেকে ঘরে ফিরেছে কালীচরণ। কিন্তু কালী-চরণের চোখ দুটো যেন দুটো দৃষ্টিহীন কোটর। মুখটা যেন মরা মানুষের মুখের মত বিবর্ণ।

নতুন দুল আনতে পারেনি কালীচরণ। কুড়িয়ে পাওয়া পুরানো দুলটাও ফিরিয়ে আনতে পারেনি। শুধু পনরটি টাকা, যেমন হাতে করে নিয়ে গিয়ে-ছিল, তেমনি হাতে করে ফিরে এসেছে।

মাধব স্যাকরার ঘরেতে রমেশের সঙ্গে দেখা হয়েছে কালীচরণের। চুপ করে শুনেছে আর দেখেছে কালীচরণ, দেবতাও কি ভয়ানক ঠাট্টা করতে পারে।

রমেশ মিস্তিরি একটা অদ্ভুত রকমের করুণ মুখ নিয়ে মাধব স্যাকরার কাছে এসেছে, পকেট থেকে ছোট্ট একটা দুল বের করে মাধবকে অনুরোধ করেছে রমেশ—এইরকম একটি দুল গড়িয়ে দাও মাধব। এটা হলো মেয়েটার মরা মায়ের দুল। কিন্তু দামটা এখন দিতে পারবো না মাধব।

মাধব বলে—তা হয় না, মাপ কর মিস্তিরি!

কালীচরণ হঠাৎ আতঙ্কিতের মত চেঁচিয়ে ওঠে। একটা দুল কেন হে রমেশ।

রমেশ—একটা হারিয়ে গেছে রে ভাই। আমিই একদিন দুল জোড়া বেচতে নিয়ে গিয়ে একটাকে যে কোথায় হারিয়ে ফেললাম, কে জানে?

কালীচরণ—ময়দানের দিকে গিয়েছিলে কি?

রমেশ—ঠিক সন্দেহ করেছো। ময়দান পার হয়ে কয়লাঘাট হয়ে হাওড়াতে এক বাবুর কাছে দুলজোড়া বেচতে নিয়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু অদৃষ্ট মন্দ।

ফ্যাল ফ্যাল করে রমেশের হাতের দুলটার দিকে তাকিয়ে থাকে কালীচরণ। রমেশ বলে—মেয়ের মা বেচারা মরবার আগেও জানতে পারেনি যে একটা দুল হারিয়েছে। মরবার আগের দিনও বলেছে—বিয়ের দিনে মেয়েটার কানে আমার দুলজোড়া পরিয়ে দিও।

থরথর করে কালীচরণের হাতটা কাঁপতে থাকে। তারপরেই পকেটের ভিতর থেকে একটা দুল বের করে রমেশের হাতের কাছে এগিয়ে দেয়—দেখ দেখি, এটা সেই হারানো দুল কি না?

—এই তো, এই তো! কোথায় পেলে তুমি? উল্লাসে চেঁচিয়ে ওঠে রমেশ।

কালাচরণ যেন একটা আর্তনাদ চেপে বলে—ময়দানে।

আর কোন কথা না বলে, দুলটাকে রমেশের হাতে ফেলে দিয়ে সোজা ঘরে ফিরে এসেছে কালীচরণ।

—কই? কথা বলছো না যে। আবার প্রশ্ন করে সনাতনী।

মেঝের উপর ধপ করে বসে পড়ে কালীচরণ। যেন একটা মূর্ছার ঘোরে বিড়-বিড় করে।—ওটা রমেশের বউ-এর দুল। আজ জানতে পেলাম।

—তারপর? কি করলে দুলটাকে? বুকফাটা আর্তনাদ শিউরে দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে সনাতনী।

—রমেশের হাতেই ওটা ফেলে দিয়েছি।

—হায় রে হায়! মানুষও এত গোমুখ্খু হয়? মেঝের উপর গড়িয়ে পড়ে কাঁদতে থাকে সনাতনী। কালীচরণও স্তব্ধ হয়ে বসে তেমনই ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে দেখতে থাকে, সনাতনীর কান দুটো মেঝের সঙ্গে ঘষা লেগে যেন একটা মাটিমাখা নিষ্ঠুরতার আঘাত সহ্য করতে গিয়ে ছটফট করছে।

কালীচরণ যেন ভীরু অপরাধীর মত বিড-বিড করে—কি করবো বল? রমেশের বউ মরবার আগে বলে গিয়েছিল, মেয়েটাকে যেন বিয়ের দিনে ওর দুলজোড়া পরিয়ে দেওয়া হয়। এদিকে, রমেশেরও সাধ্যি নেই যে, নতুন একটা দুল গড়াতে পারে। কাজেই···।

মাটিয়ে লুটিয়ে-পড়া সনাতনীর শরীরটার করুণ কাতরতা আর ছটফটে জ্বালা যেন হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যায়। তারপরেই মনে হয়, যেন ঘুমিয়ে পড়েছে সনাতনী।

আশ্চর্য হয় কালীচরণ, সত্যিই এত দুঃখ পেয়েও কি সুন্দর শান্তটি হয়ে, যেন সুখের ঘুমে বিভোর হয়ে আছে সনাতনী।

রাত কত হলো? সারা বস্তি যে একেবারে নীরব হয়ে গিয়েছে।

কালীচরণ ডাকে—সনু।

সনাতনী ধড়ফড় করে জেগে ওঠে।—রাত অনেক হলো বুঝি?

—হ্যাঁ।

—তবে তো মেয়েটার বিয়ে হয়েই গিয়েছে।

—হ্যাঁ, সন্ধ্যাতেই লগ্ন ছিল।

—যাঃ, আক্ষেপ করে সনাতনী।

কালীচরণ—কি হলো?

সনাতনী—বিয়েটা দেখা হলো না।

সনাতনীর মুখটাকে ভাল করে দেখবার জন্য কালীচরণের শুকনো চোখের দৃষ্টিটা যেন হঠাৎ তীব্র হয়ে জ্বলজ্বল করে।

বিড়বিড় করে কালীচরণ—ভারি তো বিয়ে, রমেশ মিস্তিরির মেয়ের বিয়ে না দেখা হলো তো বয়েই গেল।

সনাতনী আঁচল দিয়ে চোখ-মুখ মুছতে মুছতে বলে—না গো, মায়ের দুল-জোড়া কানে দিয়ে মেয়েটাকে কেমন দেখাচ্ছে ; দেখবার বড সাধ ছিল।

প ক্ষি ত ত্ত্ব

লোকে আকাশের দিকে তাকিয়ে যা দেখতে পায় ও দেখতে চায়, মহেশবাবু তা দেখতে পান না, দেখতে চানও না।

লোকে দেখতে পায়, শরৎকালের আকাশ কত নীল! শ্রাবণের আকাশে কী কালো মেঘের ঘটা আর কী সুন্দর বিদ্যুতের ঝলক! কিন্তু ওসব দৃশ্য হয়তো মহেশবাবুর চোখে পড়ে না, কিংবা তিনি ইচ্ছা করে আকাশের ওসব শোভা দেখেন না।

আকাশের দিকে তাকিয়ে মহেশবাবু শুধু দেখতে পান, পাখি। কখনো ঝাঁক বেঁধে, কখনো বা জোড়া-জোড়া, এবং কখনো নিতান্ত একলা, নানা রঙের ও আকারের পাখি আকাশে উড়ে যায়। মহেশবাবু দুই মুগ্ধ চক্ষু নিয়ে দেখতে থাকেন, কী সুন্দর দেখতে, সাদা ফুলের উডন্ত মালার মত বকের সারি উড়ে চলে যাচ্ছে। কত উঁচুতে, প্রায় মেঘের কোলের কাছে আস্তে আস্তে আর অলসভাবে সাঁতার দিয়ে ভাসছে একলা একটা চিল।

লোকে গাছের দিকে তাকায়—ফুল ফল বা পাতার বাহার দেখবার জন্য। কিন্তু মহেশবাবু গাছের দিকে তাকান, শুধু পাখি দেখবার জন্য। পেয়ারা গাছের পাকা পেয়ারার দিকে তাকাবার কোন সাধ তাঁর মনে নেই। তিনি শুধু মুগ্ধ চক্ষু নিয়ে দেখতে থাকেন, কী চমৎকার দুটো টিয়া সবুজ রঙের পালক আর লাল ঠোঁট নিয়ে গাছের ডালে আর পাতার ঝোপের মধ্যে বসে রয়েছে। গোলাপ গাছের গোলাপটির দিকে নয়, মহেশবাবু তাকিয়ে থাকেন ছোট্ট একটি মৌটুসি পাখির দিকে। কেমন অবাধ আনন্দে টুক্-টুক্ করে লাফিয়ে লাফিয়ে গোলাপের পাপ-ড়িতে ঠোঁট দিয়ে ঠোকর দেয় ছোট্ট রঙীন মৌটুসি!

কেন মহেশবাবু? আপনি এত মুগ্ধ হয়ে শুধু পাখিগুলির দিকে তাকিয়ে থাকেন কেন? অনেকে এই প্রশ্ন করে, এবং সবাই মহেশবাবুর কাছ থেকে সেই একই উত্তর শুনতে পায়।

মহেশবাবু বলেন—পাখিরাই সুখী। তাই ওদের দেখতে এত ভাল লাগে।

—কেন? এরকম ধারণা কেন হল আপনার?

মহেশবাবু বলেন—এ ধারণা কি আমার আজকের ধারণা রে ভাই? সেই, সেই ছাপ্পান্ন বছর আগে যখন এতটুকুটি ছিলাম, যখন মাত্র চার বছর বয়স তখন থেকে বুঝেছি যে এই পৃথিবীতে পাখিরাই সুখী।

—সেই ঐটুকু বয়সেই আপনার কেন মনে হয়েছিল পাখিরাই সুখী?

মহেশবাবু বলেন—বাড়ির চারদিকে মস্ত উঁচু পাঁচিল। ফটকের দরজায়

মাথার উপর ছোট একটা খিল। পাঁচিল ডিঙিয়ে বাইরে যাবার সাধ্যি ছিল না। ফটকের দরজার খিল খোলবারও সাধ্যি ছিল না! চার বছর বয়সের ছেলের ছোট্ট হাতের নাগালের অনেক উঁচুতে সেই খিল।

—এর জন্য পাখিগুলোকে সুখী বলে মনে হবে কেন?

মহেশবাবু—হবেই তো! আমি চার বছর বয়সের মানুষ হয়ে সারাদিন বাড়ির মধ্যে আটক হয়ে থাকি, আর আমার চেয়ে ছোট পাখিগুলি সারাদিন যেখানে ইচ্ছে সেখানে উড়ে বেড়ায়। আমার চার বছর বয়সের সেই ছোট্ট জীবনের দুঃখ তোমরা বুঝতে পারছো কি?

—পারছি মহেশবাবু।

মহেশবাবু—সেই চার বছর বয়সেই মনের দুঃখে বুঝেছিলাম যে, পাখিরাই সুখী, পাখিদের সারাদিন ঘরে থাকতে হয় না।

—কিন্তু এ তো আপনার সেই চার বছর বয়সের কথা। তার পরেও কেমন করে এতদিন ধরে আপনি ঐ একই ধারণা নিয়ে রয়েছেন?

মহেশবাবু—তারপর আরও ভাল করে বুঝলাম, পাখিরাই সুখী।

—কেন?

মহেশবাবু—আমার তখন ষোল বছর বয়স। পরীক্ষার পড়া পড়ছি সব সময়। ফাইনাল পরীক্ষা। এসে পড়েছে পরীক্ষার দিন। আর দশটা দিনও বাকি নেই। ভেবে দেখ আমার সেই ষোল বছর বয়সের মনের অবস্থা। সে কী উদ্বেগ ইতিহাসের একটা পাতাও তখনো মুখস্ত হয়নি। অ্যালজেব্রার সব ফরমূলা মনের মধ্যে এলোমেলো হয়ে গিয়েছে। কাকা বলেছেন, ফেল করলে কাকার অফিসের বেয়ারার কাজে ঢুকিয়ে দেবেন।

—কিন্তু এর মধ্যে পাখির ব্যাপার কি ছিল?

মহেশবাবু—আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখতাম, কী অবাধ আনন্দে আর নিশ্চিন্তমনে উড়ে যাচ্ছে পাখির দল! গাছের ডালে সারাদিন মনের সুখে কিচির মিচির করে পাখি। পাখিরাই তো সুখী। পাখিদের জীবনে এনট্রেন্স পরীক্ষা নেই। পাখিদের কোন পরীক্ষা দিতে হয় না।

—কিন্তু তাই বলেই কি পাখিরা সুখী? পাখিদেরও কি কোন দুঃখ নেই? ওরাও তো ঝড়ের দিনে ভয় পায়, বৃষ্টিতে ভিজে কাঁপতে থাকে।

মহেশবাবু—সে তো আমিও কাঁপি, তুমিও কাঁপ। ঝড়ের রাতে একলা গাছতলায় পড়ে থাকলে তোমারও ভয় ভয় করবে, আমারও করবে। সকলেই যে ভয় পায়, সেটা কোন দুঃখই নয়। সবাই যে কাঁপুনি কাঁপে, সেটাও কোন দুঃখ নয়।

—কিন্তু আপনার সেই পরীক্ষার ভয় তো কবেই কেটে গিয়েছে।

মহেশবাবু—হ্যাঁ, যখন বি-এ পরীক্ষা দিলাম আর বি-এ পাশ করলাম, তখন আমার বয়স একুশ বছর।

—তারপর কি হলো ? তার পরেও কেন এই ধারণা করে রইলেন যে পাখিরাই সুখী ?

মহেশবাবু—কেন করবো না ? পঁচিশ বছর বয়স হবার আগেই চাকরিতে ঢুকেছি। সকাল দশটা থেকে সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত ; কোন কোনদিন রাত্রি আটটা পর্যন্ত অফিসের ঘরের এক কোণে বসে কলম পিষতে হয়। সকাল নটা হলেই সাত-তাড়াতাড়ি নাকে-মুখে দুটো ভাত পুরে দিয়ে ছুটতে হয়। পৌছতে এক মিনিট দেরী হলে বড়বাবু বলেন, লেট হলে মাইনে কাটা যাবে।

—এর মধ্যে পাখি কোথায় ?

মহেশবাবু—ঐ তো, আমি যখন এক মিনিট দেরী হবার ভয়ে ঠিক নটার সময় ট্রাম ধরবার জন্য ছাতা বগলে নিয়ে ছুটতে থাকি, তখন দেখতে পাই, পাঁচ-ছ'টা চড়াই ছাদের কার্নিশের উপর বসে চোখ বন্ধ করে মনের সুখে ঝিমোচ্ছে। কাজের তাড়া নেই পাখিদের। ওরাই সুখী। পাখিদের চাকরী করতে হয় না।

—কিন্তু আপনি তো দু'বছর হলো রিটায়ার করেছেন। বিশ্রাম করবার সুযোগ পাচ্ছেন। কাজের তাড়া, আর সকাল ন'টায় অফিসে ছুটবার পালা তো অনেকদিন হলো চুকিয়ে দিয়েছেন।

মহেশবাবু—তা দিয়েছি।

—তবে আজও কেন এতক্ষণ ধরে আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে পাখি দেখছেন ?

মহেশবাবু—দেখছি, পাখিরাই সুখী।

—কেন ?

মহেশবাবু বলেন—পাখিদের মেয়ের বিয়ের জন্য চিন্তা করতে হয় না।

ঐতিহাসিক বস্তুবাদ

ঐতিহাসিক বস্তুবাদ ; হিস্টরিকাল মেটিরিয়ালিজম্। কথাটার অর্থ বুঝতে অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু বুঝতে পারিনি। আজ হঠাৎ মনে হয়েছে, যেন বুঝতে পেরেছি। কারণ আজ হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল আমাদের সেই কলেজের অধ্যাপক বিমল বসুর কথা।

তিনি ছিলেন আমাদের ইতিহাসের অধ্যাপক। বয়সের দিক দিয়ে তিনি অধ্যাপকদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট ছিলেন ; কিন্তু কলেজে ঢুকে প্রথম বছরের প্রথম দিনেই আমরা বুঝে ফেলেছিলাম যে, বিদ্যাবত্তার দিক দিয়ে তিনিই অধ্যাপকদের মধ্যে সবচেয়ে বড। প্রথম দিনেই ইংরেজীর ক্লাস, লজিকের ক্লাস ও সংস্কৃতের ক্লাস মনের ভিতর কেমন যেন একটা দুর্ভাবনা ছড়িয়ে দিয়ে গেল। অধ্যাপকেরা নানা বই ঘাঁটলেন এবং পড়ালেন ; পড়াতে গিয়ে অনেককিছু বোঝালেন, বোঝাতে গিয়ে যথেষ্ট ভয়ও পাইয়ে দিলেন। কিন্তু ইতিহাসের

ক্লাসটা আমাদের মন একেবারে মুগ্ধ করে দিল।

অধ্যাপক বিমল বসু ইতিহাসের বই ছুঁলেন না, ইতিহাসের নামে শুধু একটি বক্তৃতা দিলেন। কিন্তু কী অদ্ভুত বক্তৃতা, একেবারে বক্তৃতা বলেই মনে হয় না। একটা অভিনয়। যেন নাটকের চন্দ্রগুপ্ত মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে তাঁর মনের যত আশা আকাঙ্ক্ষা আক্ষেপ আর প্রতিজ্ঞার কথা অনর্গল বলে চলেছেন। তিনি বললেন, আমি ইতিহাসের প্রফেসর নই, আমিই ইতিহাস। ইতিহাস আমার স্বপ্নে, ইতিহাস আমার রক্তে ও স্নায়ুতে।

আজও মনে পড়ে, কলেজে ঢুকে প্রথম দিনেই ইতিহাসের প্রফেসর বিমল বসুকে আমাদের সবচেয়ে বেশি ভাল লেগেছিল। তাঁর চেহারাটিও বেশ, সাজ-পোশাকেও বেশ একটা ছিমছাম স্টাইল ছিল। গেরুয়া রঙের মিহি খদ্দরের ঢিলে পাঞ্জাবি পরতেন তিনি। চশমার ফ্রেম সোনার। আর পায়ে থাকত জরি বসানো মুলতানী নাগরা। ধুতি ছিল সিল্কের। তিনি বলতেন, কেন তিনি সিল্কের ধুতি পরেন। সিল্ক হল চীনাংশুক। এই সিল্কের সঙ্গে ইতিহাসের মস্ত বড একটা স্মৃতির এসোসিয়েশন রয়েছে। সুদূর অতীতে ভারতের সঙ্গে চীনের যে অতি সুন্দর একটি অন্তরঙ্গ সম্পর্কের বন্ধন ছিল, এই সিল্কের মধ্যে যেন তারই স্পর্শ অনুভব করা যায়।

সত্যিই জিনিয়াস! ইতিহাসের প্রফেসর বিমলবাবুর মত এমন মনে-প্রাণে বিদ্বান প্রফেসর আমাদের সেই কলেজে আর কেউ ছিলেন না। বাংলার প্রফেসর বুডো চারুবাবুও একদিন আমাদের এই বিশ্বাসটাকে উৎসাহিত করে দিলেন।

প্রশ্ন করেছিলেন চারুবাবু—কি হে, কেমন লাগছে কলেজের পডা?

মাধব উত্তর দিল—ইতিহাসের পডা সবচেয়ে ভাল লাগছে স্যার্।

চমকে উঠলেন চারুবাবু—ও, প্রফেসর বিমল বসুর ক্লাস?

ইন্দু—হ্যাঁ; স্যার্।

চারুবাবু কেমন যেন চিবিয়ে চিবিয়ে বলতে থাকেন—তা তো লাগবেই, বিমল বসুর ইতিহাস তোমাদের মনে ধরবারই কথা।

আমি বলি—প্রফেসর বসু মস্ত বড স্কলার, নয় কি স্যার্?

চারুবাবু—হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়! উনি একটি গ্রেট ইনটেলেক্চুয়াল।

মাধবের দুই চোখে ভক্তিভরা বিস্ময় উথলে ওঠে: আপনিও তাহলে বিশ্বাস করেন স্যার্?

চারুবাবু—করি বই কি। তোমাদের প্রফেসর বিমল বসু যখন দিনের মধ্যে অন্তত পাঁচবার নিজেই নিজেকে গ্রেট ইনটেলেক্চুয়াল বলেন, তখন কথাটা বিশ্বাস করতেই হয়।

চলে গেলেন অধ্যাপক চারুবাবু। ইন্দু বলে—উনি বিশ্বাস করেন ঠিকই, কিন্তু একটু হিংসেও করেন বোধহয়।

এক সপ্তাহ পরে আরও বুঝলাম, প্রফেসর বিমল বসু স্বয়ং ইতিহাস তো

নিশ্চয়ই, তার উপর আরও কিছু বেশি। তিনি বললেন—পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে বেশি মহৎ, উদার, উদাত্ত, অত্যুজ্জ্বল ও অপূর্বসুন্দর একটি মানুষকে আমি আমার মনের মণিকোঠায় পুষে রেখেছি। তিনিই আমার জীবনের আদর্শ; তিনি আমার সব চিন্তার কাণ্ডারী; সব পথের দিশারী। তিনিই হলেন, দেবানাং প্রিয় প্রিয়দর্শী মহারাজ অশোক।

আমরা মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকি প্রফেসর বসুর মুখের দিকে, কিন্তু তিনি আমাদের কারও বিস্মিত মুখের দিকে না তাকিয়ে স্বপ্নালু চোখের দৃষ্টি দূরের ওই সীতাগড় হিলের চূড়ার দিকে প্রসারিত করে দিয়ে বলতে থাকেন—এক এক সময় হঠাৎ অনুভব করি, আমি যেন পাটলিপুত্রের পাথর-বাঁধানো পথের উপর মধ্যাহ্নের রৌদ্রজ্বালার মধ্যে একা দাঁড়িয়ে আছি! দূরে একটি ছায়াময় অশ্বত্থ। সেই অশ্বত্থের ছায়াতলে দাঁড়িয়ে এক শান্ত সৌম্য ও স্নিগ্ধ মূর্তির মানুষ হাত তুলে আমাকে তাঁর নিকটে যেতে ডাকছেন। কে তিনি? তিনি হলেন প্রিয়দর্শী অশোক।

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন প্রফেসর বসু। তারপর হাতের কাছে একটা বই টেনে নিয়ে বললেন—অশোক দি গ্রেট, এনসিয়েন্ট হিস্টরি অব ইণ্ডিয়া পেজ ফিফটি সেভেন।

এই প্রথম ইতিহাসের বই স্পর্শ করলেন প্রফেসর বসু। আমরা এই প্রথম ইতিহাসের বইয়ের পাতা উল্টে অশোক দি গ্রেটকে খুঁজে বের করলাম। অশোকের জীবন আর কীর্তি সম্বন্ধে অনেক নতুন কথা বললেন প্রফেসর বসু, যে-সব কথা পাঠ্য বইটার মধ্যে নেই।

প্রফেসর বসু বললেন—অশোক সম্বন্ধে আমি আড়াই শো ছোট বড় বই পড়েছি; অশোকস্তম্ভের ছায়ায় বসে দশটি দুপুর কাটিয়েছি। আমাকে যদি বুঝতে পার, তবে অশোককেও তোমরা বুঝতে পারবে। আর অশোককে যদি বুঝতে পার, তবে আমাকেও বুঝতে পারবে।

বই বন্ধ করে শেষ কথা বলে ক্লাস শেষ করলেন প্রফেসর বিমল বসু।—চারুবাবু আমাকে আড়ালে আড়ালে বিদ্রূপ করেন। আমি নাকি একজন খাঁটি অশোকিস্ট। কিন্তু তোমার বিশ্বাস কর, চারুবাবুর এই ঠাট্টার কথা শুনে আমি মনে মনে গৌরব অনুভব করি।

চারুবাবুর উপর আমাদের মন আবার বিরূপ হয়ে ওঠে। প্রফেসর বসুর মত এমন একজন ইনটেলেকচুয়াল আর ভাবুক মানুষের নামে এ রকম ঠাট্টার চিমটি কেটে বেড়াবার দরকার কি? ইতিহাসের অশোককে জীবনের ধ্যানের বিষয় করে তুলেছেন প্রফেসর বসু। বেশ করেছেন তাতে চারুবাবুর এত ক্ষুব্ধ হবার কি আছে?

এখনও বিয়ে করেননি প্রফেসর বসু। নিজের মন আর পাটলিপুত্রের স্বপ্ন নিয়ে যেন এক ভাবরাজ্যের মধ্যে একা ঘুরে বেড়াচ্ছেন। চারুবাবুর মত দু'বেলা

প্রাইভেট পড়া পড়িয়ে টাকা রোজগার করেন না। এই যুগের যত স্বার্থ লোভ আর মতলব থেকে অনেক দূরে আর অনেক ঊর্ধ্বে রয়েছেন প্রফেসর বসু। তাঁর বাড়িতে গিয়েও দেখেছি, বিছানার উপর ছড়িয়ে রয়েছে সম্রাট অশোকের যত শিলালিপির ছবি। দেখেছি, তিনি ব্রাহ্মী লিপিতে তাঁর আত্মজীবনী লিখছেন। কথায় কথায় মন্ত্রের অদ্ভুত সব ছড়া তিনি অনর্গল উচ্চারণ করেন। তিনি বলে দেন বলেই বুঝতে পারি ভাষাটা হল দু'হাজার বছর আগের মাগধী-প্রাকৃত।

প্রফেসর বিমল বসু একটি জিনিয়াস, একটি গ্রেট ইনটেলেকচুয়াল, এবং অদ্ভুত স্কলার। কিন্তু কী আশ্চর্য, এসব সত্য জেনেও এবং চোখের উপর দেখতে পেয়েও ক্লাসের অনেক ছেলে ঠিক আমাদের মত মুগ্ধ হয় না। ওরা চায়, প্রফেসর বসুও চারুবাবুর মত শুধু পড়াবেন। একটা মাস যেতে না যেতে দেখলাম, অনেক ছেলে হিস্টরি ছেড়ে দিল। অন্য সাবজেক্ট নিয়ে অন্য ক্লাসে ভিড় জমাল।

মাধব বলে, আমিও হিস্টরি ছেড়ে দিয়ে বোটানি নিতাম, কিন্তু ছাড়তে পারছি না, প্রফেসর বসুর অদ্ভুত পার্সোনালিটির জন্যই। এই রকম একটি মানুষের সঙ্গে আধ ঘণ্টা পার করে দেওয়াই মস্ত বড় একটা শিক্ষা।

কলেজের ক্লাসের বাইরে মাঝে মাঝে যখন প্রফেসর বসুর সঙ্গে আমাদের দেখা হয়, তখনও আমরা একরকমের শিক্ষা পেয়ে থাকি। তাঁর সব কথার মধ্যে যেন অদ্ভুত একটা আবেদন আছে। জীবনকে মহৎ করে তোলবার আবেদন। শোন, বোঝ, বুঝতে চেষ্টা কর আমাকে···তার মানে সম্রাট অশোকের সেই বিরাট আদর্শের এক-একটি বাণীকে, তাহলেই সব শিক্ষার বড় শিক্ষা পেয়ে যাবে।

মাধব বলে—তাহলে হিস্টরিতেও নিশ্চয় আমরা বেশ স্ট্রং হতে পারব স্যার্। কম করে সিক্সটি পারসেণ্ট মার্ক রাখতে পারব।

চমকে ওঠেন প্রফেসর বসু। রুমাল দিয়ে চশমার কাঁচ মুছে নিয়ে উদাস এবং যেন একটু ব্যথিতভাবে মাধবের মুখের দিকে তাকান। তারপর গম্ভীর হয়ে বলেন—তোমার কথা শুনে বড় দুঃখিত হলাম মাধব!

মাধব অপ্রস্তুত হয়: কেন স্যার্?

প্রফেসর বসু বলেন—আদর্শবাদ ও বস্তুবাদ এক জিনিস নয়।

ইন্দুও বিরক্ত হয়ে মাধবের দিকে ভ্রূকুটি করে: আইডিয়ালিজম্ আর মেটিরিয়ালিজম্ এক জিনিস নয়। হিস্টরিতে বেশি নম্বর নাই বা পেলাম, তাতে কি আসে যায়?

প্রফেসর বসু একটু খুশি হয়ে বলেন—পরীক্ষায় বেশি নম্বর পাওয়া কিংবা পাস করা আর চাকরি পাওয়ার জন্য শিক্ষা নয়। ব্যক্তিত্ব পাওয়া, চরিত্র পাওয়ার জন্য শিক্ষা।

আমি মাধবের কানে কানে বলি—প্রফেসর বিমল বসুর মত একটি পার্সোনালিটি যদি পেতে পারি, তবে সেটাই কি আমাদের জীবনের কম লাভ রে মাধব?

লাল কাঁকরের পথ ধরে সারবাঁধা দেবদারুর ছায়ায় ছায়ায় পথ হেঁটে এক রবিবারের দুপুরে প্রফেসর বসুর সঙ্গে বেড়িয়ে বেড়িয়ে আমরা যখন টাউনের শেষ ল্যাম্পপোস্টের কাছে এসে পড়েছি, তখন প্রফেসর বসু হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন। নিকটেই রাস্তার ওপারে ঘন হাসনুহানার ঘেরানের ভিতর ছোট্ট ও সুন্দর একটি বাংলোবাড়ির দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবতে থাকেন প্রফেসর বসু।

ছোট্ট ওই বাংলোটার নাম সিতারা মঞ্জিল। শহরের বিখ্যাত ধনী হাইড-মার্চেণ্ট করিম সাহেবের সম্পত্তি। বাড়িটা খালি পড়ে আছে। করিম সাহেব তাঁর বিগতা স্ত্রীর নামে এই সুন্দর ও সুশ্রী মঞ্জিল উৎসর্গ করে দিয়েছেন। শুধু একজন মালী ছাড়া এই মঞ্জিলের সীমানার ভিতর আর কেউ থাকে না। পথের উপরে দাঁড়িয়ে মঞ্জিলের চার পাশের দামাস্কা গোলাপের স্তবক দেখা যায়। ডেপুটি কমি-শনার উড সাহেবের জামাই এসে এই মঞ্জিল মাত্র এক মাসের জন্য ভাড়া নিতে চেয়েছিলেন। করিম সাহেব এই সিতারা মঞ্জিলকে একদিনের জন্যও ভাড়া দিতে রাজী হননি।

সিতারা মঞ্জিলের এই ইতিহাসটুকু আমরা জানতাম, এবং আমরাই সে ইতি-হাস প্রফেসর বসুর কাছে বর্ণনা করলাম। শুনে আরও মুগ্ধ হয়ে সিতারা মঞ্জিলের দিকে তাকিয়ে রইলেন প্রফেসর বসু।

তারপর আর বেশীক্ষণ নয়। প্রফেসর বসু বললেন—চল।

টাউনের দিকে আবার ফিরে চললাম। পথ চলতে চলতে প্রফেসর বসু শুধু একটি কথাই বললেন—সম্রাট অশোকের সত্যিকারের গ্রেটনেস কোথায় এবং কিসে, সেটা বুঝতে পেরেছ কি?

ইন্দু বলে—এখনও বুঝতে পারিনি স্যার্।

প্রফেসর বসু—পূজেতয়া তু এব পরপাসংডা তেন তেন প্রকরণেন। অন্য সম্প্রদায়কেও বিশেষ বিশেষ কারণে শ্রদ্ধা করা উচিত। গিরনার পাহাড় থেকে ধৌলি পাহাড় পর্যন্ত কত পাথরের গায়ে এই উপদেশ মানুষের শিক্ষার জন্য উৎকীর্ণ করে গিয়েছেন অশোক।

প্রফেসর বসু সত্যিই মনে-প্রাণে অশোকিস্ট। আমরা আর একটা নূতন প্রমাণ স্বচক্ষে দেখতে পেলাম। করিম সাহেবের সঙ্গে একই মোটর গাড়িতে চড়ে রোজ সন্ধ্যায় ফকির ইব্রাহিমের কবরে ফুল আর চেরাগ দেবার জন্য চলেছেন প্রফেসর বসু। এবং আর সাতদিন পরেই দেখলাম, মল্লিক বোর্ডিং হাউসের সেই ক্ষুদ্র কক্ষটি ছেড়ে দিয়ে সিতারা মঞ্জিলে গিয়ে আশ্রয় নিলেন প্রফেসর বসু। আমরা আশ্চর্য হলাম। আমাদের আরও আশ্চর্য করে দিয়ে প্রফেসর বসু বললেন —করিম সাহেবের অনুরোধ তুচ্ছ করতে পারলাম না। তিনি আমার কাছ থেকে এক পয়সাও ভাড়া নেবেন না, অথচ আমাকে এখানেই থাকতেই হবে। বল দেখি এমন বিপদেও মানুষ পড়ে?

অশোকিস্ট বিমল বসুর আরও এক-একটি আন্তরিক নিষ্ঠার এইরকম কীর্তি দেখতে পাব, আমাদের এই আশার কথা আমরা আড়ালে আড়ালে বলাবলি করি। এবং ইতিহাসের ক্লাসে একদিন আমাদের মনে আশা চমকে দিয়ে প্রফেসর বসু প্রশ্ন করলেন—প্রিয়দর্শী মহারাজ অশোকের সবচেয়ে বেশি সুন্দর মহত্বটি কি তোমরা ঠিক ধরতে পারছ? সন্দেহ, পারছ না। তিনি ছিলেন মহাকরুণার প্রতীক। শুধু মানুষের প্রতি নয়, সর্বজীবের প্রতি তাঁর মন মমতায় ও করুণায় সর্বক্ষণ টলমল করত।

সেদিন ছিল পিঁজরাপোলের গোপাষ্টমীর মেলা। মেলা দেখতে গিয়ে সেই সন্ধ্যাতেই আমরা দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম, প্রফেসর বসু একটা খোঁড়া গরুকে নিজের হাতে কচি ঘাস খাওয়াচ্ছেন। তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে পিঁজরাপোলের ম্যানেজার হরকিষণলাল প্রফেসর বসুর মুখের দিকে শ্রদ্ধানিবিড় দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে আছেন।

এবং আর দু'দিন পরে সকালবেলা সিতারা মঞ্জিলে গিয়ে ড্রামাটিক ক্লাবের চাঁদা চাইবার জন্য প্রফেসর বসুর কাছে এসে দাঁড়াতেই দেখতে পেলাম, পিঁজরাপোলের দারোয়ান এক সের খাঁটি দুধ রেখে দিয়ে চলে গেল।

প্রফেসর বসু বললেন—হরকিষণলাল বড় উপদ্রব শুরু করেছে। রোজই এক সের দুধ পাঠাচ্ছে, অথচ দাম নিচ্ছে না।

ফিরে যাবার সময় মাধব দু'বার মাথা চুলকে নিয়ে প্রশ্ন করে—তোরা কি রকম বুঝছিস, ঠিক করে বল্ তো?

ইন্দু বলে—কি?

মাধব—এই সব অশোকিজমের মানেটা কি?

আমি বাধা দিয়ে বলি—একটু তলিয়ে বুঝতে চেষ্টা কর মাধব। চট করে প্রফেসর বসুর মত লোককে বাজে সন্দেহ করে বসিস না।

মাধব বলে—আরে না না, আমি সম্রাট অশোকের গ্রেটনেসটাই বুঝতে চাইছি, প্রফেসর বসুর কথা বলছি না।

ইন্দু বলে—ওই তো, প্রথম গ্রেটনেস হল অন্য সম্প্রদায়কে শ্রদ্ধা, দ্বিতীয় গ্রেটনেস মহাকরুণা।

মাধব উদাসভাবে বলে—শুধু এইটুকু জানলেই কি হিস্টরিতে পাশ করতে পারা যাবে?

ঠিকই বলেছিল মাধব। অশোকের গ্রেটনেস সম্বন্ধে আমাদের জানবার যে আরও অনেককিছু বাকি আছে, সেটা আমরা আর ক'দিন পরে বুঝতে পারলাম।

সেদিন আমাদের ইতিহাসের ক্লাসটাই কেমন যেন চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। ক্লাস-ঘরের বাতাসটা যেন ভোরবেলার ফুলবনের হাওয়ার মত হঠাৎ ফুরফুরে হয়ে গেল, তার মধ্যে অদেখা মধুপের গুঞ্জনও যেন ঘুরে বেড়ায়। এমন অভিনব কোন ঘটনা নয়; ক্লাসের প্রথম সারি থেকে একটু তফাতে নতুন একটা ডেস্কের কাছে একটি নতুন মুখ দেখা যায়। একটি ছাত্রী।

প্রফেসর বসু ক্লাস-ঘরে ঢুকেই নবাগন্তুকা ছাত্রীটির দিকে গম্ভীরভাবে তাকালেন। তারপর প্রশ্ন করার ভঙ্গীতে ডাক দিলেন, স্টেলা হেমব্রাম?

স্টেলা বলে, ইয়েস স্যার্।

প্রফেসর বসু—তুমি কোন্ স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করেছ?

—পালামৌ স্কুল থেকে।

—তোমার দেশ কোথায়?

—পালামৌ।

—এখানে তোমার কে আছেন?

—কেউ না।

—তুমি কোথায় থাক?

—আমি লুথারিয়ান মিশনের হোমে থাকি।

আর প্রশ্ন করলেন না প্রফেসর বসু। ইতিহাস পড়াতে আরম্ভ করলেন প্রফেসর বসু। তাঁর সেদিনের পড়াবার সেই ভঙ্গী, তাঁর বক্তৃতার সেই ভাষা এবং দেবানাং প্রিয় প্রিয়দর্শী মহারাজ অশোকের হৃদয়বত্তা সম্বন্ধে তাঁর সেই স্তব আজও ভুলতে পারিনি।

আমরা দেখে খুশি হলাম, স্টেলা হেমব্রামও মুগ্ধ হয়ে শুনছে প্রফেসর বসুর অদ্ভুত ভাববিভোর বক্তৃতার ভাষা। মনে হল, আমাদের চেয়েও বেশি মুগ্ধ হয়েছে স্টেলা।

আমাদের চেয়ে বয়সে একটু বড়ই হবে স্টেলা। ছিপছিপে শ্যামলা মেয়ে। একটা ধবধবে সাদা শাড়ি বড় সুন্দর করে যেন লতিয়েলতিয়ে স্টেলার ছিলছিপে শরীরটাকে জড়িয়ে ধরে আছে। খোঁপার ছাঁদটাও অদ্ভুত, দুটো মহুয়া ফুল গোঁজা রয়েছে। এখান থেকে পালামৌ অনেক দূর। মনে হয়, সেই দূর পালামৌয়ের এক মহুয়াবনের বুকের ভিতর থেকে পথহারানো এক চঞ্চল-চিত্তা হরিণী এখানে এই কলেজের ইতিহাসের ক্লাসের ভিড়ের মধ্যে এসে পড়েছে। ঝরনার জল খায়, আর কচি শালের গায়ে হেলান দিয়ে জংলা চাঁদের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে, সেই রকম একটি প্রাণ। পাহাড়ী ডিহির একটা কালো মেয়ে বটে, কিন্তু কী সুন্দর ওর চোখের চাউনি! দাঁতগুলো যেন মুক্তো দিয়ে মাজা, কথা বললে ঝিক করে ঠোঁটের ফাঁকে যেন এক টুকরো জোৎস্না হেসে ওঠে।

অনেকক্ষণ আমরা আনমনা হয়ে এইসব কথাই ভাবছিলাম। হঠাৎ শুনতে পেলাম, প্রফেসর বসু বলছেন—সম্রাট অশোকের সবচেয়ে মহৎ কীর্তি কি? কেন তিনি ইতিহাসের মহত্তম মানুষ? তিনি ছিলেন প্রেমিক। সে প্রেম সেকালের সঙ্কীর্ণ আর্য আভিজাত্যের বন্ধনে বাঁধা ছিল না। তিনি অনার্যকে আপন করে নিয়েছিলেন শুধু মুখের কথায় নয়, প্রেমের উপহারে। সেই বিদিশা নগরের উপান্তে এক অরণ্যময় রাজ্যের এক ভীলকন্যাকে তিনি বিবাহ করেছিলেন।

দেখলাম স্টেলার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠেছে! রুমাল দিয়ে কপা-

লের ঘাম মুছে স্টেলা আবার প্রফেসর বসুর ভাববিভোর সেই সুশ্রী মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। স্টেলার চোখে একটা ভীরু বিস্ময়ও যেন ছলছল করে।

চলছে ইতিহাসের ক্লাস। মাত্র ওই একটি দিনই স্টেলার চোখের বিস্ময়টাকে ভীরু-ভীরু মনে হয়েছিল। কিন্তু তারপর আর নয়। প্রফেসর বসুর বক্তৃতা শোনে স্টেলা, যেন বাঁশির শব্দ শুনছে হরিণী। প্রফেসর বসুও যেভাবে ও যে-ভঙ্গীতে বক্তৃতা করেন, দেখে-শুনে মনে হয় যে,এই ক্লাসের মধ্যে যেন একটি মাত্র শ্রোতাই আছে, এবং শুধু তাকেই মুগ্ধ করে দেবার জন্য তিনি বক্তৃতা করছেন। ডু ইউ ফলো স্টেলা ? শুধু স্টেলাকেই প্রশ্ন করেন। আমরা কি বুঝলাম বা না বুঝলাম, তার জন্য প্রফেসর বসুর মনে বিশেষ কোন কৌতূহল আগের মত সেরকম কোন প্রশ্ন হয়ে বেজে ওঠে না।

ক্লাসের বাইরেও অবস্থাটা যে এত তাড়াতাড়ি প্রায় এই রকম অদ্ভুত হয়ে উঠবে, সেটা অনুমান করতে পারিনি। কোন রবিবারের সকালে সিতারা মঞ্জিলে গিয়ে প্রফেসর বসুকে আর দেখতে পাই না। মালী বলে—ভোর হতে না হতেই তিনি দামাস্কা গোলাপের তোড়া হাতে নিয়ে কোথায় যেন গিয়েছেন।

আমরা আশ্চর্য হই। মাধব বলে, হুঁ। ওই সীতাগড় পাহাড়ের গুহার গায়ে তো কোন ব্রাহ্মীলিপি লেখা নেই। শালের জঙ্গলে শুধু উইঢিপি আছে ; কোন স্তূপ আর স্তম্ভ তো নেই। ইতিহাসের কোন্ রহস্য সন্ধানের জন্য দামাস্কা গোলাপের তোড়া হাতে নিয়ে কোথায় কোন্‌দিকে চলে যান প্রফেসর বসু ? ইতিহাসের সঙ্গে দামাস্কা গোলাপেরই বা কি সম্পর্ক থাকতে পারে ?

ইন্দু বলে—সম্রাট অশোক নিশ্চয় গোলাপ ফুল ভালবাসতেন।

মাধব প্রশ্ন করে—তা না হয় হল, কিন্তু গোলাপ ফুল নিয়ে যেতেন কোথায় ? কাকে দেবার জন্য ?

আমি বলি—আমার মনে হয়, বিদিশার কাছে সেই অরণ্যময় রাজ্যের সেই অনার্যা ভীলমেয়েকে ফুলের তোড়া উপহার দিতেন প্রিয়দর্শী অশোক।

ভালই তো। কল্পনা করতে ভালই লাগে, যেমন সম্রাট অশোকের উপর তেমনি প্রফেসর বসুর উপরেও আমাদের শ্রদ্ধাটাই যেন আরও বিস্মিত হয়। কত উদার, কত মহৎ, আর কী সুন্দর ওই প্রেমে-ভরা মন! বেচারা স্টেলা, নেহাতই গরিব এক পাহাড়ী ডিহির মেয়ে। খবর পেয়েছি, স্টেলার বাবা পালামৌ হাসপাতালে কম্পাউণ্ডারের কাজ করেন। স্টেলার সঙ্গে প্রফেসর বসুর যদি বিয়ে হয়ে যায়, তবে সেটা অতি সুন্দর একটা ঐতিহাসিক ব্যাপারই হবে।

হবেই বোধ হয়। তার প্রমাণও পেয়ে গেলাম। ইতিহাসের ক্লাসে নয়, ইংরেজীর ক্লাসে সেদিন একটা ঘটনা সত্যিই একেবারে অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণ করে দিল যে, আমরা ঠিকই ধারণা করেছি।

ছোট্ট এক টুকরো কাগজের উপর কয়েকটা অক্ষর—স্টেলা বসু। লিখেছিল রাঁচির সেই দুর্দান্ত হরিপদ। কাগজটা একটা মোড়কের মত ভাঁজ করে, তার-

পর এদিক ওদিক তাকিয়ে নিয়ে স্টেলার গায়ের উপর ছুঁড়ে দিল হরিপদ। আনমনা স্টেলা চমকে ওঠে। কাগজের মোড়ক খুলে নিয়ে লেখাটা পড়ে। আমাদের বুক ভয়ে দুর-দুর করে! কিন্তু স্টেলার দু'চোখে অদ্ভুত রকমের একটা হাসিমাখা আভা যেন ঝিলিক দিয়ে শিউরে ওঠে। ঠোঁটের ফাঁকে ধবধবে সাদা দাঁতের জ্যোৎস্না দেখা যায়। কাগজের টুকরোটাকে বইয়ের ভাঁজের ভিতর রেখে দেয় স্টেলা। লেখাটা যেন ওর জীবনের এক নতুন ইতিহাসের শিলালিপি; যেন অতি সাবধানে, বেশ যত্ন করে আর অনেক মায়া করে কুড়িয়ে নিয়ে সেই লিপিকে বুকের কাছে গোপন করে রাখতে চায় স্টেলা।

কলেজ থেকে বাড়ি ফেরার পথেও একদিন দেখতে পাই, দূরে একটা ইউ-কালিপটাসের গা ঘেঁষে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে স্টেলা। মনে হয়, আনমনা হরিণীর মত খামকা দাঁড়িয়ে আছে স্টেলা। কিংবা হয়তো পাখির ডাক শুনছে, অথবা কাঠবিড়ালীর খেলা দেখছে। তারপরেই বুঝেছি, খামকা নয়, একজনের আসার আশাপথ চেয়ে প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে স্টেলা। সত্যিই, ক্লাসের পড়ানো শেষ করে দিয়ে প্রফেসর বসু যখন ধীরে ধীরে হেঁটে হেঁটে স্টেলার কাছে এসে দাঁড়ালেন, তখন যেন একটা খুশির মলয় বাতাস লেগে দুলে উঠল স্টেলার সেই ছিপছিপে লতার মত শরীরটা। হেলে দুলে প্রফেসর বসুর সঙ্গে গল্প করতে করতে চলে গেল স্টেলা।

ভালই তো। মন্দ কি? নিন্দে করবার কি আছে? দেখে বরং খুশি হওয়াই উচিত যে প্রফেসর বসু শুধু মুখের কথায় আদর্শ প্রচার করেন না। প্রিয়দর্শী অশোকের মনের মত সুন্দর একটি উদার মন পেয়েছেন প্রফেসর বসু, তাই তো স্টেলার মত মেয়েকে ভালবাসতে পেরেছেন!

এখন শুধু প্রশ্ন, কবে শুনতে পাব স্টেলার সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে প্রফেসর বসুর? তারিখটা জানতে পারলে হয়। কারণ আমাদেরও তৈরী হতে হবে, অশোকিস্ট প্রফেসর বসুর মত মানুষের বিয়েতে যে উপহার মানায়, ঠিক সেই রকম একটি উপহার দিতে হবে। ইন্দু বলে—সবাই মিলে চাঁদা তুলে রূপোর একটা সাঁচিস্তূপ উপহার দিলে কেমন হয়?

মাধব বলে—খুব ভাল হয়।

দেখেছিলাম, প্রফেসর বসুর ঘরের টেবিলের উপর সিমেন্টের তৈরী সাঁচি-স্তূপের একটা মডেল আছে। মডেলটাকে দু-চার দিনের জন্য প্রফেসর বসুর কাছ থেকে ধার নেওয়া দরকার। তা হলে মধু স্যাকরাকে দিয়ে একটা রূপোর সাঁচি গড়িয়ে নিতে অসুবিধে হবে না।

শুধু এই উদ্দেশ্য, আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না, আমরা হঠাৎ এক রবিবার সন্ধ্যায় সোজা সিতারা মঞ্জিলে গিয়ে প্রফেসর বসুর ঘরের দরজায় কড়া নেড়ে হাঁক দিলাম—আমরা এসেছি স্যার্।

দরজা খুলে দিলেন প্রফেসর বসু, এবং আমরা ঘরে ঢুকেই চমকে উঠলাম।

একটা চেয়ারের উপর বসে আছে স্টেলা হেমব্রাম।

মাধব অপ্রস্তুত হয়ে বলে—আমরা তা হলে এখন চলে যাই স্যার; না হয় আর একদিন আসব।

প্রফেসর বসু বলেন—হাঁ, আজ যাও। কিন্তু সম্রাট অশোকের জীবনের একটি নীতিকেও জেনে যাও। অশোকের নির্দেশ ছিল, যে-কোন ব্যক্তি যে কোন শুভ-কাজের দরকারে অবাধে ও স্বচ্ছন্দে তাঁর শয়নঘরের ভেতরেও চলে আসতে পারবে। কোন বাধা ছিল না। তোমরাও আসবে, আজ যেমন স্টেলা তার জীবনের মস্ত একটা দরকারী কথা বলবার জন্য এসেছে।

এতক্ষণ যেন পাথরের চোখের মত স্তব্ধ হয়ে জানালার দিকে তাকিয়ে ছিল স্টেলার চোখ দুটো। হঠাৎ ভয় পেয়েছিল বোধহয়। কিন্তু এইবার ছটফট করে ওঠে, যেন রুমাল দিয়ে চোখ দুটো আড়াল করতে চায় স্টেলা! খোঁপা থেকে আলগা হয়ে টুপ করে একটা ফুল মেঝের উপর ঝরে পড়ে। দেখতে পেলাম, হাসছে স্টেলা। চোরা হাসি, লাজুক হাসি, কিন্তু একেবারে নির্ভয় একটা হাসি।

কী আশ্চর্য, ইতিহাসের ক্লাসে আজ স্টেলাকে দেখতে পাচ্ছি না কেন? শুধু সেদিনই নয়, পর পর আরও কয়েকটা দিন পার হয়ে গেল, স্টেলা আর আসে না। ইংরেজীর আর লজিকের ক্লাসেও স্টেলাকে দেখা যায় না।

প্রফেসর বসুর ইতিহাসের বক্তৃতাগুলিও কেমন যেন সুর বদল করেছে বলে মনে হয়। কিন্তু সেই একই কথা। প্রিয়দর্শী মহারাজ অশোকের বিরাট ব্যক্তিত্ব, বলিষ্ঠ চরিত্র, মহৎ হৃদয়বত্তা আর অপূর্ব কর্তব্যনিষ্ঠার কথা।

প্রফেসর বসু বললেন—চারুবাবু আবার আমাকে ঠাট্টা করেছেন। আমাকে করিম সাহেবের সঙ্গে এক টেবিলে বসে মুরগী খেতে দেখে ঠাট্টা করেছেন, এ কেমন অশোকিজম? কিন্তু চারুবাবু জানেন না যে, অশোক ময়ূরের মাংস খেতেন এবং পাণিনির টীকাকার কাত্যায়নের মতে মোরগ হল ময়ূরবর্গের পাখি।

বলতে বলতে প্রফেসর বসুর স্বর যেন আরও গম্ভীর এবং আরও গভীর হয়ে গেল।—যারা ইতিহাসের কিছুই জানে না, তারাই বুঝতে এই ভুল করে। তারা জানে না যে, প্রিয়দর্শী অশোক ছিলেন বাইরে কোমল, কিন্তু ভিতরে রুদ্র। কর্তব্যের চেয়ে বড তাঁর কাছে আর কিছুই ছিল না। কর্তব্যের জন্য তিনি হত্যার নির্দেশ দিতেও দ্বিধা করতেন না। অশোকের গিরিলিপি বলে, যো পি চ অপ-করেয় তি ছমিতবিয়মতে বো দেবানং প্রিয়সয়ং শকো ছমনয়ে—যদি কেউ আমার অপকার করে তবে যতক্ষণ পর্যন্ত ক্ষমা করা চলে শুধু ততক্ষণই আমি তাকে ক্ষমা করব।

বোধহয় চারুবাবুকে আর ক্ষমা করা চলে না, চারুবাবুকে একটা শিক্ষা দিতে চান প্রফেসর বসু। কিন্তু বুঝতে পারি না, চারুবাবুর ঐ সব ঠাট্টায় কী এমন

ভয়ানক অপকার হয়েছে প্রফেসর বসুর ?

কিন্তু এ কি ? এ সব আবার কি বলছেন প্রফেসর বসু ? কী অদ্ভুত কথা—প্রিয়দর্শী মহারাজ অশোকের জীবনের সে এক চরম পরীক্ষা। পাটলিপুত্র তাঁকে ডাকছে, কর্তব্যের ডাক। কিন্তু বিদিশার নিকটে অরণ্যখণ্ডের সেই অনার্যা ভীল নারী তাঁর জীবনের বাধা হয়ে উঠল। সেই বাধাকে অনেক দিন ধরে ক্ষমা করলেন অশোক, কিন্তু যখন আর ক্ষমা করা চলে না, তখন তিনি চলে গেলেন, এবং জীবনে আর তার কাছে ফিরে আসেননি।

ঘণ্টা বেজে উঠল। হনহন করে হেঁটে ক্লাস ছেড়ে চলে গেলেন প্রফেসর বসু।

রূপোর সাঁচি-স্তূপ তৈরী করবার দরকার হবে কি হবে না, ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। তাই সেদিন দুর্ভাবনা নিয়ে সিতারা মঞ্জিলের দিকে আমরা এগিয়ে যাচ্ছিলাম। ফটকের কাছে পৌঁছতেই দেখি, সেই স্টেলা হেমব্রম আস্তে আস্তে হেঁটে সিতারা মঞ্জিলের ভিতর থেকে বের হয়ে আসছে। আমাদের দেখতে পেয়ে থমকে দাঁড়াল স্টেলা। রুমাল দিয়ে যেন শক্ত করে চোখ দুটোকে চেপে রইল। কি ব্যাপার ? স্টেলার ঠোঁটের ফাঁকে সাদা দাঁতের জ্যোৎস্না কেন হেসে ওঠে না ? খোঁপাতে ফুল নেই কেন ? থরথর করে কাঁপছে কেন ওর ছিপছিপে লতার মত শরীরটা ?

আমরা কোন প্রশ্ন করবার আগেই আস্তে আস্তে হাঁপাতে হাঁপাতে ক্লান্ত রোগীর মত চলে গেল স্টেলা।

সিতারা মঞ্জিলের ফটক পার হয়ে ভিতরে ঢুকতেই চেঁচিয়ে উঠল মালী—মাস্টার সাহেব নেহি হ্যায়।

মাধব—তার মানে ? কোথায় গিয়েছেন মাস্টার সাহেব ?

মালী বলে—কলকত্তা।

আশ্চর্য হলাম, কিন্তু আরও একটু আশ্চর্য হওয়া বাকি ছিল। সেদিন চারুবাবুর বাংলা ক্লাসই আমাদের মনের সব প্রশ্নগুলিকে যেন একটা আছাড় দিয়ে গুঁড়ো করে দিল।

পড়াতে গিয়ে হাসছিলেন চারুবাবু এবং আমাদের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ প্রশ্ন করে বসলেন,—গ্রেট ইন্‌টেলেকচুয়াল প্রফেসর বসুর খবর শুনেছ তো ?

—কিছুই শুনিনি স্যার্।

—তাঁর বিয়ে। কলকাতার এক মস্ত বড়লোকের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে। মেয়ের বাপের সব সম্পত্তি যৌতুক পাবেন প্রফেসর বসু। তাই আড়াই শো টাকা মাইনের মাস্টারি ছেড়ে দিয়ে চলে গিয়েছেন।

ইন্দু ফিসফিস করে মাধবের কানের কাছে বলে—এ কি কাণ্ড ? কিছু বুঝতে পারছিস মাধব ?

মাধব বলে—ঠিক বুঝতে পারছি না।

ইন্দু—কেন ?

মাধব—অশোক দি গ্রেট কথাটা মনে পড়তেই মাথাটা যেন চেঁচিয়ে উঠছে : বিমল বসু দি গ্রেট !

স্ব ম হি ম চ্ছা য়া

দেশী মানুষ হয়ে বিলাতী সদাগরী অফিসের ছোট সাহেব হওয়া সাধারণ ব্যাপার নয়। আজ পর্যন্ত ক'জনই বা এরকম অসাধারণ প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন ?

পেয়েছেন নিখিল মিত্র। যাঁরা বিশেষ কিছু খবর রাখেন না, তাঁরাই শুধু ভেবে আশ্চর্য হন, কেমন করে নিখিল মিত্রের মত এত সাধারণ বিদ্যার একজন মানুষ এরকম অসাধারণ একটা পদের অধিকার পেয়ে বসলেন। অফিসটাও নিতান্ত সাধারণ রকম কারবারের অফিস নয়। এদিক থেকে পাট গালা আর অভ্রের রপ্তানি, আর ওদিক থেকে ইস্পাত ও নানা কেমিক্যালের আমদানি। অফিসের বড়-বড় ঘরের বড়-বড় আলমারিতে বড়-বড় ফাইলের স্তূপ দেখে বোঝা যায়, এই অফিস বছরে কয়েক কোটি টাকার হিসাব নাড়াচাড়া করে। সেইসঙ্গে উঠে বসে আর নড়চড় করে বেড়ায় কয়েক শত মানুষের জীবিকা। সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, সুপারভাইজর, ইনস্পেক্টর, ক্লার্ক, টাইপিস্ট, পিয়ন, বেয়ারা আর চাপরাসি। অনেক মানুষের জীবনের উপরে করুণা করবার, ভাল করবার, এবং এমন কি ইচ্ছে করলে ক্ষতিও করবার ক্ষমতা নিশ্চয় আছে তাঁর, যাঁর নাম নিখিল মিত্র, যিনি এই সদাগরী অফিসের ছোটসাহেব।

যাঁরা কিছু কিছু খবর রাখেন, তাঁরা জানেন, নিখিল মিত্র ভাগ্যের জোরে এই অফিসের ছোটসাহেব হয়েছেন। একচল্লিশ বছর ধরে এই অফিসের বড়বাবু ছিলেন যিনি, তিনি ছিলেন নিখিল মিত্রের কাকা। ভাই-পো'র ভাল করবার জন্য অনেক চিন্তা করতেন কাকা এবং মারা যাবার আগের দিন রোগশয্যা থেকে চিঠি লিখে বড়সাহেব আর ডিরেক্টরদের কাছে শেষ অনুরোধ জানিয়েছিলেন, তাঁর ভাই-পো নিখিল মিত্রকে যেন বিশেষ অনুগ্রহ করে বিশেষ একটা ভাল পোস্ট দেওয়া হয়। একচল্লিশ বছর ধরে অনেক নিষ্ঠা পরিশ্রম আর সুপরামর্শ দিয়ে এই সদাগরী কোম্পানীর অনেক উন্নতি ঘটিয়েছিলেন যিনি, তাঁর শেষ অনুরোধের সম্মান তুচ্ছ করেননি কোম্পানীর ডিরেক্টর বোর্ড, এবং বড়সাহেবও। সাধারণ বিদ্যার মানুষ, যে নিখিল মিত্র একটা অতি সাধারণ চাকরির ভরসাও ছেড়ে দিয়ে, আর নিজেরই সম্পর্কে বড় বেশি হতাশ হয়ে ঘরে বসেছিলেন, সেই নিখিল মিত্র অকস্মাৎ একদিন লণ্ডনগামী জাহাজে উঠে বসলেন। অনুগ্রহ করেছে কাকার কাছে কৃতজ্ঞ কোম্পানী। এক বছরের মত কোম্পানীর লণ্ডন অফিস থেকে কিছু-কিছু কাজের শিক্ষাদীক্ষা নিয়ে কলকাতায় ফিরে এলেন নিখিল মিত্র। সেই থেকে তিনি কোম্পানীর কলকাতা অফিসের ছোটসাহেব।

যেদিন ছোটসাহেব হয়ে এই অফিসের ঐ কামরায় ঐ চেয়ারটিতে প্রথম

বসেছিলেন নিখিল মিত্র, সেদিন তিনি মনে মনে তাঁর ভাগ্যকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন। কাকার স্নেহের কথা মনে রেখে চোখ ছলছলও করে উঠেছিল, এবং সেই সঙ্গে নিজেরই উপর খুশি হয়ে উঠেছিলেন। এক বছর আগেও নিজের সম্বন্ধে যিনি হতাশ হয়েছিলেন, তিনি তাঁর ছোট-সাহেবী জীবনের প্রথমদিনে প্রথম ঘটনাতে নিজের উপর যে শ্রদ্ধা বোধ করে ফেললেন, সেই শ্রদ্ধা আজও তাঁর প্রতিক্ষণের চিন্তার মধ্যে সজাগ হয়ে রয়েছে। বাইশ বছরের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ভাদুড়িমশাই নিখিল মিত্রের কামরার ভিতরে ঢুকেই মাথা হেঁট করে আর হাত তুলে অভিবাদন জানিয়েছিলেন। যাবার সময়ও হেঁট মাথা দুলিয়ে আর যে-আজ্ঞে-স্যার বলে চলে গিয়েছিলেন ভাদুড়িমশাই। সেই মুহূর্তে নিজেকে নতুন করে চিনতে আর বুঝতে পেরেছিলেন নিখিল মিত্র। তাঁর ভাগ্য অসাধারণ, তাই তিনিও অসাধারণ। নিজেকে অসাধারণ বলে সত্যই মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেছিলেন। হঠাৎ অ্যাকাউন্টেন্টের ঘরের ভিতরে গিয়ে দাঁড়াতেই আর একটা দৃশ্য দেখতে পেয়েছিলেন নিখিল মিত্র। ঘরের সব মানুষ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। অত্যন্ত সৌজন্যের সঙ্গে এবং নম্রস্বরে কথা বলেছিলেন নিখিল মিত্র—বসুন, বসুন, সবাই বসুন।

এভাবে সৌজন্য প্রকাশ করতেও যে এত আনন্দ আছে, আগে কল্পনা করতে পারেননি নিখিল মিত্র। তাঁর মুখের একটা সামান্য কথা, কিন্তু তারই মধ্যে কত-বড় আদেশের শক্তি! সত্যিই তাঁর কথার ইঙ্গিতে এতগুলি মানুষের জীবন উঠছে আর বসছে।

লক্ষ্য করলেন নিখিল মিত্র, তার এত সরল ও উদার সৌজন্যের নির্দেশ শুনেও এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে রইলেন। ভদ্রলোকের চোখে কেমন যেন বিনীত ও লজ্জিত একটা কুণ্ঠার ভাব। ছোটসাহেব দাঁড়িয়ে আছেন, তাই বোধহয় চেয়ারে বসতে পারছেন না ভদ্রলোক।

—আপনি বসুন। ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে কথা বললেন নিখিল মিত্র। ভদ্রলোক কাঁচুমাচু হয়ে বললেন—বসছি স্যার। কিন্তু বসলেন না। যেন ছোট-সাহেবের অসাধারণ মর্যাদা কিছুতেই ভুলতে পারছেন না সেই ভদ্রলোক, যাঁর নাম নিতাইবাবু, এই ঘরের টাইপিস্ট।

নিতাইবাবুর এই অতিবিনীত ভঙ্গীটিকেও দেখতে ভাল লাগে নিখিল মিত্রের। নিখিল মিত্রের সৌজন্যের অনুরোধ অমান্য করে টাইপিস্ট নিতাইবাবু যেন পৃথিবীʼ এই নতুন সত্যকে অত্যন্ত স্পষ্ট করে ঘোষণা করছে, নিখিল মিত্র কত অসাধারণ। কত বড় সম্মানের আস্পদ। টাইপিস্ট নিতাইবাবুকে বড়ই ভালমানুষ বলে মনে হয়; সকলের চেয়ে নিতাইবাবুকে দেখতে একটু বেশি ভাল লাগে।

বোধহয় ছোটসাহেবী জীবনের প্রথম দিনেই এই ধরনের কয়েকটা ঘটনার পর নিখিল মিত্রের ধারণা অনুভব আর বিশ্বাসের জগতে ছোট-খাট একটা

বিপ্লব ঘটে গিয়েছিল। অফিসঘরের এতগুলি হেঁট-মাথা মূর্তি যেন তাঁর জীবনের অত্যুচ্চ কৃতিত্বের প্রত্যক্ষ স্বীকৃতি। এই সম্মান, এই ক্ষমতা, আর এই দায়িত্ব, এই সবই কি নিতান্ত ভাগ্যের দান? না, ভাগ্যের অনুগ্রহ তাঁকে কৃতী করে তুলেছে, একথা ঠিক কথা নয়। তিনি কৃতী বলেই ভাগ্য তাঁকে অনুগ্রহ করেছে। নইলে ইকনমিক্সের ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট এম-এ ঐ সলিল সেনের জীবনে এরকম একটা ভাগ্যের অনুগ্রহ ঘটে না কেন? যে সলিলের কথা মনে পড়তে আগে শ্রদ্ধা জাগত নিখিল মিত্রের মনে, আজ মনে শুধু জাগে একটু দুঃখ আর একটু করুণা। কোন্ এক স্কুলের টিচার হয়েছে সলিল। নিখিল মিত্র কল্পনা করেন, সলিলের একটু উপকার করলে কেমন হয়? এই অফিসেই সিনিয়র গ্রেডের কোন একটা কেরাণীর পোস্টে সলিলকে বসিয়ে দিতে পারলে সলিল নিশ্চয় নিখিলের কাছে আজীবন কৃতজ্ঞ হয়ে থাকবে।

যাই হোক, যদিও একটা বছর পার হয়ে গিয়েছে, কিন্তু আজও কলেজ-বন্ধু সলিল সেনের কোন উপকার করে উঠতে পারেননি নিখিল মিত্র। মনে হয়েছে, সলিলের ডিপ্লোমাই সার, অসার, মাথা ঘামাবার কোন কাজেরই যোগ্য নয় সলিল। এক বছর ধরে নিজের এই অসাধারণ কৃতী জীবনের সত্যতাকেই শুধু অনুভব করেছে নিখিল মিত্র এবং সেই অনুভব একটি সুন্দর বিশ্বাস হয়ে উঠেছে।

নিখিল মিত্রের এই সুন্দর বিশ্বাস একেবারে ধন্য হয়ে যায় এই পৃথিবীরই বিশেষ একজনের দুটি সুন্দর হর্ষদীপ্ত চক্ষুর কাছে। নিখিল মিত্রের স্ত্রী মীরা মিত্র যখন মুগ্ধ হয়ে নিখিল মিত্রের কৃতী জীবনের প্রাত্যহিক ঘটনার গল্পগুলি নিখিল মিত্রের মুখ থেকে শুনতে শুনতে মুগ্ধ হয়ে যান, তখন মনে হয় নিখিল মিত্রের, তাঁর অসাধারণ কৃতী জীবনের স্বীকৃতি যেন এতক্ষণে পূর্ণ হয়ে উঠলো।

মীরা মিত্র হলেন তেমন এক সাধারণী নারী, যিনি স্বামীর প্রতিষ্ঠায় নিজেরই জীবনের প্রতিষ্ঠা এবং স্বামীর সম্মানে নিজেরই সম্মান বোধ করেন। স্বামীর কৃতিত্বের মধ্যে নিজেরই জীবনের গর্ব অনুভব করার মত মন আছে, আগ্রহও আছে মীরা মিত্রের।

—আসছে পূজার বোনাসের জন্য কলকাতা অফিসের স্টাফের প্রায় সাড়ে তিনশ' মানুষ আমার মুখের দিকে আশা করে তাকিয়ে আছে।

মীরা মিত্রের দিকে তাকিয়ে একথা বলতে অদ্ভুত একটা উদারতার মহিমা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে নিখিল মিত্রের দুই চোখে। মীরা মিত্র বলেন—তুমিই তো ওদের একমাত্র ভরসা। তোমাকেই তো এসব ভাবতে হবে, তুমি ছাড়া ওদের উপকার করবার আছেই বা কে? বলতে গিয়ে মীরা মিত্রের দুই চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

নিখিল মিত্রের আনন্দ হলো মীরা মিত্রের দুই চোখের ঐ উজ্জ্বলতাটুকু, মীরা মিত্রের কথাগুলির অর্থ টুকু বোধহয় নয়। নিখিল মিত্রের ক্ষমতা, প্রতিষ্ঠা,

অধিকার ও কৃতিত্বের গৌরব মীরা মিত্রের ঐ বিশ্বাসভরা ও সপ্রশংস দুই চক্ষুর দৃষ্টির মধ্যে ঝকঝক করছে।

অফিসে এবং ঘরে, দুই ভিন্ন জগতের ক্রোড়ে নিখিল মিত্রের কৃতী জীবনের গৌরব এইভাবে মানুষের সপ্রশংস দৃষ্টির অভিনন্দনে স্বীকৃত হয়ে রয়েছে। অফিসে টাইপিস্ট নিতাইবাবু, এবং এঁরই মত আরও অনেকজন। আর ঘরে স্ত্রী মীরা মিত্র। তবে পার্থক্য আছে। অফিসের সপ্রশংস ও বিনীত দৃষ্টিগুলির মধ্যে যেন একটা ভঙ্গী আছে। নিখিল মিত্রের বুদ্ধি অন্ধ নয়, এবং বুঝতে পারে যে, টাইপিস্ট নিতাইবাবু ও তাঁর মত আরও অনেকে নিখিল মিত্রের ছোটসাহেবী জীবনকে একটি অসাধারণ কৃতিত্বের জীবন বলে বিশ্বাস করুক বা না করুক, অন্ততঃ বিশ্বাসের ভঙ্গী দিয়ে স্বীকার করে নিচ্ছে। একটু খাদ, সামান্য একটু ভেজাল নিশ্চয় আছে অফিসের এইসব সুবিনীত ভঙ্গীগুলির মধ্যে। থাকুক, তবু দেখতে ভাল লাগে। কিন্তু সবচেয়ে ভাল দেখতে মীরা মিত্রের দুটি স্মিত চক্ষুর সপ্রশংস দৃষ্টি। ওর মধ্যে কোন ভেজাল নেই! মীরা মিত্রের ঐ দৃষ্টি বিশ্বাসের ভঙ্গী নয়, ওটা বিশ্বাস। তাইতো ছোটসাহেবী জীবনের প্রতিদিনের নানা তুচ্ছ ঘটনার গল্প মীরা মিত্রের কাছে বর্ণনা করে করে নিখিল মিত্রের জীবনের প্রতিটি সন্ধ্যা তৃপ্ত হয়।

ভালই ছিলেন নিখিল মিত্র, কিন্তু টাইপিস্ট নিতাইবাবু একদিন একটা অদ্ভুত খবর শুনিয়ে নিখিল মিত্রের মনের মধ্যে কেমন যেন একটা অস্বস্তি ছড়িয়ে চলে গেলেন। আর একজন টাইপিস্ট, নিতান্ত সি-গ্রেডের মানুষ, যাঁর নাম হরেন নিয়োগী, যিনি অ্যাকাউন্টস দপ্তরের এক কোণে বসে থাকেন, সেই হরেন নিয়োগী নাকি অফিসে বসেই মোটা মোটা বই পড়েন। একটা বই-এর নামও বলে দিয়ে গেলেন নিতাইবাবু, ফিলসফির বই! সেই মুহূর্তে অর্ডার লিখলেন নিখিল মিত্র, অফিসে বসে কেউ যেন বাইরের বই না পড়ে।

তার পরের দিন হরেন নিয়োগীর টেবিলের কাছে এসে দাঁড়িয়ে লোকটিকে ভাল করে দেখলেন নিখিল মিত্র। ছোটসাহেবকে দেখে হরেন নিয়োগী উঠে দাঁড়ালেন, বসতে বলা মাত্র বসে পড়লেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে টাইপ করে যেতে লাগলেন। বিনীত ভঙ্গী নেই, অবিনীত ভঙ্গিও নেই। লোকটা বিশেষ ভদ্রও নয়, অভদ্রও নয়। যেন একটা নিরেট নিখুঁত কর্তব্যের যন্ত্র।

সারা অফিসের মধ্যে এই প্রথম একটি মানুষকে দেখলেন নিখিল মিত্র, যাকে দেখলে মন অপ্রসন্ন হয়। অফিসের মধ্যে ঘুরে ফিরে নানা প্রসঙ্গের কথা বলতে থাকেন নিখিল মিত্র। ছোটসাহেবের ভাষণ সকলেই মুগ্ধ হয়ে শুনতে থাকে, এবং সকলেই কিছুক্ষণের জন্য কলম থামিয়ে রাখে। শুধু হরেন নিয়োগীর টাইপ-রাইটার অক্লান্ত ও একঘেয়ে শব্দে বাজতে থাকে। ছোটসাহেব হাত তুলে ইঙ্গিতে হরেন নিয়োগীকে থামতে বলেন। একবার হাসেন নিখিল মিত্র, তারপর

প্রায় চেঁচিয়ে বলতে থাকেন,—আপনারা পড়েছেন আজকের কাগজে, দেশ-বিখ্যাত দার্শনিক শাস্ত্রী মশাই-এর বক্তৃতা?

কেউ কেউ বলেন—হ্যাঁ স্যার।

নিখিল মিত্র বলেন—কিন্তু ওগুলি কি বক্তৃতা, না উজবুগের প্রলাপ!

অফিসের চেয়ারে-চেয়ারে সমাসীন এক-একটি বিনীত মূর্তির মুখে হাসির উচ্ছ্বাস মুখর হয়ে ওঠে। টাইপিস্ট নিতাইবাবু বলেন—আপনি ঠিক বলেছেন স্যার।

দেখতে পেলেন নিখিল মিত্র, সি-গ্রেডের সেই মানুষটা, সেই টাইপিস্ট হরেন নিয়োগীর মুখটা চাবুক-খাওয়া জন্তুর মতন দেখাচ্ছে। যেন একটা দুঃসহ যন্ত্রণা অসহায়ের মত মুখ বুজে সহ্য করছে লোকটা। ঠিক হয়েছে, বেশ হয়েছে। যা চেয়েছিলেন নিখিল মিত্র, তাই হয়েছে। খুশি হয়ে ঘর ছেড়ে অন্য ঘরের কাজের জীবন দেখতে চলে গেলেন নিখিল মিত্র।

কিন্তু এই খুশির জের বেশিদিন রইল না। একটা সংবাদ এনে নিখিল মিত্রের মনে আবার একটা কাঁটার খোঁচা বিঁধিয়ে দিয়ে গেলেন নিতাইবাবু। হরেন নিয়োগীর একটা লেখা বের হয়েছে এক পত্রিকায়। ইংরেজী কবিতা সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ।

চমকে উঠলেন, এবং একটু পরেই সি-গ্রেডের মানুষ সেই হরেন নিয়োগীর টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ালেন নিখিল মিত্র। তারপর কাশলেন এবং একটু হাসলেন। পায়চারী করলেন কিছুক্ষণ, তারপর ঘরসুদ্ধ মানুষকেই যেন প্রশ্ন করলেন—আপনাদের কারও মনের মধ্যে কি কোন বাতিক আছে, কোন বাজে বাতিক? আই মীন, এইসব কবিতা-টবিতা সাহিত্য-টাহিত্য!

নিতাইবাবু বলেন—আমরা কাজের মানুষ স্যার, ওসব বাজে বাতিক-টাতিক আমাদের নেই।

নিখিল মিত্র বলেন—তবে শুনুন, এই ক'দিন আগে আপনাদের দেশের এক নামকরা কবি এসেছিলেন আমার কাছে, বললেন চাকরি চাই। পরীক্ষা করে দেখলুম, একটি আস্ত গবেট। কোন কাজেরই যোগ্য নয়।

হরেন নিয়োগীর মুখটা আবার চাবুকখাওয়া জন্তুর মুখের মত দেখায়। নিখিল মিত্র খুশি হয়ে চলে যান।

কিন্তু আবার এই খুশির জের বেশিদিন মনের মধ্যে থাকবার সুযোগ পায় না। আবার আসেন নিতাইবাবু, এবং চুপে চুপে হরেন নিয়োগীর আর একটা গোপন অপরাধের সংবাদ শুনিয়ে দিয়ে যান হরেন নিয়োগী—আজকাল বন্যা-পীড়িতদের জন্য চাঁদা যোগাড় করছে। সেদিন আবার জানা গেল, হরেন নিয়োগী কোন এক দাতব্য লাইব্রেরী কমিটির প্রেসিডেণ্ট হয়েছে।

ভাবতে ভাবতে আশ্চর্য হয়ে যান নিখিল মিত্র। হরেন নিয়োগী, ঐ বাজে লোকটা যেন ইচ্ছে করে মানুষকে জ্বালাবার জন্য মহাপুরুষ-মহাপুরুষ খেলা

খেলছে। মানুষটা যদি এতই গুণের মানুষ হয়ে থাকে, তবে এখানে সি-গ্রেডের জীব হয়ে পড়ে থাকে কেন? লোকটার কথা মনে পড়তেই নিখিল মিত্রের মনের সব বিশ্বাসের মধুরতা যেন তিক্ত হয়ে ওঠে। লোকটাকে বড় বেশি উদ্ধত আর অহংকারী বলে মনে হয়। অত্যন্ত বাধ্যভাবে এবং নিয়মমত কাজ করে চলে যায় হরেন নিয়োগী, এই নিখুঁত বাধ্যতাও যেন একটা বেপরোয়া অহংকার। কাজেও কোন ভুল হয় না। ছোটসাহেব দয়া করে ভুল ক্ষমা করে দেবেন, এই সুযোগ থেকেও নিখিল মিত্রকে বঞ্চিত রেখেছে হরেন নিয়োগী। কিন্তু ভুল কি করবে না কোনদিন?

হ্যাঁ, একদিন ভুল করলেন হরেন নিয়োগী, এবং নিখিল মিত্রের মনও প্রসন্ন হয়ে উঠলো। দু'দিন কাজে অনুপস্থিত হয়েছেন হরেন টাইপিস্ট এবং তৃতীয় দিনেও হরেন নিয়োগীর কোন ছুটি প্রার্থনার দরখাস্ত এল না। তার চেয়ে আরও ভাল, নিতাইবাবু খবর জানিয়ে গেলেন, এবং ছোটসাহেব নিখিল মিত্র জানলেন, নানা জায়গায় গানের আসরে গান গেয়ে বেড়াচ্ছেন হরেন নিয়োগী!

আশ্চর্য হন নিখিল মিত্র—কী আশ্চর্য, লোকটা গানও গাইতে পারে না কি?

নিতাইবাবু বলেন—ভয়ানক গাইতে পারে স্যার। কিন্তু আপনি কি এইভাবে বার বার ওকে ক্ষমা করতে থাকবেন স্যার?

নিখিল মিত্রের মুখটা হঠাৎ কঠোর হয়ে ওঠে।—আমি কালই ওকে সাসপেণ্ড করবো।

সন্ধ্যায় পার্কে বেড়িয়ে বাড়ি ফিরছিলেন নিখিল মিত্র। সঙ্গে মীরা মিত্র। অফিসের গল্প করছিলেন নিখিল মিত্র, এবং তাঁর ছোটসাহেবী জীবনের নানা খুঁটিনাটি গর্বের কৃতিত্বের ও সম্মানের নানা ঘটনার গল্প, তেমনি মুগ্ধ হয়ে শুনছিলেন স্বামীর সুখে সুখিনী মীরা মিত্র।

পার্কের গেট থেকে বের হয়ে ডাইনের ছোট রাস্তা দিয়ে একটু এগিয়ে যেতেই অকস্মাৎ থমকে দাঁড়ালেন মীরা মিত্র। নিখিল মিত্রও থামলেন।

একটু দূরে ছোট মাঠের উপর সামিয়ানার নীচে আলো-ছড়ানো একটা আসর। চারদিকে ঘন জনতার ঠাসাঠাসি একটা বৃত্ত। দূরের আসর থেকে এক মুঠো আলোর ঝলক এসে লুটিয়ে পড়েছে মীরা মিত্রের মুগ্ধ ও বিস্মিত দুটি চোখের উপর। কিন্তু এই বিস্ময় আলো-দেখা মুগ্ধতার বিস্ময় নয়, মীরা মিত্রের দুই কান মুগ্ধ হয়ে শুনছে একটা গানের সুর। কবীরের ভজন গাইছেন কোন্ এক গুণী।

মীরা মিত্র বলেন—এই ভজনটা আমি অনেকের মুখে অনেকবার শুনেছি, কিন্তু শুনতে এত ভাল কোনদিন লাগেনি।

একটু চুপ করে থেকে মীরা মিত্র বলেন—চল, কাছে গিয়ে শুনে আসি।

জীবনে এভাবে অপ্রস্তুত হবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না নিখিল মিত্র। আস-

রের কাছে এগিয়ে যেতেই যেন হঠাৎ-আহত মানুষের মত পা টলে উঠলো নিখিল মিত্রের। এতটা ভাবেননি নিখিল মিত্র, কিন্তু একেবারে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে, তাই সত্য হয়েছে। আসরের মাঝখানে বাস গান গাইছে সেই সি-গ্রেডের মানুষটা, টাইপিস্ট হরেন নিয়োগী। কাজ ফাঁকি দিয়ে সরে রয়েছে যে লোকটা, যাকে কালই সাসপেণ্ড করতে হবে।

দৃশ্যটা নানা কারণেই দুঃসহ। হরেন নিয়োগী যেন বিশ্বসংসারের রঙ্গমঞ্চে এক মহামহিম সম্মানের সিংহাসনে বসে রয়েছে। চারদিকে শত শত মুগ্ধ চক্ষুর অভিনন্দন। আসরের সামনের দিকে চেয়ারের উপরে যাঁরা বসে রয়েছেন, তাঁদের মধ্যে একজনকে চিনতে পারলেন নিখিল মিত্র। রেলওয়ের জনার্দন সাণ্যাল, যিনি যে-সে মানুষ নন, যাঁর অফিসারী গৌরব নিখিল মিত্রের সদাগরী অফিসারের ছোট-সাহেবী গৌরবের চেয়ে অনেক বড়। কী ভয়ানক বিশ্রীভাবে মাথা দুলিয়ে জনার্দন সাণ্যাল বারবার সাধুবাদ জানাচ্ছেন ভজন-মুখর ঐ হরেন নিয়োগীকে!

আরও আশ্চর্য করলেন স্বয়ং মীরা মিত্র। আসরের উদ্যোক্তাদের একজন এগিয়ে এসে অনুরোধ করতেই মীরা মিত্র এগিয়ে গেলেন, এবং একটি চেয়ারের উপর বসে পড়লেন। পিছনের দিকে, কিংবা পাশের নিখিল মিত্রের দিকে একবার তাকিয়ে দেখতেও ভুলে গেলেন মীরা মিত্র। মীরা মিত্র যেন বাঁশির স্বরে মুগ্ধ হরিণীর মত সব ভুলে ছুটে চলে গেলেন আসরের ভিতরে।

হরেন নিয়োগীর গান আসরের বাতাসকে মধুময় করে তুলেছে। চারদিকের জনতার চোখের মুগ্ধতা আর মুখের উল্লাসও যেন ভিন জগতের এক কৃতীর মহিমাকে অতি কঠোর এক সম্মানের কবচ দিয়ে রক্ষা করে রেখেছে। ওদিকে এগিয়ে যাবার যেন কোন অধিকার নেই, ক্ষমতা নেই, সাহসও হয় না নিখিল মিত্রের। নিখিল মিত্র শুধু ছায়ার মত মাঠের ফাঁকার মধ্যে পায়চারী করে বেড়াতে থাকেন। নিখিল মিত্রের মুখটা চাবুক-খাওয়া জীবের মত যন্ত্রণাক্ত হয়ে ওঠে।

আর কতক্ষণ? কতক্ষণে শেষ হবে ঐ গান? ঠিকই বলেছে নিতাই টাইপিস্ট, লোকটা ভয়ানক গাইতে পারে।

হরেন নিয়োগীর গান শেষ হয়। মীরা মিত্রও উঠে আসেন, এবং আসরের বাইরে এসে নিখিল মিত্রকে দেখতে পেয়েই আক্ষেপ করেন।—এখানে দাঁড়িয়ে থেকে কেন মিছামিছি সময় নষ্ট করলে?

নিখিল মিত্র প্রশ্ন করেন—তার মানে?

মীরা মিত্র বলেন—কাছে গিয়ে শুনলে বুঝতে পারতে, কী সুন্দর গাইলেন ভদ্রলোক।

পথ চলতে থাকেন দু'জনে। নিখিল মিত্র বলেন—যে লোকটা গাইলে তাকে তুমি চেন না নিশ্চয়?

মীরা মিত্র বলেন—আমি চিনব কেমন করে? তুমি চেন বোধহয়।

নিখিল মিত্র বলেন—চিনি। লোকটা আমার অ্যাকাউণ্টেণ্টের আণ্ডারে কাজ করে।

মীরা মিত্র বিস্মিত হয়, যেন ভয়ানক এক বিস্ময়।—কী আশ্চর্য!

চমকে ওঠেন নিখিল মিত্র। মীরার বিস্ময় যেন নিখিল মিত্রের এতদিনের বিশ্বাসের জগৎটাকে একটি নিষ্ঠুর খোঁচা দিয়ে শিশুর তুচ্ছ বিশ্বাসের ক্রীড়ণকের মত অনায়াসে একেবারে উল্টে দিয়েছে। মীরা মিত্রের বিস্ময় যেন বলতে চায়, হরেন নিয়োগীর মত মানুষ পৃথিবীর অতি সাধারণ একটা সদাগরী অফিসের চেয়ারের অধীন কেন? হরেন নিয়োগীর মত মানুষের জীবনের গৌরব যে এই সন্ধ্যার আকাশে বাতাসে মধুর সুরের ঝংকার হয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে।

বাড়িতে ঢোকবার সময় আরও আশ্চর্য করলেন মীরা মিত্র। বললেন—ভালই হলো। পুঁটুর জন্মদিনে ভদ্রলোককে নেমন্তন্ন করো, আরও ভাল গান শোনা যাবে।

বাড়ির সামনে একটা ঝাউ। চেয়ারে বসে সেই ঝাউয়ের দিকে তাকাতেই দেখতে পেলেন নিখিল মিত্র, এক ফালি চাঁদ উঠেছে আকাশে। শিকলখোলা হাউণ্ডটা অকারণে ছুটোছুটি করছে, আর আকাশের দিকে তাকিয়ে ঘেউ ঘেউ করছে।

বার বার কাশলেন নিখিল মিত্র। মনে পড়ে, অফিসের টেবিলে সেই সোনা-বাঁধানো কলমটার চেহারা। কালই হরেন নিয়োগীকে সসপেণ্ড করার কথা। ঐ কলমেই সসপেণ্ড করার অর্ডার লিখতে হবে।

কিন্তু সেই অর্ডার লিখতে পারা যাবে তো? কেমন যেন মনে হয়, নিখিল মিত্রের মনের ভিতর প্রতিজ্ঞাটা যেন ভয়ে-ভয়ে মুখ লুকিয়ে ফেলছে, নেতিয়ে পড়ছে। বুঝতে পারেন নিখিল মিত্র, ছোট-সাহেবের সোনাবাঁধানো কলমটার মেরুদণ্ড ভেঙে গিয়েছে।

দণ্ডমুণ্ড

অনুকূল গোঁসাই রামপুর জেলের সান্ত্রী।

রামপুর সেণ্ট্রাল জেল। এককালে এখানে কোন জংলী রাজার কেল্লা ছিল। এখন কিন্তু চেনবার আর উপায় নেই। ডঙ্কা বাজাবার তোরণগুলি ভেঙে ভেঙে কংক্রীটের গুমটি বসানো হয়েছে। গড়ের খাত ভরাট করে বসানো হয়েছে কলমী-আমের বাগান—ল্যাংড়া, কিষণভোগ, হুসেনশাহ আর কালা মানিক। সেকেলে পাঁচিলটা শুধু অটুট আছে, অজগরের পাকের মত।

গাঁয়ের লোকেরা বলে, ঐখানে ছিল রাজা জরাসন্ধের কারাগার। জেলের ভেতর দু'হাত মাটি খুঁড়লে এখনও পাওয়া যায়, শুধু হাড় আর হাড।

গেট জমাদার বলে—জেলখানা না কিলখানা। নতুন কয়েদী এলেই জমাদার

একবার হুঁসিয়ার করে দেয়—সামলে থেক বাপধন। নইলে ও চেহারার আর কিছু থাকবে না। স্রেফ বনমানুষ হয়ে যাবে।

রতন কম্পাউণ্ডার বলে—কলির কুম্ভীপাক! বটতলার পাঁজিতে ঠিক এই রকম একটি ছবি আছে। বাইরে থেকে যত খুনোখুনি যেন ঝেঁটিয়ে এইখানে জড়ো করা হয়েছে। সমস্তদিন শুধু পাপী নিয়ে টানা-ছেঁড়া। বেতের মারে রক্ত গড়ায় কোমর ফেটে। ভাতবন্ধ দুর্বৃত্ত খাবি খায় চোরা কুঠরীতে। চর্বি দিয়ে মাঙ্গা করা হয় ফাঁসির দড়ি। ছিটের জাঙ্গিয়া পরা নারকীদের দুরস্ত করা হয় বেল্টের বাড়ি দিয়ে। এর মধ্যে কারু বিরক্তি, গ্লানি, সাধ-অসাধের প্রশ্ন নেই।

যোগা যোগা ওয়ার্ডার, চিঁড়িতনের গোলামের মত জবরজং পোষাক। পিট্টিবিদ্যায় কী মজবুত হাত! ঝড়ের মত চড়-ঘুসি চালায়, হাতের গাঁট্টাগুলি লোহা হয়ে গেছে।

কে না ভয় পায় ঐ অফিস ঘরটিকে? বিশেষ করে পোক্ত সীসুকাঠের ঐ আলমারিকে। ওপরের থাকে সাজানো প্রচণ্ড প্রচণ্ড ভল্যুম জেলকোড আর ম্যানুয়েল। নিচের থাকে সারি সারি ফাইল।

প্রতিদিনের ডাকে কোত্থেকে ভেসে আসে কতগুলি নিঃশব্দ অক্ষর, জরুরী আর আধা-জরুরী অর্ডার। জীবন-মৃত্যুর ওলটপালট হয়ে যায় এদিকে। এর নড়চড় হয় না। এখানে আবেদন-নিবেদন চলে না। শাশ্বত বিধানের জাল পেতে বসে আছে নির্বিকার ফাইল-ব্রহ্ম। কয়েদ, সাজা, মুক্তি। চাকুরী, পুরস্কার, পেন্সন, ভাতা ও ছুটি—ভবলোকের যত শুভাশুভ গচ্ছিত আছে ঐ ফাইলের পাতায় পাতায়।

বেঁটে মজবুত চেহারার প্রৌঢ় মানুষ অনুকূল গোঁসাই। পট্টি জড়ানো পা দুটো ছোট একজোড়া গদার মত। অনুকূলের উগ্র রকমের নিয়মনিষ্ঠা, ওর কেতা-দুরস্তী আচরণের কথা সেপাই মহলে সবাই জানে। উর্দির পেতলের বোতাম-গুলিতে পালিশ দিতে হয় না ওর কোনদিন। বুট বেল্ট চক্‌চক্ করে। লোকটা যেন সারাক্ষণ ড্রিল করছে। সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্প্রিংয়ের ওপর বসানো। কেউ একটা বিড়ি দিলে বুক চেতিয়ে বুক ঠুকে, ফৌজী ঢঙে হাত পাতে।

ডিউটি শেষ হলেও ধুতি পরে থাকতে অস্বস্তি বোধ হয় অনুকূলের। কেমন ন্যাংটো ন্যাংটো লাগে। শরীরটার ওজন নেই মনে হয়। হাঁটতে গিয়ে তাল থাকে না। বুটজোড়া পায়ে চড়িয়ে তবে অনুকূল সুস্থ হয়।

কাউকে হাই তুলতে দেখলেও অনুকূল চটে যায়; বিউগল পড়লেও যে কি করে লোকে আরও আধ মিনিট মট্‌কা মেরে শুয়ে থাকে! আশ্চর্য!

মাইনে নেবার দিন, মাসের পয়লায় অনুকূলের কেতাদুরস্তীর পরাকাষ্ঠা জেগে ওঠে। প্যারেডে প্রাইজ পাওয়া গোটা দশেক মেডেল বুকের ওপর পিন দিয়ে ঝুলিয়ে, ফিটফাট উর্দি বুট বেল্ট পট্টির সাজ পরে, স্যালুট দেগে ক্যাশিয়ারবাবুর কাউন্টারে এসে দাঁড়ায়! আঠারটি টাকা হাতে তুলে, দু'পা পিছিয়ে আবার

স্যালুট দেয়। শরীরটাকে এবাউট টার্নে একটা লঘুললিত মোচড দিয়ে তাল মেপে পা ফেলে চলে যায়।

দোসরা তারিখে কাঁটায় কাঁটায় বেলা বারোটায় মনিঅর্ডার করে আসে আটটি টাকা—শ্রীমতী নয়নতারা দেবী, ঝালদা, মানভূম। কুপনে বউকে একটি ছত্রে কুশল জিজ্ঞাসা করে। সমস্ত মাসে শুধু এই একবার। অতি কষ্টে লিখতে হয় অনুকূলকে। বন্দুক-ঘাঁটা কড়া-পড়া ভোঁতা আঙুলে কলম আর চলে না।

বাইরের এই আচরণের মত অনুকূলের মনের ভেতরেও একটা ক্রূর রকমের সততা। পেটান লোহার পাতের মত কঠোর। সরকারী গাছের একটা এঁচোড খেতে হলেও অনুকূল দরখাস্ত করে, ন্যায্য দাম দিতে চায়। আইনকানুন ওর আত্মা। চাকুরিই সর্বস্ব। আঠার আনা মাইনে দিলেও বোধহয় সান্ত্রীগিরি ছাড়তে পারবে না অনুকূল।

বেড়ীপরা কয়েদীর পাল চরিয়ে ওয়ার্ডারেরা বাইরে ফার্মে নিয়ে যায়। খৈনি টিপে খোসগল্প করে আর ল্যাকপ্যাক করে হেঁটে চলে। অনুকূল আচমকা হুঙ্কার দেয়—ফল্ ইন্!

হাঁকের দাপটে অপ্রস্তুত ওয়ার্ডারেরা লাইন বেঁধে ফেলে। এগিয়ে গিয়ে আস্তে আস্তে গাল দেয়—শালা কোথাকার জেনারেল যেন!

আই-জি সাহেবের ড্রাইভার জেল ফটকে বসেছিল। তাড়ির নেশাটা মাথার ভেতর একটু জোরে চাগিয়ে উঠতেই একটা গজল ধরলো গলা ছেড়ে। অনুকূল নিঃসংকোচে তার ঘাড ধরে ফটকের বাইরে পার করে দিল। ঠিক এমনি নিঃসংকোচে সে ঘাসখেকো গাধাগুলোকে ফুলবাগান থেকে কান ধরে হিড হিড করে টেনে ফটক পার করে দেয়।

সেপাইরা আর ওয়ার্ডারেরা অনুকূলের ওপর মনে মনে চটা। ওর মত অষ্টপ্রহর পল্টন সেজে মানুষে থাকতে পারে কি? তাছাডা, ভেতর থেকে একটা পুরনো কম্বল, একঢেলা গুড়ও বাগিয়ে আনার উপায় নেই। অনুকূলের চোখে পড়েছে কি চুগলি হয়ে গেছে জেলারবাবুর কানে।

বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড। খালাস-পাওয়া কয়েদীরা গেট-জমাদারের পায়ের ধুলো নিয়ে হাসিমুখে মোটর বাসে চড়ে। পিত্তি জ্বলে যায় অনুকূলের। মনে মনে এই জিজ্ঞাসাই ওকে অস্থির করে তোলে, চোট্টাদের যদি ছেড়েই দিতে হয়, তবে কেন এতদিন ধরে পোষা, এত হয়রানি! বলিহারি নিয়ম!

হাবিলদা'র বিমর্ষ হয়ে বলে—বউয়ের চিঠি এসেছে। ছেলেটা বড় বেয়াদবি আরম্ভ করেছে। রাত্তিরে লোকের বাগান ভেঙে বেড়ায় দুটো আম লিচুর লোভে। একবার ধরা পড়ে মার খেয়েছে।

অনুকূল বলে—যাও, বাড়ি গিয়ে ছোঁড়ার হাত দুটো ভাল করে মুচড়ে দিয়ে চলে এসো।

লক্ষ্মণ দুবে বলে—ভাইটা অবাধ্য হয়ে উঠেছে! স্কুলে দিয়েছি, পয়সা খরচ

করছি এদিকে সমস্তদিন মেলায় জুয়ো খেলছে।

অনুকূল বলে—দিনের বেলায় ইঁটের ভাঁটায় লাগিয়ে দাও, বার ঘণ্টা কাদা ঠাসবে। আর রাত্তিরে মাহাতোদের ভাঁড়ারে জাল দেবে আখের রস। ভোর পর্যন্ত ছিব্ড়ে ঠেলবে উনুনে।

মতি হালদারের ছেলে, এখনও বর্ণপরিচয় শেষ করেনি। পায়খানায় বসে বিড়ি টানে। অনুকূল সমাধানের প্রস্তাব করে—একটা বিড়িতে ভাল করে কাঁচা ইয়ে মাখিয়ে মুখে ঢুকিয়ে দিও একদিন। টিট হয়ে যাবে।

ওয়ার্ডারদের ভাঙের বৈঠকে হাসি-ঠাট্টার হল্লার মধ্যে আলোচনা হয়—ধর, অনুকূল যদি জজ হতো?

—ওরে বাবা। প্রায় একসঙ্গে সকলে আঁৎকে ওঠে। ছাতুচোরেরও ফাঁসি হতো তাহ'লে।

লক্ষ্মণ দুবে ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছে—পেন্সন নেবার পর অনুকূল বড়জোর এক ঘণ্টা বেঁচে থাকতে পারবে।

বছরান্তে একবার ছুটি নেয় অনুকূল, একমাসের জন্য। কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য যে, দশটা দিনও দেশে কাটাতে পারে না।

সামন্তবাবুরা এসে বলেন—তুমি কেমন হে অনুকূল! আঠার টাকা মাইনেতে বিদেশ বিভূঁয়ে পড়ে রয়েছ। সঙ্গীন উঁচিয়ে হুট বুট করা কি তোমার সাজে? তোমার বাবা ছিলেন আচায্যি মানুষ। চলে এস, আমাদের কাছারীতে তসিলদারী করবে।

অনুকূলের শালা এসে অনুযোগ করে—কি করছো দাদা! আজ ষোল বছর চাকরি করে ক'টি কড়ি জমিয়েছ বল তো? ঘরের দেয়াল যে বসে গেছে। দেশে তসিলদারী, হোলই বা পনের টাকা মাইনে। বিদেশের পঞ্চাশ টাকার সমান।

সব গোলমাল করে দেয় নয়নতারা।—তসিলদারী করলে কি ছোট হয়ে যাবে তুমি? পনের টাকা মাইনে তো ফালতু দক্ষিণে। চাল তেল নুন থেকে শুরু করে আম-কাঁঠাল পর্যন্ত আর কিনে খেতে হবে না। দেখছো তো, বৈকুণ্ঠ তসিলদারের নতুন বাড়ি, রানীগঞ্জের টালি দিয়ে চাল ছেয়েছে।

ব্যাস, এইটুকু যথেষ্ট। সেদিন সন্ধ্যার ট্রেনে অনুকূল বিদায় নেয়। গরম ছাইরঙা সোয়েটার গায়ে চড়িয়ে, কাপড়চোপড় পুঁটলি করে পিঠে ঝুলিয়ে, ভারি বুট দিয়ে ক্ষেতের আল মাড়িয়ে স্টেশনের পথ ধরে। এই রকম অন্ধকারে তারা-ভরা আকাশের নিচে, রাইফেল হাতে রামপুর জেল ফটকের ডিউটি; রাত্রির পৃথিবীর রাজা দণ্ডমুণ্ডের মালিক অনুকূল। সেখানে তার চ্যালেঞ্জের হাঁকে অন্ধকার কাঁপে, কমিশনার সাহেবের গাড়ি থেমে যায়।...আর তসিলদারী! থুথু ফেল এমন চাকুরীর কপালে। চাকুরী না চুরি? শালা সামন্ত!

আজকের রাতটা ভয় করার মতই। অন্ধকারটা যেন আজ হাত দিয়ে ছোঁয়া

যায় এমনই নিরেট। ঝড়ের আলোতে জেলফটকের গরাদগুলো চকচক করছে অতিকায় হাঙরের দাঁতের মত। অনুকূল সান্ত্রী ডিউটিতে দাঁড়িয়ে সামান্য এক-একটা শব্দে অযথা চমকে উঠছে। অনেকদিন আগে এই রকম একবার হয়েছিল। সেদিন মা মারা গেছেন।

ফটকে পাহারা দিচ্ছে অনুকূল। আজ এই সুষুপ্ত চরাচরের সমস্ত পাপ পুণ্যের একমাত্র প্রহরী অনুকূল। এক-একটি পদক্ষেপে, ভারি বুটের স্পর্শে যেন গুঁড়ো হয়ে আওয়াজ করছে কাঁকরগুলো, ছ্যাঁক ছ্যাঁক ছ্যাঁক। এই শব্দে যত উদ্যতফণা অপরাধের সাপ যেন সভয়ে মুখ লুকিয়ে ফেলবে গর্তের ভেতর। হঠাৎ একটা দম্‌কা হাওয়া গুঁড়ো গুঁড়ো বৃষ্টির ঝাপ্টা দিয়ে উড়ে গেল। বেয়নেটটা রুমাল দিয়ে মুছে নিয়ে আবার সহজ হয়ে নিল অনুকূল।

গুমটির ভেতর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনুকূল একটু মুসড়ে পড়েছে। মুঠোর ভেতর থেকে আলগা হয়ে হেলে পড়েছে রাইফেল। একবার কেশে গলাটা সাফ করে নিয়ে অনুকূল আবার পায়চারি শুরু করলো। অনেকক্ষণ অন্ধকারে চোখ দুটোকে চুবিয়ে নিয়ে ভাল করে তাকালো সামনের দিকে। এইবার একটু ফাঁকা হয়েছে যেন। পাকুড় গাছটা দেখা যায়, জেল কম্পাউণ্ডের একেবারে শেষে, খাস সড়কের গা ঘেঁসে। যাক, তবু টর্চটা আনতে ভুল হয়নি আজ।

এখন তো শেষরাত্রি। অন্যদিন দু'চারটে শেয়াল ছোটাছুটি করে। গাছে গাছে বাদুড়ের উৎপাত চলে। বটফল ঝরে পড়ে টুপ টাপ। আজ সবাই যেন চক্রান্ত করে বয়কট করেছে। অনুকূল আবার ঝিমিয়ে পড়লো।

হাঁটুর ওপর একটা মশা কামড়াচ্ছে। অনুকূল সমস্ত গায়ের জোর দিয়ে একটা চড় বসিয়ে, গা ঝাড়া দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। চড়ের শব্দে তবুও গুমোট যেন হাল্কা হলো খানিকটা।

মচ মচ্! মচ মচ্! ভারি বুটের আওয়াজ! রাইফেলটা কাঁধে তুলে অনুকূল টান হয়ে দাঁড়ালো। একটা টিম-টিমে আলো দুলতে দুলতে আসছে। অনুকূল চিতাবাঘের মত থাবা পেতে অন্ধকারে মিশে রইল অসাড় হয়ে।

…হল্ট, হুকমসদার! অনুকূলের গলাফাটা চ্যালেঞ্জে একজোড়া পেঁচা উড়ে পালিয়ে গেল পাকুড় গাছের কোট থেকে।

—পাস ফ্রেণ্ড অলসোয়েল।

রাউণ্ড বেরিয়েছে হাবিলদার! সামনে এগিয়ে এসে বললো—ঠিক হায়! আজ একটু চটু পট থাকবে। আর রাত বেশি নেই। সাহেবরা এল বলে।

হাবিলদার চলে গেলে আবার সেই অন্ধকারের নেশা। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে অকারণে। এমন তো কোনদিনই হয় না। পাগলাঘণ্টি বাজবে নাকি আজ!

মুখের ওপর একটা শীতল কঠিন স্পর্শ। গুমটির গায়ে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল অনুকূল। রাইফেলটা হেলে পড়েছে। সুমসৃণ বেয়নেটটা ছোট ছেলের

ঠাণ্ডা গালের মত লেগে আছে মুখের ওপর। অনুকুল ধড়ফড় করে উঠলো।

পাকুড় গাছের তলায় কিছু একটা নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে। অন্ধকারের চেয়ে আরও ভরাট মিশমিশে চেহারা। কে ও?

চ্যালেঞ্জ করবে কি না ভাবছে অনুকুল। চেপে গেলে চলবে না। সিঁদেল শালারা এইরকম তেল-ভুসো মেখেই আসে। কোন্ ফাঁকে কি হয়ে যায় বলা যায় না—হল্ট হুকমসদার। বুট ঠুকে হাঁক ছাড়লো অনুকুল, তার মনের সমস্ত ত্রাস যেন সেই আওয়াজে থরথর করে কেঁপে উঠলো।

কোন উত্তর, সাড়াশব্দ নেই। শুধু রক্তজবার হাসির মত এক টুকরো লাল দ্যুতি দপ্ করে ফুটে উঠলো অন্ধকারের বুকে, পাকুড় গাছের নিচে। একটা অগ্নিমুখ ছায়ামূর্তি দাঁড়িয়ে আছে নিথর হয়ে।

দাঁতে দাঁত চেপে রাইফেলটা তুলে অনুকুল এগিয়ে এল। কান দুটো তেতে উঠেছে। এইবার ঘোড়া দেগে ফেলবে। একটি ফায়ারে ছেঁদা হয়ে লুটিয়ে পড়বে ঐ ছায়াশরীর, যেই হোক সে। বিকার রোগীর মত উত্তেজনায় মোচড় দিয়ে উঠলো অনুকুল। ঘোড়া থেকে হাতটা তুলে দাঁতে চেপে রইলো নিজেরই আঙুল। কিছুক্ষণ মাত্র!

গুমটির ভেতর থেকে হুকে ঝোলানো টর্চটা নিয়ে এক পা দু'পা করে এগিয়ে চললো অনুকুল। মূর্তিটা তবু পালাবার নাম করে না, যেন শঙ্কাহীন স্থৈর্যে সমাসীন। গজ দশেক দূরে দাঁড়িয়ে অনুকুল টর্চের বোতাম টিপলো। পাকুড়তলা ঝলসে উঠলো আলোয়।

মনে সুখে গাঁজায় দম দিচ্ছে পাগলটা। খুব বুড়ো একটা পাগল। কোমরে নেংটি আছে বলে উলঙ্গ বলা যায় না। উটের পায়ের গাঁটের মত হাঁটু আর কনুইয়ে থাবা থাবা কড়া। আর্ধেক পিঠ জুড়ে একটা পুরু দাদের আচ্ছাদন। জটপড়া পাকা চুলে সমস্ত মাথাটা ঠাসা।

রাগে কুঁচকে উঠলো অনুকুলের মুখ। রাইফেলের কুঁদো দিয়ে পাগলের কোমরে সজোরে একটা ঘা জমিয়ে দিল, শুকনো কাঠের ওপর টাঙির আঘাতের মত খটাস্ করে একটা ফাঁকা আওয়াজ। ঝুপ করে পড়ে গেল পাগল শুকনো পাতার স্তূপের ওপর।

অনুকুল ততক্ষণে রাগ সামলে নিয়েছে। গাঁজার কলকেটা কেড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পাগলের পিঠে বেয়নেটের ছুঁচালো মুখটা আস্তে চেপে ধরলো অনুকুল।

—ওঠ!

পাগল তবু নির্বিকার। শকুনির মত নখ দিয়ে পিঠের দাদ চুলকোচ্ছে সে।

বেয়নেটটা আর একটু জোরে চেপে ধরে অনুকুল বলে—দেখছিস ঐ ফটক! যেতে চাস বল?

আগুনে পোড়া সাপের মত তিড়বিড় করে লাফিয়ে উঠলো পাগল। সোজা

দৌড় দিল মরিয়া হয়ে ; ভূতের ছায়ার মত মিলিয়ে গেল সড়কের অন্ধকারে।

এতক্ষণ পরে তবু একটা অ্যাকশন হলো। অনুকূল হাসলো মনে মনে—একটু সামান্য বেয়নেটের খোঁচা, ব্যস্। কি রোগ না সারে অস্ত্র চিকিৎসায় ? ফোঁড়া থেকে পাগলামি পর্যন্ত।

আবার ডিউটির নেশা জমে উঠেছে। দৃষ্টি ঘুরছে দশ দিক। হাতের মুঠো ঘেমে পেছল হয়ে উঠেছে। ফুঁ দিয়ে হাত শুকিয়ে নিয়ে কাঁধ বদল করছে রাইফেল, ডান থেকে বাঁয়ে, বাঁ থেকে ডাইনে।

যেন পাপ আর পুণ্য রাজ্যের মাঝখানে, সীমান্তের আলের ওপর দাঁড়িয়ে আছে অনুকূল, অতন্দ্র প্রহরীর মত। সমস্ত রাত আকাশেও যেন একটা তোলপাড় চলছে। দূর ঝিলের ওপর খসে পড়ে বড় বড় তারা, সাবধানী সান্ত্রীদের বুলেট ছুটছে সেখানে।

গুমটির কাছে আমগাছটার ঝিঁঝির কীর্তন আরম্ভ হলো একসঙ্গে। একেবারে কানের কাছে। মাথা ধরে উঠলো অনুকূলের।

ওখানে আবার কে ? টেনিস কোর্টের কাছে, কাঠগোলাপের ঘেরানের পাশে ? নিশ্চয় মালীদের ছোঁড়ারা। সাবাস্ দুঃসাহস ! কদিন আগে করবী গাছটাকে একেবারে নেড়া করে সমস্ত ফুল সাবাড়ে নিয়ে গেছে। কিন্তু ব্যাটারা বেকুব, সাদা কাপড় পরে এসেছে চুরি করতে। দফা সেরেছি আজ শালাদের ! হাত পা বেঁধে শোরের মত ফেলে রাখবো আজ, হিম খাওয়াবো সমস্ত রাত ! তারপর হাজতের মশা !

পা টিপে টিপে এগিয়ে টর্চ টিপলো অনুকূল।

মালীর ছেলেরা কেউ নয়। ভুঁড়ো শেয়াল একজোড়া। বিষঘায়ে পচা একটা কাটা-পা কুড়িয়ে এনে, জড়ানো ব্যাণ্ডেজটা খুলছে টানাটানি করে। আইডোফর্মের ঝাঁঝালো গন্ধে বাতাসে কাঠগোলাপের মিঠে গন্ধটুকু মারা পড়েছে।

—ধুর ! ধুর ! শেয়ালদুটোকে তাড়িয়ে দিয়ে অনুকূল ফিরে এল ফটকের গুমটিতে।

প্যারেডের মাঠে আবার কারা ? না, বার বার চোখের ভুল নয় ! বেশ স্পষ্ট। এগিয়ে এসে অনুকূল মাঠের একটা পোস্টের কাছে দাঁড়ালো।

টুং টুং মিঠে চুড়ির শব্দ। উৎকর্ণ হয়ে অনুকূল শুনলো সে আওয়াজ, না মিথ্যে নয়। ছিঃ ছিঃ, কী নির্লজ্জ দুঃসাহস! এ যে প্যারেডের মাঠ, জেল এলাকা। সতর্ক দৃষ্টি রেখে অনুকূল চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল !

অনেকক্ষণ, তবু তারা যায় না। অনুকূল বিমনা হয়ে গেছে।

আজকের এই অন্ধকারে হৈমন্তী হিমের রোমাঞ্চ। কুয়াশার যেন কস্তুরী নেশার বিহ্বলতা। অলজ্জ বাহুপীড়নে যৌবন বিলিয়ে দেবার মত এই শক্ত মাটির ওপর ভেজা ঘাসের বিছানা। কতদিনেরই বা কথা, বিয়ের আগে, তখন নয়নতারা কতই বা বড, ঝালদার মেলার ভিড়ে খোঁপা টেনে দিয়ে পালিয়ে

যাওয়া……।

চমকে উঠলো অনুকূল। আজ চণ্ডু খেয়েছে নাকি সে! ডিউটিতে দাঁড়িয়ে এসব ছেলেমানুষি চিন্তা। নিজের ওপর রাগ হলো অনুকূলের। হোক কেলেঙ্কারি আজ আর ছাড়াছাড়ি নেই। ওদের ধরতেই হবে।

টর্চ টিপলো অনুকূল। অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে বোকার মত সটান গুমটিতে ফিরে এসে দাঁড়িয়ে রইল। জেলমুদি রামু শেঠের কুত্তি বিলি, গলার বকলসে ঘুন্টি বাঁধা। আর একটা গোত্রহীন পথের কুকুর। বিলির ঘুন্টি থেকে-থেকে অন্ধকারে বাজছে, ভামিনী অভিসারিকার নূপুরের মত।

মোটরের হর্নের চাপা গম্ভীর আওয়াজ। হেড-লাইটের আলো ধূমকেতুর লেজের মত ছড়িয়ে পড়েছে সড়কের ওপর। দুটো গাড়ি গোঁ-গোঁ করে দাঁড়ালো ফটকের কাছে।

সাহেবরা এসেছে। জেলারবাবু, ডাক্তার আর কম্পাউণ্ডার এসেছে। ঘুমভরা চোখ, নিশির ডাকে ঘর ছেড়ে হঠাৎ বেঘোরে চলে এসেছে সব।

সাড়াশব্দ নেই কারও মুখে। বড় জমাদার ফটকের কুলুপ খুলছে। গরাদ আঁটা ছোট লোহার দরজাটা কঁকিয়ে কঁকিয়ে ফাঁক হয়ে আবার বন্ধ হলো।

—ওঃ হো! আজ গোপী দোসাদের ফাঁসি!

সমস্ত জড়তা মুহূর্তে উবে গেল! চিড়িয়খানায় খাঁচায় পোষা বাঘের মত লাফিয়ে ঘুরে ফিরে একটানা পায়চারি আরম্ভ করলো অনুকূল।

কার্তিক মাসের রাত, তার ওপর কুয়াশার ঘোর। ফর্সা হতে অনেকক্ষণ। শিশিরের ফোঁটা ঝরে পড়ছে বটপাতা থেকে। ফটকের কার্নিশ হিমে ভিজে উঠেছে। এখনও কাকের রা নেই, নেশা করে যেন ঘুমিয়ে পড়েছে সব। আজ সমস্ত পৃথিবীর ওপর একটা কালাপানির বাষ্প থমকে রয়েছে।

হল্ট, হুকমসদার! অনুকূলের চ্যালেঞ্জ আছড়ে পড়লো শুব্ধ অন্ধকারের ওপর। বিভীষিকা ভেদ করে হনহনিয়ে ফটকের দিকে বেপরোয়া চলে আসছে কে? অনুকূল তাক্ করবার জন্যে রাইফেল ওঠালো। কিন্তু না, একেবারে কাছে এসে পড়েছে।

—আমি গোপীর মা!

বুড়ী আর তার সঙ্গে বছর চারেকের ন্যাংটো একটা ছেলে বুনো বেড়ালের মত তুড়-তুড় করে এগিয়ে এল।

ফটকের আলোতে নিয়ে গিয়ে অনুকূল বুড়ীর হাতের সার্টিফিকেটটা দেখে নিল। বুড়ী লাস নিতে এসেছে সংকারের জন্য।

—আয় হাবা। আঁচল দিয়ে হাবাকে আর নিজের নাক পর্যন্ত ঢেকে, চোখ-দুটো শুধু খোলা রেখে বুড়ী থাম ঘেঁসে বসে রইল।

ডিউটির পিনিক চড়েছে অনুকূলের মাথায়। তাঁতের মাকুর মত মার্চ জমিয়েছে কাঁকরের ওপর।

—কত দেরি হবে সেপাই বাবা ?

অনুকূল বুড়ীর প্রশ্নে তাকিয়েও দেখলো না। বুড়ী কিন্তু উসখুস করছে কথা বলার জন্য।

—এই হাবাই হলো গোপীর ছেলে। আমার এই একটি নাতি।

অনুকূলের কানে ভোঁ ধরে গেছে তখন। রাবণের চিতার শব্দটা হু-হু করছে। পালা-জ্বরের মত হাত পায়ে জমাট ডিউটির জ্বালা ধরে গেছে।

—ছেলের মধ্যেও আমার ঐ একটি, গোপী।

এতক্ষণে কাক জেগেছে। ফর্সা হয়ে গেছে। দূরের পাঁচিলের গুমটির ওপর আলোগুলো ঝাপসা হয়ে গেছে। জলভরা চোখের মত। জেলের ভেতরে ঘুমা ভাঙানো বিউগল বেজে উঠেছে ভাঙা গলায়। ফটক খুলে ঝাড়ুবালতি নিয়ে মেথরেরা বেরুচ্ছে একে একে। মোটর গাড়ি দুটো হর্ন দিয়ে মোড় ফিরলে পাকুড়গাছের কাছে, বড় সড়কে।

অনুকূল শান্ত হয়ে দাঁড়ালো!

অনেকে এসে গেছে। লাইন বেঁধে দাঁড়িয়ে গেছে ওয়ার্ডারেরা। হাবিলদার এসেছে। কম্পাউণ্ডারবাবু দাঁড়িয়ে আছেন। আর···।

খাটিয়ার ওপর শোয়ানো আছে, সাদা মলমলে ঢাকা গোপী দোসাদের লাস. মরা কুমিরের মত। বুড়ী খাটিয়া ছুঁয়ে বসে আছে। হাবা ঘুর-ঘুর করছে এদিকে ওদিকে।

কুমিরের মত কেন ? অনুকূলের মনে পড়লো, ছেলেবেলায় দেখা মামা-বাড়ির একটি ঘটনা। রূপনারায়ণের খালের একটা কুমির তিল ক্ষেতে উঠে পড়েছিল ভুল করে। গাঁয়ের লোকেরা তাকে পিটিয়ে পিটিয়ে মেরে ঠিক এমনি করে সটান শুইয়ে রেখেছিল ক্ষেতের ওপর। আগুরিদের বিধবা ছোটবৌকে কিছুদিন আগে অনেক খুঁজেও পাওয়া যায়নি। নিশ্চয় তাকে খেয়েছে এই শালা কুমির।

কম্পাউণ্ডার বললো—মিছেই এলি বুড়ি। লোকজন কৈ তোর ? নিয়ে যাবি কি করে ?

—জাতের কেউ এল না, রোগে তো মরেনি, রাজি হলো না কেউ ছুঁতে।

—কিছু টাকা খসালেই আসতো।

—তাও সেধেছিলাম। তবুও এল না।

একটু ভেবে নিয়ে কম্পাউণ্ডার বলে—কি জাত ?

—রবিদাস বাবা !

—আচ্ছা, বার কর টাকা। এখুনি জাত জোগাড় করে দিচ্ছি।

বুড়ী কি যেন হাতড়াচ্ছে, আঁচল ঢাকা থাকায় বোঝা যাচ্ছিল না। হাবিলদার আর ওয়ার্ডারেরা এগিয়ে এল। সকলের চোখে যেন লালা ঝরে পড়ছে। দুটো মেথর কাজ ভুলে বসে পড়লো সেইখানে।

হাবিলদার কম্পাউণ্ডারের কানে কানে বললো—বেশ কিছু এনেছে বুড়ী।

—গ্যাংগের গোদা, কিছু তো রেখে গেছে নিশ্চয়।

ক'টা টাকা বার করতে বুড়ি দেরি করছে বড। হয়তো তোড়ার গেরো খুলতে পারছে না। ওয়ার্ডারের অনুকূলের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে নিয়ে ফিসফিস করে—তুমি বাবা ঐ দিকেই থাক। চুগলিবাজ!

কম্পাউণ্ডার বললো—বুড়ী, একটু জলদি কর।

—এই নাও। একটা ময়লা রূপোর হাঁসুলি বার করে সামনে ধরলো বুড়ী।

বুড়ী হাঁপাচ্ছে, গায়ের আঁচল পড়ে গিয়ে গলার দাগটা দেখা যাচ্ছে। হাঁসু-লিটা খুলতে গিয়ে টানা-হেঁচড়ায় ছড়ে গেছে খানিকটা।

অপ্রস্তুত হাবিলদারের গোঁফ ঝুলে পড়লো, বেকুবের মতো কেঠো হাসি হেসে তাকালো কম্পাউণ্ডারের দিকে। মেথর ছুটো মুচকি হেসে মুখ ফিরিয়ে নিল।

গলা ঝেড়ে নিয়ে কম্পাউণ্ডার বললো—ওটা রেখেই দে বুড়ী। ওতে কিছু হবে না।

সকলেই একটু নিঝুম হয়ে গেছে। হাবিলদার হঠাৎ গর্জে উঠলো।—আঃ, এই বুড়ীয়া, হাত সরা শীগগির। চোখের সামনে কি করছে দেখ!

মলমল কাপড়ের ঢাকাটা একটু সরিয়ে গোপীর মাথায় হাত বুলোচ্ছিল বুড়ী। ধমক খেয়ে হাত সরিয়ে নিল।

অনুকূলের পাহারা শেষ হতে আর খুব বেশি দেরি নেই। কি ভেবে সে'ও এগিয়ে এসে দাঁড়ালো।

কম্পাউণ্ডার ব্যস্ত হয়ে বললো—বিপদে ফেলেছে বুড়ী। লাস সরাবার নাম করে না। এইবার ভেপসে গন্ধ ছাড়বে। অগত্যা···

কম্পাউণ্ডার বিড়ি ধরিয়ে গল্প আরম্ভ করলো—তুমি তো শোননি অনুকূল গোঁসাই, ক'টা দিন কী উৎপাতই না করলো এ ব্যাটা দোসাদ। আমি স্বচক্ষে দেখেছি। ইস্!

বড় জমাদার—বড ভারি ডাকু ছিল বুঝি?

—ওরে বাবা! ভাগ্যিস সেদিন মিলিটারির গাড়ি পৌঁছে গেল সময় মত, নইলে প্রাণ গিয়েছিল সে-যাত্রা! মহারাজগঞ্জের সড়ক ধরে জঙ্গলে জঙ্গলে ফিরছি চাতরা থেকে। নদীর পুলটার কাছে এসে দেখি, পথে পড়ে আছে ছুটো গাড়ো-য়ানের লাস। টাঙি দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে মারা হয়েছে। গাড়ির আটা ঘি সব লুটে নিয়ে গেছে। অর্ধেক ছড়িয়ে পড়ে আছে রাস্তার ওপর।

ওয়ার্ডারেরা বলে—ও কি ভেবেছিল দুনিয়াকে? আইন নেই? সাজা নেই? মালিক নেই?

বিড়িতে জোরে টান দিয়ে কম্পাউণ্ডার বললো—সবচেয়ে দুঃখ হয়েছিল পুলের কাছে সেই মন্দিরটার দশা দেখে। ক'হাজার বছরের পুরনো মন্দির,—জঙ্গলটাকে কত পবিত্র করে রেখেছিল। আজ পর্যন্ত কলেরা প্লেগ নদী পার হয়ে এদিকে আসতে পারেনি। সে ঐ মন্দিরের বিগ্রহের মহিমা। দেখলাম, এই মন্দিরের

কপাট ভেঙে অমন সুন্দর নওলকিশোরের রূপোর চোখ দুটো উপড়ে নিয়ে গেছে।

—চণ্ডাল! চণ্ডাল! ফাঁসিতে কী হয়েছে ওর? ওকে ধরে…। হাবিলদার বুড়ীর দিকে মারমূর্তি হয়ে তাকালো।

কম্পাউণ্ডার—তারপর, লুট করবি তো কর, গরুর গাড়ি দুটোতে আগুন লাগালি কেন? আমরা যখন পৌঁছেছি, তখন একটা গরু ঝলসে মরেই গেছে আর বাকিগুলো ছটফট করছে তখনো।

ওয়ার্ডারেরা একসঙ্গে প্রায় ক্ষেপে চেঁচিয়ে উঠলো—এ পাপীর লাস শেয়ালে কুকুরে খেয়ে ফেলুক!

কম্পাউণ্ডারের বিড়ি শেষ হয়েছে।—কিন্তু বাবা, পলাইতে পথ নাই যম আছে পিছে। এখন টের তো পেলে? দাঁড়কাক ঠুকরে খাবে যে এইবার!

হঠাৎ মহুয়ার গন্ধে বাতাসটা সিঁটকে উঠলো। টলতে টলতে আসছে হরি, ফাঁসিঘরের ডোম। হাতে একটা বড় মেটে সাবান, কোমরে নতুন তোয়ালে জড়ানো।

—একি? বেড়ে সব বসে শবসাধনা করছ! লাস সরেনি এখনো! বড় সাহেবের জুতোর ঠোকর আছে কপালে।

একজন ওয়ার্ডার বললো—হরিয়া, ঐ দেখ।

—কি?

আর একজন ওয়ার্ডার আঙুল তুলে হাবাকে দেখিয়ে দিল।

হরি—ওটা কে?

কম্পাউণ্ডার—গোকুলে বাড়িছে যে!

বড় জমাদার—গোপীডাকুর ছেলে।

হাবা নিজের মনে কাঁকর নিয়ে খেলছিল। হরি হাততালি দিয়ে আদর করে ডাকলো—আয়! আয়! আয় বেটা আয়।

হাবা দৌড়ে এসে হরির কোলের ওপর লাফিয়ে চড়ে বসলো। হাবার ধুলো-মাখা পাছাটা হাত দিয়ে পরিষ্কার করে দিয়ে হরি হাসতে থাকে—জলদি বড় হ বেটা। আমার পেন্সনের সময় আসছে। তোকেই বসিয়ে যাব আমার গদিতে। আর তো উপযুক্ত কাউকে দেখছি না।

কারু মনে নেই যে অনুকূল সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে অনুকূল, চোখের তারা দুটো তার পাথর হয়ে গেছে যেন।

কম্পাউণ্ডার অনুকূলকে আড়চোখে ভাল করে একবার দেখে নিয়ে বুড়ীকে প্রশ্ন করলো:—তোর গোপী এ পথে এল কেন বুড়ী? সামলাতে পারিসনি?

আপত্তি করলো হরি—কেন মিছে গল্প জমাচ্ছ কম্পাউণ্ডারবাবু?

ডাকাতের গল্প। সকলে শুনতে চায় সেই রক্তবীজের কাহিনী, মহারাজগঞ্জের জঙ্গলের নরশার্দূল—লুট, রাহাজানি, নরহত্যার নরকাসুর গোপী দোসাদের গল্প। এখনও কুয়াসা সরেনি। পৃথিবী জাগেনি। শেষ ঘুমের দুঃস্বপ্নের মত

শোনাবে ডাকাতের জীবন কথা।

—বল বুড়ী বল! ওয়ার্ডাররা সকলেই উৎসুক ও উদ্‌গ্রীব হয়ে হুকুম করে।

বুড়ী বলে—ছেলেবেলা থেকেই বড় পেটুক ছিল আমার গোপী।

হেসে উঠলো সকলে—এই সেরেছে! ভারি কথা শোনালে। পেটুক কে না পৃথিবীতে? তা বলে সবাই তো আর ডাকাত হয় না বুড়ী।

—ছেলেবেলাতেই একবার চিলের মাংস খেয়ে কলেরা হয়েছিল গোপীর! সে-যাত্রা ভগবান বাঁচিয়ে দেয়।

আরও জোরে হাসির হর্‌রা উঠলো—হ্যাঁ এইবার বলেছে বটে। ডাকাতেরা ছেলেবেলা চিলের মাংস খাবে, পিশাচে পাবে, তবে তো।

—হ্যাঁ বাবা, সত্যই একবার পিশাচে পেয়েছিল ওকে! ওঝা ডাকিয়ে অনেক ঝাড়ালাম। কিছুই হলো না। গাঁ ছেড়ে পালিয়ে গেল গঞ্জে।

হাবিলদার—চাকরি করতে না চুরি করতে?

—ভিক্ষে করতে। সমস্তদিন হালুইকরের দোকানে ঠোঙা কুড়িয়ে খেত। পুরি মেঠাই খেয়ে জিভ বড় হয়ে গেল, আর কি ঘরে ফেরে!

কম্পাউণ্ডার—তারপর?

—শেষে ক'বছর পরে, খেয়ে খেয়ে মুটিয়ে দামড়া হয়েছে যখন, তখন বিয়ের লোভে ঘরে এল একদিন। হাবার মা যখন এল তখন সে এইটুকু। মেয়েই কুলো-ধুচুনী বেচে ছোঁড়াটাকে খাইয়েছে, কত সেবা করেছে। আর হতভাগা······!

রাগে অভিমানে বুড়ীর গলায় স্বর চেপে এল—হতভাগা দিনরাত ঠেঙিয়েছে বৌকে। সন্দেহ করে লোহা তাতিয়ে ছোঁকা দিয়েছে। বউ শেষে ঘরের বার হওয়া বন্ধ করলো।

বড় জমাদার—তার পরেই বুঝি ডাকাতি ধরলো।

—না, লেঠেলি,—মোহান্তবাবার লেঠেল হলো গোপী।

কম্পাউণ্ডারের চোখে হঠাৎ প্রবল একটা উৎসাহ কিলবিল করে উঠলো।—হাঁ হাঁ মনে পড়েছে। সেই ফৌজদারি মামলা; সিমেণ্টের খাদ নিয়ে মোহান্ত আর চৌধুরীবাবুদের ফৌজদারি। এ পক্ষে দোসাদ লেঠেল ওপক্ষে জংলিমাঝি। ববাকরের দহে কত লাস গুম হলো। তিনবছর ধরে মামলা। পাটনাই ব্যারিস্টারের দল সওয়াল জেরায় গরম করে দিল আদালত। দেড় শো সাক্ষী, দেড় লক্ষ টাকা খরচ। কিন্তু আলবাৎ মোহন্তাদর মোচ! মরদের মোচ বলতে হবে। টাকার দরিয়া বইয়ে দিল, একটা লোককেও আইনে গাঁথতে পারলো না। লেঠেলদের ক'জনের দু'চার মাসের কয়েদ হলো শুধু।

—হ্যাঁ, আমার গোপীরও ছ'মাস হয়েছিল।

হাবিলদার—হুঁ বুঝলাম, তখন থেকেই গোপী তোমার হাত পাকিয়েছে।

বুড়ী কি বলতে গিয়ে থেমে গেল।

ওয়ার্ডারেরা বলে—থামছিস্ কেন? বলে যা, পাপীর কাহিনী রামায়ণেও

আছে, শুনতে দোষ কি ?

—জেল থেকে ফিরে গোপী চাকরী নিল। রাজপুত বাবুদের কাঠের গোলায় করাত টানতো। দু'আনা করে পেতও রোজ। কিন্তু ছেলেবেলার সেই পেটুকে দোষ, খাই-খাই আর বদমেজাজ! আজ আচার নেই কেন, কাল তরকারী নেই কেন। মার খেয়ে খেয়ে হাড মাটি হয়ে যেত বউয়ের।

এদিক ওদিক তাকিয়ে বুড়ী একবার হাবাকে খুঁজলো।—হাবা তখন হয়েছে। বউ গঞ্জে গিয়ে ভিক্ষে খাটতে আরম্ভ করলো।

কম্পাউণ্ডার—ভিক্ষে কেন ? আগে না কুলো-ধুচুনী বেচতো !

—না, ধুচুনী বেচতো না। একদিন ভিক্ষে থেকে সমস্ত রাত ঘরে না ফিরে বউ এল পরদিন সকালবেলা। গোপী টাঙি নিয়ে কাটতে গেল বৌকে। আমি বুড়োমানুষ, কতই বা গায়ের জোর। তবু গোপীর হাতের টাঙি ধরে ঝুলে রইলাম। বৌকে বললাম পালিয়ে যা, ঠেঁটা বৌ তবু পালালো না।

এখনও পৃথিবীর ঘুম ভাঙেনি। কাতিকের ভরাট কুয়াশার আবছায়ায় ডাকাতের টাঙি ঝিলিক দিয়ে উঠেছে। গল্প জমে উঠেছে এইবার। এই তো রক্তাক্ত উপসংহারের আরম্ভ। শ্রোতার দল রুদ্ধনিঃশ্বাসে চুপ করে বসে শুনতে লাগলো।

—কিন্তু গোপীকে আটকাতে পারলাম না। আমারও চোখে পড়লো, বউ ধর্ম খারাপ করে এসেছে। চেহারা দেখেই সব বুঝে ফেললাম। মূর্ছা গেলাম আমি।

বুড়ী ঢোঁক গিলে চোখ বন্ধ করে খানিকক্ষণ নিঝুম হয়ে রইল। মূর্ছার মতই মনে হলো।

হাবিলদার চেঁচিয়ে বললো—এই বুড়িয়া, সামলে।

চোখ খুলে বুড়ী আরম্ভ করলো—জেগে উঠে দেখি, কাটামডা বউয়ের বুকে চডে হাবা মাই খাচ্ছে। গোপী পালিয়েছে।

এতক্ষণে বুড়ীর শুকনো খটখটে চোখে জল দেখা দিল। চোখে আঁচল দিল বুড়ী।

—তারপর ? এ প্রশ্ন আর এল না কারও কাছে। সকলের মনের সব কৌতূহলের যেন ক্ষান্তি হয়ে গেছে।

হরি ডোম দেওয়ালে ঠেস দিয়ে একেবারে ঘুমিয়ে পডেছে, নাক ডাকছে ঘড ঘড করে। হাবিলদার অন্যদিকে তাকিয়ে খৈনির ডিবে বার করেছে। ওয়ার্ডারেরা গম্ভীর মুখে বুড়ীর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। কম্পাউণ্ডার একটু বিমর্ষ, নিজের মনে কি ভাবছে। স্তব্ধতার মাঝখানে শুধু হাবা লাফালাফি করছে কাঁকর নিয়ে। এই ক্লিন্ন ইতিহাসের কবল থেকে হাবা যেন একটু ছিট্‌কে সরে রয়েছে।

কম্পাউণ্ডার ভাবছে গোপীর টাঙির কথা। কী নিদারুণ সে টাঙি! মহারাজ-

গঞ্জের জঙ্গলের গাড়োয়ানের আর হাবার মা'র গলায় পড়েছে তার কোপ। গোপী যেন তার ভাগ্যকে কুপিয়ে বেড়িয়েছে, ক্ষ্যাপা কাঠুরিয়ার মত।

কসুর আর সাজা! সাজা আর কসুর! অনুকূলের দিকে তাকিয়ে আর বিড়-বিড় করে কথাগুলিকে বলে নিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো কম্পাউণ্ডার।

অনুকূলের চোখের পাতা ঢুলে পড়েছে ভারি হয়ে। এই চেহারা সেই রুদ্র অনুকূলের চেহারাই নয়। এ যেন একজন ধ্যানী অনুকূলের চেহারা। অপরাধী পৃথিবীর ঐ গলিত অন্ধকারের মধ্যে বসে যেন দেখতে পেয়েছে অনুকূল, এগান থেকে এই সড়ক ধরে পুষ্পিত শাল-মহুয়ার জঙ্গল ছাড়িয়ে—গেরুয়া পলিপড়া দামোদর। সুসর্পিল চুটুপালুর পাহাড়ী ঘাট—রাঁচীর মেঘরঙা গিরিমালার ভীড়। তারপর পুরুলিয়া রোড, দু'পাশে ধানক্ষেত, লাক্ষাচষা কুলের জঙ্গল—ঝালদা। ঝালদার বটের ছায়াতে অনেক শান্তি।

খাটিয়ার দিকে তাকালো অনুকূল। না মরা কুমীর নয়। যেন লড়াইয়ে ঘায়েল জবরদস্ত এক সেপায়ের লাস, সাদা কফনে ঢাকা। নাই বা বাজলো বিউ-গল, নাই বা বাজলো ড্রাম। কোন বিলাপ গাইতে হবে না ব্যাগপাইপে। কাতার বেঁধে সেপাইরা বিদায় দেবে না গোপীকে। রাইফেল তুলে আকাশে শোকের শট দাগবার দরকার নেই।

ঐ বড় ঝিলের উত্তরে, সোনালী রোদের ছিটে লেগেছে এখন ফণীমোরব্বার বনে। সেইখানে এক জায়গায়, অজস্র শান্ত মাটির ধুলো দিয়ে চাপা দিতে হবে গোপীকে।

খাটিয়ার পায়াতে ঠোকর দিয়ে দাঁড়ালেন জেলারবাবু।

—ডিসপার্স। বেকুব সব। লাস হঠাও এক্ষুনি। ডোম বোলাও।

ঝুপ করে রাইফেলটা নামিয়ে রাখলো অনুকূল। এগিয়ে এসে খাটিয়ার একটা ধার তুলে বুড়ীকে বললো—উঠাও!

বুড়ী কাঁদ কাঁদ হয়ে বললো—সে কি বাবা, আমি একা কি করে পারি, তার চেয়ে বরং যা খুশী।······

—ওঠাও। অনুকূল যেন ধমক দিল।

—এ কি? এ কি? সকলে একসঙ্গে সবিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠল।

হাবিলদার—এ অনুকূল, তুমি পাগল হলে নাকি?

কম্পাউণ্ডার—আরে গোঁসাই, তোমার কি চাকরীর ভয় নেই? তোমার ডিউটি শেষ হয়নি এখনও।

বড় জমাদার—এ অনুকূল, তোমার গায়ে উর্দি রয়েছে, এ কি করছো তুমি?

ততক্ষণে গোপীর খাটিয়ার এক দিকটা তুলে অনুকূল তার ঘাড়ের পেছনে চড়িয়ে ফেলেছে। অপর দিকটা বুড়ীর মাথার ওপর। লাল কাঁকরের রাস্তা ধরে, ফটক ছেড়ে বিশ গজ চলে গেছে তারা।

পাকুড়গাছটা পার হয়ে বড় সড়কের ওপর এসে ওরা উঠলো। হাবা সমান

তালে পা ফেলতে পারছে না, পেছনে দৌড়ে দৌড়ে চলেছে। ঝিলের দিকে মোড় ফিরতে একটা ঘুমন্ত খেঁকিকুকুর জেগে উঠে উৎসাহে লেজ নেড়ে ওদের সঙ্গ নিল।

অনুকূলের রাইফেলটা তুলে নিয়ে হাবিলদার কম্পাউণ্ডারকে ফিস ফিস করে বললো—ডিসমিস হবে অনুকূল, নিশ্চয় !

কম্পাউণ্ডার—তবু ভাল, জেল যেন না হয়।

নন্দের নন্দন

তারকবাবুর চেষ্টায় জয়রামপুর নামে ছোট এই গঞ্জ নতুন একটা মর্যাদা লাভ করেছে। গঞ্জ জয়রামপুর এখন একটা মিউনিসিপ্যালিটি, আর তার প্রথম চেয়ারম্যান হয়েছেন স্বয়ং তারকবাবু। তিনিই জয়রামপুরকে নানাভাবে পরিচ্ছন্ন করেছেন। শুধু পথঘাটের পরিচ্ছন্নতা নয়, জয়রামপুর থেকে নানা রকমের অসামাজিক নোংরামিও তিনি সরিয়ে দিয়েছেন। কানা খোঁড়া আর জরাগ্রস্ত অক্ষম ছাড়া আর কোন ভিখারী জয়রামপুরে ভিক্ষে করার সুযোগ পায় না। তারকবাবুর ব্যবস্থা মতো, হয় তারা মাটি কাটে, নয় জয়রামপুর ছেড়ে পালিয়ে যায়।

শুধু পালিয়ে যায় না মথুরা, লেঠেলপাড়ার খালের কিনারায় একটা শিমুলগাছের তলায় কুঁড়ে ঘরের ভেতরে থাকে যে মথুরা। রুগ্ন পাখির মতো জিরজিরে আর লিকলিকে চেহারা, গাঁজা খায় আর নিজেরই বাচ্চা ছেলেটাকে ভিক্ষেতে খাটিয়ে পয়সা রোজগার করে, সেই মথুরা, লেঠেলপাড়ার সেই বিখ্যাত লেঠেলদের বংশধর। এখন ঐ শিমুলের তলায় মথুরার ঘরের ভিটাটি সেই লেঠেল বংশের একটি মাত্র ভিটা, যেখানে আজও সন্ধ্যায় বাতি জ্বলে। মথুরা বলে, আমি নড়বো না, আমি আমার সাতপুরুষের ভিটাতেই থাকবো।

হ্যাঁ তবে জয়রামপুর শহরের নতুন অনুশাসন মেনে নিয়েছে মথুরা। জয়রামপুরের কোন পথে, পাড়ায় বা বাজারে আর ভিক্ষে করতে ভোলাকে পাঠায় না মথুরা। সকাল হলেই ভোলাকে সঙ্গে নিয়ে এক-একদিন শিমুল তলার কুঁড়ে থেকে বের হয় মথুরা। সাঁকো পার হয়ে, খোয়া বিছানো সড়ক পার হয়ে একেবারে মেঠো পথের উপর এসে দাঁড়ায়। চলে যায় নিকট ও দূর গাঁয়ের হাটে বাজারে ও মেলায়। সন্ধ্যা হলেই ফিরে আসে।

তারকবাবুর সন্দেহ মেটে না। মথুরাকে দেখতে পেলেই ধমক দেন।—তুই নিশ্চয় চারদিকের গাঁয়ে গাঁয়ে ছেলেটাকে দিয়ে ভিক্ষে করিয়ে পয়সা রোজগার করছিস।

মথুরা বলে—না কর্তা, বাপ-ছেলেতে মিলে গায়ে গায়ে কাজ করে বেড়াই।

তবু সন্দেহ মেটে না তারকবাবুর। কিন্তু খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন, সত্যিই নিকটের বা দূরের কোন গাঁয়ের বাজারে মথুরার বাচ্চা ছেলেটাকে ভিক্ষে

করতে কেউ দেখেনি। থানার জমাদারও বলে, লোকটা চুরি-টুরি করে বলেও তো মনে হয় না। কিন্তু বেশ আছে গেঁজেল নিষ্কর্মা মথুরা। দম ভরে গাঁজা খায় আর গানও গায়। মন্দ নয় এই রহস্য, কিন্তু কেমন করে এটা সম্ভব হয়? ভিক্ষেও করে না, চুরিও করে না?

গাঁয়ের হাটের ভীড়ের মধ্যে মথুরা আর মথুরার ছেলে ভোলা প্রায় প্রতিদিনই ছদ্মবেশে একটা কাণ্ড বাধায়। কিন্তু এমনই সুন্দর ছদ্মবেশ যে, জয়রামপুরের মানুষও দেখে চিনতে পারে না, কে এরা, কোথা থেকে আসে আর কোথায় চলে যায়!

হাটের ভীড়ের মধ্যেই এক জায়গায় একটা গাছের ছায়ায় এক কিশোর কৃষ্ণের মূর্তি কখনো নেচে নেচে, কখনো বাঁশী বাজিয়ে আর কখনো বা সুর করে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে একটা মন-মাতানো চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। ছয় সাত বছরের একটা ছেলে, সর্বাঙ্গে নীলরঙের আঠা মাখানো, পরনে হলদে রঙের একটা খাটো কাপড, পায়ে নূপুর, মাথার চুল ঝুঁটি করে বাঁধা, তার মধ্যে গোঁজা থাকে ময়ূরের পাখার একটা টুকরো, গলায় পাঁচ-মেশালি রঙীন বুনো ফুলের মালা, আর হাতে একটা বাঁশী।

পায়ের ঘুঙুর বাজিয়ে নেচে নেচে এক পাক ঘুরে নিয়ে এই শিশু-কৃষ্ণটি সুর করে বলে—আমি বেন্দাবনে ধেনু চরাবো, আমি যে রাখালরাজা! আমি বেন্দাবনে বাঁশী বাজাবো, আমি যে রাখালরাজা!

দর্শক জনতা হেসে হেসে দেখতে থাকে। মন্দ সঙ নয়। কেউ বা ভক্তিবিহ্বল চক্ষে তাকিয়ে আর ভাবাবিষ্ট স্বরে বলে ওঠে।—আহা!

রাখালরাজা তার ছোট শরীরটা ত্রিভঙ্গিম করে গাছের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে বুলি-শেখানো তোতার মত বলতে থাকে।—এই যে আমার মোহনবাঁশী, এই যে আমার বনমালা, এই যে আমার পীতধড়া।

হাতের বাঁশী নামিয়ে সোজা টান হয়ে দাঁড়িয়ে গম্ভীর মুখে রাখালরাজা আবার বলে—আমি কালীয়দমোন, আমি কংসোনাসোন, আমি সিরিহরি মুরারি।

বিচলিত হয় দর্শক জনতার বিহ্বল দৃষ্টি। রাখালরাজার পায়ের কাছে এক একটা পয়সা পড়তে থাকে।

দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এইভাবে হাটের ভীড়ে এক কচি রাখালরাজার নাচ গান বুলি আর ভঙ্গীর খেলা চলতে থাকে। সন্ধ্যার অন্ধকার যখন ঘনিয়ে আসে, হাটের ভীড়ও ভাঙতে থাকে, তখন দেখা যায় আর এক অদ্ভুত দৃশ্য। আর একটা রহস্যময় সঙ। বড বড় সাদা চুলে ভরা মাথা, আর লম্বা লম্বা সাদা দাড়িতে বুক ঢাকা, একটা বুড়ো মূর্তি কোথা থেকে এগিয়ে আসে। সাদা পাট ও শণের পরচুলা পরে বুড়ো সেজেছে একটা লোক। লোকটা সুর করে ডাক দেয়—কোথা রে বাপ রাখালরাজা, কোথা রে নন্দের নন্দন।

জনতা সেই আবছা অন্ধকারে দেখতে পায়, বুড়ো বাপ নন্দ এসে বাছা কেষ্টকে কোলে তুলে নিয়ে চলে গেল।

সেদিন ছিল রাজহাটির মাঘমেলা। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মেলার মাঝখানে গাছের তলায় দাঁড়িয়ে সেই অদ্ভুত সঙ, সেই ক্ষুদে এক রাখালরাজা তার নীলরঙের আঠা-মাখানো চেহারা নিয়ে নাচলো গাইলো আর পয়সা পেল ; সব শেষে তেমনি বুড়ো নন্দ এসে বাছা কেষ্টকে কোলে তুলে নিয়ে চলে গেল।

মাঘ মাসের রাত, কনকনে ঠাণ্ডা, কুয়াশায় ঢাকা জয়রামপুরের লেঠেলপাড়াও যেন ঘুমে নিথর হয়ে গিয়েছে। শুধু চোরের মত সতর্ক একটা অদ্ভুত মূর্তি এগিয়ে চলেছে খালের কিনারায়, শিমূলতলায় কুঁড়ে ঘরের দিকে।

কুঁড়ে ঘরের দরজার কাছে অনেকক্ষণ থেকে প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়েছিল থানার জমাদার। স্বচক্ষে দেখে নিজের মনের সংশয়টা চরমভাবে পরীক্ষা করে নেবার জন্যই জমাদার দাঁড়িয়ে আছে। সত্যিই কি চুরি করে না মথুরা ?

দপ্ করে জ্বলে ওঠে জমাদারের হাতের টর্চ। থমকে দাঁড়ায় মূর্তিটা।

দেখতে পায় জমাদার, কাঁধের উপর কাপড়ের খুঁট দিয়ে ঢেকে অতি মূল্যবান চোরাইমালের মত কি একটা বস্তু সন্তর্পণে বয়ে নিয়ে আসছে মথুরা। হাঁপাচ্ছে নিষ্কর্মা গেঁজেল মথুরার জিরজিরে পাঁজরা।

—চোর কোথাকায় !

জমাদারের ধমক শুনে আস্তে আস্তে কাঁধের বোঝা মাটির উপর নামিয়ে রাখে মথুরা।

কিন্তু দেখেই চমকে ওঠে জমাদার।—কি সর্বনাশ !

চোরাই মাল নয়, কিন্তু দেখতে তার চেয়েও ভয়ানক একটা বস্তু। নিবিড় ঘুমে অচেতন ক্ষুদ্র একটা উলঙ্গ শিশুশরীর, সর্বাঙ্গে নীলরঙের আঠা মাখানো।

জমাদার বলে—তুমিই বেটা নন্দ সেজে আর ছেলেটাকে কেষ্ট সাজিয়ে বাজারে বাজারে ভিক্ষে করে পয়সা রোজগার করছো ?

শুকনো খটখটে দুটো চোখ তুলে তাকিয়ে থাকে মথুরা, কোন উত্তর দেয় না।

হাত দিয়ে ভোলার ঘুমন্ত শরীরটাকে নাড়াচাড়া করে পরীক্ষা করে জমাদার সঙ্গে সঙ্গে শিউরে ওঠে।—ইস্, ছেলেটার জ্বর হয়েছে রে।

তেমনি শুকনো খটখটে দুটো চোখ নিয়ে মথুরা তাকিয়ে থাকে। একটা নির্বোধ দৃষ্টি ! নিজেরই বাচ্চা, নিজেরই সন্তানের শিশু-শরীরটার দিকে তাকিয়ে কোন মায়া বেদনা জাগে না যে চোখে, মদ্দা শ্বাপদের সেই চোখের মতো মথুরার চোখ দুটো জ্বলছে।

জমাদার বলে—এসব আর চলবে না মথুরা। তুমি বেটা ডবল পাপী। ছেলেটাকে দিয়ে ভিক্ষে করাচ্ছো, তার উপর কসায়ের মতো ছেলেটাকে প্রাণে মারছো। কালই ব্যবস্থা করছি।

পরদিনই ব্যবস্থা হয়ে গেল। তারকবাবুর বৈঠকখানায় মথুরাকে ডাকিয়ে আনা হলো। পরামর্শ নেবার জন্য আরও কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে আহ্বান করা হলো।

তারকবাবু বললেন—একটা বাচ্চাছেলের উপর এরকম নিষ্ঠুরতা চলতে দেওয়া উচিত নয়। আইন অনুসারে লোকটাকে জেলে দেওয়া যায়। কিন্তু তারপর বাচ্চাটাকে নিয়ে সমস্যায় পড়তে হবে।

পাঁচজনে বলে—ছেলেটার ওপর নিষ্ঠুরতা আগে বন্ধ করুন। স্টুপিডটা ছেলের রোজগারে গাঁজা খায়, আর ছেলেটাকে কষ্ট দিয়ে প্রাণে মারছে।

তারকবাবু বলেন—একটা উপায় বলুন।

সকলে বলে—মথুরাকে কাজ করতে বাধ্য করা হোক।

হেসে ওঠেন তারকবাবু—ওকি সেই চিজ? মরে যাবে তবু কাজ করবে না। চেষ্টা কি করিনি আমি?

একটু চুপ করে থেকে তারকবাবু আবার বলেন—তাছাড়া ঐ লিকলিকে গেঁজেলের শরীরে কি আর কাজ করবার সামর্থ্য আছে?

জমাদার বলে—তাহলে ছেলেটাকে একটা কাজ দেওয়া হোক, যে কাজ ওর পক্ষে সাজে।

তারকবাবু—হ্যাঁ, আমিও তাই ভাবছি। ছেলেটা এখন থেকে ভিক্ষে করতে শিখছে, তাও আবার কেষ্ট সেজে লোক-ঠকানো ভিক্ষে, এটা ঠিক নয়। কিন্তু···

কিন্তু কি করা যায়? সমস্যাটা একটু জটিলই বটে। ছয়-সাত বছর বয়সের একটা বাচ্চাকে কাজ দিতে হবে, আর সে-কাজটার মধ্যে যেন কোন কঠোরতা আর নিষ্ঠুরতা না থাকে, সে-কাজ যেন ছেলেটার শরীরে আর শক্তিতে কুলোয়।

সকলেই বলে—আপনি দয়া করলে একটা ব্যবস্থা হয়েই যাবে তারকবাবু।

তারকবাবু বলেন—আমার সাঁওতাল রাখালটা কাল কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে গিয়েছে।

সকলে একসঙ্গে বলে—এই তো, ভাল কাজ। গাঁয়ের বাচ্চা বাচ্চা ছেলে-গুলিই তো গরু চরায়। মথুরার ছেলেটাকে লাগিয়ে দিন এই কাজে।

তারকবাবু বলেন—করুক। রোজ এক-পো চাল আর নগদ একআনা পাবে।

জমাদার খুশি হয়ে হাঁক দেয়—শুনলি তো মথুরা।

মথুরা তখুনি হাত-জোড় করে প্রস্তাব মেনে নেয়।—শুনেছি হুজুর। আপনাদের দয়া মেনে নিতেই তো হবে।

জমাদার—বাচ্চাটাকে যদি আর কখনো কষ্ট দিয়েছিস তো জেলে যেতে হবে।

শুকনো খটখটে চোখ আর জিরজিরে চেহারা নিয়ে আস্তে আস্তে চলে গেল নিষ্কর্মা ও নিষ্ঠুর গেঁজেল মথুরা।

পরদিন সকালে শিমুলতলার কুঁড়েঘরের কাছে গেঁজেলের গলার গান আর

বেজে উঠলো না। তখন তারকবাবুর বাগানের পেছনে খাটালের কাছে দাঁড়িয়ে আছে মথুরা আর মথুরার ছেলে ভোলা। ভোলাকে নতুন কাজে, একটা সত্যি-কারের কাজে লাগিয়ে দেবার জন্য এসেছে মথুরা।

এক দুই তিন, এক এক করে পঁচিশটা শ্যামলী ধবলী ও রাঙী শিং দুলিয়ে বের হয়ে আসে খাটাল থেকে। খালের পাশের পথ ধরে দূরের মাঠের দিকে যেতে থাকে গরুর পাল। পেছনে পেছনে আস্তে আস্তে হেঁটে চলে মথুরা আর ভোলা। শীতকাল, ভোলাকে তাই একটা ছেঁড়া পশমের কোট দিয়েছেন তারক বাবু। ভোলার ছোট শরীরের পা পর্যন্ত ঝুলছে ছেঁড়া পশমের কোট। ভোলার হাতে ছোট একটা লাঠিও ধরিয়ে দিয়েছে মথুরা।

মাঠের কাছে এসে একটা গাছের তলায় দাঁড়ায় মথুরা আর ভোলা। ভোলা প্রশ্ন করে—বাবা গো!

—কি রে?

—এখানে কেন এলি বাবা?

—এখানেই তো গরু চরাবি তুই।

ভোলা চেঁচিয়ে ওঠে—তুই যে বললি, আজ আমি ধেনু চরাবো।

মথুরা ধমক দেয়—হ্যাঁ রে হতভাগা।

ভোলা বলে—তবে ধেনু কই?

মথুরা—এই তো।

ভোলা নাকিস্বরে কঁকিয়ে আপত্তি করে—এ তো গরু।

মস্ত বড একটা শিঙেল গরু হাঁসফাঁস করে এগিয়ে এসে একেবারে ভোলার গা ঘেঁসে দাঁড়ায়। এক লাফ দিয়ে সরে মথুরার পেছনে এসে দাঁড়িয়ে ভোলা বলে—বাবা গো!

—কি রে?

—বড ভয় করছে বাবা?

মথুরা চেঁচিয়ে বলে—ভয় কি রে, মার লাঠি। জোরে জোরে মার।

হাতের লাঠি তুলে গরুর গায়ে জোরে একটা বাডি মারে ভোলা। ছুটতে থাকে শিঙেল গরু। পেছনে তাডা করে দৌডে চলে ভোলা। মথুরা চিৎকার করে উৎসাহ দেয়।—মার মার, আরও জোরে মার।

লাঠি হাতে নিয়ে আর উৎসাহে দুঃসাহসী হয়ে ছুটতে থাকে ভোলা, ছেঁড়া পশমের কোটে ঢাকা একটা বাচ্চা-শরীর। দেখতে অদ্ভুতও লাগে। পলকহীন লাল লাল চোখ তুলে দেখতে থাকে গেঁজেল মথুরা।

হ্যাঁ, সত্যিই কাজে লেগে গেল ভোলা। ছেলেটা বড় বাধ্য। কোন ফ্যাসাদ ভুগতে হলো না। শিখিপাখা বনমালা আর পীত-ধড়ার জন্য কান্নাকাটি করলো না।

এইবার ঘরে ফিরবে মথুরা। কোমরের গোঁজ থেকে গাঁজার কল্কে বের

করে।

গাঁজা টিপতে-টিপতে মাঠের উড়ন্ত ধুলোর দিকে একবার তাকায় মথুরা। তাই তো! বনমালা নেই, মোহনবাঁশী নেই, তবু কেমন নেচে নেচে ছুটে ছুটে ধেনু চরাচ্ছে রাখালরাজা।

কী আশ্চর্য, নিষ্কর্মা ও নিষ্ঠুর গেঁজেল মথুরার যে চোখ গাঁজার ধোঁয়াতেও কোনদিন ছলছল করেনি, সেই শুকনো খটখটে চোখ দুটো ছলছল করতে থাকে।

গো ত্রা স্ত র

মকতপুর। কাঁচা সড়কের ওপর এই তো একটা জরাজীর্ণ বাড়ি! খোলার চালের পুরনো বাঁশের ঠাট থেকে ঘুনের ধুলো ঝরে পড়ে। তিন বছর পালেস্তারা পড়ে নি। ঘরে একপাল মানুষ। কাচ্চা বাচ্চা, কাঁথা আর লেপ তোষকের জঞ্জাল। এই তো সঞ্জয়ের সুইট হোম!

একা বড়দার গোনাগুনতি মাসোহারার জোরে ভাত-কাপড়ের ক্ষুধা আর বাগিয়ে রাখা যায় না। সবদিকে ব্যয়বাহুল্য নির্মমভাবে ছেঁটে ফেলা হয়েছে। এখন কোপ পড়েছে পেটের ওপর। ঘি চিনি চা—সংসারের বুভুক্ষু জিভটার এক একটা অংশ বড়দা প্রতিমাসে ছুরির পোঁচ দিয়ে কাটছেন। এ ছাড়া উপায় নেই। কে জানতো, সঞ্জয় এত লেখাপড়া শিখেও রোজগারের বেলায় এমন ঠুঁটো হয়ে বসে থাকবে। এক আধ দিন নয়, আজ চার বছর ধরে।

বিকেলবেলার হালকা ঝড়ে বাড়ির সমুখে শিরিষ গাছে শুকনো সুঁটিগুলো ঝুম ঝুম করে বাজে, মোটা ঘুঙুরের বোলের মত। এই সময়টা বেশ লাগে। সারাদিনের সঞ্চিত আলস্য অবসাদে মিষ্টি হয়ে ওঠে।

সেদিন বারান্দায় বসে এক গেলাস গুড়ের তৈরী চা হাতে নিয়ে সঞ্জয় চুমুকে তার নিত্যদিনের ভাবনাগুলির আস্বাদ ঝালিয়ে নিচ্ছিল।

যে যার পথ দেখ। বড়দা সময়ে অসময়ে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু বছর চারেক আগেকার কথা। পরীক্ষার দিন এই বড়দা নিজের হাতে টিফিন কেরিয়ারে খাবার নিয়ে কলেজ হলের গেটে দাঁড়িয়ে থাকতেন। সেও একদিন গেছে। বড়-দার মনের সুপ্ত সাধ আকাঙ্ক্ষাগুলি সেদিন ছিল দুঃখ অভাবের কালিতে মাখা বিনম্র কামনার মালার মত। এই অভাবের গ্লানি একদিন ধুয়ে মুছে যাবে। সঞ্জয়ের একটা চাকরী হবে, রূপোর কাঠির স্পর্শে মকতপুরের দত্তবাড়ি স্বাচ্ছন্দ্যে ঝকঝক করে উঠবে। এই ছিল অবধারিত সত্য।

এম-এ ডিগ্রী। সচ্চরিত্রতা স্বাস্থ্য আর খেলাধুলার দশটা সার্টিফিকেট, বিলিতি পত্রিকায় ছাপা তার নিজের লেখা তিনটে অর্থনীতির প্রবন্ধ, গান আর অভিনয়ের মেডেল, ভূমিকম্পে সুকঠোর সেবাব্রতের প্রশংসাপত্র—সঞ্জয়ের বহু ও বিচিত্র প্রতিভার পরিচয় একটা মোটা বাণ্ডিলে বাঁধা হয়ে বাক্সে পড়ে

আছে। চার বছর দরখাস্তবাজি করে একটা চাকরী জোটেনি। বড়দা হতাশ হয়ে পড়েছেন। মায়ের মুখেও গঞ্জনাবাক্য উথলে ওঠে।

অপ্রতিভ হয়ে গেছে সঞ্জয়। কিন্তু এই ধিকৃত চারটি বছরের প্রতি মুহূর্তের ভাবনায় তার অনেক মোহ ভেঙে দিয়েছে। আগে এমনি অবস্থায় পড়লে লোকে বিবাগী হয়ে যেত। কিন্তু সঞ্জয় অন্য ধাতুতে তৈরী। বিংশ শতাব্দীর বিপ্লবী ধনবিজ্ঞানের সূত্রগুলি তার জানা আছে।

সঞ্জয় বুঝেছে, এখানে প্রত্যেকটি স্নেহ পণ্য মাত্র। প্রত্যেকটি আশীর্বাদ এক একটি পাওনার নোটিশ। চার বছর বয়স, এই ভাই-ঝি পুতুল, মাথা ধরলে চুলে হাত বুলিয়ে দেয় ঠিকই। কিন্তু সঞ্জয় জানে, এক রত্তির মেয়ের এই হৃদ্যতার মধ্যে লুতাতন্তুর মত কী সূক্ষ্ম কারবারী বুদ্ধি লুকিয়ে আছে। কাজ শেষ হলেই সোজা দাবী জানাবে—সিল্কের ফিতে চাই আমার।

ওপর থেকে দেখতে কী সুন্দর! মা বাপ ভাই বোন, আপন জন, আত্মীয়তার নীড়। কত গালভরা প্রবচন! একটু আঁচড় দিলেই চামড়া ভেদ করে দেখা দেয় নির্লজ্জ মহাজনের মাংস! সঞ্জয় এক এক সময় হেসে ফেলে। তবে এ তত্ত্ব নতুন কিছু নয়। ইতিহাসের শিরায় শিরায় এই রীতি গড়িয়ে আসছে বহু হাজার বছর ধরে। সেই গুহা-মানবের গৃহধর্ম থেকে শুরু করে মকতপুরের দত্তবাড়ির সংসারকলা। প্রেম প্রণয় আত্মীয়তা—লঙ্কা গুড় আদা মরিচ। যে ক্রেতা সেই আপন জন!

সুমিত্রাও অনেকদিন এদিকে আসে না। প্রেমের হাওয়া হয়তো ঘুরে গেছে। আশ্চর্য কিছু নয়! সুমিত্রার বাবা অভয়বাবুরও মতিগতি কিছুদিন থেকে উল্টো রকমের দেখাচ্ছে। বাড়ি মর্টগেজ দিয়েছেন। সুমিত্রারও কি পাত্র জুটে গেল?

গেল বিজয়া দশমীর দিনও সে প্রণাম করতে এসেছিল। চাঁপা রঙের শাড়ীতে অমন কালো মেয়েকেও দেখাচ্ছিল কত সুন্দর?

চন্দনের টিপপরা সুমিত্রার কপালটা অলস হয়ে পড়ে রয়েছে দু'মিনিট ধরে, সঞ্জয়ের পায়ের ওপর। বয়স্থা কুমারীমেয়ের যৌবন অভিমানে যেন মাথা খুঁড়ছে। সুমিত্রা ভালবেসে ফেলেছে।

পুরনো দিনের এসব কাহিনী ভাবতে ভালই লাগছিল। কিন্তু বৌদি এসে সামনে দাঁড়ালেন। অভয়বাবুদের খবর শুনেছ ঠাকুরপো?

—না।

—সাবরেজিষ্ট্রার নবীনবাবুর সঙ্গে সুমিত্রার···।

—বিয়ে, এই তো!

বৌদি হেসে চলে গেলেন। হাসিটা তিরস্কারের মতই। যাক, সবচেয়ে বড় ভুলটাও ভেঙে গেল। এই একটা লাভ। ঐ চোখের জল, প্রণাম লজ্জানত মুখ—কী ক্ষুরধার পবিত্র কোকেট্রি! সে চিনেও চেনেনি। এটা তারই অপরাধ।

সময় থাকতে সরে পড়া চাই। নইলে নীলামী মহলে তার সব মনুষ্যত্ব অতি

সস্তায় বিকিয়ে যাবে। এই ভণ্ডহাস ভদ্র সংসারের ছলনাকে পেছনে রেখে চলে যেতে হবে। পশুর মত নিছক একট। গোত্রমোহের তাড়নায় সমস্ত জীবনের ইষ্ট এখানে সে বাঁধা রাখতে পারবে না। সঞ্জয় বুঝেছে, তার সবচেয়ে বড় প্রয়োজন গোত্রান্তর! এই গৃহকূটের রহস্য সে ধরে ফেলেছে।

সঞ্জয় চলে যাচ্ছে দূর দেশে। রতনলাল সুগার মিলে ত্রিশ টাকা মাইনের চাকরী। মাইনে কমবেশীর প্রশ্ন কিছু নেই। এই ত্রিশ টাকার চাকরীর মধ্যে সে দেখেছে অজস্র মুক্তির প্রসাদ।

বিদায়ের দিন মকতপুরের এই জরাজীর্ণ বাড়িটা যেন আর-একবার সমস্ত যাদুবল নিয়ে সঞ্জয়কে দমিয়ে দেবার মতলব করলো। ভাইবোনেরা বাক্স বিছানা বেঁধে দিল। পুতুল সকাল থেকে আঁচিলের মত গায়ে লেগে আছে, যেতে নাহি দিব গোছের ইচ্ছেটা। বাবার কথাগুলোর কটু ঝাঁজ উবে গেছে, সুস্থভাবে তামাক টানতে পারছেন না। মা রান্নাঘর থেকে এখনও বাইরে আসেননি। উনুনের সামনে বসে যেন তাঁর অদাক্ষিণ্যের প্রায়শ্চিত্ত করছেন। মাছের তরকারীই রাঁধলেন তিন রকমের!

বড়দা বিচলিত হয়েছেন সবচেয়ে বেশি। বললেন—ভাল মনে যাও, আর মনে রেখ, উদ্যোগী পুরুষসিংহ লক্ষ্মীলাভ করেই! তুমিই একদিন ঐ মিলের মালিক হয়ে বসতে পার। স্যর রাজেন কি ছিলেন? সব সময় প্রসপেক্টের দিকে লক্ষ্যরাখবে।

মোটর বাসে উঠে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লো সঞ্জয়।

একদিকে নির্জলা ফল্গু, আর তিনদিকে জঙ্গল। মাঝে চুরাশী পরগণা। জঙ্গলের ভেতরে গ্রাণ্ডকর্ড লাইন নাড়ীর মত ধুকপুক করে। একটা রাবখড়ির টিলার রেঞ্জ চলে গেছে করমপুর স্টেশন পর্যন্ত।

মিল এলাকার নাম রতনগঞ্জ। একটা বাজার আর দূরে ও কাছে কুলি ও কর্মচারীদের বাসা। চুরাশী পরগণার দিগন্ত জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে আলবাঁধা ঠাসা শাকসব্জী ও আখের ক্ষেত। ঠুঁটো ঠুঁটো কাকতাড়ুয়া মূর্তি, শুয়োর খেদাবার চালা, আঁকাবাঁকা নালা আর মাঝে মাঝে জল সেচবার বড় বড় কাঠের লাঠা, যেন দূরের জাহাজের মাস্তুলের মত ভেসে আছে সবুজের সাগরে।

আখের ফসল পেকে ওঠে। দেড় মানুষের সমান লম্বা লম্বা ঋজু দাঁড়া, এক এক হাতের পাব, পাতা যেন উৎসবের নিশান। তুরী ছত্রী আর আহীরদের বস্তি, যাদের হাড়ের সারে রত্নসম্ভবা হয়েছে চুরাশী পরগণার মাটি।

মিলের মালিক রায়বাহাদুর রতনলাল অতি সজ্জন লোক। একটা নগণ্য প্যানম্যানকেও আপনি বলে সম্বোধন করেন। প্রাতঃস্নানের আগে বাগানের যত পিঁপড়ের গর্তে মুঠো মুঠো চিনি ছড়িয়ে আসেন।

ক্যাসমুন্সী সঞ্জয়। রায়বাহাদুর সঞ্জয়কে আশ্বাস দিলেন—এই মিল তোমার।

এর উন্নতি হলে তোমারও উন্নতি হবে। কাজ দেখাও, এখানে প্রসপেক্ট আছে।

কিন্তু মাসের পর মাস, চালান রসিদ রেজিষ্টার আর লেজার ঘষে, টাকা নোট আর রেজকি ঘেঁটে আঙুলের ডগা বিষিয়ে যায়। ক্রাশিং মেশিনের শব্দ, ছোবড়ার পাহাড় আর রাবগুড়ের গন্ধে প্রসপেক্টের টিকি খুঁজে পাওয়া যায় না। সঞ্জয়ের মনেও ওরকম কোন ভুয়া আশার প্রগল্‌ভতা নেই। এই সব পয়োমুখ ধনকুন্তদের রীতিনীতি তার ভাল রকমই জানা আছে।

প্রসপেক্ট নয়, আরও বড় ও কঠোর এক সাধনার ভার নিয়ে সঞ্জয় এসেছে এখানে। নিঃশেষে লোপ করতে হবে তার পুরাতন সত্তাকে, ফেরারী আসামীর মত।

অদ্ভুত চরিত্রের একটা লোক সঞ্জয়কে ভাবিয়ে তুলেছে খুব! ওর নাম নেমিয়ার। লোকটা কর্তৃপক্ষের বিষ। আজ পাঁচ বছর ধরে এখানে লোডিং মুহুরীর চাকরী করছে। ত্রিশ টাকায় আরম্ভ করে এখন এসে ঠেকেছে পনর টাকায়। লোকটার ছায়ার মধ্যে দুর্ভাগ্যের ছোঁয়াচ।

একে কুৎসিত, তার ওপর প্লুরিসি। সপ্তাহে তিনদিন টেবিলে পাঁজর চেপে অসাড় হয়ে পড়ে থাকে। দেখে মনে হয় লোকটা মেরুদণ্ডহীন, নইলে কেন্নোর মত অমন গুটিয়ে পাকিয়ে পড়ে থাকা যায় না।

তাছাড়া আছে রুক্মিণী, নেমিয়ারের বোন। রতনলাল মিলের প্রবীণ অর্বাচীন সবাই সঞ্জয়কে সাবধান করে দিয়েছে—ঐ ভাইবোনের খপ্পর থেকে সামলে থেক বাঙালীবাবু।

নেমিয়ার গায়ে পড়ে ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করছে। হঠাৎ এসে একদিন বলে গেল, এক-নম্বরের কুয়োর জল ছাড়া অন্য জল খেয়ো না বাবুজী। ম্যালেরিয়া হবে।

আর একদিন কয়েক শিশি আইডিন, ক্যাষ্টর অয়েল আর কুইনিনের বড়ি দিয়ে গেল।—তোমার জন্য নিয়ে এলাম করমপুর হাসপাতাল থেকে।

সঞ্জয় শুধু অপেক্ষায় আছে, দেখা যাক এই নিষ্কাম প্রীতির পরিণাম কোথায় গিয়ে ঠেকে। ঠিকই, তিন সপ্তাহের মধ্যে নেমিয়ারের ছদ্মবেশ ধরা পড়ে গেল। অফিসে খাতা লিখছিল সঞ্জয়। মুখ তুলে তাকাতেই দেখলো নেমিয়ার দাঁড়িয়ে, ছোট ছোট চোখ দুটো মিটমিট করে জ্বলছে।

নেমিয়ার বললো—এইবার একটা বন্দুকের লাইসেন্স নিয়ে ফেল বাবুজী। দু'জনে একসঙ্গে শিকার করা যাবে। রোজ খরগোসের রোষ্ট, দোয়াস্তা মহুয়ার সঙ্গে জমবে ভাল।

সঞ্জয়কে নিরুৎসাহ দেখে একবার কি ভেবে নিয়ে হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে বললো—পাঁচটা টাকা লোন দাও তো বাবুজী। আসছে মাসে তাহ'লে তুমি পাবে ছ'টাকা আট আনা।

সঞ্জয় স্পষ্ট বলে দিল হবে না, মাপ কর!

নেমিয়ার চলে গেলে সঞ্জয় হাসলো মনে মনে। মানুষের হৃদয়বৃত্তির চরম পরিচয় সে জেনেছে। অত সহজে ভবী আর ভোলে না। নেমিয়ার কোন্ ছার।

কিন্তু নেমিয়ারকে চিনতে বোধহয় এখনো অনেক বাকী ছিল।

রাত্রিবেলা জোর বৃষ্টির শব্দের মধ্যে দরজার বাইরে কড়া নাড়ছে কেউ। সঞ্জয় দরজা খুলতেই ঘরে ঢুকলো রুক্মিণী, হাতে খাবারের থালা।

—আজ নেমিয়ারের জন্মদিন। নেমিয়ার বলেছে আপনিই তার একমাত্র বন্ধু। তাই সামান্য কিছু খাবার নিয়ে এলাম আপনার জন্য।

কথা শেষ করে রুক্মিণী থালাটা নামিয়ে তক্তপোষের এক পাশে বসে পড়ে হেসে ফেললো।

সঞ্জয় এই প্রথম ভাল করে দেখলো রুক্মিণীকে। মেয়েটা কালো আর রোগা। বেশ বুদ্ধিভরা সেয়ানা দৃষ্টি। চোখের কোল দুটোতে রাত-জাগা ক্লান্তির কালিমা। তবু দেখে বোঝা যায়, শুধু ভাল করে খেতে পেলে এই চেহারারই কী চমক খুলবে। বেশ দামী একটা শাড়ী পরে এসেছে, বিলিতী সুগন্ধী মাখা। সবচেয়ে সুন্দর ওর দাঁতগুলো। কথা বলার সময় দেখায় দু'পাটি সারি বাঁধা ছোট ছোট শুক্রমণি পোখরাজের মত। হেসে ফেলে যখন, তখন মুক্তদল কুঁড়ির স্তবকের মত হঠাৎ ফেঁপে ওঠে।

সঞ্জয়ের তন্ময়তা দেখে রুক্মিণী অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে বললো—আপনি খেয়ে নিন। ততক্ষণ আমি বসছি।

খাওয়া শেষ হতেই রুক্মিণী উঠে ত্বরিৎ হস্তে এঁটো বাসনগুলি তুলে নিয়ে দাঁড়ালো—এবার চলি বাবুজী, অনেক রাত হয়েছে।

সঞ্জয় একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললো—একা যাবে কী করে?

—তা যেতে পারবো। এক ঝলক হাসি হেসে বাইরে পা বাড়াতেই সঞ্জয় এঁটো হাতে খপ করে ওর হাত চেপে ধরে।

রুক্মিণী বলে—আঃ, বাসনগুলো পড়ে যাবে। আগে নামিয়ে রাখতে দাও।

ক'দিন পরে নেমিয়ার অফিসে টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ালো। মেরুদণ্ডহীন প্রাণীর চোখ দুটো আবার মিটমিট করে জ্বলছে। গলার স্বর নামিয়ে কথা বললে —তুমি রুক্মিণীকে ভালবাস? প্রশ্নের আঘাতে সঞ্জয় চমকে উঠতেই নেমিয়ার বলে—সে তো সুখের কথা। লজ্জা করবার কি আছে? আচ্ছা আমি চলি এবার। দাও।

সঞ্জয়—কি?

—সেই যে পাঁচটা টাকা দেবে বলেছিলে!

চমকে ওঠে, টাকা দেয় সঞ্জয়।

—থ্যাঙ্ক ইউ! নোটটা পকেটে গুজে নেমিয়ার বলে—যখন যা দরকার হবে আমায় বলো।

সত্যিকারের গোত্রান্তর হয়েছে সঞ্জয়ের। পাখী শুধু তার ডাকার আবেগে যেমন করে সঙ্গিনী লাভ করে, রুক্মিণী তেমনিভাবে এসেছে তার কাছে। তার লাঞ্ছিত পৌরুষকে এই পথের মেয়েটাই সসম্মানে লুফে নিয়েছে। জ'লো দাম্পত্যের চেয়ে এ ঢের ভাল! তার বিদ্রোহের প্রথম পরিচ্ছেদ পূর্ণ হয়েছে।

বাড়ির চিঠি আসে। খাঁটি বাঙালী ভদ্র বাড়ির চিঠি—কেমন আছ? উন্নতির কতদূর হল? সংসারে বড় টানাটানি। কিছু পাঠাতে পারলে ভাল হয়।

চিঠি আসে কিন্তু উত্তর যায় না। মধ্যে অনেক দূর ব্যবধান—বালুচর আর চোরাবালি। চিঠিগুলি খবরের কাগজের টুকরোর মত মনে হয়। ও দুঃখ তো আর একা মকতপুরের দত্তবাড়ীর নয়। এই নেমিয়ারের বৌ তিনটি ছেলে কোলে করে কুয়োয় ঝাঁপিয়ে আত্মহত্যা করেছে। সেই খবরের কাটিং আছে নেমিয়ারের বুকপকেটে। পৃথিবীর দুঃখ মিটলে দত্তবাড়ীরও দুঃখ মিটবে।

রাত্রে হাঁড়িয়া খেয়ে একদিন কড়া নেশায় মাথায় জ্বালা ধরে। সঞ্জয়ের চোখ দিয়ে জল গড়াতে থাকে। রুক্মিণী অনুনয় করে জিজ্ঞাসা করে—তুমি কাঁদ কেন?

চিঠিগুলি কুচিকুচি করে ছিঁড়ে পুড়িয়ে দেয় সঞ্জয়, ক্ষ্যাপা বামুন যেমন করে তার পৈতে ভস্ম করে।

চুরাশী পরগণা থেকে সহস্র যোজন দূরে, লবণ পারাবারের অপর প্রান্তে ওলন্দাজের দেশে মুদ্রালক্ষ্মী যেন বিধবা হয়েছে। স্বর্ণমান বাতিল হয়ে বাট্টা আর বিনিময়ের হার পাল্টে গেছে রাতারাতি। গিল্‌ডারের দাম এক দফায় নেমে গেছে সস্তা হয়ে।

সেই ক্ষুব্ধ বাণিজ্যবায়ু হু হু করে আকাশে পাড়ি দিয়ে এসে ঠেকেছে কলকাতার বন্দরে। টন-টন জাভা চিনি নামছে অতি মন্দা দরে। ইণ্ডিয়ান চেম্বারে বিষাদ। মতিপুর চম্পারণ আর কানপুর স্পেশাল বস্তাবন্দী হয়ে আড়তে আড়তে কাঁদছে।

ওলন্দাজের বাজারের অভিশাপ এসে লাগলো রতনলাল মিলে আর চুরাশী পরগণার আখের ক্ষেতে। মিলের ঘরে ঘরে মুনিবজী নোটিশ পড়ে গেলেন—মাইনে ও মজুরী শতকরা চল্লিশ কাট্।

কিষাণেরা ফটকে ভীড় করেছে; চোঙ মুখে দিয়ে মুনিবজী আখের দর ঘোষণা করে দিলেন—এগার পয়সা মণ। যে যে বেচতে রাজী আছ কাল থেকে ফসল পৌছাও।

সন্ধ্যে পর্যন্ত মিলের ফটকে কর্মচারী ও কিষাণদের জনতা নিঝুম হয়ে বসে রইল। রায়বাহাদুরের ছেলে সূর্যবাবু চলে গেলেন করমপুর, ট্রাঙ্ক টেলিফোনে কলকাতার বাজারের অবস্থা জানতে।

ভীড় সরাতে রায়বাহাদুর স্বয়ং হাতজোড় করে এসে দাঁড়ালেন।—বাবালোগ বৃথা ঝামেলা কেন? এ সব নসীবের মার। ভগবানের কাছে জানাও, যেন

সুদিন ফিরে আসে।

কিষাণদের মধ্যে মুনিরাম একটু জবরদস্ত। সাফ জবাব দেবার মত জিভ ওরই আছে। মুনিরাম বললো—সরকারী রেট তো পৌনে পাঁচআনা বাঁধা আছে হুজুর।

রায়বাহাদুর স্মিতহাস্যে বললেন—ওসব সুখস্বপ্ন ছাড়ো ভাইয়া, সে রামরাজ নেই। জাভা মাল এসে ডাকাতি করছে। তামাম আগুন লেগে গেছে! মিল বন্ধ না করে দিতে হয়।

মুনিরামও ছাড়বার পাত্র নয়—কাল সকালে ঘরের ছেলেমেয়েগুলিকে সব পাঠিয়ে দেব। মেহেরবানি করে গুলি চালিয়ে শেষ করে দেবেন। সেই বরং ভাল।

সস্নেহে ভর্ৎসনা করে রায়বাহাদুর বললেন—বেকুব ঘোড়া কাঁহাকা। যা যা ঘরে গিয়ে মাথা ঠাণ্ডা কর্ সব। এ শঙ্কর পালোয়ান, ফটক বন্ধ করো।

পরাজিত পল্টনের মত জনতা ফটক থেকে সরে গেল। কর্মচারী ও মজুরেরা যে যার ঘরের পথ ধরলো। শুধু সঞ্জয় চললো অন্যদিকে। সঙ্গে নেমিয়ার মুনিরাম সুখলাল ছেদি আরও ক'জন কিষাণ। বুড়ো বটের তলায় পুরনো শিবালয়ের সিঁড়িতে ওরা নিঃশব্দ এসে বসলো।

সঞ্জয় বললো—এর প্রতিশোধ নিতে হবে।

মুনিরামের অন্তরাত্মা যেন এই বরাভয়বাণীর জন্য ও২ পেতে বসেছিল। লাফিয়ে উঠে বললো—দোহাই বাঙালীবাবু। একটা উপায় বলে দাও।

কয়েকটা গবেটগোছের কিষাণ কি জানি কিসের প্রেরণায় ডাক ছাড়লো—হর হর মহাদেও!

নেমিয়ার দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে খিস্তি করে ধমক দিল—খবরদার! কোন আওয়াজ নয়।

এই অবস্থায় কিছুক্ষণ কেটে যাবার পর সঞ্জয় প্রস্তাব করলো—কেউ ফসল বেচবে না।

সবাই বললো—ঠিক কথা।

—তোমরা দর নামিও না। ওরা শেষে কিনতে বাধ্য হবে। নতুন মেশিন এসেছে, কাজ ওদের চালু করতেই হবে!

সুখলাল বললো—যদি না কেনে?

মীমাংসা হয়েই যাচ্ছিল, সুখলালের প্রশ্নে আবার বিতণ্ডা শুরু হল।

সঞ্জয় উঠে দাঁড়িয়ে বললো—কিনতে বাধ্য হবে। লড়াই শুরু করে দাও। বট পাতা ছুঁয়ে সকলে কসম খাও।

সঞ্জয়ের কথার মধ্যে অদ্ভুত এক আশ্বাসের উদ্দীপনা ছিল। যেটুকু সংশয়ের মেঘ ছিল, সকলের প্রতিজ্ঞা আর উৎসাহের ঝড়ে তাও কেটে গেল! পুণ্য বাতাসে শিবালয়ের ঐ নিরেট বধির বিগ্রহটা সত্যিই যেন জেগে উঠলো এত

দিনে। বৈঠক শেষ হল।

রুক্মিণীর ঘরের কাছাকাছি এসে সঞ্জয় বললো—নেমিয়ার, তুমি এইবার যাও। আজ থেকেই কাজে লেগে যাও। খুব ভাল করে অর্গানাইজ কর।

—বহুৎ আচ্ছা বাবুজী।

নেমিয়ার চলে গেলে সঞ্জয় অন্ধকারে অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। এম-এ পাশ সঞ্জয় ক্যাশমুন্সী হয়ে গেছে। তার অপমানিত প্রতিভা যেন ব্যর্থ রোষে ফণা নামিয়ে দিন গুণছিল। এইবার ফিরে ছোবল দিতে হবে, যতখানি বিষ ঢালতে পারা যায়।

অন্ধকারে চুপ করে দাঁড়িয়ে তার সমস্ত ভাবনাকে সংগ্রামের সাজে সাজিয়ে তৈরী হল সঞ্জয়। রতনলাল মিলের চিমনিটা অস্পষ্ট দেখা যায়। ডাইনোসরের মত ঘাড় উঁচিয়ে তাকিয়ে আছে চুরাশী পরগণার বিস্তীর্ণ আখের ক্ষেতের দিকে। ঐ দানবীয় চর্বির স্তূপের ভিতর কোথায় হৃৎপিণ্ড লুকিয়ে আছে, তা সঞ্জয়ের অজানা নয়, ঠিক সেখানেই তাক করে আঘাত দিতে হবে।

মন-ভরা উল্লাস নিয়ে সঞ্জয় রুক্মিণীর ঘরে ঢুকলো।

আদরের বাড়াবাড়ি দেখে রুক্মিণী প্রশ্ন করে—বড় সস্তার সওদা পেয়েছ, না? তবুও একদিন তো ছেড়েই দেবে!

—সস্তা? আমার কি দেবার বাকী আছে? আর ছেড়েই বা দেব কেন?

রুক্মিণী যেন একটু অনুতপ্ত হয়ে হাত দিয়ে সঞ্জয়ের মুখ চেপে ধরে বললো—আচ্ছা! মাপ করো। আর বলবো না। তবে তুমি নিজেই সেদিন নেশার ঘোরে বলছিলে, আমি নাকি সরবতের গেলাস, সরবত নই।

সঞ্জয়ের প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করেই রুক্মিণী বললো—আমার কিছু থোক টাকা চাই। একবার ভাল করে তাকিয়ে দেখ তো আমার দিকে।

রুক্মিণী গায়ের আঁচলটা নামিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো—বুঝেছ? আমার চলবে কি করে?

—হ্যাঁ বুঝেছি। সঞ্জয় গম্ভীর হয়ে গেল।

রতনলাল মিলের সমস্ত মেশিন বন্ধ। অতিকষ্টে দু'চার গাড়ি মাল যোগাড় হয়েছে। কলকাতার মার্কেটের অর্ডার মেটাবার শেষদিন এগিয়ে আসছে। রায় বাহাদুর প্রায় পাগল হয়ে সদরে এস্-ডি-ও'র বাংলোতে দৌড়াদৌড়ি করছেন।

চুরাশী পরগণার ফসল শুকোচ্ছে মাঠে মাঠে। এজেন্টরা গাড়ি আর টাকার তোড়া নিয়ে বস্তি বস্তি ঘুরে বেড়াচ্ছে! মাল ছাড়বে তো ছাড়। পাতা লাল হয়েছে কি এক আনাও দর দেব না। কিষাণরা হেসে চুপ্ করে থাকে।

নেমিয়ার একেবারে উধাও হয়েছে। বাড়িতেও থাকে না, অফিসেও আসে না। দাঁড়কাকের মত সে দিনরাত চুরাশী পরগণার মাঠে ঘাটে বস্তিতে উড়ে বেড়ায়।—খবরদার এজেন্টদের কথায় কেউ ঘাবড়িয়ো না। রতনলাল মিল ঠাণ্ডা

হয়ে আসছে।

চুরাশী পরগণার ওপর শকুন উড়ছে ক'দিন থেকে! গো-মড়ক লেগেছে। মুনিরামের একটা ছেলেও মারা গেছে বসন্তে।

সাহুরা খেরোবাঁধা খাতা আর তমসুখের নথি নিয়ে দরজায় দরজায় হানা দিচ্ছে তাগাদায়। একজন রিক্রুটার ত্রিশজন তুরীকে গেঁথে নিয়ে সরে পড়েছে মালয় রবার বাগানের জন্যে। জিতেন নগরের সড়কে গরুর গাড়ি লুট হয়েছে। মিলিটারী পুলিশ রুট মার্চ করে গেছে।

পঙ্গপালের মত করমপুরের গয়লারা এসেছে দলে দলে। মোষ কিনছে পাঁচ টাকায়, দুধেল গরু আট টাকায়, বাছুর বার আনা। সাহুরা চড়া সুদে রুপোর গয়না বন্ধক নিচ্ছে, পেতল কাঁসার বাসন বিকিয়ে যাচ্ছে মাটির দরে।

চুরাশী পরগণার ঘরে ঘরে সেদ্ধ হচ্ছে কোনার গাছের পাতা। ঘরে ঘরে দানা আনাজ নিঃশেষ।

এক মাস হতে চললো। রায়বাহাদুর এজেন্টদের গালাগালি দিয়েছেন।—যেমন করে পার মাল নিয়ে এস। মার্কেটে আর ইজ্জৎ থাকে না! মেশিন যে মরচে পড়ে গেল।

এস্-ডি-ও এসে মিল দেখে গেছেন। পেয়াদা দিয়ে চুরাশী পরগণায় ঢোল পিটিয়ে দিয়েছেন।—সব কোই হুশিয়ার হো যাও। ফসল ছাড়, একদিন মাত্র সময় দেওয়া গেল। নইলে কাল থেকেই লয়াবাদ পরগণা থেকে ফসল আনা হবে।

মুনিরাম আর সুখলাল এল সন্ধ্যাবেলা। ঘেয়োকুকুরের মত চেহারা। এখনও ভরসা জলজল করছে ওদের চোখে, হাত পেতে হুকুম চাইছে—বাবুজী, এইবার কি করতে হবে হুকুম দাও।

সঞ্জয় বললো—আর ক'টা দিন সবুর কর।

মুনিরাম আর সুখলাল চুপ করে অনেকক্ষণ বসে থেকে চলে গেল। তাদের একটা কিছু বলবার হয় তো ছিল। বলা আর হল না।

ঘটনাগুলি কেমন ঘোরাল হয়ে আসছে। রায়বাহাদুর এখনও তাকে ডাকলো না, এই সঙ্কটে একটা পরামর্শের জন্য। আভাসে সঞ্জয় একদিন জানিয়েও ছিল—যদি বলেন তো কিষাণদের আমি শাস্ত করি।

এদিকে রুক্মিণী আবার এক কাঁটা গিলে বসে আছে। দুদিকেই একটা ব্যবস্থা এবার করা উচিত। কিন্তু নেমিয়ার ছাড়া কি করে কাজ হয়। কাজের বেলা লোকটা সত্যিই বড় সহায়।

নেমিয়ার এসে সামনে দাঁড়ালো।

কেরোসিনের বাত্তির ময়লা আলো। নোংরা খাকি প্যাণ্ট, ছেঁড়া কামিজ, পাখীর বাসার মত রুক্ষ চুলে ভরা মাথাটা। কেন্নো নেমিয়ার দাঁড়িয়ে আছে লোহার মূর্তির মত ঋজু ও কঠিন। গোত্রহীন মানুষের স্বরূপ দেখে আজ সঞ্জয় আঁৎকে

উঠেছে, বসে আছে মাথা নীচু করে।

নেমিয়ার চাইতে এসেছে মিলের ক্যাশঘরের চাবি। গিরগিটির মত চেটে নিয়ে আসবো যা কিছু ক্যাশ আছে। ঘরে আগুন লাগিয়ে দেবো। ফাইল রেজিস্টার ছাই হয়ে যাবে! তোমাকে দায়ী করবে কি দিয়ে? কে বলবে কত ব্যালান্স ছিল? দাও, চাবি দাও।

সঞ্জয় ঘাডটা একবার তুলে তাকালো বাইরের অন্ধকারের দিকে। আলোটা একটু উজ্জ্বল থাকলে দেখা যেত, দমকা শিহরে তার হাঁটু দুটো থরথর করে উঠলো।

নেমিয়ার যেন ভয়ঙ্কর অর্থহীন এক ব্যালাড গাইছে—চুরাশীপরগণার রসদ চাই। তারপর দেখবো, লয়াবাদের সডক দিয়ে কোন্ মরদকা বাচ্চা বাইরের মাল আনতে পারে। কেউ বেচবে না ফসল, ক্ষেতে ক্ষেতে শুকিয়ে যাবে, পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া হবে। কিষাণেরা সব কসম খেয়েছে। আজ রাত্রে লাঠি মাজা হচ্ছে ঘরে ঘরে। সব তো গেছে, কিন্তু রতনলাল মিলকে দেখে নেবে তারা। মাথা দেবে, মাথা নেবে।

বসন্তে ক্ষতাক্ত মুখ, গোল গোল চোখ, বেঁটে রোগা ঘুঁটে রঙের চেহারা নেমিয়ারের, যাকে চড়ুই পাখীও ভয় পায় না, সে-ই এসে দাঁড়িয়েছে সঞ্জয়ের সুমুখে, অতি আসন্ন এক বিপ্লবের ফরমান হাতে নিয়ে।

নেতিয়ে পড়েছে সঞ্জয়। নেমিয়ার পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললো—অত ভাবনা কিসের কমরেড দাদা! তোমার কিষাণ ফৌজকে খেতে হবে তো। দাও, আর দেরী করো না।

ক্যাশঘরের চাবির তোড়া নিয়ে নেমিয়ার অন্ধকারে পিছলে সরে পড়লো।

উদ্‌ভ্রান্তের মতো অনেকক্ষণ পায়চারি করে সঞ্জয় এসে দাঁড়ালো ঘরের বাইরে একটু ঠাণ্ডা হাওয়া পেতে। একটা সামান্য দলাদলির এ রুদ্র পরিণাম সে কল্পনা করতে পারেনি। সার্কাস দেখাবার জন্যে যে সিংহকে খাঁচার বাইরে আনা হয়েছে, একটু সামান্য খোঁচা দিতেই সেটা যে বুনো হাঁক ছেড়ে অবাধ্য হয়ে উঠবে, কে এতটা ভেবেছিল?

—নেমিয়ার। অন্ধকারে সঞ্জয়ের ভাঙা গলা কেঁপে উঠলো।

দৌড় দিল সঞ্জয়।

রুক্মিণীর ঘরের জানালার ফাঁক দিয়ে মৃদু আলোর সঙ্গে তারযন্ত্রের বিলাপের মতো একটা স্বর ঠিকরে এসে পড়েছে। সঞ্জয় দম বন্ধ করে জানালার ফাঁকে চোখ লাগিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

মেঝের ওপর লুটোচ্ছে রুক্মিণী। শাড়ীর ভার খসে গিয়ে কোমরে শুধু গেরোটা লেগে আছে। খোঁপাটা মাটিতে ঘসা খেয়ে খেয়ে নোংরা হয়ে গেছে। কাচের চুড়িগুলো ভেঙে ছড়িয়ে রয়েছে এদিক ওদিক। আহত নাগিনীর মতো রুক্মিণী যেন কোমর ভেঙে অবশভাবে পড়ে আছে। শুধু এপাশে ওপাশে মোচড় দিয়ে

কাতরাচ্ছে।

রুক্মিণীর প্রাণবায়ু যেন করাল ঝঞ্ঝার মতো সমস্ত শরীরে একবার গুমরে উঠলো। এমন অবস্থায় অনেকে তো মারা যায়। রুক্মিণীর কপালেও কি তাই আছে?

অনাবৃত মসৃণ হাঁটুর ওপর অতি পরিচিত সেই নীল শিরার আঁকা-বাঁকা রেখাগুলি, জোঁকের মতো ফুলে উঠেছে। ঠোঁটের ওপর দাঁতের পাটি চেপে বসে গেছে। চোখের কোণ থেকে তোড়ে তোড়ে জল গড়িয়ে পড়ছে কান ভাসিয়ে। চাপা আর্তস্বর পর্দায় পর্দায় তীক্ষ্ণ হয়ে উঠছে। ফুসফুসটা ফেটে যায় বুঝি। এই কি মৃত্যু?

কী নিষ্ঠুর বিভ্রম! সমস্ত যন্ত্রণা ধন্য করে কপট মৃত্যুর আড়ালে এক নব-জীবনের রক্তবীজ পৃথিবীর মাটিতে হাত বাড়িয়েছে। সঞ্জয় এক লাফে পিছনে এসে গাছের নিচে দাঁড়ালো!

নেমিয়ার কোথায়? সঞ্জয় এগিয়ে যায়, নেমিয়ারের ঘরের দরজার ফাঁকে উঁকি দেয়।

কালো প্যাণ্ট পরে, কোমরে একটা চওড়া বেল্ট কসে নেমিয়ার বসে বসে চিবোচ্ছে বাসি রুটি। হাঁড়ি থেকে ঢেলে পচাই খাচ্ছে এক-এক চুমুক। একটা ধারালো ভোজালি সামনে রাখা। মুখে অদ্ভুত এক প্রসন্নতা; শুকনো ঠোঁট দুটো নেকড়ের ঠোঁটের মতো হাসছে।

এ ঘরে ভাই, ও-ঘরে বোন। পুরাকল্পের বর্বর পৃথিবীর দু'জন ;পিত ডাইন ও ডাইনী যেন তুক্ করে সর্বনাশের আহ্বান করছে!

নদীতে বান ডাকে, ভয়াল তোড় আসে, গর্জন করে। জেলে তার যথাসর্বস্ব ঘাড়ে তুলে দৌড় দেয়। সঞ্জয় দৌড় দিল। সড়ক না ধরে, মাঠের ঢালু খাড়াই খাদ গর্ত ডিঙিয়ে সঞ্জয় দৌড়তে থাকে। মিল ফটকের আলোটা ঘোলাটে আলেয়ার মতো কুয়াশায় দপ-দপ-দপ করছে। আর বেশি দূর নয়।

মকতপুরই বা কতদূর? আজ শেষরাত্রে ট্রেন ধরলে কাল বিকালে পৌঁছে যাবে। শিরিষ গাছে হয়তো সুঁটি পেকেছে। সোনালী বৈকালে হাল্‌কা বাতাসে মোটা ঘুঙুরের মতো শব্দ করে বাজে। বড়দা বারান্দায় বসে গুড়ের তৈরী চা খান। মা উঠোনে বসে লক্ষ্মীর পিঁড়ি ধুতে থাকেন। পুতুল আকাশে আঙুল তুলে শঙ্খচিলের ঝাঁক গোণে—এক দুই তিন। সুমিত্রা, হয়তো তার বিয়ে হয়নি। তার শবরীদৃষ্টি ঘুরে বেড়ায় মকতপুরের বাড়ির জানালায়—পথে—আগন্তুক মোটরবাসের দিকে।

রায়বাহাদুর রতনলাল, সূর্যবাবু, মুনিবজী—সামনে টুলের ওপর বসে আছে সঞ্জয়—বিশীর্ণ রোগীর মতো। ভাঙা কাঁসরের মতো গলার আওয়াজ। এক গেলাস গরম দুধ সঞ্জয়কে খেতে দেওয়া হয়েছে।

রায়বাহাদুর ডাকলেন—শঙ্কর পালোয়ান, ক্যাশঘরে পাহারা বসাও। নেমি-

-য়ার বাবুজীকে ছুরি দেখিয়ে চাবি নিয়ে গেছে। আজ রাতেই চুরি করতে আসবে। চোট্টা শালাকে ধরে কাঁচা খেয়ে ফেলতে হবে।

রায়বাহাদুর এবার মুনিবজীকে হুকুম দিলেন—বাবুজী স্টেশনে যাবেন। এখনই একটা ভাল ঘোড়ায় গদি চড়িয়ে দাও। আর আমার সিন্দুক খোল, বকশিস দিতে হবে। বড় ইমানদার ছেলে!

বকশিসের পঞ্চাশটা টাকা হাতে নিয়ে আর আদাব জানিয়ে সঞ্জয় উঠলো। রায়বাহাদুর বললেন—কটা দিন বাড়ি গিয়ে বিশ্রাম কর। তারপর এসে' আমার গোরখপুর মিলে—শও রূপেয়া তনখা।

রামখড়ির রেঞ্জের গায়ে সরু জংলী পথে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে সঞ্জয়। আকাশের বুকটা লাল হয়ে গেছে। কিষাণেরা আগুন ধরিয়ে দিয়েছে নিজের নিজের ক্ষেতে। যেন পুড়ে পুড়ে শুদ্ধ হচ্ছে চুরাশী পরগণা।

সামনের মাঠটা পার হলেই স্টেশন, ডিস্টান্ট সিগনালের আলোটা নীল তারার মতো ভেসে রয়েছে। ছপ্‌ করে একটা শব্দ। ঘোড়াটা একটা স্রোতে পা দিয়েছে।

সঞ্জয় ঘোড়া থেকে নেমে স্রোতের ধারে বসে আঁচলা ভরে জল খেল। গেরস্তের মুর্গি চুরি করে একটা শেয়াল ভেজা বালির ওপর বসে গোঁপের রক্ত চাটছিল। সেও জল খাবার জন্য স্রোতে মুখ নামালো।

সা য় ন্ত নী

এক সন্ধ্যায় ফুটেছিল যে মল্লিকা, আর-এক সন্ধ্যায় ফুটে উঠলো সেই মল্লিকার বিয়ের ফুল।

অনেক আলো জ্বলছে, শানাই বাজছে, আঙিনায় আলপনা আঁকা হয়েছে, লোক-জনের ব্যস্ততা হৈ-হৈ করছে। কলকাতার ননীকাকা এসেছেন। বর্ধমানের চারুমামাও এই কিছুক্ষণ আগে পৌঁছেছেন। চারুমামার বড় মেয়ে পারুলদি, যাঁকে আগে কোনদিন দেখেনি মল্লিকা, তিনিও এসেছেন। রঙীন বেনারসী জড়িয়ে আর কপালে চন্দনের লবঙ্গ-তিলক এঁকে একটা শাঁখ বাজানো সঙ্কেতের অপেক্ষায় ঘরের ভিতরে মেঝের উপর একটা আসনে বসে আছে মল্লিকা। কাজল দেওয়া চোখের কোলে লজ্জাঘন ভীরুতা, কিন্তু মুখটা হাসি ঝরাচ্ছে। এইরকম একটা উৎসবের রূপ ফুটে উঠলেই তো বিয়ের ফুল ফুটে যায়।

সেই জ্যেঠামশাই আজ আর নেই, এই মল্লিকা নামটাই যাঁর দেওয়া নাম। আজ তিনি থাকলে নিজেরই চোখে দেখতে পেতেন, তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী কত সার্থক হয়েছে। সেই সন্ধ্যার সেই ফুটফুটে আর ধবধবে সাদা এইটুকু একটা মল্লিকা আজ সন্ধ্যায় সত্যিই যেন নানা রঙে রঙীন একটি নতুন রূপের মল্লিকা হয়ে গিয়েছে। বলেছিলেন জ্যেঠামশাই, আমি এখনই বলে দিচ্ছি, এ মেয়ে হলো রূপ-চোরা মেয়ে; এখন দেখে কিছুই বুঝতে পারবে না, কিন্তু বুঝবে তখন, যখন

বড়টি হবে এই মেয়ে। রূপ তখন এমন রঙ খুলবে যে, দেখনেওয়ালার চোখের পলক পড়বে না।

একটু অদ্ভুত মানুষ ছিলেন সেই জ্যেঠামশাই। এই আমতলা হাটের স্টেশনের কাছে একটা চালের আড়তে কাজ করতেন। মাথাভরা টাক আর মুখ-ভরা দাড়ি, রোগাটে চেহারার ছোটখাট মানুষটি। আড়তের খাটুনি থেকে একটু ছুটিছাটা পেলেই সারাদিন কালিদাস পড়তেন।

বাড়ির পিছনে ডোবার মতো দেখতে ঐ পুকুরটার পাশে নিজের হাতে ফুলের বাগান করেছিলেন জ্যেঠামশাই। রাত্রিবেলা বাগানের শিউলিগুলির দিকে তাকিয়ে আর হেসে হেসে বলতেন—আহা! রজনীহাসিনী শেফালিকা। সকালবেলায় শালুকগুলোর দিকে তাকিয়ে বলতেন—প্রভাতকিরণবন্দিতা নলিনী।

আরও কত কি বলতেন; বসন্তানিলপ্রিয়া মাধবী, সায়ন্তনী মল্লিকা!

হ্যাঁ, জ্যেঠামশায়ের বাগানের মল্লিকা সন্ধ্যাবেলাতেই ফুটত। কাজেই, চালের আড়তের কাজ সেরে সন্ধ্যাবেলা ঘরে ফিরেই, যখন শুনলেন যে, যোগেশের একটি মেয়ে হয়েছে, তখন একেবারে আঁতুড়ঘরের দরজার কাছে এসে, আর সদ্যোজাতা ভাইঝিকে দেখে তখনই নাম দিলেন—সায়ন্তনী মল্লিকা।

জ্যেঠামশাই নিজে অবশ্য মল্লিকাকে সায়ন্তনী বলেই ডাকতেন। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে মল্লিকার সায়ন্তনী নামটাও চলে গিয়েছে। থেকে গিয়েছে শুধু মল্লিকা।

বলেছিলেন জ্যেঠামশাই, মেয়েটা যদি রাত্রিবেলা জন্ম নিত, তবে নাম দিতাম শেফালিকা। সকালবেলায় হলে, নলিনী। বসন্তকালে হলে মাধবী। বর্ষাকালে হলে, কেতকী। আর··· ।

শালুর কাপড়ে বাঁধানো কালিদাসের পাতা ওলটাতে থাকেন জ্যেঠামশাই।

মল্লিকার বয়স তখন প্রায় পনর, তখনও বেঁচে ছিলেন জ্যেঠামশাই। আর, মল্লিকার চেহারার রকম দেখে মল্লিকার মা মাঝে মাঝে দুঃখ করতে গিয়ে হেসেই ফেলতেন।

—এত কাব্যি করে বড়দা কী যে বললেন, আর কী যে হলো! সিঁটকে সিড়িঙ্গে আর গাল-ভাঙ্গা, বড় হয়ে শ্রীমতীর রূপ এই তো খুলেছে!

মন্তব্যটা একদিন শুনতে পেয়েছিলেন জ্যেঠামশাই; শালুর কাপড়ে বাঁধানো কালিদাস হাতে নিয়ে প্রায় তেড়ে এসে বলেছিলেন—তুমি খুব ভুল বুঝেছ বউমা। সায়ন্তনী বড় হতে না-হতেই তুমি এসব কথা কেন বলছো?

—আর বড় হবে কবে?

—না, এখনও বড় হয়নি সায়ন্তনী। এই বয়সটাকে বড়-হওয়া বয়স বলে না। এর ডবল বয়স হওয়া চাই।

—তার মানে তিরিশ?

—নিশ্চয়।

জ্যেঠামশায়ের একটা সাধের কল্পনা, কিংবা কল্পনার সাধ। কিন্তু তাও যে

বর্ণে বর্ণে সত্য হয়েছে। মল্লিকার বয়সটা তিরিশই হয়েছে। আর, রূপটাও সত্যিই একটা রঙীন ফুললতা, দেখনেওয়ালার দুই চোখ অপলক করে দেবারই মতো। কে বলবে এই চেহারা একদিন একটা সাদা সিঁটকে সিড়িঙ্গে চেহারা ছিল? বয়সটা যে তিরিশ হয়েছে, তাই বা বলবার সাধ্যি আছে কার?

কিন্তু শাঁখ বেজে উঠবার পরেই এত মুখর বিয়ে বাড়িটা এত নীরব হয়ে গেল কেন? বর আর বরযাত্রীরা এসে যাবার পরেই যদি বিয়েবাড়ির উৎসবের প্রাণ এত স্তব্ধ হয়ে যায়, তবে তো সেই ভয়ানক সন্দেহটাই করতে হয়, ফোটা ফুল বোধহয় ঝরে গেল।

মল্লিকাও যে তাই সন্দেহ করতে শুরু করে দিয়েছে। তা না হলে, এতক্ষণের মধ্যে একটা মানুষও মল্লিকার কাছে ছুটে আসে না কেন? যারা এতক্ষণ কাছে ছিল আর এত হাসছিল, তারা বর দেখবার জন্য সেই যে হন্তদন্ত হয়ে চলে গেল, যেন চলেই গেল। কেউ আর ফিরে আসে না কেন? কোথায় গেল ওরা, মীরা আর ধরা? বাসরঘরে হৈ-চৈ করবে বলে আগে থেকেই কোমরে আঁচল বেঁধে তৈরী হয়েছিল যারা দু'জন? মা কোথায় চুপ করে লুকিয়ে রইলেন, যিনি এতক্ষণ ধরে এত কাজের চাপের মধ্যেও একটা আনমনা ব্যাকুলতার মতো বার বার এসে শুধু মেয়ের মুখটি দেখে যেন ধন্য হয়ে আবার চলে যাচ্ছিলেন? সেই পারুলদিই বা কোথায় সরে রইলেন, আর্টিস্ট পারুলদি, যিনি বলেছিলেন, বর এসে পড়লেই কেউ যেন তাঁকে জাগিয়ে দেয়। তিনি এসে নিজের হাতে মল্লিকার খোঁপাটাকে জুঁই-এর কুঁড়ির মালা দিয়ে নতুন ছাঁদে বেঁধে দেবেন। কেউ কি এখনও পারুলদিকে জাগিয়ে দেয়নি? বর তো এসে গিয়েছে।

তবে কি নতুন কোন দাবী তুলেছে বরপক্ষ? সত্যিই কি বরপণ হিসাবে নগদ কয়েকশো টাকা ওরা পেতে চায়? কিংবা এসেই খোঁজ নিয়েছে, দানসামগ্রী হিসাবে যা দেবার কথা ছিল তা সত্যিই দেওয়া হচ্ছে কি না?

এরকম একটা কাণ্ড যে বাধতে পারে, সেটা একটু আগেই আঁচ করেছিলেন চারুমামা। মেয়ের বাবাকে স্পষ্ট করে শুধিয়েছিলেন—ওরা যা বলেছে, সেটা স্পষ্ট করে বলুন যোগেশদা। পণ চাই না, এ কথা কি সত্যিই ওরা বলেছে?

যোগেশবাবু বলেছিলেন—পণ চাই, এমন কথাও তো ওরা বলেনি।

—তার মানে এ নয় যে, ওরা পণ চায় না।

—আমি তা মনে করি না।

—বরপক্ষের মনস্তত্ত্ব আপনি কিছুই জানেন না, তাই এরকমটি মনে করে বসে আছেন। দেখবেন, ঠিক সময় বুঝে পণ দাবি করে ওরা চেপে ধরবে, আর আপনারই মত যুক্তি দেখাবে—পণ চাই না এমন কথা তো আমরা বলিনি।

—একথা বলে কী লাভ ওদের? আমাকে কেটে ফেললেও তো টাকা বের হবে না।

—সেই জন্যেই তো বলছি যোগেশদা, ব্যাপারটা ওদের সঙ্গে স্পষ্টাস্পষ্টি আলোচনা করে একটু খোলসা করে নেওয়া ভাল ছিল। শেষে বিয়ে নিয়েই একটা গণ্ডগোল না বাধে।

মল্লিকার দুশ্চিন্তার প্রশ্নগুলি ভীরু মনের বাতাসে গুনগুন করে; বরপণের দাবি না হয় ওরা ছেড়েই দিল, কিন্তু দানসামগ্রীর চেহারাটা যদি ওরা আগেই দেখতে চায়, তবে কেমন করে পার পাবেন যোগেশবাবু? দানসামগ্রী বলতে তো এই—দুটো থালা, দুটো গেলাস আর দুটো বাটি। আর, একটা তোষক একটা চাদর ও দুটো বালিশ।

মল্লিকা জানে, দান-সামগ্রীর ব্যাপারেও ওদের কোন দাবি ছিল না। বরের বাড়ির পিসি শুধু বলেছিল—দেখতে ভাল দেখাতো, যদি একটা পালঙ্ক দেওয়া হতো।

—অবশ্যই দেব। চিঠি লিখে স্পষ্ট ভাষায় প্রতিশ্রুতির কথা যে বরপক্ষকে জানিয়ে দিয়েছিলেন বাবা, তাও মল্লিকার অজানা নয়।

মা অবশ্য বার বার বাবাকে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন, কথা দিয়েও জিনিসটা না দেওয়া একটুও উচিত হচ্ছে না। যেমন করে পার, ধারের জন্য অনাদিবাবুর কাছে যদি আর-একবার হাত পাততেও হয়, তাও ভাল।

বাবা বলেছিলেন ধার পাওয়া যায় না।

মা রাগ করেছিলেন—তবে ওদের কথা দিয়েছিলে কেন?

বাবা একটুও রাগ না করে মার রাগটাকেই তুচ্ছ করলেন—ওটা একটা কথার কথা।

মা—কিন্তু শেষে যদি এ নিয়ে কোন কথা ওঠে আর কোন গণ্ডগোল হয়, তা হলে আমি কিন্তু…।

বাবা বলেছিলেন—হ্যাঁ, তা হলে আমাকে ফাঁসি দিয়ো তুমি।

এ ছাড়া আর এমন কি কারণ থাকতে পারে যার জন্যে বরপক্ষ এত বিরূপ হতে পারে?—ভাল করে অভ্যর্থনা করা হয়নি? আসা মাত্র চা দেওয়া হয়নি?

তাই বা কি করে হবে? বরপক্ষকে অভ্যর্থনা করবার আর খাইয়ে-দাইয়ে সব রকমে তুষ্ট করবার দায় নিয়েছেন যিনি, তিনি হলেন ননীকাকা। শোনা যায়, এই জীবনে তিনি এযাবত পঞ্চাশেরও বেশি বিয়েতে বরপক্ষ আর বরযাত্রীকে তুষ্ট করবার কাজে খেটেছেন। ননীকাকা নিজেও গর্ব করে বলেন, আমার হাতে পড়ে আজ পর্যন্ত কোন বর কোন বরপক্ষ আর কোন বরযাত্রী অতুষ্ট থাকতে পারেনি। গোখরো সাপের মত মেজাজ, কত বরকর্তার হৃদয় গলিয়ে দিলাম!

বর বরপক্ষ আর বরযাত্রীকে অভ্যর্থনা করতে সে ননীকাকার কাজে কথায় আর ব্যবহারে কোন ত্রুটি ঘটেছে,—এটাও যে কল্পনা করা যায় না। নিতান্ত অসম্ভব।

তবে আর কি কারণ থাকতে পারে? তবে বর আর বরপক্ষ কি এমন সত্য

জেনে ফেলেছে, যেটা গোপন রাখা হয়েছিল? তাই কি হঠাৎ ভয় পেয়ে চমকে উঠেছে বর মানুষটার আশা আর বরপক্ষের বিশ্বাস? তাই কি ওরা রাগ করে যোগেশ দত্তের বাড়ির প্রথম উৎসবের আলো নিবিয়ে দিতেই চায়?

মল্লিকার কাজল-দেওয়া চোখের কোণের লজ্জাটা হঠাৎ করুণ হয়ে যায়। শিউরে ওঠে চোখ দুটো। আয়নার দিকে তাকাতে আর ইচ্ছা হয় না।

ঠিকই তো, একটা সত্য গোপন রাখা হয়েছে। এর জন্য কিন্তু বাবাকে মোটেই দায়ী করা যায় না। দায়ী হলেন মা আর জেঠিমা। বিয়ের কথা যখন চলছিল, মা আর জেঠিমা বাবাকে বার বার মনে করিয়ে দিয়েছিলেন—ওরা মেয়ের বিষয় যা কিছু জিজ্ঞেস করবে, সবই ঠিক-ঠিক বলে দিও; কিন্তু বয়সটা বলে দিও না।

—তার মানে?

বাবার বুদ্ধির উপর মা আর জেঠিমা দুজনের কারও কোন আস্থা কোনদিনও ছিল না। দুজনই বলে দিলেন—তার মানে একটু কম করে বলে দেবে।

—পনর?

—না; আঠার বললেই চলবে।

আগে নিশ্চয় ওরা জানতে পারেনি; তা হলে আগেই একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যেত। এখানে এসে মানুষের জীবনের একটা আশার শঙ্খকে বেজে উঠবার সুযোগ দিয়ে, তারপর মানুষকে অপমান করবার এমন একটা নিষ্ঠুর কাণ্ড ওরাও করতো না। বুঝুন এখন মা আর জেঠিমা, তাঁদের বুদ্ধির মিথ্যেটা কত মিথ্যে হয়ে গেল। বিয়ে করতে এসে, বিয়ের লগ্ন যখন আসন্ন, তখন এক ভদ্রলোক সহজে তাঁদের আদুরে মেয়ের বয়েসটাকে কত সহজে অপমান করে দিল।

কিন্তু জ্যেঠামশাইয়ের একটা ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা হয়ে গেল।

জ্যেঠামশাই বলতেন: কোন্ রাজপুত্তুর না সায়ন্তনীকে বিয়ে করতে চাইবে? কিন্তু তাই বলে আমাদের সায়ন্তনী কি তাকে বিয়ে করে ফেলবে? সেটি হবে না, কখ্খনো না। তোমাদের কারও পছন্দে নয়, নিজে পছন্দ করবে, তবে বিয়ে করবে সায়ন্তনী।

পছন্দ তো করেওছিল মল্লিকা। ওঘরে বসে আর বেশ জোরে জোরে চেঁচিয়ে মল্লিকাকে শোনাবার জন্যে, পাত্রের পরিচয় বর্ণনা করেছিলেন মল্লিকার বাবা যোগেশ দত্ত। সরকারী চাকরি করে পাত্র, বেহালাতে নিজের বাড়ি আছে, নামটা হল অনিরুদ্ধ রায়। বেশ দেখতে, বেশ স্বাস্থ্য, বেশ হাসি-খুশি মুখটি, এক কথায় বলা যায়…।

মা'ও বেশ খুশি হয়ে হাসেন।—একটু স্পষ্ট করেই শুনিয়ে দাও না, যা বলা যায়।

চেঁচিয়ে ওঠেন বাবা।—এক কথায় বলা যায়, বেশ মানুষটি।

বাবার চেঁচিয়ে বলা এই সত্যের মধ্যে তবু কেমন যেন একটা অস্পষ্টতা থেকে যাচ্ছে। তাই ঘরের ভিতরে চুপ করে দাঁড়িয়ে মল্লিকার একলা মূর্তির মুখটা তবু

হেসে উঠতে পারেনি। আরও একটা সত্য, যেটা জানবার জন্যে মল্লিকার আশার মনটা উৎকর্ণ হয়ে আছে, সেটাই যে স্পষ্ট করে বলে দিচ্ছেন না বাবা।

জেঠিমারও মনে বোধহয় একটা খটকা লেগেছিল। তাই জিজ্ঞাসা করলেন —বেশ মানুষটি মানে কি?

—মানে, অনিরুদ্ধ ছেলেটি চমৎকার মানুষ।

ছেলেটি! যাক্, আর বেশি কিছু জানবার দরকার নেই। হেসে ফেলেছিল মল্লিকা। সেই ভয়ের ছায়াটা সরে গিয়েছিল। মল্লিকার আশাও নিশ্চিন্ত হয়ে গিয়েছিল।

অনিরুদ্ধকে জীবনে কোনদিন দেখেনি মল্লিকা। অনিরুদ্ধর কোন ফটোও বাবা নিয়ে আসেননি। কিন্তু মল্লিকার বিহ্বল চোখ দুটো যেন অনিরুদ্ধর হাসি-খুশি মুখটাকে দেখতে পেয়েছে।

কত সম্বন্ধ এসেছে আর চলে গিয়েছে। যেন যোগেশ দত্তের দরিদ্রতার ভয়ানক চেহারাটাকে দেখেই ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল যত ঘটকালির উল্লাস। যোগেশ দত্তের মেয়ের চেহারাটাকে দেখেও কোন সম্বন্ধের করুণা হয়নি। লেখাপড়া বলতে কিছুই জানে না বলা চলে, শুধু একটা সুন্দর চেহারা, তাকে ঘরের বউ করে নিয়ে যাবার জন্য পৃথিবীর ভাল ভাল ঘরগুলির কেউই রাজি নয়। এমন কি ফলতার বসুবাড়ি, যাঁদের সেকেলে বড়মানুষিপনার দালানটা জীর্ণ হয়ে প্রায় ভেঙ্গে পড়েছে, সে বসুবাড়ির ইচ্ছাটা অনেক দূর এগিয়ে এসেও শেষে পিছিয়ে গেল। যোগেশ দত্তের মত এত দরিদ্র একটা কুটুম্ব পেতে বসুবাড়ির ভাঙ্গা দালানটাও রাজি নয়।

অনেক বিয়ের প্রস্তাব ফিরিয়ে দেওয়াও হয়েছে। যেমন টালিগঞ্জের ভরতবাবুর ছেলের সঙ্গে মল্লিকার বিয়ের প্রস্তাবটা। ছেলে একটা চায়ের দোকানে কাজ করে। মা আর জেঠিমা চেঁচিয়ে উঠেছিলেন—তা হয় না। এর চেয়ে মেয়েকে সন্ন্যেসিনী করে একটা মঠে রেখে দিয়ে এলেই ভাল হয়।

মল্লিকার মনটাও ভয় পেয়ে শিউরে উঠেছিল—ছি, এমন বিয়ের আগে মরে যাওয়াই ভাল।

আশা আশাভঙ্গ ভয় আর আপত্তি; এই নিয়েই বছরের পর বছর পার করে দিতে দিতে মল্লিকার বয়সটা তিরিশে এসে ঠেকেছে। কিন্তু মল্লিকার জীবনটা একটু হতাশ হয়ে পড়লেও ভাগ্যটা যে একটুও হতাশ হয়ে পড়েনি, তার প্রমাণ বেহালার অনিরুদ্ধ, যে আজ আমতলা হাটের সবচেয়ে গরিবের একটা দুশ্চিন্তিত সংসারের আঙিনায় সুন্দর একটি উৎসব জাগিয়ে দিয়ে মল্লিকার হাত ধরতে এসেছে।

কিন্তু এখন বুঝতে পারা যাচ্ছে, আর কোন সন্দেহ নেই, মল্লিকার ভাগ্যটাকে ঠাট্টা করবার জন্য এসেছে অনিরুদ্ধ নামে একটা শখের অহংকার। বিয়ে হবে না। এই বেনারসী ছেড়ে ফেলতে হবে। চন্দনের লবঙ্গতিলক মুছে ফেলতে হবে।

আর্টিস্ট পারুলদিকে জাগিয়ে তোলার আর কোন দরকার নেই।

এইবার শুনতেও পেল মল্লিকা; চেঁচিয়ে উঠেছেন চারুমামা।—না, এ বিয়ে হবে না।

তারপরেই বাড়ির আঙিনায়, এঘরে-ওঘরে আর দাওয়ার আনাচে কানাচে নীরব মানুষের এক-একটি জটলার বুক থেকে একটা গম্ভীর আক্ষেপের সোরগোল যেন উথলে ওঠে।—না, এ বিয়ে হতে পারে না।

—কথ্খনো না।

—হওয়া উচিত নয়।

—হতেই দেওয়া হবে না।

চমকে ওঠে মল্লিকার বেনারসী জড়ানো মূর্তিটা। সোরগোলের ভাষাটা যে অদ্ভুত একটা রহস্যের ভাষা! অনিরুদ্ধ নয়, উৎসবেরই বাড়িটা ইচ্ছে করে বিয়ে ভেঙ্গে দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

এইবার ছুটে এসে ঘরের ভিতর ঢুকে, মল্লিকার একলা মূর্তিটার বিমূঢ়তা চমকে দিয়ে চারুমামা চেঁচিয়ে ওঠেন—একটা কাণ্ডই করেছেন যোগেশদা, ছিঃ!

কী ব্যাপার মামা?—ভয়ার্ত চোখ দুটো অপলক করে বিড়বিড় করে মল্লিকা।

—লোকটার বয়স পঞ্চাশের কম নয়।

মা আর জেঠিমাও ছুটে এসে ফোঁপাতে থাকেন।—আমরা তো কখনো এমন সন্দেহ করতেই পারিনি যে…।

চারুমামা ধমক দিয়ে বলেন—কেন পারেননি?

মা বলেন—ওর কথা থেকে ধারণা হয়েছিল…।

—ধন্যি আপনাদের ধারণা! আর ধন্যি যোগেশদার কথা!

—তা তো হলো; কিন্তু এখন কি উপায় হবে চারু?

মল্লিকা চেঁচিয়ে ওঠে।—না, কোন উপায় হবে না। বিয়ে হবে না। তোমরা সবাই দয়া করে একটু চুপ কর।

চন্দনের লবঙ্গতিলক দিয়ে আঁকা একটা অভিশাপের ঠাট্টাকে এই মুহূর্তে মুছে দিয়ে কপালের জ্বালা জুড়িয়ে দেবার জন্য তোয়ালেটাকে হাতে তুলে নেয় মল্লিকা। চারুমামা বাধা দিয়ে মল্লিকার হাতটা শক্ত করে ধরে ফেলেন। চারুমামার চোখ দুটোও ছলছল করে।—থাম মল্লিকা।

—কেন?

—একটু ধৈর্য ধর।

—কেন?

—একটু অপেক্ষা কর।

—কি ছাই বলছেন মামা, আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

—আমার বিশ্বাস, বিয়ে হয়ে যাবে।

—তার মানে?

—তার মানে, বেহালার ঐ ভদ্রলোকের সঙ্গে নয়। অন্য কারও সঙ্গে।

—না, যাকে-তাকে এনে পিঁড়ির ওপর বসিয়ে দেবেন, আর আমি বেহায়ার

—না না, যাকে-তাকে এনে বসাবো কেন? একজন সৎপাত্রকেই নিয়ে এসে বসাবো।

—না, তা হয় না, হবে না। ওসব কাণ্ড শুধু থিয়েটারেতে সম্ভব হয়। আপনি মিছে চেষ্টা করবেন না।

—আপত্তি করিস না মল্লিকা। চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি?

—দশ বছর ধরে তো কত চেষ্টাই করলেন আপনারা। চেষ্টার ফলও দেখলাম। আর কেন? এখন একটু লজ্জা পেয়ে চেষ্টাটা ছেড়ে দিন।

—ছি, এত রাগ করতে নেই মল্লিকা। এখনও পর পর তিনটে লগ্ন আছে। রাত দেড়টার সময় শেষ লগ্ন। একটু চেষ্টা করবার সময় আছে মল্লিকা।

মীরা আর ধরা, পুকুরপাড়ের নন্দীবাড়ির দুই মেয়ে, দুজনেই দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। ওদের চোখ দুটো ছলছল করছে। জেঠিমা ইশারায় মীরাকে আর ধরাকে কী যেন বলেন। মীরা আর ধরা তখনি এসে মল্লিকার দুই হাত চেপে ধরে।—তোমার পায়ে পড়ি মল্লিকাদি, তুমি চুপটি করে শুধু বসে থাক। মামা যখন বলেছেন যে⋯।

হেসে ফেলে মল্লিকা, আর হাসতে গিয়ে চোখ থেকে বড় বড় জলের ফোঁটা ঝরে পড়ে।

চারুমামা উৎসাহিত হয়ে বলেন—আমি কথা দিচ্ছি মল্লিকা। তোর পছন্দ হবে না, এমন কাউকে বিয়ে করবার জন্য তোকে কেউ পীড়াপীড়ি করবে না।

চলে গেলেন চারুমামা। তারপরেই আঙিনার দিক থেকে চারুমামার গম্ভীর প্রতিজ্ঞার আর-একটা আওয়াজ শোনা যায়—মল্লিকার বিয়ে হবে। কিন্তু সাবধান, যোগেশদা যেন ঘরের ভিতর থেকে এক পা'ও বাইরে না আসেন।

ঘরের বাইরে এক পা বাড়িয়ে দেবার আর ইচ্ছা নেই, শক্তিও নেই যোগেশবাবুর। শুধু চারুমামা নন, রামবাবু বিজয় আর রত্নেশ্বর—পাড়ার মানুষদের মধ্যে যারা তিনজন সবচেয়ে খুশি হয়ে আজকের উৎসবের কাজে এতক্ষণ ধরে খাটছিল তারাও যোগেশবাবুকে গঞ্জনা দিতে ছাড়েনি।—না হয় মেয়ের বিয়ে না-ই হতো, আপনি এরকম একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোকের কাছে মল্লিকার মতো বয়সের মেয়েকে গছিয়ে দেবার ব্যবস্থা করলেন কেন? কোন্ প্রাণে? কী দেখে?

কোন উত্তর দেননি, দিতে পারেননি যোগেশবাবু।

রামবাবু বিজয় আর রত্নেশ্বরের সঙ্গে কী যেন পরামর্শ করেন চারুমামা। তারপর চারজনেই যেন বাইরে কোথাও যাবার জন্য একসঙ্গে চলতে থাকেন।

কিন্তু যাবার আগে আর একবার চেঁচিয়ে হাঁক দেন চারুমামা—শানাই বাজতে থাকুক। থামলে কেন, এই শানাইওয়ালা?

দাওয়ার উপর পাড়ার মহিলাদের ভীরু ভীরু আর কুণ্ঠিত একটা ভিড়ের দিকে তাকিয়ে চারুমামা বলেন—আপনারা ওভাবে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবেন না, ছোড়দি।

ছেলেপিলেদের হতাশ ভিড়টার দিকে তাকিয়ে বলেন।—তোরা একটু দৌড়াদৌড়ি কর না কেন?

উৎসবের ফোটা ফুল আর ঝরে পড়তে পারলো না। আলো জ্বলে, শানাই বাজে, ছেলেপিলেরা ছুটোছুটি করে। সাজানো বরণডালার চারদিকে ঘিরে বসে গল্প করেন মহিলারা।

—তবে কার সঙ্গে বিয়ে হবে মেয়েটার?

মল্লিকার মা করুণভাবে হাসেন—ভগবান জানেন। চারু তো জোর গলা করে বলে গেল, ভাল ছেলেরই সঙ্গে বিয়ে হবে।

ননীকাকা কোথায়? পঞ্চাশেরও বেশি বিয়েতে বর বরপক্ষ আর বরযাত্রীকে অভ্যর্থনা করবার অভিজ্ঞতা যাঁর আছে, তিনি এখন কি করছেন? তাঁর আর করবারই বা কি আছে?

ননীকাকার অভিজ্ঞতার গর্বটা এমন বিপন্ন হয়নি কোনদিন। অভ্যর্থনা করবার ডিউটি নয়, তুচ্ছ করে সরিয়ে আর ফিরিয়ে দেবার ডিউটি। এ বিয়ে হবে না, পাত্রকে দেখে কেউ পছন্দ করতে পারেনি, এ বয়সের মানুষের সঙ্গে ও বয়সের মেয়ের বিয়ে হওয়া উচিত নয়, হতে পারে না। বর বরপক্ষ আর বরযাত্রীদের কথাগুলি স্পষ্ট করে শুনিয়ে দেবার ভার পড়েছে ননীকাকার উপর। ননীকাকাও স্পষ্ট করে শুনিয়ে দিতে একটুও দেরি করেনি।

ঐ তো সবসুদ্ধ মাত্র সাতজন। অনিরুদ্ধ রায়, তিনজন নিতান্ত অল্পবয়সের খুড়তুতো ভাই, দশ বছর বয়সের একটি খুকি ভাইঝি, এক বৃদ্ধ পুরুতঠাকুর আর একটা চাকর।

উৎসবের এই বাড়ি থেকে একটু দূরে রামবাবুর বাড়ির বৈঠকখানায় ওদের বসবাসের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এখনও সেখানে বসেই আছে ওরা। আর ননীকাকা এখনও সেখানেই আছেন।

শানাই বেজে বেজে দুটি ঘণ্টা পার হয়ে গেল; তার মধ্যে রাত সাড়ে আটটার লগ্নটাও পার হয়ে গেল।

মীরা আর ধরা যতই পীড়াপীড়ি করুক, বসে বসে আর গল্প করতে পারে না মল্লিকা। অনেক চেষ্টা করেও মল্লিকাকে ওরা আর হাসাতে পারেনি। মেঝের মাদুরের উপর শুয়ে পড়েছে মল্লিকা। ঘুমিয়ে পড়েছে বোধহয়। ধড়াচুড়া পরে এভাবে অপেক্ষা করবার লজ্জাটা যে ত্রিশ বছর বয়সের প্রাণে কাঁটার মতো বিঁধে যন্ত্রণা দিচ্ছে। ঘুমিয়ে পড়তে পারলেই শান্তি। মীরা আর ধরা চুপ করে মুখ কালো করে মল্লিকার মাথায় পাখার বাতাস দিতে থাকে।

বরণডালা সাজাবার দায় মহিলাদের কাছে সঁপে দিয়ে মা আর জেঠিমা

দুজনেই উঠে এসেছেন। এই ঘরের দরজার কাছে স্তব্ধ হয়ে বসে আঙিনার দিকে তাকিয়ে আছেন। ভগবান জানেন, কোথায় গিয়েছে চারু! দুর্ভাগ্যের অন্ধকার হাতড়ে কোথা থেকে যে সৌভাগ্যের খবর নিয়ে আসবে, কখনই বা আসবে কে জানে! মিছিমিছি মেয়েটাকে মিথ্যে আশা দিয়ে শান্ত করবার দরকার ছিল না। এর পরেও যদি মেয়েটার আশার অপমান হয়, তবে যে ··।

চারুই যে আসছে মনে হচ্ছে।

জেঠিমা বলেন—হ্যাঁ, রামবাবুও আসছেন। রত্নেশ্বরও আসছে, আর বিজয়ও ওদিকে চলে গেল!

একঘেয়ে শানাই বাজা উৎসবের প্রাণটা এতক্ষণের অপেক্ষার ক্লান্তি ঠেলে দিয়ে আবার চঞ্চল হয়ে ওঠে। চারুমামা ব্যস্তভাবে হেঁটে এসে একেবারে মল্লিকার ঘরের দরজার কাছে থামেন ও হাঁপ ছাড়েন।

—কোন চিন্তা নেই; ভাল খবর।

আমতলা হাটের যেখানে বড় বড় বাড়ি আর ভাল-ভাল রাস্তা নিয়ে একটা সৌখীন শহুরে উপনিবেশের রূপ গড়ে উঠছে, সেখানে গিয়েছিলেন চারুমামা।

আজই যে ছেলেটি চারুমামার সঙ্গে কলকাতা থেকে একই ট্রেনের একই কামরায় আমতলা হাটে এসেছে, তারই সঙ্গে দেখা করে, কথা বলে আর কথা নিয়ে ফিরে এসেছেন চারুমামা।

চারুমামারই ছাত্র মিহির। আমতলা হাটের মিত্র ভবন হলো মিহিরের মামা-বাড়ি। আইন' পাশ করে এক সাহেব কোম্পানির মাইনে করা উপদেষ্টা হয়েছে মিহির।

—কিন্তু ছেলে কত মাইনে পায়? জিজ্ঞেস করেন জেঠিমা।

—আপনি স্বপ্নেও ভাবতে পারবেন না, কত পায়! সাড়ে চারশো টাকা।

চারুমামার আনন্দটা মাত্রাছাড়া রকমের আনন্দ হয়ে গিয়েছে; বোধহয় সেই আনন্দের গর্বে চারুমামার কথাগুলিও মাত্রাছাড়া রকমের কঠোর হয়ে উঠেছে।

মল্লিকার মা একটু ভয়ে-ভয়ে বিড়বিড় করেন।—বয়স কত?

—বয়েস বত্রিশ। আমার হাবুলের চেয়ে মাত্র এক বছরের বড়। দেখলে মনে হবে পঁচিশ।

রামবাবুর স্ত্রী বলেন—ছেলের বাপ-মা কিছুই জানতে পেলেন না, অথচ ছেলে এদিকে হঠাৎ বিয়ে করে···।

—সে সমস্যা নেই। ছেলের বাপ-মা বেঁচে নেই। আপনার জন বলতে আছেন ঐ মিত্রভবনের মামা নরেশবাবু। আমি তাঁরও সম্মতি নিয়ে এসেছি।

মা আর জেঠিমা, মীরা আর ধরা, রামবাবুর স্ত্রী আর পাড়ার আর-সব মহিলাদের বিস্মিত বিচলিত ও হর্ষোৎফুল্ল মুখগুলির দিকে তাকিয়ে চারুমামা যেন এই গরিব বাড়ির আশার অতিরিক্ত একটা প্রাপ্তির বার্তা নিবেদন করতে থাকেন।

—যোগেশদার ভুলের কথা বলেছি, শুনে রাগ করেছে মিহির। যোগেশদার অবস্থার কথা বলেছি, শুনে মিহিরের মুখটা করুণ হয়ে গিয়েছে। মল্লিকার কথাও সব বলে দিয়েছি, একটুও বাড়িয়ে বলিনি, একটুও কমিয়ে বলিনি। মেয়ে লেখাপড়া ভাল জানে না, বয়সটাও ত্রিশ, আর দেখতেও বেশ সুন্দর—ভালমন্দ সবই বলে দিয়েছি। শুনে লজ্জা পেয়েছে, হেসেও ফেলেছে মিহির। মিহিরের কথা হলো, যদি আমাদের মল্লিকার আপত্তি না থাকে, তবে তারও আপত্তি নেই।

ধরা আর মীরার চোখ দুটো উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। মল্লিকার কানের কাছে ফিসফিস করে দুজনে—উঠে বসো মল্লিকাদি।

চারুমামা তাড়া দিয়ে বলেন—উঠে বস মল্লিকা।

ধরা আর মীরার দিকে তাকিয়ে চারুমামা বলেন—মিহির তোদের বাবার চেয়েও ফরসা। কী সুন্দর সুশ্রী চেহারা। তা ছাড়া, রেকর্ডে তোদের ওস্তাদ বাবার গলার গানও তো শুনেছি, মিহিরের গলার গান তার চেয়েও ভাল।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আর মল্লিকার শুয়ে থাকা চেহারাটার দিকে তাকিয়ে চারুমামার চোখের আনন্দটা ছলছল করে।—নির্বন্ধ কেউ খণ্ডাতে পারে না।

উঠে বসে মল্লিকা। চারুমামার মুখের দিকে আস্তে আস্তে তাকায়, আর তাকাতে গিয়ে চোখ দুটো অপলক হয়ে যায়।

মল্লিকার চোখে যেন একটা বিস্ময়ের স্নেহ চিকচিক করছে। এ কী অদ্ভুত কথা শোনাচ্ছেন চারুমামা? যেন এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না মল্লিকা, রূপে গুণে চমৎকার এত বড় একটা করুণা আজকের অভিশাপের অন্ধকারটার এত কাছে লুকিয়েছিল? এ কি সম্ভব? মল্লিকা নামে একটা অচেনা জীবনের উৎসব বিপন্ন হয়েছে, ব্যথিত আশা আর্তনাদ করে উঠেছে, শুনতে পেয়েই ছুটে আসতে চেয়েছে মিহির নামে একটি উদার প্রাণ।

যেন শানাই-বাজা রাত্রিটার মায়ারাগিনীর একটা গমক এতক্ষণে মল্লিকার কানের কাছে এসে পৌঁছেছে। দুঃসহ অভিমানে শুব্ধ হয়ে ছিল মল্লিকার যে ঠোঁট দুটি, সেই ঠোঁট দুটিরই ফাঁকে ঝিরঝির করছে অদ্ভুত একটা তৃপ্তির হাসি।

চারুমামা চেঁচিয়ে ওঠেন—হ্যাঁ, এবার কেউ গিয়ে পারুলকে জাগিয়ে দিয়ে ডেকে নিয়ে আসুক। মল্লিকাকে একটু ভাল করে সাজিয়ে দিক। আর দেরি করা চলে না। আর···।

আঙিনার দিকে তাকিয়ে চারুমামা আরও ব্যস্তভাবে বলেন—এইবার বিজয় আর রত্নেশ্বর চলে যাক। মিহিরকে সঙ্গে নিয়ে চলে আসুক ওরা। এগারটার লগ্ন যেন আবার পার না হয়ে যায়।

একটু থেমে নিয়ে মল্লিকার দিকে তাকিয়ে চারুমামা বলেন—হ্যাঁ, তার আগে একবার স্পষ্ট করে জেনে নিই। তোর কোন অপছন্দ নেই তো, মল্লিকা? স্পষ্ট করে বল।

উত্তর দেবার জন্য মুখ তুলে চারুমামার দিকে তাকায় মল্লিকা। একটা বিস্মিত

স্মিত মুখ। চন্দনের লবঙ্গ-তিলক জ্বলজ্বল করছে। চারুমামা যদি এখনও স্পষ্ট করে কিছু না বুঝে থাকেন তবে স্পষ্ট করে বলে দেওয়াই ভাল। স্পষ্ট করে বলে দেবার জন্য মল্লিকার ঠোঁট দুটো সব মিথ্যা কুণ্ঠার বাধা জয় করতে গিয়ে কেঁপে ওঠে।

কিন্তু বলা আর হলো না। ঘরে ঢুকলেন ননীকাকা।

চারুমামা চেঁচিয়ে ওঠেন—এতক্ষণে তোমার দেখা পাওয়া গেল! কোথায় ডুব দিয়েছিলে তুমি?

ননীকাকা হাসেন—আমি আমার ডিউটি করছিলাম.

—তার মানে? ওরা কি এখনও চলে যায়নি।

—না।

—কেন?

—বললে, রাত করে এখন আর কোথায় গিয়ে দাঁড়াব? স্টেশনে একটা শেডও নেই। তা ছাড়া স্টেশনটাও তো কম দূরে নয়। সকাল হলেই চলে যাব।

—কিন্তু বড় বিশ্রী ব্যাপার হবে ননী। ওরা কি এখনো শোনেনি যে, অন্য একটা ছেলের সঙ্গে এ বাড়ির মেয়ের বিয়ে আজই হয়ে যাবে?

—হ্যাঁ, বিজয় গিয়ে সে কথাও বলে দিয়েছে।

—তারপর?

—ওরা বলছে, ধরুন না, আমরা কন্যাপক্ষেরই লোক; আমরাও না হয় বিয়ে দেখবো; তাতে দোষ কি?

—ছোকরাগুলো বলেছে বোধ হয়?

—না। বলতে গিয়ে ননীকাকা হেসে ফেললেন।—অনিরুদ্ধবাবু বললেন।

—অনিরুদ্ধও কি বিয়ে দেখতে চায়?

—হ্যাঁ, যদি আমাদের আপত্তি না থাকে, তবে অনিরুদ্ধবাবুরও আপত্তি নেই।

—বাঃ, এ তো বড় মজার উপদ্রব!

—সত্যি কথা বলতে গেলে, কোন উপদ্রবই ওরা করেনি। ওরাই ভয় পেয়েছে আর হতভম্ব হয়ে গিয়েছে; অনিরুদ্ধবাবু অবশ্য বেশ ঠিক আছেন। অদ্ভুত!

—আশীর্বাদটা ফেরত দেওয়া হয়েছে?

—ফেরত দিতে চেষ্টা করেছি কিন্তু ফেরত নিতে রাজি হচ্ছে না।

—তার মানে? তিনভরি সোনার গয়নাটা ফেরত নেবে না?

—তাই তো বলছেন; আশীর্বাদ ফেরত নেওয়া নাকি উচিত নয়। তবে আমরা যদি নেহাতই ফেরত দিই, তাহলে ফেরত নেবে।

—ওদের চা টা খাবার টাবার কিছু দেওয়া হয়েছে তো?

ওসব কর্তব্য কি আমাকে শেখাবার দরকার হয়? সবই দেখেছিলাম, কিন্তু কেউ খেতে রাজি হলো না।

ননীকাকা যেন একটা অদ্ভুত আশ্চর্যদেশের গল্প শোনাচ্ছেন, সেখানে সব অসম্ভবই সম্ভব হয়। অনিরুদ্ধের সঙ্গে যারা এসেছে, তারা কেউ চা-খাবার খেতে রাজি হয়নি, এমন কি চাকরটাও না। চা খেয়েছেন শুধু একজন, অনিরুদ্ধবাবু। বেশ হেসে হেসে ননীকাকার সঙ্গে গল্প করে চা খেয়েছেন।

এ-বাড়ির মানুষ এ-বিয়েতে রাজি নয়, বিয়ে হবে না ; খবরটা শুনে শুধু এক মিনিট গম্ভীর হয়েছিলেন অনিরুদ্ধবাবু। তারপরেই হেসে হেসে বললেন—আমরা কি তাহলে এখনই চলে যাব ?

ননীকাকা—আপনারা বুঝে দেখুন। যদি মনে করেন যে অসুবিধে হচ্ছে, তবে…।

অনিরুদ্ধ—আমাদের কোন অসুবিধে হবে না। ভয় হচ্ছে, আপনাদের অসুবিধে হতে পারে।

ননীকাকা—আমাদের আর কি এমন অসুবিধে হবে ? দুটি ডাল-ভাত খাবেন আর…।

অনিরুদ্ধ—না না ; আপনাদের ওপর ওসব কোন উপদ্রব আমরা করবো না। শুধু আজকের রাতটুকুর মত থেকে যেতে চাই। বুঝেছেনই তো, সঙ্গে একটা বাচ্চা মেয়ে আছে, এতটা পথ ওকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া খুবই কষ্টের ব্যাপার হবে। তা ছাড়া, বুড়োমানুষ পুরুতমশাইও বড় ক্লান্ত।

ননীকাকা—অগত্যা…তাহলে কি…।

ননীকাকা একেবারে স্পষ্ট করে আপত্তির কথাটা বলতে পারছেন না। বললে যেন একটু বেশি কঠোরতা হবে। তা ছাড়া, এত ভয় পেয়েছে আর হতভম্ব হয়ে গিয়েছে যারা, তাদের উপর বেশি কড়াকড়ি করবার কোন দরকারও হয় না।

—অগত্যা, আমি তবে বাড়ির লোকের কাছ থেকে একটু স্পষ্ট করে জেনে আসি। তার আগে আমি তো আপনাদের কোন কথা দিতে পারছি না। ননীকাকা একটু কুণ্ঠিতভাবে কথা বলেন।

অনিরুদ্ধ কিন্তু খুশি হয়ে বলেন—হ্যাঁ, তাই উচিত। ওঁদের যদি কোন অসুবিধে হয়, তবে আমরা এখনই চলে যাব।

উঠেই আসছিলেন ননীকাকা, কিন্তু হঠাৎ কী ভেবে একটু থমকে গিয়ে প্রশ্ন করে ফেললেন—আচ্ছা, একটা কথা বলবেন ?

—বলুন, কি বলবো ?

—এই বয়সে আপনার বিয়ে করবার ইচ্ছে কেন হলো ?

—ইচ্ছে হলো, এই মাত্র বলতে পারি।

ননীকাকা চোখ কুঁচকে নিয়ে বলেন—জিজ্ঞেস করছি ; কেন ইচ্ছে হলো ?

অনিরুদ্ধ রায় চোখ বড় করে কথা বলেন—যেজন্য ইচ্ছে হয়, সেইজন্য ইচ্ছে হলো।

—কিন্তু যোগেশদার মেয়েকে বিয়ে করবার ইচ্ছে কেন ? অন্য আরও কত

মেয়ে তো আছে।

—যোগেশবাবুর মেয়ের চেয়ে সুন্দর মেয়ে আছে কি? আমার তো মনে হয় না।

—কিন্তু আপনার এ সন্দেহ কেন হয়নি যে মেয়ে আপনাকে অপছন্দ করতে পারে?

—সন্দেহ হয়েছিল বইকি।

—তবে?

—ভেবেছিলাম, বিয়ের পর ক্ষমা চাইলেই চলে যাবে।

—তার মানে?

—তার মানে আপনাদের মেয়ে আমাকে ক্ষমা করে পছন্দ করে নেবে!

—এসব কথা আমার কাছে বলতে কি আপনার একটুও লজ্জা··· ।

—না, কোন লজ্জা নেই। আপনি যখন জিজ্ঞেস করতে কোন লজ্জা বোধ করলেন না, তখন আমিই বা কেন··· । বেশ শান্ত অবিচল ও নির্বিকার খুশির আবেগে হেসে হেসে কথা বলে অনিরুদ্ধ।

—যাক গে, এসব তর্কের কথা ছেড়ে দেওয়া যাক। আপনি কি সত্যিই মল্লিকার বিয়েটা দেখবেন?

—বলছি তো, আপনারা যদি আপত্তি না করেন, তবে আমার কোন আপত্তি নেই।

—আপনার একটুও অস্বস্তি হবে না?

—একটুও না।

—কেন?

—একজন যোগ্য পাত্রের সঙ্গে যোগেশবাবুর মেয়ের বিয়ে হবে, এতে আমার তো অস্বস্তি বোধ করবার কিছু নেই। আমরা সত্যই খুশি হয়েছি ননীবাবু আপনাদের মেয়েকে একটা অপছন্দ বিয়ের দুঃখ সহ্য করতে হলো না।

—কিন্তু মনে হচ্ছে, এরা খুব দুঃখিত হয়েছে।

—কারা?

—এই সব ছেলেরা, ঐ মেয়েটি আর এইসব যারা আপনার সঙ্গে এসেছে।

—এদের দুঃখ আমার বিয়েটা হলো না বলে। আপনাদের মেয়ের বিয়ে হবে শুনে এরা দুঃখিত নয়।

—কিন্তু এরা খেলো না কেন?

—সে জন্যে দুঃখ করবেন না।

—খুকিটির তো এতক্ষণে খুব ক্ষিধে পাওয়ার কথা।

—ক্ষিদে পেয়েছে হয়তো।

—তবু খেতে রাজি হবে কি?

রাজি হবে না। যেতে দিন ওসব সাধাসাধির ঝঞ্ঝাট।

—কিন্তু…।

—কি ?

—সব দোষ তো আপনার উপর চাপাতে পারছি না।

—কেন ? হো হো করে হেসে ওঠে অনিরুদ্ধ।

—যোগেশদা তো সব জেনে শুনেই এই বিয়ে ঠিক করেছিলেন। প্রথম দোষ আর আসল দোষ যোগেশদার।

—আঃ, কি যে বলেন ননীবাবু। একবার বুঝে দেখুন, সামান্য অবস্থার এক ভদ্রলোক, যার পক্ষে সংসারের সামান্য দাবী মেটানও কত কষ্টসাধ্য,—সে ভদ্রলোক মেয়েকে ভাল পাত্রের হাতে দেবার মত একগাদা টাকা কোথা থেকে পাবেন ? ভাল-মন্দ পাত্র বাছাবাছি করতে পারেন, যোগেশবাবুর মনের অবস্থাটাও তো এমন নয়।

—যাই হোক, উনিই তো আপনাকে পছন্দ করেছিলেন।

—ঠিক কথা। আর সত্যি কথা, আমিও আশ্চর্য হয়েছিলাম, কি দেখে উনি আমাকে পছন্দ করলেন ?

—আপনি একথা যোগেশদাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন ?

—হ্যাঁ।

—কি বললেন যোগেশদা ?

—বললেন, আমি নাকি চমৎকার মানুষ। বলতে বলতে অনিরুদ্ধ রায়ের দু'চোখ থেকে অদ্ভুত একটা হাসির আভা ঠিক্‌রে পড়ে; যেন আগুন লাগা লজ্জার আভা। কিন্তু মুখটাকে তেমনই শান্ত-সরল খুশির আবেগে হাসিয়ে দিয়ে কথা বলেন—বলিহারি যোগেশবাবুর ধারণা।

কত স্বচ্ছন্দে হেসে হেসে কথা বলছেন ভদ্রলোক, বেহালার এই অনিরুদ্ধ-বাবু। যেন একটা বৈঠকী আসরে অন্য কোন মানুষের জীবনের গল্প বলে যাচ্ছেন। সে গল্পের সঙ্গে এই অনিরুদ্ধবাবুর জীবনের কোন সম্পর্ক নেই।

ননীকাকা অপ্রস্তুত হয়ে আনমনার মত বিড়বিড় করেন—তবু ভাবতে একটু দুঃখ হচ্ছেযে…।

—ছি ছি ; আপনারা একটুও দুঃখ করবেন না, ননীবাবু। বলতে গিয়ে ননী কাকার হাত ধরে ফেলেন অনিরুদ্ধ রায়।

এখানে যে-ঘরের ভিতরে একটা নীরব কৌতূহলের আসর, যেখানে ননী-কাকা এতক্ষণ ধরে গল্প বলে যাচ্ছেন, সে ঘরের সঙ্গেও অনিরুদ্ধ রায়ের এখন আর কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু গল্প-বলা অনিরুদ্ধ রায়ের হাসিটার সঙ্গে যেন একটা সম্পর্ক হয়ে গিয়েছে। নীরব ঘরের মনে কেমন-যেন একটা ভয় ধরিয়ে দিচ্ছে অনিরুদ্ধর হাসির নীরব শব্দটা। তা না হলে, নিতান্ত একটা হাসির গল্প শুনে এত গম্ভীর হয়ে যাবেন কেন মা আর জেঠিমা ; এমন-কি চারুমামাও ?

দেখতে আরও অদ্ভুত, মল্লিকার কপালে চন্দনের জ্বলজ্বলে লবঙ্গ-তিলকও

কেমন যেন থমথমে হয়ে গিয়েছে।

ননীকাকার মুখটাও কেমন যেন, বেশ একটু বিষণ্ণ। ননীকাকার কৃতিত্বের পুরনো রেকর্ডটাই বোধহয় বিষণ্ণ হয়েছে। জীবনে এই প্রথম, বর বরপক্ষ আর বর-যাত্রীকে আদর-আপ্যায়ন করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু, কি আশ্চর্য, অনাদর-করা বরপক্ষই খুশি হয়েছে। এটা যে ননীকাকার গর্বহারা অকৃতিত্বের প্রথম রেকর্ড।

জোরে একবার কেশে, গলার ভিতরের একটা বোবা গুমোট জোর করে পরিষ্কার করে নিয়ে চারুমামা এইবার চেঁচিয়ে ওঠেন।—তুমি কিন্তু মিছিমিছি ওখানে বসে অনেক সময় নষ্ট করলে, ননী।

ননীকাকা হাসেন।—তা তো করছি। যাই হোক, এখন শুধু ওদের···

চারুমামা—না, এখন ওখানে তোমার আর কোন কাজ নেই। এখন শুধু এদিকে···।

ননীকাকা—ওখানে একটা কাজ এখনও আছে বলেই তো বলছি।

—কি কাজ ?

—আপনারা বলুন, ওরা এখন ওখানে থাকবে, না চলে যাবে ? থাকলে আমাদের কোন অসুবিধে হবে না তো ? সেটাই ওরা জানতে চায়।

—যদি বলি অসুবিধে হবে ?

—তবে ওরা চলে যাবে।

—তবে বলে দাও, অসুবিধে আছে।

—মামা ! চারুমামার মুখের দিকে অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে, আর অদ্ভুত রকমের একটা আর্তনাদের মত স্বরে ডাক দিয়ে ফেলেছে মল্লিকা।

চারুমামা অপ্রস্তুতের মতো কুণ্ঠিতভাবে বলেন—হ্যাঁ··মিছিমিছি কথায় কথায় অনেক সময় নষ্ট হয়ে গেল। মিহিরকে আনবার জন্যে বিজয়কে এখনই রওনা করিয়ে দিই।

মল্লিকা—না।

—রাত্রি বারটা তিরিশেও একটা লগ্ন আছে।

—না।

—না মানে কি ? মিহিরকে কেউ ডাকতে যাবে না ?

—না।

—তার মানে মিহিরকেও পছন্দ হয় না ?

—না।

—আশ্চর্য ; তাহলে বিয়ে হবে না ?

—হবে !

—কার সঙ্গে হবে ?

—যে এসেছে তারই সঙ্গে হবে।

—কেন ?

ননীকাকা হঠাৎ চিৎকার করে হেসে চারুমামার বিস্মিত কেন'র একটা উত্তর দিয়ে দেন—অনিরুদ্ধবাবু চমৎকার মানুষ।

—আর মিহির বুঝি একটা…।

কথাটা শেষ করে মল্লিকার মুখের দিকে তাকিয়ে চারুমামা একটা রুষ্ট ও বিরক্ত ভ্রূভঙ্গী হানেন—কি রে, তুই কি বুঝলি বল? মিহির বুঝি একটা বাজে ··।

মুখ ফিরিয়ে, দেয়ালের গায়ে কপাল ঠেকিয়ে দিয়ে আর ছটফট করে ফুঁপিয়ে ওঠে মল্লিকা—না মামা, মিহিরবাবু বাজে হবেন কেন? মিহিরবাবু সত্যিই চমৎকার দয়ার মানুষ…কিন্তু…

—কিন্তু কি? রাগের ঝোঁকে চিৎকার করে ওঠেন চারুমামা।

ননীকাকা যেন পাল্টা চিৎকার করে জবাব দেন—কিন্তু অনিরুদ্ধবাবু চমৎকার মানুষ।

—যাক, বুঝেছি। চারুমামা যেন শ্রান্ত স্বরে একটা ধমক দিয়ে তাঁর শেষ আক্ষেপের প্রাণটাকে দমিয়ে দিলেন।—যাও বিজয়, আমার হয়ে মিহিরকে একটা ধন্যবাদ জানিয়ে বলে এস…মল্লিকা যা বলেছে তাই বলে দিয়ে চলে এস।

ব্যস্ত হয়ে ওঠেন ননীকাকা। এতক্ষণে যেন কৃতিত্বের একটা নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করবার চান্স পেয়ে গিয়েছেন। ননীকাকার চিৎকারের হাসিতে উৎসবটা এইবার উতলা হয়ে উঠতে থাকে।—তাহলে আমি এবার আমার ডিউটিতে লেগে যাই, ছোটবউদি।

রামবাবুর স্ত্রীও আর চুপ করে থাকতে না পেরে উলু দিতে শুরু করে দিলেন।

আর, ওঘরের ভিতর থেকে এতক্ষণের বোবা ও বধিরদশার একটা বন্দিত্ব থেকে মুক্ত হয়ে আঙিনার উপর এসে যোগেশবাবু বেশ শক্ত হয়ে দাঁড়ালেন—আমি তো এই কথাই বলেছিলাম, অনিরুদ্ধ চমৎকার মানুষ। মিথ্যে বলেছিলাম কি?

জেঠিমা হাসতে গিয়ে কেঁদে ফেলেন—সে মানুষটাও তো মিথ্যে বলে যায়নি। মল্লি যাকে পছন্দ করবে, তারই সঙ্গে বিয়ে হবে। তাই তো হলো।

চারুমামার গম্ভীর মুখটাও হঠাৎ হেসে ফেলে চেঁচিয়ে ওঠে।—বেশ হলো।·· এবার তোরা কেউ পারুলকে তাড়াতাড়ি জাগিয়ে তোল। মেয়েটার খোঁপাটাকে জুঁই-এর কুঁড়ির মালা দিয়ে বেশ করে…!

সুন্দরম্

সমস্যাটা হলো সুকুমারের বিয়ে। কি এমন সমস্যা! শুধু একটি মনোমত পাত্রী ঠিক করে শুভলগ্নে শাস্ত্রীয় মতে উদ্বাহ কার্য সমাধা করে দেওয়া; মানুষের একটা জৈব সংস্কারকে সংসারে পত্তন করে দেওয়া। এই তো!

কিন্তু বাধা আছে—সুকুমারের ব্রহ্মচর্য। বার বছর বয়স থেকে নিরামিষ ফোঁটা তিলক ধরেছে সে। আজও পায়ে সেধে তাকে মুসুরির ডাল খাওয়ান যায় না। সাহিত্য কাব্য তার কাছে অস্পৃশ্য। পাঠ্যপুস্তক ছাড়া জীবনে সে পড়েছে ক'খানি যোগশাস্ত্রের দীপিকা। বাগানের নির্জন পুকুরঘাটে গভীর রাতে একাগ্র প্রাণায়ামে কতবার শিউরে উঠেছে তার সুষুম্না। প্রতি কুম্ভকে রেচকে সুকুমার অনুভব করেছে এক অদ্ভুত আত্মিক শক্তির তড়িৎস্পর্শ, শ্বাসে প্রশ্বাসে রক্তে ও স্নায়ুতে।

সুকুমার চোখ বুজলেই দেখতে পায় তার অন্তরের নিভৃত কন্দরে সমাসীন এক বিবাগী পুরুষ। আবিষ্ট অবস্থায় কানে আসে, কে যেন বলছে—মুক্তি দে, মুক্তি দে। জপ ছেড়ে চোখ মেলে তাকালেই দেখতে পায়, কার এক গৈরিক উত্তরীয় ক্ষণিকের দেখা দিয়ে মিলিয়ে গেল বাতাসে।

সুকুমার বন্ধুদের অনেকবার জানিয়েছে—বাস্, এই এগজামিনটা পর্যন্ত, তার পর আর নয়। হিমালয়ের ডাক এসে গেছে আমার।

সুকুমারের বাবা কৈলাসডাক্তার বলতেন—প্রোটিনের অভাব। পেটে দুটো ভালো জিনিস পড়ুক, গায়ে মাংস লাগুক, এসব ব্যামো দু'দিনেই কেটে যাবে। কত পাকামি দেখলাম!

কিন্তু মা, পিসিমা, ছোটবোন রাণু আর ঝি, তাদের মন প্রবোধ মানে না। সকলে মিলে চেপে ধরলো কৈলাসডাক্তারকে—যত শীগগির পার পাত্রী ঠিক করে ফেল আর দেরী নয়!

ঝিয়ের কোঁদল তো লেগেই আছে—ছি ছি, সংসারে থেকেও ছেলের বনবাস। ছোটজাতের ছোটঘরেও কেউ এমন কসাইপনা করে না বাপু।

সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা হলো। কৈলাসবাবু পাত্রী দেখবেন। ভগ্নীপতি কানাইবাবু সুকুমারের মতিগতির চার্জ নিলেন। যেমন করে পারেন কানাইবাবু সুকুমারকে সংসারমুখো করবেন।

পাশের খবর বেরিয়েছে। কানাইবাবু সুকুমারকে দিয়ে জোর করে দরখাস্তে সই করালেন! নাও, সই কর। মুন্সেফী চাকরী ঠাট্টার নয়! সংসারে থেকেও সাধনা হয়। ঐ যাকে বলে, পাঁকাল মাছের মত থাকবে। জনকরাজা যেমন ছিলেন।

বাড়ির বিষন্ন আবহাওয়া ক্রমে উৎফুল্ল হয়ে আসছে। কৈলাসবাবু পাত্রী দেখে এসেছেন। এখন সমস্যা সুকুমারকে কোন মতে পাত্রী দেখাতে নিয়ে যাওয়া। কানাইবাবু সকলকে আশ্বস্ত করলেন—কিছু ভাববার নেই; সব ঠিক হো যায়েগা।

সংসারের ওপর সুকুমারের এই নির্লেপ, এখনও কেটে যায়নি ঠিকই! তবু একটু চাঞ্চল্য, আচারে আচরণে রক্তমাংসের মানুষের মেজাজ এক আধটুকু দেখা দিয়েছে যেন।

তবু একবার পড়ার ঘরে কানাইবাবুর সঙ্গে সুকুমারের একটা বচসা শোনা গেল। বাড়ির সবারই বুক দুরদুর করে উঠলো। ব্যাপার কি?

কানাইবাবুর কথার ফাঁদে পড়ে সুকুমারকে উপন্যাস পড়তে হয়েছে, জীবনে এই প্রথম। নাভিমূলে চন্দনের প্রলেপ দিয়ে, অগুরু পুড়িয়ে ঘরের বাতাস পবিত্র করে নিয়ে অতি সাবধানে পড়তে হয়েছে। বলবান ইন্দ্রিয়গ্রাম, কি হয় বলা তো যায় না।

কিন্তু উপন্যাস না নরক। যতসব নীচ রিপুসেবার বর্ণনা। সমস্ত রাত ঘুম হয় নি, এখনও গা ঘিন ঘিন করছে।

সুকুমার বলে—আপনাকে এবার ওয়ার্নিং দিয়ে ছেড়ে দিলাম কানাইবাবু।

মানে অপমানে সম্পূর্ণ উদাসীন কানাইবাবু বললেন—আজ সন্ধ্যেয় সিনেমা দেখাতে নিয়ে যাব তোমায়। যেতেই হবে ভাই, তোমার আজ্ঞাচক্রের দিব্যি। তা ছাড়া ভাল ছবি, ধ্রুবের তপস্যা। মনটাও তোমার একটু পবিত্র হবে।

কানাইবাবুর এক্সপেরিমেণ্ট বোধহয় সার্থক হয়ে উঠলো। ক'দিন পরেই দেখা গেল, সুকুমার কাব্য পড়ছে, কোন্ এক আখড়ায় গিয়ে মাথুর শুনে এসেছে, ঘন-ঘন সিনেমায় যাচ্ছে। এদিকে অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট পত্রও চলে এসেছে।

কিন্তু অনাসক্তির ঘোর সম্পূর্ণ কাটেনি। আজকাল সুকুমারের অতীন্দ্রিয় আবেশ হয়। জ্যোৎস্না রাতে বাগানে একা বসে বসে নেবুফুলের সুগন্ধে মনটা অকারণে উড়ে চলে যায়—ধূলিধূসর সংসারের বন্ধন ছেড়ে যেন আকাশের নীলিমায় সাঁতার দিয়ে বেড়ায়! একটা বিষণ্ণ সুখকর বেদনা। কিসের অভাব! কাকে যেন চাই! কে সেই না-পাওয়া? দীর্ঘশ্বাস চাপতে গিয়ে লজ্জা পায় সুকুমার।

রাত করে সিনেমা দেখে বাড়ি ফিরবার পথে কানাইবাবু সুকুমারকে জিজ্ঞেস করলেন—নাচটা কেমন লাগলো?

সুকুমার সহসা উত্তর দিল না। একটু চুপ করে থেকে বললো—কানাইবাবু?

—কি?

—মানুষের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।

—নিশ্চয়। কালই চল বারাসত। যাদব ঘোষের মেয়ে বনলতা। তোমার মেজদি যেতে লিখেছে। আর বাবা তো আগেই দেখে এসেছেন।

উকীলের মুহুরী যাদব বোস। বংশ ভাল আর মেয়ে বনলতা দেখতে ভালই। যাদব বোস অল্পপণে সৎপাত্র খুঁজছেন।

মেজদি একটি বছর পনের বয়সের মেয়েকে হাত ধরে সামনে টেনে নিয়ে এলেন।—ভাল করে দেখে নে সুকু, মনে যেন শেষে কোন খুঁতখুঁত না থাকে।

যাত্রাদলের রাজকুমারীর মত মেয়েটাকে যতদূর সম্ভব জবরজং করে সাজানো হয়েছে! বিরাট একটা ঝকমকে বেনারসী শাড়ি আর পুরু সাটিনের জ্যাকেট। পাড়ার মেয়েদের কাছ থেকে ধার-করা চুড়ি রুলি বালা ও অনন্ত, কনুই পর্যন্ত

বোঝাই করা দুটি হাত। ঘামে চুপসে গেছে কপালের টিপ, পাউডারের মোটা খড়ির স্রোত গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে গলার ওপর। মেয়েটি দম বন্ধ করে, চোখের দৃষ্টি হারিয়ে যেন যজ্ঞের পশুর মত এসে দাঁড়ালো।

বনলতার শক্ত খোঁপাটা চট করে খুলে, চুলের গোছা দু'হাতে তুলে ধরে মেজদি বললেন—দেখে নে সুকু। গাঁয়ের মেয়ে হলে হবে কি? তেলচিটে ঘাড নয়, যা তোমাদের কত কলেজের মেয়ের দেখেছি। রামোঃ।

মেজদি যেন ফিজিয়লজি পড়াচ্ছেন। বনলতার থুতনিটা ধরে এদিক ওদিক ঘুরিয়ে দেখালেন। চোখ মেলে তাকাতে বললেন—ট্যারা কানা নয়। পায়চারী করালেন—খোঁড়া নয়। সুকুমারের মুখের সামনে বনলতার হাতটা টেনে নিয়ে আঙুলগুলি ঘেঁটে ঘেঁটে দেখালেন—দেখছিস তো, নিন্দে করার জো নেই!

দেখার পালা শেষ হলো। বাড়ি ফিরে কানাইবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—কি যোগীবর, পছন্দ তো?

সুকুমার চুপ করে বসে রইল। মুখের চেহারা প্রসন্ন নয়। কানাইবাবু বুঝলেন, এক্ষেত্রে মৌনং অসম্মতি লক্ষণং!

—সিনেমায় বনানী দেবীর নাচ দেখে দেখে চোখ পাকিয়েছ ভায়া, এ সব মেয়ে কি পছন্দ হয়!—কানাইবাবু মনের বিরক্তি মনে চেপে রাখলেন।

পিসিমা বললেন—ছেলের আপত্তি তো হবেই। হা-ঘরের মেয়ে এনে হবে কি? মুহুরীর-টুহুরীর সঙ্গে কুটুম্বিতা চলবে না।

সুন্দরী মেয়ে চাই। এইটেই বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে এখন। কৈলাসডাক্তার পাত্রী দেখেছেন আর বিপদের কথা এই যে, তাঁর চোখে অসুন্দর তো কেউ নয়। তাই কৈলাসডাক্তার কাউকে সুন্দরী বলে সার্টিফিকেট দিলেই চলবে না। এ বিষয়ে তাঁর রুচি সম্বন্ধে সকলের যথেষ্ট সংশয় আছে। প্রথম ছেলে, জীবনসঙ্গিনী নিয়ে ঘর করতে হবে যাকে, তারই মতটা গ্রাহ্য। তারপর আর সকলের।

কৈলাসবাবু নিজে কুরূপ। কুৎসা করা যাদের আনন্দ তারা আড়ালে বলে 'কালো জিভ' ডাক্তার। ভদ্রলোকের জিভটাও নাকি কালো। যৌবনে এ গঞ্জনা কৈলাসডাক্তারকে মর্মপীড়া দিয়েছে অনেক। আজ প্রৌঢ়ত্বের শেষ ধাপে এসে সেই পীড়িত মর্মের কোন অভিমান আর নেই।

বাংলোর বারান্দায় সোফায় বসে নিবিষ্ট মনে কৈলাসডাক্তার এই কথাই ভাবছিলেন। এই রূপতত্ত্ব তাঁর কাছে দুর্বোধ্য। আজ পঁচিশ বছর ধরে যে ঝানু সার্জন ময়নাঘরে মানুষের বুক চিরে দেখে এসেছে, তাকে আর বোঝাতে হবে না, কা'কে সোনার দেহ বলে! মানুষের অন্তরঙ্গ রূপ-এর পরিচয় কৈলাসডাক্তারের মত আর কে জানে! কিন্তু তাঁর এই ভিন-জগতের সুন্দরম্, তাকে কদর দেবার মত দ্বিতীয় মানুষ কৈ? দুঃখ এইটুকু।

হঠাৎ শেকল-বাঁধা হাউণ্ডটার বিকট চিৎকার আর লাফঝাঁপ। ফটক ঠেলে হুড়মুড় করে ঢুকলো মানুষের ব্যঙ্গমূর্তি কয়েকটি প্রাণী। যদু ডোম আর নিতাই

সহিস দৌড়ে এল লাঠি নিয়ে।

যদু ও নিতাইয়ের গলাধাক্কা গ্রাহ্য না করে ফটকের ওপর জুৎ করে বসলো একটা ভিখারী পরিবার। নোংরা চটের পোঁটলা, ছেঁড়া মাদুর, উনুন, হাঁড়ি, ক্যানেস্তারা, পিঁপড়ে ও মাছি নিয়ে একটা কদর্য জগতের অংশ। সোরগোল শুনে সবাই বেরিয়ে এল।

কৈলাসবাবু বললেন—কে রে এরা যদু? চাইছে কি?

—এ ব্যাটার নাম হাবু বোষ্টম, তাঁতীদের ছেলে। কুষ্ঠ হয়ে ভিক্ষে ধরেছে।

কুষ্ঠী হাবু তার পট্টিবাঁধা হাত দুটো তুলে বললো—কৃপা করো বাবা!

—এই বুড়ীটা কে?

—এ মাগীর নাম হামিদা। জাতে পশ্চিমা বেদিয়া, বসন্তে কানা হবার পর দল ছাড়া হয়েছে। ও এখন হাবুরই বৌ।

হামিদা কোলের ভেতর থেকে নেকড়ায় জড়ানো ক'মাসের একটা ছেলেকে দু'হাতে তুলে ধরে নকল কান্নায় কঁকিয়ে কঁকিয়ে বললো—বাচ্চাকা জান হুজুর! এক পিয়ালী দুধ হুজুর! এক মুঠ্‌ঠি দানা হুজুর!

—আর এই ধিঙ্গি ছুঁড়িটা কে? পিসিমা প্রশ্ন করলেন।

—ওর নাম তুলসী। হাবু আর হামিদার মেয়ে।

—আপন মেয়ে?

—হ্যাঁ পিসিমা। যদু উত্তর দিল।

তুলসী একটা কলাই-করা থালা হাতে চুপ করে বসে আছে। পরিধানে খাটো একটা নোংরা পর্দার-কাপড়, বুকের ওপর থেকে গেরো দিয়ে ঝোলানো। আভরণের মধ্যে একটা কৌড়ির তাবিজ।

দেখবার মত চেহারা এই তুলসীর! বছর চৌদ্দ বয়স, তবু সর্বাঙ্গে একটা রূঢ় পরিপুষ্টি। ডাকিনীর টেরাকোট্টা মূর্তির মত কালি-মাড়া শরীর। মোটা থ্যাবড়া নাক। মাথার বেঢপ খুলিটা যেন একটা চোট লেগে টেরে-বেঁকে গেছে। বড় বড় দাঁত, জুড়ে যেন একটা দস্তুর হিংসে ফুটে রয়েছে। মুখের সমস্ত পেশী ভেঙে-চুরে গেছে, ছন্নছাড়া বিক্ষোভে। এ মুখের দিকে তাকিয়ে দাতাকর্ণও দান ভুলে যাবে, গা শিরশির করবে। কিন্তু যদু বললো—তুলসীর ভিক্ষের রোজগারই নাকি এদের পেটভাতের একমাত্র নির্ভর।

হাবু ঠিক ভিক্ষে করতে আসেনি। মিউনিসিপ্যালিটি এদের বস্তি ভেঙে দিয়েছে। নতুন আফিমের গুদাম হবে সেখানে। শহরের এলাকায় এদের থাকবার আর হুকুম নেই।

হাবু কান্নাকাটি করলো—একটা সার্টিফিকেট দিন বাবা। মুচিপাড়ার ভাগাড়ের পেছনে থাকবো। দীননাথের দিব্যি, হাঠবাজারে ঘেঁসবো না কখনো। তুলসীই ভিক্ষে খাটবে, ওর তো আর রোগ বালাই নেই।

পিসিমা বললেন—যেতে বল, যেতে বল। গা ঘিন্ ঘিন্ করে। কিছু দিয়ে

বিদেয় করে দে রাণু।

রাণু বললো—আমার ছেঁড়া ফ্লানেলের ব্লাউজটা দিয়ে দিই। এই শীতে তবু ছেলেটা বাঁচবে।

—হ্যাঁ দিয়ে দে। থাকে তো একটা ছেঁড়া শাড়িও দিয়ে দে। বয়স হয়েছে মেয়েটার, লজ্জা রাখতে হবে তো।

কৈলাসডাক্তার বললেন—আচ্ছা যা তোরা। সার্টিফিকেট দেব, কিন্তু খবরদার হাটবাজারে আসিস না।

হাবু তার সংসারপত্র নিয়ে আশীর্বাদ করে চলে গেলে তুলসীর কথাটাই আলোচনা হলো আর একবার। কৈলাসবাবু হেসে বললেন—দেখলে তো সুন্দরী তুলসীকে! ওরও বিয়ে হয়ে যাবে, জানো?

ঝি উত্তর দিল—বিয়ে হবে না কেন? সবই হবে। তবে সেটা আর বিয়ে নয়।

কৈলাসবাবু একটি পাত্রী দেখে এসেছেন। নন্দ দত্তের বোন দেবপ্রিয়া। মেয়েটি ভালই, তবে সুকুমার একবার দেখে আসুক।

দেখান হল দেবপ্রিয়াকে। মেদের প্রাচুর্যে বয়স ঠিক ঠাহর হয় না। চওড়া কপাল, ছোট চিবুক, গোল গোল চোখ। গায়ের রঙ মেটে, কিন্তু সুমসৃণ। ভারি ভুরু দু'টোতে যেন তিব্বতী উপত্যকার ধূর্ত একটু ছায়া, প্রচ্ছন্ন এক মাঙ্গোলিনীকে ইসারায় ধরিয়ে দিচ্ছে। ঠোঁটে হাসি লেগেই আছে। সে বোধহয় জানে, তার এই অপ্রাকৃত পৃথুলতা লোক হাসাবার মতই। দেবপ্রিয়ার গলা মিষ্টি, গান গায় ভাল।

সুকুমার হ্যাঁ না কিছুই বলে না। বলা তার স্বভাব নয়। বোঝা গেল, এ মেয়ে তার পছন্দ নয়।

পিসিমাও বললেন—হবেই না তো পছন্দ। শুধু গলা দিয়েই তো আর সংসার করা যায় না। তা ছাড়া নন্দরা বংশেও খাটো।

কৈলাসডাক্তার দুশ্চিন্তায় পড়লেন। সমস্যা ক্রমেই ঘোরালো হচ্ছে। এ মোটেই সহজ ব্যাপার নয়। নানা নতুন উপসর্গ দেখা দিচ্ছে একে একে। শুধু সুন্দরী হলেই চলবে না। বংশ, বিত্ত, শিক্ষা ও রুচি দেখতে হবে।

মাঝে পড়ে পুরুত ভটচাযিয় আরও খানিকটা ইন্ধন জুগিয়ে গেছেন। সমস্যাটা ক্রমেই তেতে উঠেছে। ভটচাযিয বাড়ির সকলকে বুঝিয়ে গেছেন—নিতান্ত আধ্যাত্মিক এই বিয়ে জিনিসটা। কুলনারীর গুণ-লক্ষণ মিলিয়ে পাত্রী নির্বাচন করতে হবে। গৃহিণী সচিব সখি প্রিয়শিষ্যা, সব যাচাই করে দেখতে হবে। সারাজীবনের ধর্মসাধনার অংশভাগিনী, এ ঠাট্টার ব্যাপার নয়। ধরে বেঁধে একটা নিয়ে এলেই চলবে না। ওসব যাবনিক অনাচার চলবে না।

হ্যাঁ, তবে সুন্দরী হওয়া চাই-ই। কারণ সৌন্দর্য একটা দেবসুলভ গুণ।

এবার যতদূর সম্ভব সাবধানে, খুব ভেবেচিন্তে কৈলাসডাক্তার এক পাত্রী দেখে এলেন। অনাদি সরকারের মেয়ে অনুপমা, সুশিক্ষিতা ও সুন্দরী।

অনুপমার বয়সএকটু বেশি। রোগা বা অতিতন্বী দুই-ই বলা যায়। মুখশ্রী আছে কি না-আছে তা বিতর্কের বিষয়। তবে চালচলনে সুরুচির আবেদন আছে নিশ্চয়। রূপে যেটুকু ঘাটতি তা পুষিয়ে গেছে সুশিক্ষার হ্লাদিনী গুণে।

প্রতিবাদ করলো রাণু।—না, ম্যাচ হবে না। যা ঝিরকুট চেহারা মেয়ের!

ঋষি বালকের মত কাঁচা মন সুকুমারের। হাঁ-না বলা তার ধাতে সম্ভব নয়। কিম্বা অতিরিক্ত লজ্জা, তাও হতে পারে। তবে তার আচরণেই বোঝা গেল, এ বিয়েতে সে রাজী নয়।

পিসিমা বললেন—ভালই হল জানি তো, কী কিপ্‌টে এই অনাদি চাষা। বিনাখরচে কাজ সারতে চায়। পাত্র যেন পথে গড়াচ্ছে।

দৈবজ্ঞী মশায় এসে পিসিমাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন—পাত্রীর রাশি আর গণ খুব ভাল করে মিলিয়ে দেখবেন পিসিমা। ওসব কোন তুচ্ছ করার জিনিস নয়।

—সবই গ্রহের কৃপা। দৈবজ্ঞী সুকুমারের কোষ্ঠী বিচার করে বাড়ির সকলকে বড় রকম একটা প্রেরণা দিয়ে চলে গেলেন।—যা দেখছি তা তো বড়ই ভাল মনে হচ্ছে। পতাকীরিষ্টি আর নেই, এবার কেতুর দশা চলেছে। এই বছরের মধ্যে ইষ্টলাভ। সুন্দরী রামা, রাজপদং, ধনসুখং। আর, আর কত বলবো।

—এই ছুঁড়ি ওখানে কি করছিস? কৈলাসবাবু ধমকে উঠলেন। সুকুমারের পড়ার ঘরের সামনের বারান্দায় ফুলগাছের টবের কাছে বসে আছে তুলসী। হাতে কলাই-করা থালাটা।

যদু কোত্থেকে এসে একসঙ্গে হুমকি দিল।—ওঠ্ এখান থেকে হারামজাদি! কেমন ঘুপটি মেরে বসে আছে চুরির ফিকিরে।

কৈলাসডাক্তার বললেন—যাক্, গালমন্দ করিস নে। খিড়কির দোরে গিয়ে বসতে বল।

সামনে কানাইবাবুকে পেয়ে কৈলাসডাক্তার বললেন—কি কানাই? এবার আমাকে বিড়ম্বনা থেকে একটু রেহাই দেবে কি না? সুন্দরী পাত্রী জুটলো তোমাদের?

—আজ্ঞে না! চেষ্টার তো ত্রুটি করছি না।

—চেষ্টা করেও কিছু হবে না। তোমাদের সুন্দরের তো মাথামুণ্ড কিছু নেই।

—কি রকম?

—কি রকম আবার? চুল কালো হলে সুন্দর আর চামড়া কালো হলে কুৎসিত। এই কথাটা কি মহাব্যোমে লেখা আছে, শাশ্বত কালি দিয়ে?

একটু চুপ করে থেকে কৈলাসডাক্তার বললেন—পদ্মপত্র যুগ্মনেত্র পরশয়ে শ্রুতি। ধন্যি বাবা কাশীরাম! একবার ভাব তো কানাই, কোনো ভদ্রলোকের যদি

নাক থেকে কান পর্যন্ত ইয়া দুটো চোখ ছড়িয়ে থাকে, কী চীজ হবে সেটা!

কানাইবাবু বললেন—যা বলেছেন। কত যে বাজে সংস্কারের সাত-পাঁচ রয়েছে লোকের। তবে মানুষের রূপের একটা স্ট্যাণ্ডার্ড অবশ্য আছে। আনথ্রপলজিস্টরা যেমন বলেন…।

—অ্যানথ্রপলজিস্ট না চামড়াওয়ালা। কৈলাসবাবু চড়া মেজাজে বললেন—আসুক একবার আমার সঙ্গে ময়নাঘরে। দুটো লাসের ছাল ছাড়িয়ে দিচ্ছি। চিনে বলুক দেখি, কে ওদের আলপাইন নেগ্রিটো আর কে প্রোটো-অষ্ট্রাল। দেখি ওদের বংশবিদ্যের মুরোদ। মেলা বকো না আমার কাছে।

কানাইবাবু সরে পড়ার পথ দেখলেন।

—জান কানাই, আমাকে আড়ালে সবাই কালোজিভ বলে ডাকে। বর্বর আর গাছে ফলে? একটা বাজে টাবু ছাড়বার শক্তি নেই, সভ্যতার গর্ব করে! আধুনিক হয়েছে! যত সব ফাজিলের দল!

কৈলাসডাক্তার ক্ষুব্ধ লাল চোখ দুটিকে শান্ত করে চুরুট ধরালেন।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা সত্যদাসের বাড়িতে ভাল একটি পাত্রী দেখে খুশি মনে কৈলাসডাক্তার ফিরলেন। ফটকে পা দিয়েই দেখলেন, সুকুমারের পড়ার ঘরের সামনে বসে যদু আর নিতাই তুলসীর সঙ্গে হাসি-মস্করা করছে।

—এই রাস্কেল সব! কি হচ্ছে ওখানে?

তুলসী ওর থালা হাতে নিয়ে আর দৌড় দিয়ে পালিয়ে গেল। যদু নিতাই আমতা আমতা করে কিছু একটা গুছিয়ে বলতে বৃথা চেষ্টা করে চুপ করে রইল। কৈলাসবাবু সুকুমারকে ডেকে বললেন—ঘরের দোর খোলা রাখ কেন? সেই ভিখিরি ছুঁড়িটা কদিন থেকে ঘুরঘুর করছে এদিকে। খুব নজর রাখবে, কখন কি চুরি করে সরে পড়ে, বলা যায় না।

সুকুমারের মাকে ডেকে কৈলাসবাবু জানালেন—সত্যদাসের মেয়ে মমতাকে দেখে এলাম। একরকম পাকা কথাই দিয়ে এসেছি। এবার সুকুমার আর তোমরা দেখে এস। আমায় আর নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিও না।

যথারীতি মমতাকে দেখে আসা হলো। মমতার রূপে অসাধারণত্ব আছে, সন্দেহ নেই। যেন একটি অমাবস্যা' কুমারী, ঘুটঘুটে কালো। সমস্ত অবয়বে একটা সুপেশল কাঠিন্য। মনিবন্ধ ও কনুইয়ের মজবুত হাড় আর হাতপায়ের রোমঘন পারুষ্য পুরুষকে লজ্জা দেয়। চওড়া করোটির ওপর অতিকুঞ্চিত স্থূলতন্তু চুলের ভার, নীলগিরির চূড়ার ওপর মেঘস্তবকের দৃশ্যটা মনে পড়িয়ে দেয়। মূর্তির শিল্পীরা অবশ্য খুশি হয়ে বলবেন, এ যেন এক দৃঢ়া দ্রবিড়া নায়িকার মূর্তি। মমতার প্রখর দৃষ্টির সামনে সুকুমারই সঙ্কুচিত হল। বরমালা-কাঙাল অবলার দৃষ্টি এ নয়; বরং এক অকুতোলজ্জা স্বয়ংবরার জিজ্ঞাসা যেন জলজল করছে মমতার দুই চোখে।

সত্যবাবু গুণপনার পরিচয় দিলেন।—বড় পরিশ্রমী মেয়ে, কারণ স্বাস্থ্য খুব

ভাল। ছাত্রীজীবনে প্রতিবছর স্পোর্টে প্রাইজ পেয়ে এসেছে।

মেয়ে দেখে এসে সুকুমার মুখভার করে শুয়ে রইল। রাণু বললো—এ নিশ্চয় রাক্ষসগণ।

পিসিমাও একটু বিমর্ষ হয়ে বললেন—হ্যাঁ, সেই তো কথা। বড় হট্টাকট্টা চেহারা। নইলে ভাল বরপণ দিচ্ছিল, দানসামগ্রীও।

তবু কৈলাসডাক্তার তোড়জোড় করছেন। মমতারই সঙ্গে বিয়ে একরকম ঠিক। এবার একটু শক্ত হয়েছেন তিনি। দশজনের দশ কথার চক্রে আর ভূত সাজতে পারবেন না।

কিন্তু যা কখনো হয়নি, তাই হল। সুকুমারের প্রকাশ্য বিদ্রোহ। সুকুমার এবার মুখ খুলেছে। রাণুকে ডেকে নিয়ে জানিয়ে দিয়েছে—সত্যদাসের সঙ্গে বড় গলাগলি দেখছি বাবার! ওখানে যদি বিয়ে ঠিক হয়, তবে একটু আগে ভাগে আমায় জানাবি। আমি যুদ্ধে সার্ভিস নিচ্ছি।

কথাটা শুনে পিসিমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো। সুকুমারের মা রান্না ছেড়ে বৈঠকখানায় গিয়ে কৈলাসবাবুর সঙ্গে একপ্রস্থ বাক্‌যুদ্ধ সেরে এলেন। কিন্তু ফল হল না কিছুই। কৈলাসবাবু এবার অটল।

সুকুমারের মা কেঁদে ফেললেন—ঐ হদকুচ্ছিত মেয়ের সঙ্গে বিয়ে! তোমার ছেলে ঐ মেয়ের ছায়া মাড়াবে ভেবেছ? এমন বিয়ে না দিয়ে ছেলের হাতে চিমটে দিয়ে বিদেয় করে দাও না!

কৈলাসবাবুর অটলতার ব্যতিক্রম হল না কিছুই। তিনি শুধু একটা দিন স্থির করার চেষ্টায় রইলেন।

সুকুমার মারমূর্তি হয়ে রাণুকে বললো—সেই দৈবজ্ঞীটা এবার এলে আমায় খবর দিবি তো!

—কোন্ দৈবজ্ঞী?

—ঐ যে বেটা সুন্দরী রামাটামা বলে গিয়েছিল। জিভ উপড়ে ফেলবো ওর।

আড়ালে দাঁড়িয়ে কৈলাসডাক্তার শুনলেন এ বার্তালাপ। রাগে ব্রহ্মতালু জ্বলে উঠলো তাঁর! সুকুমারের মাকে ডেকে প্রশ্ন করলেন—কি পেয়েছ?

শঙ্কিত চোখে কৈলাসবাবুর দিকে তাকিয়ে সুকুমারের মা বললেন—কি হয়েছে?

—ছেলের বিয়ে দিতে চাও?

—কেন দেব না?

—সৎপাত্রী চাও, না সুন্দরী পাত্রী চাও?

সুকুমারের মা ভেবে নিয়ে ভয়ে ভয়ে বললেন—সুন্দরী পাত্রী।

—বেশ তবে লিখে দাও আমাকে, সুন্দরী কাকে বলে। তন্বী শ্যামা পক্ক-বিম্বাধর, আরও যা আছে সব লিখে দাও। আমি সেই ফর্দ মিলিয়ে পাত্রী দেখবো।

এই বিদঘুটে প্রস্তাবে সুকুমারের মা'র মেজাজও ধৈর্য হারাবার উপক্রম করলো। তবু মনের ঝাঁজ চেপে নিয়ে বললেন—তার চেয়ে ভাল, তোমায় পাত্রী দেখতে হবে না আমরা দেখছি।

—ধন্যবাদ। খুব ভাল কথা। এবার তা হলে আমি দায়মুক্ত।

হ্যাঁ।

কৈলাসডাক্তার এখন অনেকটা সুস্থির হয়েছেন। হাসপাতালে যান আসেন। রুগী নিয়ে, ময়নাঘরের লাস নিয়ে দিন কেটে যায়। যেমন আগে কাটতো।

বাগানের দিকে একটা হট্টগোল। কৈলাসডাক্তার এগিয়ে গিয়ে দেখেন, যদু-ডোম আর নিতাই তুলসীকে ঘাড় ধরে হিড়হিড় করে টেনে বাগানের ফটক দিয়ে বার করে দিচ্ছে।

—কি ব্যাপার নিতাই?

—বড় পাজি এ ছুঁড়িটা, হুজুর। পয়সা দেয়নি বলে দাদাবাবুর ঘরে ঢিল ছুঁড়ছিল। আর, এই দেখুন আমার হাত কামড়ে দিয়েছে।

কৈলাসডাক্তার বললেন—বড বাড বেড়েছে ছুঁড়ির। ভিখিরীর জাত, দয়া করলেই কুকুরের মত মাথায় চড়ে। কেবলই দেখছি মাস তিন চার থেকে শুধু এদিকেই নজর। এবার এলে পুলিশে ধরিয়ে দিবি।

তুলসী ফটকের বাইরে গিয়েও মত্তা বাতুলীর মত আরও কয়েকটা ইটপাট-কেল ছুঁড়ে চলে গেল। কৈলাসডাক্তার বললেন—সব সময় ফটকে তালা বন্ধ রাখবে।

সেদিনই সন্ধ্যেবেলা। অনেক রাতে রুগী দেখে বাড়ি ফিরতেই কৈলাসডাক্তার দেখলেন, ফটক খুলে অন্ধকারে চোরের মত পা টিপে-টিপে সরে পড়ছে তুলসী। কৈলাসবাবুকে দেখে আরও জোরে দৌড়ে পালিয়ে গেল! কৈলাসডাক্তার হাঁক দিতেই যদু ও নিতাই হাজির হল লাঠি হাতে।

অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে কৈলাসডাক্তার বললেন—এ কি? ফটক খোলা, বারান্দায় আলো জ্বলছে, সুকুমারের ঘরে আলো, আমার বৈঠকখানা খোলা; তোমরা সব জেগেও রয়েছ, অথচ ছুঁড়িটা বেমালুম চুরি করে সরে পড়লো!

কৈলাসডাক্তার সমস্ত ঘর তন্নতন্ন করে দেখলেন।—আমার ঘরটা সব তছনছ করেছে কে? টেবিল থেকে নতুন বেলেডোনার শিশিটাই বা গেল কোথায়?

অনেকক্ষণ বকাবকি করে শান্ত হলেন কৈলাসডাক্তার। কিছু চুরি হয়নি বলেই মনে হল।

পরের দিন। দিনটা আজ ভাল নয়। সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত আকাশে দুর্যোগ ঘনিয়ে আছে। কানাইবাবু এসে কৈলাসডাক্তারকে জানালেন—সুন্দরী পাত্রী পাওয়া গেছে। জগৎ ঘোষের মেয়ে। সুকুমারের এবং আর সবারও পছন্দ হয়েছে। বংশে শিক্ষায় ও গুণে কোন ত্রুটি নেই।

কৈলাসডাক্তার বললেন—বুঝলাম, তোমরা কল্পতরুর সন্ধান পেয়েছ, সুখবর।

—আপনাকে আজ রাত্রে আশীর্বাদ করতে যেতে হবে।

—তা, যাব।

যদুডোম এসে তখুনি খবর দিলে, তিনটে লাস এসেছে ময়না তদন্তের জন্য। কৈলাসডাক্তার বললেন—চল রে যদু! এখনি সেরে রাখি। রাত্রে আমার নানা কাজ রয়েছে।

ময়নাঘরে এসে কৈলাসডাক্তার বললেন—বড় মেঘলা করেছে রে। পেট্রো-মাক্স বাতি দুটো জ্বেলে দে।

যন্ত্রপাতিগুলো গামলায় সাজিয়ে আস্তিন গুটিয়ে নিয়ে কৈলাসডাক্তার বললেন—রাত হবে নাকি রে যদু?

—আজ্ঞে না। দুটো আগুনে পোড়া লাস, পচে পাঁক হয়ে গেছে। ও তো জানা কেস, আমি চিরে ফেড়ে দেব। বাকি একটা শুধু…।

—নে কোন্‌টা দিবি, দে! কৈলাসডাক্তার করাত হাতে টেবিলের পাশে দাঁড়ালেন।

লাসের ঢাকাটা খুলে ফেলতেই কৈলাসডাক্তার চম্‌কে উঠলেন—অ্যাঁ, এ কে রে যদু?

যদু ততক্ষণে আলগোছে সরে পড়ে ঘরের বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। কৈলাস ডাক্তারের প্রশ্নে ফিরে এসে বললো—হ্যাঁ হুজুর তুলসীই, সেই ভিখিরী মেয়েটা।

কৈলাসডাক্তার বোকার মত যদুর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। যদু চটপট হাত চালিয়ে তুলসীর নোংরা শাড়ীটা আর গায়ের ছেঁড়া কোটটা খুলে মেঝের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিল। আবার বাইরে যাবার চেষ্টা করতেই কৈলাস-ডাক্তার বললেন—যাচ্ছিস কোথায়? স্পিরিট দিয়ে লাসটা মোছ ভাল করে। ইউক্যালিপটাসের তেলের বোতলটা দে। কিছু কর্পূর পুড়তে দে, আরও একটা বাতি জ্বাল।

—ওয়ান মোর আনফর্চুনেট!

কথাটার মধ্যে যেন একটু বেদনার আভাস ছিল। তুলসীর লাসে হাত দিলেন কৈলাসডাক্তার।

করাতের দু'পোচে খুলিটা দুভাগ করা হল। কৈলাসডাক্তারের হাতের ছুরি ফোঁস ফোঁস করে সনিশ্বাসে নেচে কেটে চললো লাসের উপর। গলাটা চিরে দেওয়া হল। সাঁড়াশি দিয়ে পটপট করে পাঁজরাগুলো উল্টে দিলেন কৈলাস-ডাক্তার।

যেন ঘুমে ঢলে রয়েছে তুলসীর চোখের পাতা। চিমটে দিয়ে ফাঁক করে কৈলাসডাক্তার দেখলেন, নিশ্চল দুটি কণীনিকা যেন নিদারুণ কোন অভিমানে নিষ্প্রভ হয়ে আছে। শুকিয়ে কুঁচিয়ে গেছে চোখের শ্বেতপটল। সুজলা অশ্রু-শীলা নাড়ীগুলো অতিস্রাবে বিষণ্ণ।

—ইস, মরার সময় মেয়েটা কেঁদেছে খুব। কৈলাসডাক্তার বললেন।

যদু বললো—হ্যাঁ হুজুর, কাঁদবেই তো। সুইসাইড কিনা! করে ফেলে তো ঝোঁকের মাথায়। তারপর খাবি খায়, কাঁদে আর মরে!

—গলা টিপে মারেনি তো কেউ? কৈলাসডাক্তার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলেন। কৈ কোন আঘাতের চিহ্ন নেই! গুচ্ছ গুচ্ছ অম্লান স্বররজ্জু, শ্বাসবহা নালিটাও তেমনি প্রফুল্ল। অজস্র লালায় পিচ্ছিল সুপুষ্ট গ্রসনিকা।

—এত লালা! মরবার আগে মেয়েটা খেয়েছে খুব পেট ভরে।

—হ্যাঁ হুজুর, ভিখিরি তো খেয়েই মরে।

দেহতত্ত্বের পাকা জহুরী কৈলাসডাক্তার। তাঁকে অবাক করেছে আজ কুৎসিতা এই তুলসী। কত রূপসী কুলবধূর, কত রূপাজীবা নটীর লাস পার হয়েছে তাঁর হাত দিয়ে। তিনি দেখেছেন তাদের অন্তরঙ্গ রূপ, ফিকে ফ্যাকাশে ঘেয়ো। তুলসী হার মানিয়েছে সকলকে। অদ্ভুত।

বাতিটা কাছে এগিয়ে নিয়ে কৈলাসডাক্তার তাকিয়ে রইলেন—প্রবাল পুষ্পের মালঞ্চের মত বরাঙ্গের এই প্রকট রূপ, অছদ্ম মানুষের রূপ। এই নবনীত-পিণ্ড মস্তিষ্ক, ফোটা শতদলের মত উৎফুল্ল হৃৎকোষের অলিন্দ আর নিলয়। রেশমী ঝালরের মত শত শত মোলায়েম ঝিল্লী। আনাচে কানাচে যেন রহস্যে ডুব দিয়ে আছে সুসূক্ষ্ম কৈশিক জাল।

কৈলাসডাক্তার তেমনই বিমুগ্ধ হয়ে দেখলেন—থরে বিথরে সাজানো সারি সারি রক্তিম পর্শুকা। বরফের কুচির মত অল্পঅল্প মেদের ছিটে। মজ্জাস্থি ঘিরে নেমে গেছে প্রাণদা নীলার প্রবাহিকা।

কৈলাসডাক্তার বাতিটাকে আরও কাছে এগিয়ে নিয়ে আর দু'চোখ অপলক করে দেখতে থাকেন—খণ্ডস্ফটিকের মত পীতাভ ছোট বড কত গ্রন্থির বীথিকা। প্রশান্ত মুকুটধমনী! সন্ধিতে সন্ধিতে সুপ্রচুর লসিকার বুদ্বুদ। গ্রন্থিক্ষীরে নিষিক্ত অতি অভিরাম এই অংশুপেশীর স্তবক আর তরুণাস্থির সজ্জা ঝাঁপিখোলা রত্ন-মালার মত আলোয় ঝলমল করে উঠলো।

আবিষ্ট হয়ে গেছেন কৈলাসডাক্তার। কুৎসিতা তুলসীর এই রূপের পরিচয় কে রাখে? তবুও, এ তিমিরদৃষ্টি হয়তো ঘুচে যাবে একদিন। আগামী কালের কোন প্রেমিক বুঝবে এ রূপের মর্যাদা। নতুন অনুরাগের তাজমহল হয়তো গড়ে উঠবে সেদিন! যাক্‌……।

কৈলাসডাক্তার আবার হাতের কাজে মন দিলেন। যদু বললো—এ সবে কোন জখম নেই হুজুর। পেটটা দেখুন।

ছুরির ফলার এক আঘাতে দু'ভাগ করা হল পাকস্থলী। এইবার কৈলাস ডাক্তার দেখলেন, কোথায় মৃত্যুর কামড। শ্লেমরসে মাখা একটা অজীর্ণ পিণ্ড—সন্দেশ পাউরুটী আর…আর বেলেডোনা।

—মার্ডার!

হাতের ছুরি খসে পডলো মেঝের ওপর। সে শব্দে দু'পা পিছিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন কৈলাসডাক্তার।

উত্তেজনায় বুড়ো কৈলাসডাক্তারের ঘাড়ের রগ ফুলে উঠলো দপ দপ করে। পোখরাজের দানার মত বড় বড় ঘামের ফোঁটা কপাল থেকে ঝরে পড়লো মেঝের ওপর।

হঠাৎ ছটফট করে টেবিলের কাছে আবার এগিয়ে এলেন কৈলাসডাক্তার। ছোঁ মেরে কাঁচিটা তুলে নিয়ে তুলসীর তলপেটের দুটো বন্ধনী ছেদ করলেন। নিকেলের চিমটের সুচিক্কণ বাহুপুটে চেপে নিয়ে, স্নেহাক্ত আগ্রহে ধীরে ধীরে টেনে তুলে ধরলেন, পরিশঙ্কে ঢাকা সুডৌল সুকোমল একটি পেটিকা। মাতৃত্বের রসে উর্বর, মানব জাতির মাংসল ধরিত্রী। সর্পিল নাড়ীর আলিঙ্গনে ক্লিষ্ট ও কুঞ্চিত, বিষিয়ে নীল হয়ে আছে একটি শিশু আশা।

আবেগে কৈলাসডাক্তারের ঠোঁটটা কাঁপছিল থরথর করে। যদু এসে ডাকলো—হুজুর।

ডেকে সাড়া না পেয়ে যদু বাইরে গিয়ে নিতাই সহিসের পাশে বসলো।

নিতাই জিজ্ঞেস করে—এত দেরী কেন রে যদু ?

—শালা বুড়ো নাতির মুখ দেখছে।

শা স্তি দা তা

প্রথমে চিৎকার করে উঠলেন মেজবাবু। তারপর সেই প্রকাণ্ড বাড়িটা। তারপর পাড়াটা। এবং তারপর যেন সারা গ্রামের প্রাণটা চেঁচিয়ে উঠলো। সেই চিৎকার অদ্ভুত রকমের একটা ভয়ের শিহর আর কাঁপুনি দিয়ে গড়া। সেইসঙ্গে যেন একটা আক্রোশের গর্জনও গোঁ গোঁ করে ফেটে পড়তে চাইছে। আরও মনে হয়, যেন ঘুমন্ত মানুষের একটা শিবিরের উপর হঠাৎ এক শত্রুর আক্রমণ ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। চার দিকে একটা সাজ-সাজ মার-মার শব্দের এলোমেলো দৌড়াদৌড়ি।

গাঁয়ের পথের অন্ধকারে এদিক থেকে ওদিক, এখানে আর সেখানে, ঝাঁকে ঝাঁকে লণ্ঠন ছুটোছুটি করে। লাঠির আছড়ানির শব্দ শোনা যায়, কুকুরের উচ্ছ্বসিত চিৎকার। এদিকের হাঁক শুনে ওদিকের চিৎকার ছুটে আসে; আবার এদিকের চিৎকার বৃথাই ওদিকে চলে গিয়ে হাঁপাতে থাকে। কোথায়, কোন্ দিকে, কার বাড়িতে, কতখানি সর্বনাশ হয়ে গেল ? ঘুমভাঙ্গা গ্রামের বাতাস মথিত করে যতগুলি আর যে-সব ধরনের আর্তনাদ, ভয়ের কাঁপুনি আর দাঁতঘষা আক্রোশের শব্দ জেগে ওঠে, তার মধ্যে শুধু একটি শব্দের ভাষা বুঝতে পারা যায়—চোর চোর চোর! চোর ঢুকেছে এই গ্রামের কোন ঘুমন্ত সংসারের সর্বনাশ করার জন্য।

সারা গ্রামের শেষরাতের সেই এলোমেলো চিৎকার, লণ্ঠনের আলো আর লাঠির প্রতিজ্ঞাগুলি শেষ পর্যন্ত যেন একটা ছন্দ খুঁজে পায়। সকলেই চারদিক থেকে হন্তদন্ত হয়ে একে একে মেজবাবুর সেই প্রকাণ্ড বাড়ির দিকে ছুটে আসতে থাকে।

চোর ধরা পড়ে গিয়েছে। মেজবাবুর চিৎকার থেমে গিয়েছে অনেকক্ষণ। প্রকাণ্ড বাড়ির চিৎকারও থিতিয়ে এসেছে! উঠানভরা ভিড়ের মাঝখানটা মানুষের মাথায় মাথায় ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে একেবারে নিরেট হয়ে গিয়েছে। ভিড়ের চারদিকে, উঠোনের কোণে কোণে এবং বাড়ির দরজায় দরজায় একটু ফাঁকা ফাঁকা ভিড়। মেয়েরা দাঁড়িয়ে তখনো ভয়ার্ত গুঞ্জনের মত গুনগুন করে কথা বলে। ছেলে-মেয়েরা কলরব করে। এরই মধ্যে দুটো লণ্ঠনকে উঁচু করে থামের গায়ে বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবুও চোরকে সকলে এখনও দেখতে পাচ্ছে না। কারণ, ভিড়ের সেই নিরেট মধ্যিখানের ভিতরে এখনও কিল চড় আর ঘুসির আড়ালে চাপা পড়ে আছে চোরটা! চোরের কাতরানির শব্দ একটুও শোনা যায় না। ভয়ঙ্কর কঠিন ও ধূর্ত নাকি সেই চোরের শরীরটা। মার হজম করার মন্ত্র জানে।

সবচেয়ে বেশি স্পষ্ট করে শোনা যায়, মেজবাবুর ভাগ্নে নিবারণ আর দারোয়ান বাবুলালের হুঙ্কার। এরাই দুজনে মিলে তাড়া করে চোরকে ধরেছে, এবং এখন সেই চোরকে দু'জনের দু'জোড়া হাতের প্রচণ্ড মত্ততার মাঝখানে নিয়ে কী খেলা খেলছে কে জানে!

বারান্দার উপরে চেয়ার পেতে বসে আছেন মেজবাবু। পাশে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বাড়ির মাস্টারমশাই। নিঃশব্দে, অতি শান্ত দুই চক্ষুর তৃপ্তি নিয়ে মেজবাবু এখন চোরের এই শাস্তির অনুষ্ঠানকে মাঝে মাঝে একটি দুটি কথা বলে উৎসাহিত করছেন।

মেজবাবু বলেন—সেদিন তো আর নেই মাস্টারমশাই, নইলে এরকম সাংঘাতিক চোরকে আমি নিজেই ফিনিশ করে দিতাম। আমার ঠাকুরদার কাছে গল্প শুনেছি এ গাঁয়ে ধরা পড়লে তাঁর মুণ্ড কেটে ইছামতীর জলে ভাসিয়ে দেওয়া হতো। আমি বলি, অতটা করবার কোন দরকার হয় না। ওতে ঠিক শাস্তিটাও হয় না। তাকেই বলে শাস্তি, যা দিলে এই রকম চোর ভবিষ্যতে আর কখনও চুরি করতে পারবে না।

মাস্টারমশাই বলেন—যা মার পড়েছে, তারপর লোকটা আর চুরির সাহস স্বপ্নেও পাবে না।

মেজবাবু বলেন—ভুল বুঝেছ মাস্টারমশাই, এরকম এলোমেলো মার চুরির কোন শাস্তিই নয়।

মেজবাবু হাঁক দিলেন—নিবারণ! ও বাবুলাল!

চোরের পিঠে আর কোমরে দশ-বার পাক দড়ি জড়িয়ে ততক্ষণে একটা

খুটোর সঙ্গে চোরকে বেঁধে ফেলেছে নিবারণ আর বাবুলাল।

নিবারণ চেঁচায়—বলুন মামা।

বাবুলাল হাঁপায়—বোলিয়ে হুজুর।

মেজবাবু বলেন—ওতে ওর শাস্তি হবে না। তার চেয়ে বরং ·····।

মেজবাবু বোধহয় শাস্তি-তত্ত্বের অন্তর থেকে একটা খাঁটি কাজের মত কাজের নির্দেশ পেতে চাইছেন। তাঁর শান্ত চোখ দুটো হঠাৎ ক্ষুব্ধ হয়ে কটমট করে। বার বার ভ্রূকুঞ্চিত করেন!

তাঁর পক্ষে ক্ষুব্ধ হবারই কথা। শেষ রাতে ঘুম থেকে উঠে বাইরে আসতেই থমকে দাঁড়িয়েছিলেন মেজবাবু। বুকের ভিতরটা ভয়ানকভাবে চমকে উঠেছিল। একটা ছায়ামূর্তি তাঁরই ঠাকুরঘরের দরজা থেকে বের হয়ে আস্তে চলে যাচ্ছে—কে?—কে?—কে? বলতে বলতে ছুটে আসতেই পালিয়ে গেল সেই ছায়ামূর্তি এবং ঝুপ করে কি-একটা বস্তুকে উঠোনের ওদিকে ছুঁড়ে ফেলে দিল। মেজবাবু দেখতে পেলেন, তাঁরই ঠাকুরঘরের বিগ্রহ। কষ্টিপাথরের বিষ্ণু, এই মাসেই অনেক ঘটা করে যে বিষ্ণুর মুকুট ষোল ভরি সোনা দিয়ে বাঁধিয়েছেন মেজবাবু। দশটা দিনও পার হয়নি, কতবড় অভিষেক উৎসব হয়ে গিয়েছে এই প্রকাণ্ড বাড়ির ঠাকুরদালানের আঙ্গিনায়।

মেজবাবুর চিৎকার শুনে ভাগ্যে নিবারণ আর দারোয়ান বাবুলাল চিতাবাঘের মত ছুটে গিয়েছে, এবং দীঘির ওপারে কলাবাদাড়ের ভিতর থেকে চোরকে ধরে নিয়ে এসেছে। শক্ত করে গামছা পরা, কোমরে বেল্ট বাঁধা, ছোট-খাট চেহারার একটা লোক। মুখটা ইঁদুরের মত। হাত-পাগুলি কী ভয়ানক শক্ত। আদুড় গায়ের মাংসগুলি ছোট ছোট নুড়ির মত শক্ত। ঘুসি মারলে কচকচ শব্দ করে।

ক'দিন আগে ভট্চায বাড়ির বড় ঘরে সিঁদ কেটে সিন্দুক থেকে বেছে বেছে সব রূপোর আর তামার বাসনগুলো নিয়ে গিয়েছে, কে সেই চোর? কোন সন্দেহ নেই, এই বেটাই সেই পাকা চোর। হরিশের দুটো বকনা তিনদিন হলো খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। হরিশ বলে—এই বেটাই, এ ছাড়া আমার এমন তাজা তাজা দুটো বকনাকে গোয়ালঘরের ভিতর থেকে নিয়ে যাবে কে?

শাস্তি দিতে হবে এই চোরকে। দু'জন লোক চলে গিয়েছে দফাদারকে খবর দেবার জন্যে। দেড় মাইল দূরে এক গাঁয়ে থাকে দফাদার। আসতে ভোর হয়ে যাবে। কিন্তু এলেই বা কি?

মেজবাবু বলেন—পুলিশে দেওয়া হবে ঠিকই। কিন্তু তাতে কি আর শাস্তি দেওয়া হলো? বড়জোর দু'বছর কয়েদ হবে। বেটা সুখে থাকবে লাখ টাকা দামের দালানবাড়ি ঐ জেলের ভিতরে। ফিরে এসে আবার মানুষের সর্বনাশ করবে।

হরিশ বলে—সারা গায়ে বিছুটি ঘষে দিলে ভাল হয়।

বল্লভবাবু বলেন—আগুনের ছ্যাঁকা দাও, তাহলে নিজের মুখে সব কথা স্বীকার করবে। এর আগে কোথায় কোথায় চুরি করেছে ওর নামটাই বা কি, এসব

আমাদের জেনে রাখা দরকার।

নিতাই বলে—কিছু কিছু ছুঁচ ফোটানো দরকার। কিল-চড ওর গায়ে একটুও বাজছে না, কর্তা।

অমূল্য বলে—নাকে লঙ্কার ধোঁয়া দিলেও কাজ হয়।

মেজবাবু বলেন—না, ওতে কিছু হবে না। শাস্তি চাই।

বাবুলাল চিৎকার করে—বোলিয়ে হুজুর।

ভাগ্নে নিবারণ যুযুৎসু জানে। হাত দুলিয়ে হাঁক দেয়।—কি করতে হবে বলে দিন, মামা।

মেজবাবু দাঁত চিবিয়ে বলেন—অন্তত একটা হাত ভেঙ্গে দাও, যেন ভবিষ্যতে আর কখনও ··।

মাস্টারমশাই ক্ষীণস্বরে আর্তনাদ করতে গিয়ে ফুঁপিয়ে ওঠে—মেজবাবু!

মেজবাবু ধমক দিয়ে অবহেলাভরে মাস্টারমশাই-এর দিকে তাকান—চুপ কর মাস্টার। নো সেন্টিমেণ্ট।

নিবারণ আর বাবুলাল চোরকে জড়িয়ে ধরে। বাবুলাল চেপে ধরে চোরের মাথাটা এবং নিবারণ চেপে ধরে চোরের একটা হাত। চোরের হাতটাকে পিঠের দিকে মুচডে দিয়ে ভয়ানক জোরে একটা হ্যাঁচকা টান দেয় নিবারণ। ইঁদুরের মত কিচকিচ করে আস্তে একটা শব্দ করে চোরটা। চোখ বন্ধ করে, শরীরটা কুঁকড়িয়ে, মোড়ানো হাতটাকে সোজা করবার চেষ্টা করে।

হরিশ চেঁচিয়ে ওঠে—ভেঙ্গেছে, ও হাত আর নাড়তে হবে·''

মাস্টারমশাই মেজবাবুর কানের কাছে ফিসফিস করে—এটা কিরকমের শাস্তি হলো বুঝলাম না, মেজবাবু। লোকটার হাতটাকে নষ্ট করে দিলে ওকে যে শেষে ভিক্ষে করে খেতে হবে।

—হবে। মেজবাবু চোখ কটমট করে হুঙ্কার দেন। চুরি তো আর করতে পারবে না। মানুষের সংসার নিরাপদ হবে।

মাস্টারমশাই বলে—আমার মনে হয়, এটা ঠিক শাস্তি হলো না।

—মিথ্যে তোমার ধারণা, মিথ্যে তোমার সেন্টিমেণ্ট। তোমার যদি এরকম সৌভাগ্যের বিগ্রহ একটি থাকতো, সোনা দিয়ে বাঁধানো মুকুট অমন সুন্দর একটি কষ্টিপাথরের বিষ্ণু, আর চোর এসে দেবতাকে চুরি করতো, তবে তুমি আর এসব মহত্ত্ব দেখাতে চাইতে না মাস্টার। চিৎকার করে বলতে বলতে মেজবাবু আবার ক্রুদ্ধস্বরে কপালের রগ ফুলিয়ে হুঙ্কার দেন—আর একটা হাত ভেঙ্গে দাও।

চোরের ঘাড়টা আবার জড়িয়ে ধরে বাবুলাল। যুযুৎসুর নিবারণ আবার চোরের হাত চেপে ধরে! উঠানের জনতা চোখ বড় করে দেখতে থাকে দৃশ্য।

সেই মুহূর্তে আর একটা হ্যাঁচকা টান দিয়েই ফেলতো নিবারণ, কিন্তু হঠাৎ

একটা অদ্ভুত আর্তনাদ শিউরে উঠলো এই প্রকাণ্ড বাড়ির একটি ঘরের ভিতরে। কি ব্যাপার! সকলেই চোখ ফিরিয়ে দেখবার চেষ্টা করে। কান ফিরিয়ে শোনবার চেষ্টা করে।

ঘরের ভিতর থেকে ছুটে বের হয়ে এলেন যিনি, তাঁকে দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে ওঠে নিবারণ—কি হলো মামীমা?

বাবুলাল চিৎকার করে—বোলিয়ে মায়িজী।

যা বলবার ছিল, মেজমামী বললেন। তারপর জ্ঞান হারিয়ে মাটির উপর পড়ে গেলেন। উঠানের জনতা আবার চেঁচিয়ে ওঠে। আবার সেই ভয়ের কাঁপুনি, আক্ষেপ, আতঙ্ক, আক্রোশ আর হৈ-হৈ। কিন্তু বড় ভীরু সেই ভয়। বড় করুণ সেই আক্রোশ। বড কুণ্ঠিত সেই হৈ-হৈ।

মেজমামীর ছোট ছেলেটি যে বিছানার উপর ঘুমিয়ে আছে, সেই বিছানাতে বালিশের পাশে একটি কালো কেউটে বিঁড়ে পাকিয়ে বসে আছে, আর ফণা দোলাচ্ছে। ঘুমন্ত ছেলেটি যদি একটি বার হাত নাড়ে, তবে সেই মুহূর্তে এক ছোবলে সেই ছেলের প্রাণের উপর বিষ ঢেলে দেবে ওই ভয়ঙ্কর জীব। কে জানে কখন ঘরের মধ্যে ঢুকল মৃত্যুর দূত এই কালো গরলের ভয়াল প্রাণীটি।

ঘরের দরজার কাছে এসে বিশ জোড়া হাত এবং বিশটি লাঠি হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যায়। আর এগিয়ে যাওয়া যায় না। লাঠি মারা যায় না। সাপটি ঠিক ছেলেটার প্রায় মাথা ঘেঁষে রয়েছে। একটু শব্দ করাও যায় না। হিতে বিপরীত হতে পারে। ঐ কালো গরলের জীবকে মার দিলে, সে মরতে মরতেই ঘুমন্ত শিশুটাকে একটি নিষ্ঠুর দংশনে মেরে রেখে যাবে।

প্রকাণ্ড বাড়ির প্রাণ হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যায়। সব আক্রোশ আর চিৎকার ভীরু হয়ে নীরব হয়ে যায়। মেজবাবুর চোখ দুটো যেন অসাড় হয়ে গিয়েছে। ফ্যাল-ফ্যাল করে লণ্ঠনের ধোঁয়ার দিকে তাকিয়ে থাকেন। তাঁর বুকের ভিতর ঢিপ-ঢিপ শব্দও বোধহয় নীরব হয়ে যাবে।

কী আশ্চর্য, এই নীরবতার মধ্যে প্রথম কথা বলে উঠলো সেই চোরটা। খুঁটোর সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা পিঠ বুক আর কোমর, ইঁদুরের মত মুখ সেই চোরের চোখ দুটো যেন বেজির চোখের মত জ্বলছে। চোর বলে—আমি সাপ ধরতে জানি।

নিবারণ বলে—অ্যাঁ।

চোর বলে—হ্যাঁ গো মোশাই, কত সাপ ধরলুম, কত সাপ খেলালুম। আমি বিষহরির মন্তোর জানি।

উঠানের জনতা ফিসফাস করে—লোকটাকে কাজে লাগিয়ে নাও নিবারণ।

বল্লভবাবু বলেন—ওকে একটা চান্স দাও নিবারণ। যদি সাপটাকে সরিয়ে দিতে পারে, তবে ওকে ছেড়ে দেওয়া হবে।

নিবারণ বলে—তা তো বটেই।

চোরের বাঁধন খুলে ফেলা হলো। কিন্তু চোর ওঠে না। একটা হাত আর এক হাত দিয়ে চেপে চোর আবার কাতরাতে থাকে।—বড্ড লেগেছে বাবু, হাড়গুলো চুর চুর হয়ে গিয়েছে। নাড়বো কেমন করে এই হাত?

—পারবি, পারবি। নিবারণ সমীহ করে বলতে থাকে। বল্লভবাবু এগিয়ে এসে চোরের হাত জল দিয়ে মালিশ করতে থাকেন। অমূল্য চেঁচিয়ে ওঠে।—বাস্, ঠিক হয়ে গিয়েছে।

নিবারণ বলে—এইবার ওঠ, একটু তাড়াতাড়ি কর!

চোর বলে—বড় তেষ্টা পেয়েছে বাবু।

তখুনি জল আনা হয়। একঘটি জল ঢক ঢক করে খেয়ে চোর আস্তে আস্তে হাঁপ ছাড়ে। এদিক ওদিক তাকায়। তারপর বলে—একমুঠো সরষে চাই।

ছেলের দল ঘরের ভিতরে ছুটে গিয়ে এক ডালা সরষে নিয়ে আসে। তবু চোরের উৎসাহটা তেমন করে জেগে ওঠে না। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায়। এদিক-ওদিক তাকায়। নিবারণ হাঁকে—চল্ চল্ চল্।

চোর বলে—ডান হাতটাকে যে ঘায়েল করে দিয়েছেন মশাই। বাঁ হাতের জোরে কি অমন কালো কেউটেকে বাগিয়ে ধরা যায়?

নিবারণ বলে—পারবি, নিশ্চয়ই পারবি। বকশিস দেওয়া হবে তোকে। ভাল বকশিস। নতুন কাপড় পাবি। পুলিশে দেওয়া তো হবেই না, ওঠ ওঠ।

শেষ রাতের অন্ধকার অনেকক্ষণ আগেই ফিকে হয়ে গিয়েছিল। এইবার ফর্সা হয়ে আসছে গাঁয়ের পূবের আকাশ। বাড়ির দোতলার ঘরের ভিতর মেয়েদের কান্না শুরু হয়ে গেছে। মেজমামীর মূর্ছা ভাঙেনি। মেজবাবু কাঠ হয়ে বসে আছেন।

নিবারণের হাত ধরে এক-পা দু'-পা করে ঘরের দিকে যেতে থাকে চোর। তারপর নিবারণের হাত ছেড়ে দিয়ে ধপ করে মাটির উপর বসে পড়ে আর দম ধুঁকতে থাকে। বড় বেশি দেরী করিয়ে দিচ্ছে চোরটা। আবার এক ঘটি জল খেতে চায়। জল আনবার জন্য ছুটাছুটি করে উঠানের লোক।

হঠাৎ সারা বাড়ির প্রাণটা যেন উল্লসিত হয়ে চেঁচিয়ে ওঠে। আনন্দের চিৎকার। ঘরের ভিতর ভিড়ের সেই ভয়ার্ত গম্ভীরতা যেন হঠাৎ দূর হয়ে গিয়েছে। কি ব্যাপার? চোরের হাত ছেড়ে দিয়ে ঘরের ভিতরে চলে যায় নিবারণ আর বাবুলাল।

চলে গিয়েছে সাপ। ঘর ছেড়ে সাপটা জানালা বেয়ে একেবারে বাইরে চলে গিয়েছে। এখন দেখা যায়, দূরের একটা নারকেলের গা ঘষে ঘষে সাপটা শুকনো পাতার উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে। জানালার কাছে দাঁড়িয়ে দশজোড়া চোখ সেই দৃশ্য দেখছে। হরিশ চেঁচিয়ে ওঠে, জয় বিষহরি! জয় মা মনসা।

চেয়ার ছেড়ে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালেন মেজবাবু। ছোট ছেলেটাকে তুলে নিয়ে এসে কোলের উপর বসিয়ে দিল বাবুলাল।

কিন্তু কই সেই চোর ? সেই ইঁদুর-মুখো ভয়ানক জীবটা ?

চোর নেই। এই ফাঁকে পালিয়ে গিয়েছে চোর। বাবুলাল চেঁচিয়ে ওঠে—বিলকুল মিথ্যা। সাপ ধরবার মন্তোর-টন্তোর কিছু জানে না চোর। আপনি ভুল করে চোরের দড়ি খুলিয়ে দিয়েছেন নিবারণ-দাদা!

অমূল্য বলে—ঠিক কথা। কি ভয়ঙ্কর ভাঁওতা। ছিঃ, আপনিও ওকে বিশ্বাস করলেন, নিবারণদা ?

বল্লভবাবু বলেন—এতগুলি লোককে কলা দেখিয়ে পালিয়ে গেল চোরটা। ছিঃ।

চেঁচিয়ে ওঠে নিবারণ—ঐ যে, পালাবে কোথায় ?

নিবারণ আর বাবুলালের চোখ বাঘের চোখের মত দপ্‌ করে জ্বলে ওঠে। স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, কলাবাদাড়ের পাশ দিয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে পাট-ক্ষেতের উপর নেমে পড়েছে চোরটা।

লাঠি হাতে তুলে নিয়ে নিবারণ আর বাবুলাল একটা লাফ দিতেই মেজবাবু বললেন—থাম থাম।

নিবারণ অপ্রস্তুত হয়ে বলে—আজ্ঞে।

মেজবাবু—ওকে ধরে এনে আর লাভ কি ?

নিবারণ—কি আশ্চর্য, মিথ্যে কথা বলে ভাঁওতা দিয়ে চোরটা যে দিব্যি কেটে পড়ছে, মামা! ওর আর একটা হাত যে ভেঙ্গে দিতে হবে।

মেজবাবু—না না। বোধহয় মিথ্যে কথা নয়।

বাবুলাল বলে—মিথ্যে কথাই বলেছে হুজুর। ও বেটা সাপ ধরতে জানে না।

মেজবাবু বলেন—হলোই বা মিথ্যে কথা।

হৃদ্‌ঘনশ্যাম

শুঁয়োপোকাটা দেয়ালের গা ধরে এগিয়ে আসছে। কুৎসিত নির্বোধ ও ভীরু ক্ষুদ্র একটি রোমশ সর্বনাশ যেন কেৎরে কেৎরে এগিয়ে আসছে। এই পোকাটাও একদিন প্রজাপতি হয়ে যাবে। বসন্তের বাতাসে এরই বিচিত্র পাখা থেকে রঙীন ধুলো ঝরে পড়বে। একথা বিশ্বাস করতে বাধা নেই; খুব বেশি আশ্চর্য হই না। কিন্তু শ্যামুও সাধু মহারাজ হয়ে যাবে, একথা কখনো মনে আসেনি. এখনো বিশ্বাস করতে পারি না। এটা যেন এক ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক অনিয়ম।

সুরেনদা বললেন—কিন্তু তাই যে হয়েছে।

কুঞ্জবাবু বললেন—শ্যামু শ্যামুই আছে, শুধু ভোল বদলেছে।

চরণডাক্তার বললেন—বহুজন দুঃখায় বহুজন অহিতায় চ। এবার বেশ পাকা বন্দোবস্ত করে পরের সর্বনাশ করছে।

শুঁয়োপোকাটা টুপ করে টেবিলের ওপর পড়ে গুটিয়ে রইল। শ্যামুও ঠিক

এইভাবে এক-একদিন আমাদের পায়ের কাছে অসহায়ভাবে গুটিয়ে পড়ে থাকতো—এ যাত্রা বাঁচিয়ে দাও নিতুবাবু! ভবিষ্যতে আর কখনো হবে না।

মনে পড়ে, শ্যামুর কাজ ছিল গুলি খেয়ে নেশা করা আর জুয়া খেলা। রোজগার ছিল স্টেশনে হাঁক দিয়ে বিক্রী করা—লক্ষ ব্রাহ্মণের পদধূলি, এক আনা প্যাকেট। কতবার কত অপরাধের দায়ে ধরা পড়েছে শ্যামু। আমরাই ওকে রক্ষা করেছি। টাকা দিয়েছি, মোকদ্দমার খরচ যুগিয়েছি। তারপর সাবধান করে দিয়েছি।

শ্যামুর কাছে শুনেছিলাম, ওর পিতৃদেব নাকি এক অতি বিত্তশালী ও অতি নিষ্ঠুর জমিদার। এমন বাপ না মরলে শ্যামু আর ঘরে ফিরবে না। সেই ক'টা দিন সে আমাদেরই দয়ার আশ্রয়ে কাটিয়ে দিতে চায়। তারপর, সম্পত্তি পাবার পর প্রত্যেকটি রূপোর দেনা সে সোনার ওজনে শোধ করে দেবে।

শ্যামু উধাও হয়েছিল প্রায় দশটি বছর। আজ আবার নতুন করে ওর নাম শুনছি লোকের মুখে মুখে। লোকটি সেই বটে, সে নাম আর নেই। শ্যামু এখন বাবাজী হৃদ্‌ঘনশ্যাম। আশ্রম করেছে, অন্তত শ'পাঁচেক দীক্ষিত শিষ্য ও শিষ্যা আছে। ভক্ত ও অনুরাগীর সংখ্যা আরও পাঁচ শত।

প্রতি সন্ধ্যায় শ্যামুর আধ্যাত্মিক মহিমার বহু কীর্তিকাহিনী কানে শুনতে পাই, নিত্য নতুন সব অলৌকিক ঘটনা, বিচিত্র ও অদ্ভুত। বাবাজী হৃদ্‌ঘন শ্যামের মহিমা অদৃশ্য এক জালের মত দূর দূর সহরের ব্যারিস্টার ডাক্তার জমিদার ও মার্চেন্টদের ভক্তিবিগলিত হৃদয়গুলি যেন ছেঁকে এনে ফেলেছে তার আশ্রমের আঙিনায়। কিমাশ্চর্যমতঃপরম্। যা শুনছি তা সবই বিশ্বাস হয় না; মনে হয়, অনেককিছু বাড়িয়ে বলা হচ্ছে। তবে হ্যাঁ, শ্যামু কিছু একটা কাণ্ড করার চেষ্টা করছে নিশ্চয়। কোন বড় রকমের দাঁও মারার মতলবে আছে।

সুরেনদা চরণডাক্তার ও কুঞ্জবাবু ব্যাপার দেখে সবচেয়ে বেশি চটে গেছেন। মানুষের বিশ্বাসেরও তো একটা রীতি-নীতি আছে। যেকোন একটা উজবুক জটা-চিমটে নিয়ে জুটো ধর্মের বুলি ছাড়বে, আর সঙ্গে সঙ্গে তাকে অবতার বানিয়ে ফেলতে হবে, এতটা মতিভ্রম শিক্ষিত লোকেরও কি করে হয়? শ্যামু যতই ঘুঘু লোক হোক, অন্তত গুরু-অবতার সাজবার মত মার্জিত ধূর্তামিও যে ওর নেই।

সবাই বললেন—শ্যামুকে একবার শাসিয়ে দিলে হয়। এই ভড়ং ছাড়ুক, নইলে সব পুরনো কুকীর্তি সাক্ষী-প্রমাণ দিয়ে ধরিয়ে দেব। আশ্রম-বাজি বেরিয়ে যাবে।

বললাম—যদি গ্রাহ্য না করে?

চরণডাক্তার—চেলাচেলীগুলিকে সব কথা বলে ঘাবড়ে দেব। তা'হলেই শ্যামুর চাক ভেঙ্গে যাবে।

গুড ফ্রাইডের ছুটির একটি দিনে মোটর বাসে চারটি ঘণ্টা সফরের পর ট্রাঙ্ক

রোডের একটা বাঁকে এসে থামলাম। বাবাজী হৃদ্‌ঘনশ্যামের আশ্রম দেখা যায়, বাগান, পুকুর ও মন্দির। পাশে একটা শালবন তপোবনের মত চেহারা। শীর্ণ একটা নদী আশ্রম-উদ্যানের প্রান্ত ছুঁয়ে চলে গেছে। পরেশনাথ পাহাড়ের ঘন-নীল ছায়ায় আকাশের ছবিটা আরও স্নিগ্ধ।

আশ্রমে ঢুকেই প্রথমে মন্দিরের দিকে চললাম। শ্যামু বড় শিবভক্ত ছিল জানতাম। হয়তো শিবমূর্তি বসিয়েছে।

মন্দিরের ভেতর উঁকি দিয়ে আমরা চারজনেই চারটি পাথরের থামের মত স্থির হয়ে গেলাম। এমন ভয়াবহ, এমন অপার্থিব, এমন প্রচণ্ড বিস্ময়কর দৃশ্য কখনো কল্পনায় অনুভবে ও অভিজ্ঞতায় জীবনে আমরা দেখিনি।

শ্যামু বসে আছে। মন্দির ঘরে কোনো ঠাকুর-দেবতার মূর্তি বা ছবি নেই। একটা শিলাবেদীর ওপর বাঘের ছাল পেতে স্বয়ং শ্যামু জীবন্ত বিগ্রহের মত সমা-সীন—বাবাজী হৃদঘনশ্যাম।

এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক গরদের ধুতি ও চাদর পরে, একটা ঝালর লাগানো প্রকাণ্ড পাখা নিয়ে বাবাজীর পেছনে গিয়ে দাঁড়ালেন ও ব্যজন করতে লাগলেন।

একদল মহিলা মন্দির ঘরে ঢুকলেন। আমাদের একটু সরে দাঁড়াতে হলো। আমাদের হতভম্বতা যেন একটু একটু করে কেটে যেতে লাগলো।

শ্যামুর চেহারাটা একবার উঁকি দিয়ে দেখলাম। শুঁয়োপোকা ঠিক প্রজাপতি হয়নি, অজগর হয়েছে। বপুটি যেমন নধর তেমনি বিরাট; অতি মূল্যবান ও মসৃণ রেশমের গৈরিক বেশ। মেদচিক্কণ অবয়বে একটা অসাধারণ সুখ-সন্তোষ এ সাফল্যের দীপ্তি। সুরেনদা হাত দুটি কপালে ঠেকিয়ে প্রায় প্রণাম করে ফেলে-ছিলেন। একটা চাপড় দিয়ে জোড়-করা হাত দুটো ছাড়িয়ে দিলাম, কিন্তু সুরেনদার চোখ দেখে বুঝলাম যে, তাঁর সম্বিৎ তখনো তেমনি ভোঁ মেরে আছে।

বাবাজী তখন পর্যন্ত চোখ বুঁজেই ছিলেন। আর কতক্ষণ থাকবেন বুঝলাম না। ধৈর্য আর ধরে রাখি কতক্ষণ? বুঝলাম, যার সঙ্গে লড়তে হবে, সে আর শ্যামু নয়; সে সত্যই হৃদ্‌ঘনশ্যাম। আশ্রমে ঢুকবার আগে পর্যন্ত যে বেপরোয়া সাহস মনের মধ্যে শানিয়ে রেখেছিলাম, প্রথম দেখার আঘাতেই যেন তার খানিকটা ধার কমে গেল। কিন্তু এই তো সূচনা। বাবাজী একবার চোখ খুলে আমাদের দেখুক। তারপর দেখি, কোন্ দিকে ঝড়ের গতি চলে।

বাবাজী চোখ খুললেন না। শুধু হাসতে লাগলেন। অদ্ভুত রহস্যময় অথচ তীক্ষ্ণ সেই হাসি। গরদ-পরা ভদ্রলোক জোরে জোরে বাতাস করতে লাগলেন।

বাবাজীর গলা থেকে শান্ত আবেগভরা কয়েকটি কথা বেজে উঠলো—এত-দিনে তারা এল। আসতেই হবে। একে একে সবাইকে আসতে হবে।

মন্দিরের সমাগত সকল পুরুষ ও মহিলা কৌতূহলভরা দৃষ্টি নিয়ে আমাদের দেখতে লাগলেন। একজন ভদ্রলোক এসে সবিনয়ে বললেন—ভেতরে এসে বসুন।

ভেতরে গিয়ে বসলাম। বাবাজী আবার স্থির হয়ে গেলেন। বোধহয় নিঃশ্বাস

পড়ছে না। ঠোঁট দুটো সেতারের তারের মত কাঁপছে। আর সেই, সঙ্গে বহু-দূরের কোন শালবনে চাকভাঙা মৌমাছির গুঞ্জরণের মত একটা শব্দ।

সমাগত নরনারী একসঙ্গে প্রণাম করে উঠে পড়লো। প্রণবের ক্লাস শেষ হলো। প্রত্যহ সকালবেলা একবার করে হয়।

বাবাজী যখন চোখ মেললেন, তখন ঘরে আমরা চারটি অবিশ্বাসী অভাজন ছাড়া মাত্র গরদপরা ভদ্রলোক আছেন। এঁর নাম পরমবাবু; তাঁর ইহলৌকিক যথাসর্বস্ব এই আশ্রমকে দান করে দিয়েছেন। বলতে গেলে, ইনিই বাবাজীর প্রধান শিষ্য। আশ্রমের এক্সিকিউটিভ ইনিই।

বারকোশে সাজানো নানারকম মিষ্টি ও নোনতা খাবার, চা এবং সরবৎ পৌঁছে গেল।

বাবাজী বললেন—আজ তোমাদের সেবা করবার সুযোগ পাব, একথা আমি আগেই জানতাম। তাই কাল রাত্রি থেকেই তৈরী হয়ে আছি। হ্যাঁ, তারপর আছ কেমন সুরেনবাবু?

সুরেনবাবু আমতা-আমতা করে উত্তর দিলেন—তা আপনি সেবাটেবার কথা ওসব কি বলছেন? আপনি সেবা করবেন, না আপনাকেই ··

সুরেনদার দিকে তাকিয়ে শুধু একবার চোখের ইঙ্গিতে ভর্ৎসনা করলাম। সুরেনদা অনিচ্ছাসত্ত্বেও সামলে গেলেন।

পরমবাবু একবার বাইরে গেলেন। সুযোগ পেয়ে এইবার জিজ্ঞাসা করলাম—এসব কি কাণ্ড শ্যামু?

বাবাজী হো হো করে হেসে উঠলেন।

বললাম—হাসলে কথার উত্তর দেওয়া যায় না। তোমাকে বলতে হবে, কেন এসব করছো। আমাদের কাছে বাজে কথা বলে নিষ্কৃতি পাবে না।

বাবাজী হাসতে লাগলেন। হাসির প্রতিধ্বনিতে মন্দিরঘরের বাতাস গমগম করতে লাগলো। শুধু হেসে চলেছেন। হঠাৎ দৃশ্য পরিবর্তন। বাবাজী একেবারে স্তব্ধ। শান্ত গম্ভীর মুখ, দু'চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল গড়িয়ে পড়লো। বাবাজী দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আবার সহজ হয়ে গেলেন।

আবার বলতে যাচ্ছিলাম, কুঞ্জবাবু কনুয়ের ঠেলা দিয়ে আপত্তি করলেন। কী করবো ভাবছি, বাবাজী বলে উঠলেন—নিতুবাবু, তোমরা এবার একটু কষ্ট কর। ওরা সবাই অপেক্ষা করছে। কেষ্টকথাটা সেরে ফেলি তারপর গল্পগুজব করা যাবে। তোমরাও এস সবাই।

বাবাজী গাত্রোত্থান করলেন।

কেষ্টকথা শোনবার অধিকারী সবাই হতে পারে না। বাবাজী যাদের মনোনীত করেন, শুধু তারাই শোনে। আশ্রমের উত্তর দিকে একটা লতামণ্ডপের পাশে অল্প প্রশস্ত একটি ঘর। দুটি প্রৌঢ়া, একটি তরুণী এবং জনদশেক বৃদ্ধ প্রৌঢ় ও যুবক আগে থেকেই সেই ঘরে বসেছিল। আজকের দিনের মত এরা ছাড়পত্র

পেয়েছে।

বাবাজী ও প্রধান শিষ্য পরমবাবুর সঙ্গে আমরা চারজনও এসে ঘরে ঢুকলাম। ঘরের দেয়ালে একটি বহু পুরাতন ছেঁড়া ময়লা ক্যালেণ্ডার টাঙানো। ক্যালেণ্ডারের ছবিটি হলো মুরলীধারী কৃষ্ণ, স্থানে স্থানে আবীর ও চন্দনের ছিটে লেগে আরও বিচিত্র হয়ে রয়েছে।

বাবাজী ধ্যানে বসলেন। সমবেত সকলেই চোখ বুঁজে ফেললো। সুরেনদা তো প্রায় সমাধিলাভ করে ফেলেছেন বলে মনে হলো। দেখলাম কুঞ্জবাবু মিটমিট করে একবার আমার দিকে তাকিয়ে শেষে চোখ বুঁজে ফেললেন। এই ঘরভরা আধ্যাত্মিক সুষুপ্তির মধ্যে শুধু আমারই চোখ দুটো আশঙ্কায় জেগে রইল।

শুনলাম, বাবাজী আস্তে আস্তে অস্পষ্টস্বরে একটা ভজন গাইছেন। এ ভজন কোনো কবির রচনা নয়। এই ধ্যানের আবেশে বাবাজী যা দেখছেন, সেই সব ঘটনা আপনা থেকেই সুর বেঁধে আর গান হয়ে তাঁর গলা থেকে বের হয়ে আসে।

হঠাৎ বাবাজী চীৎকার করে কীর্তনের সুরে গেয়ে উঠলেন—গোঠে গোকুলে বেণু বাজে! বাবাজী আকুল হয়ে মাথা দোলাতে লাগলেন। এক একবার হাত দিয়ে কান দুটো ঢেকে রাখছেন, যেন সেই বংশীধ্বনি তাঁর মরমে প্রবেশ করে মনপ্রাণ খাবলাচ্ছে।

আবার চুপ। বাবাজী নিষ্কম্প দীপশিখার মত সুস্থিরভাবে যেন জ্বলজ্বল করতে লাগলেন। প্রায় অর্ধ ঘণ্টা এভাবে কেটে গেল। হঠাৎ একটা দমকা বাতাস ঘরের ভেতর এসে ছুটোপুটি করতে থাকে। খরখর্ করে নড়ে উঠলো দেয়ালের ক্যালেণ্ডার।

—শুনে নে, যে আছিস শুনে নে। বাবাজী রোগীর মত ছটফট করে চেঁচাতে লাগলেন। তারপর দেয়ালের গায়ে একেবারে এলিয়ে পড়ে চুপ করে গেলেন। শুধু ঠোঁট দুটো কেঁপে বিড়বিড় করতে লাগলো।

সোহং! সোহং সোহং! সকলেই শুনছে, ক্যালেণ্ডারের কৃষ্ণ কথা বলছে। দেখতে পাচ্ছি, চরণডাক্তারের হাতের রোঁয়াগুলি শিউরে খাড়া হয়ে গেছে। এক জন বৃদ্ধ মূর্ছা গেলেন। বাকী সবাই মাথা ঝুঁকিয়ে কাঁপতে লাগলো।

একটি মিনিট মাত্র। বাবাজীর কাশির শব্দের সঙ্কেত বুঝিয়ে দিল, সমাপ্ত।

মধ্যাহ্নভোজনের পর আশ্রমের অতিথিশালার একটি ঘরে বসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করলাম। আছি মাত্র তিনজন। সুরেনদা সরে পড়েছেন দল ছেড়ে। তিনি বাবাজীর আশে পাশে ঘুরঘুর করছেন। মরমে মরে গিয়ে বুঝলাম, হারাধনের একটি ছেলে এই যে হারালো, আর ফিরছে না। বাবাজীর একটি শিষ্য সংখ্যা বাড়লো।

এইবার সত্যি ভয় পেয়ে গেলাম। শেষে কি একে একে নিভিবে দেউটি?

যারা ভড়কাতে এল তারাই ভিড়ে গেল। সুরেনদার বিশ্বাসঘাতকতায় বাবাজী যেন আমাদের সমস্ত ষড়যন্ত্রের ওপর তুরুপ মেরে গেলেন। পরাজয়ের অপমানটা ভাল করেই গায়ে বিঁধলো।

বললাম—কুঞ্জবাবু! শ্যামুকে তো একলা পাওয়া যাচ্ছে না। এবার একটু উদ্যম নিয়ে লাগুন, বাগিয়ে ধরা যাক। শুধু ওর মতলব আর এই দশ বছরের হিস্ট্রি জেনে নেব। তারপর এস-ডি-ও সাহেবের কাছে একটা দরখাস্ত করে, সব ব্যাপার ফাঁস করে, আশ্রমটা ভেঙে ফেলবার ··

কুঞ্জবাবু অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। চরণডাক্তার বললেন—একটু ভেবে-চিন্তে যা হয় করা যাবে। ব্যস্ত হবার দরকার নেই।

পরমবাবু খবর নিয়ে এলেন—বাবাজী বেড়াতে যাচ্ছেন শালবনে। আপনা-দের ডাকছেন।

ভাবলাম, এই আর একটা সুযোগ। শালবনের কোন এক নিভৃতে শ্যামুকে বাগিয়ে ধরতে হবে। কিন্তু বেড়াতে বার হয়েই খানিকটা দমে গেলাম। বাবাজীর সঙ্গে আরও দশ-বারোজন অন্তরঙ্গ চলেছেন। সুরেনদা বাবাজীর গা ঘেঁষে চলেছেন!

আমরা তিনজন পিছনে ছিলাম। বাবাজী দু'বার ডাক দিলেন—ওগো নিতু বাবু, পেছিয়ে কেন? আমার সঙ্গে এস।

কুঞ্জবাবু প্রায় দৌড়ে এগিয়ে গিয়ে বাবাজীর পাশে পাশে চলতে লাগলেন। রাগ হলো, উপায় নেই। আছি শুধু সুযোগের অপেক্ষায়।শুধু শ্যামুকে নয়, সুরেন-দাকেও ন্যাজেগোবরে নাজেহাল করে ছাড়বো। আর কুঞ্জবাবুর ব্যবহারটাও···

চলেছি। আগে আগে বাবাজী হৃদ্‌ঘনশ্যাম, ভক্ত শিষ্য ও অন্তরঙ্গের দল শনি-গ্রহের বলয়ের মত ঘিরে চলেছে। পিছনে মাত্র আমরা দু'টি অবিশ্বাসী ধূমকেতু যেন তাড়া করে চলেছি কিন্তু নাগাল পাচ্ছি না।

পাথুরে সড়কটা ধরে অনেকদূর এসেছি। এইবার রেললাইনটা পার হয়ে মাঠে নামবো, তারপর শালবন। শ্যামু গল্প আলাপ ও হাসিখুশিতে নিজে মাতো-য়ারা হয়ে এবং প্রায় পনেরটি ভক্তহৃদয়ের ফানুস উড়িয়ে তেমনি হন্‌হন্ করে চলেছে।

হঠাৎ সকলে এক সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলো—বাবাজী থামুন, থামুন। লাইস ক্রস করবেন না।

নাইন আপ ধোঁয়া ছড়িয়ে হু-হু করে দৌড়ে আসছে। বাবাজী একটু হক-চকিয়ে তারপর চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন। ট্রেনটা কি জানি কিসের জন্য ক্রমেই মন্থর হয়ে, একটু দূরে এসে থেমে গেল।

পরমবাবু বললেন—এবার এগিয়ে চলুন বাবাজী। ট্রেন তো থেমে গেছে।

—হ্যাঁ, থেমে যেতেই হবে, চলো। বাবাজী হাসলেন। অতি গভীর ও সূক্ষ্ম তত্ত্বে ভরা সেই হাসি।

বাবাজী আবার এগিয়ে চললেন। দেখলাম কুঞ্জবাবু চট করে ঝুঁকে পড়ে বাবাজীর পা ছুঁয়ে প্রণাম করলেন। দৃশ্যটাকে বিশ্বাস করতে পারলাম না। বললাম—কি ব্যাপার চরণবাবু? কুঞ্জবাবু শ্যামুকে প্রণাম করলেন মনে হচ্ছে?

চরণডাক্তারেরও মনের ভেতর অবিশ্বাসী ইঞ্জিনটার গর্জন যেন থেমে এসেছে। বোধহয় দম ফুরিয়ে এসেছে। তাই কোন মতে হাঁসফাঁস করে উত্তর দিলেন—তা প্রণাম করতে দোষ কি, বোধহয় গায়ে পা ঠেকেছে।

বললাম—পা ঠেকলে প্রণাম করতে হবে শ্যামুকে?

চরণডাক্তার আর কোনো উত্তর দিলেন না। একসঙ্গে রাগ পরাজয় আর অপমান বোধে কিছুক্ষণের জন্য আমার সমস্ত অন্তরাত্মা মারমূর্তি হয়ে রইল। এদের সঙ্গটাও ঘৃণ্য মনে হতে লাগলো। বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে। নইলে কীই বা এমন ভেল্‌কি এঁরা দেখলেন যে বিস্ময়ে আকাট মেরে গেলেন। ছেলেবেলায় স্কুলে পড়া গোল্ডস্মিথের সেই লাইনটা বার বার মনের মধ্যে চাবুক মারছিল। শেষে শেষে তাই হতে চললো। দোজ হু কেম টু স্কফ্‌ রিমেনড্‌ টু প্রে!

মনের প্রতিবাদ চেপে রাখতে পারলাম না। আর বেড়াতে না গিয়ে, একাই আশ্রমে ফিরে এলাম। আজ রাত্রের মোটরবাসে টাউনে ফিরে যাব।

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। অতিথিশালার ঘরে আর কেউ নেই। বাইরে থেকে একটা সোরগোলের রব শোনা যাচ্ছে। মনে পড়লো, আমাকে যেতে হবে। সুরেনদা ও কুঞ্জবাবু আজ বোধহয় কেউ টাউনে ফিরছেন না। এক যদি চরণডাক্তার ফেরে। সে রকমও কোনো লক্ষণ দেখছি না। এতক্ষণে শালবন থেকে চরে ফিরেছেন নিশ্চয়। যাবার আগে দু'কথা মুখের ওপর শুনিয়ে দিয়ে যাব। শ্যামুকে নয়, আমারই সতীর্থ শিক্ষিত বন্ধু দুটিকে।

পরমবাবু একটা আলো হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন—একি আপনি এখনো বসে রয়েছেন! ওদিকে যে ··চলুন চলুন। জীবনে এ দৃশ্য দেখবার সুযোগ পাবেন না। যিনি মুক্ত, যিনি ভগবান পেয়েছেন, যিনি ত্রিকালজ্ঞ, তাঁর ইচ্ছাশক্তি, আহা! সে ইচ্ছাশক্তিকে ঠেকায় কে?

চমকে উঠলাম। কিছু ভয়ানক একটা ঘটেছে। বোধহয় আকাশ থেকে ফুল-টুল পড়ছে; কিম্বা মাটি ফুঁড়ে সরবৎ।

—কী ব্যাপার পরমবাবু?

—কুকুরভোজন।

—সে কি?

—হ্যাঁ, বাবাজীর আদেশ নির্দেশ ও ইচ্ছা। তাঁর কাছে জীব শিব একই। বাগানে পাত সাজানো হয়েছে, দস্তুরমত আসন করে। খিচুড়ি ও মাংস রান্না হয়েছে। পাতা সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে।

—কুকুররা এসেছে খেতে?

—আসবে আসবে। সেই জন্যই তো বলছি, উঠুন। এ দৃশ্য দেখে নিন।

বাজারে গিয়ে ময়রার দোকানের কুকুরদের যথাবিহিত সৌজন্যের সঙ্গে নেমতন্ন করে আসা হয়েছে।

উঠলাম। চরণডাক্তার বোধহয় অনেক আগেই গিয়ে জুটেছেন। এ দৃশ্য দেখবো, ধন্য হব, তারপর হয়তো আত্মহত্যাও করে ফেলবো। পরমবাবুর সঙ্গে নেমন্তন্নের আসরের দিকে চললাম। যাবার পথে দেখলাম বাবাজী মন্দিরঘরে একা ধ্যানস্থ হয়ে আছেন। তিনি এখন এভাবেই থাকবেন। কুকুরভোজন সমাধার পর নিজে অন্ন গ্রহণ করবেন। তার আগে নয়।

যেতে যেতে পরমবাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম—কুকুরদের নেমন্তন্ন করতে কে কে গিয়েছিল ?

পরমবাবু—আমি ছিলাম, আপনার বন্ধু সুরেনবাবু ছিলেন আরও দু'তিন-জন।

—গিয়ে কি বললেন ?

—বললাম, আজ সন্ধ্যায় বাবাজীর আশ্রমে আপনারা দুটি অন্নগ্রহণ করে সবাইকে কৃতার্থ করবেন।

—একথা বললেন ? কুকুরগুলো কিছু বুঝলো ?

পরমবাবু খুব পরিশ্রম করে বোঝাতে লাগলেন—না বললে রক্ষে ছিল। বাবাজী আমাদের আস্ত রাখতেন ! কুকুর হয়েছে তো কি হয়েছে ? আপনি বিষয়ী মানুষের দৃষ্টি দিয়ে এসব বিষয় বিচার করবেন না !

নেমন্তন্নের আসরের দিকে যাচ্ছি। দেখলাম, বাগানের কয়েকটা গাছে বড বড বাতি ঝুলিয়ে দিয়ে জায়গাটা আলোকিত করা হয়েছে। সারি সারি আসন পাতা। সামনে কলাপাতায় খিচুড়ি ও মাংস। মাংস ও খিচুড়ির সুগন্ধে বাগান থমথম করছে।

চারদিকে রব উঠলো—এসেছে, এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে আশ্রমের নানাদিক থেকে, নানা ঘর ও কক্ষ থেকে উৎসুক দর্শক ও দর্শকা ছুটে আসতে লাগলো। বুঝলাম, নিমন্ত্রিত কুকুরেরা এসে গেছে। পরমবাবু দৌডালেন। আমি দৌড়তে আর পারলাম না। একটু তাডাতাডি হেঁটে এসে দর্শকদের ভিডের মধ্যে ঢুকে গলা উঁচিয়ে রইলাম।

দেখলাম দৃশ্য। কিন্তু কোথায় কুকুর। সব আসনগুলি খালি। শুধু একটা রোগাটে চেহারার সাদারঙের দীনহীন কুকুর আসন থেকে একটু দূরে ভয়ার্ত ও সন্দিগ্ধ চোখে তাকাচ্ছে।

এক ভদ্রলোক ভাবে গদগদ হয়ে বললেন—ঐ যে এসেছে। আসতেই হবে ! একে একে সবাইকে আসতে হবে।

আবার শুনলাম ফিসফিস করে কে একজন বলছে—কই পরমদা, কালো-গুলোকে এত করে বলা হলো, একটাও এল না কেন ?

ভাবুক ভদ্রলোক আবার যেন ভাবের ঘোরে ঢেঁকুর তুললেন ঘডঘড করে—

আসতেই হবে। একে একে সবাইকে আসতে হবে।

রাত্রি নটা বেজে গেছে। আর আধঘণ্টা পরে মোটরবাস আসবে। ট্রাঙ্ক রোডের ওপর গিয়ে অপেক্ষা করতে হবে। স্যুটকেশটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম।

বিদায় দেবার সময় সুরেনদা কুঞ্জবাবু ও চরণডাক্তার এসে দাঁড়ালেন। কিন্তু কোনো কথা তাঁরা বলতে পারলেন না। চরণডাক্তারের হাবভাব দেখে বুঝে ফেললাম, তিনিও ভাল করে টোপ গিলেছেন। বাবাজীর অলৌকিক মহিমা বঁড়শির মত মনের নাড়ীতে গিয়ে বিঁধেছে। শুধু পরমবাবু অনুরোধ করলেন বারবার—আজ রাত্রিটা আপনিও থেকে গেলে পারতেন।

—না। বেশ রূঢ়ভাবে বললাম।

তবু শুধু পরমবাবু বিদায় দিতে ফটক পর্যন্ত এগিয়ে এলেন। সড়কে পা বাড়িয়ে দিলাম। পরমবাবুকে নিছক ভদ্রতার খাতিরে একটা নমস্কারও জানালাম না। ইচ্ছে করেই করলাম না।

পরমবাবু কিন্তু হাত তুলে নমস্কার করলেন—আচ্ছা, আসছে পূর্ণিমায় অবশ্য আসবেন নিতুবাবু। বাবাজীর ইচ্ছেয় আর একটা উৎসব আছে। বাঘভোজন হবে।

গ্লা নি হ র

হিরোতা মারু পোতাশ্রয় ছেড়ে অনেক দূর এগিয়ে এসে এবার ডাইনে মোড় নিল। ধীরে মিলিয়ে গেল অ্যাপোলো বন্দরের অভ্রলেহী টাওয়ার আর ঠাসাঠাসি নোঙর করা কার্গোবোটের মাস্তুলের ভীড়। নিস্তরঙ্গ আরব সমুদ্রের বুক চিরে হিরোতা মারু চলল ক্ষুব্ধ সিন্ধুঘোটকের মত সাঁতার দিয়ে; তার সধূম প্রশ্বাসবায়ু মেঘের মত উড়ে গিয়ে এলিফান্টা পাহাড়ের ছোট চুড়োটাকে ঘিরে ধরল। বোম্বাইয়ের মাথার ওপর তার ঘনমসী কালো ধোঁয়ার সুগোল মারাঠী টুপিটা শুধু সুস্থির হয়ে লেগে রইল উত্তরের আকাশে।

ঠিক এমনি সময়ে হাঁ করে এই আকাশভুবনের খেলা দেখাটা যে কত মূঢ়তা, তা টের পেলাম ডেকের উপর দৃষ্টি পড়তে। শোণপুরের মেলার একটা ভগ্নাংশ যেন, এত ভীড়। এরি মধ্যে বিছানা বিছিয়ে যে যার জায়গা কায়েমী করে নিয়েছে। বাক্স তোরঙ্গ বদনা ছড়িয়ে চৌহদ্দি রেখেছে পাকা করে স্থান নেই। কিন্তু স্থান চাই, শুতে হবে। এডেন পৌঁছতে পুরো ছটি দিন; ঠায় দাঁড়িয়ে তো আর যাওয়া যায় না।

কাথিয়াবাড়ী বেনেরা তাদের ছেঁড়া জুতোগুলো পর্যন্ত দু' হাত অন্তর এলোপাথাড়ি করে সাজিয়ে রেখেছে; যতদূর পারে দখলের পরিধি ফলিয়ে রেখেছে। যেন মূর্তিমান স্বার্থ, ক্ষুরের শান দেওয়া সওদাগরী বুদ্ধি, শত অনুরোধেও কোন ফল হবে না।

জাঞ্জিবারী বোরারা চলেছে। লবঙ্গ বেচা টাকায় সব লাল লাল চেহারা, প্রত্যেকের দুটি করে বিছানা, একটি শোবার আর একটি নমাজ পড়বার। সামনে দাঁড়িয়ে মূর্ছা গেলেও এরা আধ হাত জায়গা ছেড়ে দেবে না।

আমারি মত নিরুপায় এক পালেস্তিনী ইহুদীসাহেব অগত্যা তার সুটকেশটার ওপরে বিছানা পেতে গুটিসুটি হয়ে শুয়ে পড়ল। কিন্তু আমি কি করি?

নজর পড়ল ডেকের শেষপ্রান্তে খাঁচার মত মুখোমুখি দুটো বেশ সুপরিসর কাঠের ঘর, ওপরে নোটিশ লেখা—ফর হর্সেস ওন্‌লি, শুধু ঘোড়ারা থাকিবে। এখন কিন্তু ঘোড়ারা নেই, ফিরতি পথে রেসের ঘোড়া যাবে। বাক্স বিছানা সমেত একটা খাঁচায় ঢুকে পড়লাম। দূরে দাঁড়িয়ে জাহাজের কোরিয়ান মেথরটা আমার গতিবিধি লক্ষ্য করছিল। এগিয়ে এসে আপত্তি করতেই একটা সিগারেট উপহার দিলাম। খুশি হয়ে চলে গেল।

দ্বিতীয় খাঁচাটার দিকে লক্ষ্য পড়তেই বিস্মিত হতে হল। সপরিবারে এক বাঙালী ভদ্রলোক সেখানে আশ্রয় নিয়েছেন। ভদ্রলোক, তাঁর স্ত্রী আর দুটি ছোট ছোট ছেলে। একটি বছর পাঁচেক আর একটি দুগ্ধপোষ্য, মাত্র হামা দেবার বয়সে পৌঁছেছে। খুশি হলাম দেখে। বাঙালী সহযাত্রী, তবে তো মনের সুখে বাংলা বলা যাবে—দিন যাবে ভাল। তা ছাড়া একজোড়া বাঙালী খোকা, জাহাজী জীবনে ক্বচিৎ এমন ষোল আনা স্বদেশী সঙ্গ পাওয়া যায়।

কিন্তু বড় নিরাশ হতে হল। অবাক হলাম ভদ্রলোকের সৌজন্যবোধের অভাব দেখে। এঁদের দিকে এগিয়ে যেতেই ভদ্রলোক চকিতে একবার আমাকে দেখে নিয়ে মুখ ঘুরিয়ে পাশ ফিরে শুয়ে রইলেন। ভদ্রমহিলা ঘোমটা টেনে কাঠের সিন্দুকটার আড়ালে গিয়ে বসলেন। সাগ্রহ আলাপনের উৎসাহটা উদ্যোগেই ক্ষান্ত হয়ে গেল। নিজের খাঁচায় ফিরে এলাম ক্ষুণ্ণ হয়ে।

শুয়ে শুয়ে দেখছি, মহিলাটি ষ্টোভ জ্বেলে খিচুড়ী রাঁধলেন। ভদ্রলোক আর বড় ছেলেটা খেয়ে নিল। শিশি থেকে গুঁড়ো দুধ বার করে নিয়ে জ্বাল দিলেন, ছোট ছেলেটাকে খাওয়ান হল। ভদ্রলোক সিগারেট মুখে দিয়ে শুয়ে শুয়ে বই পড়তে লাগলেন। মহিলাটিও খাওয়া দাওয়া সেরে নিয়ে তোরঙ্গ থেকে কাঁথা বার করে সেলাইয়ের কাজে মন দিলেন।

বিকেলের দিকে জাহাজের দোলা বেড়ে ওঠায় ঘুম ভেঙে গেল। চোখ বুঁজে শুনছি, মাথার কাছে কুরকুর একটা শব্দ। চেয়ে দেখি বড় ছেলেটা আমারি মাথার কাছে বিছানার কোণে বসে একবাটি গরম কফি নিয়ে খাচ্ছে আর মাঝে-মাঝে সশব্দে মিছরি চিবোচ্ছে। ছোট ছেলেটাও মেঝের উপর বসে সিগারেটের একটা খালি খোল নিয়ে দুহাত দিয়ে কুটিকুটি করে ছিঁড়ছে। বড় ছেলেটাকে প্রশ্ন করলাম—কি খোকা, নাম কি তোমার?

—পটল।

—ও তোমার কে হয়?

—আমার ভাই পল্টু।

—আর ওঁরা কারা? বাবা আর মা?

—হ্যাঁ।

—কোথায় যাচ্ছ তোমরা?

—আমরা যাচ্ছি কেপ।

—তোমার বাবা বুঝি সেখানে চাকরী করেন?

—হ্যাঁ।

প্রত্যেকটি প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিল পটল। এবার তার পালা। প্রশ্ন করল—তুমি কে?

—আমিও চাকরী করি। যাচ্ছি এডেন।

—তোমাকে কে রান্না করে দেয়?

—আমি হোটেল থেকে খাবার কিনে খাই।

—তবে তোমাকে হাওয়া করে কে? যখন কাশি হয়?

পটলের প্রশ্নে কৌতুক আর কৌতূহল জাগিয়ে তুলল। জিজ্ঞাসা করলাম—তোমার বাবার বুঝি খুব কাশি হয়?

—হ্যাঁ, হাঁপানি কাশি। কাউকে বলবেন না কিন্তু।

—কেন বল ত?···পটলের কথাবার্ত্তা ধাঁধার মত ঠেকছে।

—জাহাজের ডাক্তার আমাদের নামিয়ে দেবে তা হলে···পটল উত্তর দিল।

এইবার বুঝলাম। ছেলেটির বুদ্ধিশুদ্ধি বেশ পরিষ্কার। দেখলাম আলাপের সঙ্গী হিসেবে পটল নেহাৎ নগণ্য নয়। এ বিষয়ে বাপের চেয়েও বেশি শালীনতার পরিচয় দিয়েছে সে।

প্রশ্ন করলাম—তোমার বাবার নাম কি?

—বিকাশচন্দ্র গাঙ্গুলী।

—তোমাদের বাড়ী কোথায় পটলবাবু?

—কিম্বার্লি।

—আর মামাবাড়ী?

পটল খানিকক্ষণ ভেবে নিয়ে বলল—ইণ্ডিয়া। আমার প্রশ্ন-প্রবাহে বাধা পড়ল। এ সব আবার কি বলে! বাড়ী কিম্বার্লি, মামাবাড়ী ইণ্ডিয়া? মনে মনে বিচার করে দেখলাম, তাই হবে বোধহয়। বেচারা গাঙ্গুলী হয়ত বহুদিন দেশ ছাড়া। পেটের দায়ে পড়েছে গিয়ে সুদূর কিম্বার্লি।

এবার নজর পড়ল ছোটটার ওপর। ডাকলাম—পল্টু। ছেলেটা দ্রুত হামা দিয়ে চলে এল। পটল চেঁচিয়ে উঠল—বিছানায় বসাবেন না, ভিজিয়ে দেবে। এই বলে পল্টুকে সবলে দুহাত দিয়ে ধরে বুকের ওপর ঝুলিয়ে নিয়ে বেতালা পা ফেলে চলে গেল।

পটলের মা যে আধুনিকা নন তা বুঝতে দেরী হয় না। মাথার ঐ

ঘোমটাটিই তার প্রমাণ। তবে তিনি সাহসিকা নিশ্চয়। দুটি শিশুসন্তান নিয়ে স্বামীর সঙ্গে দূর কিম্বার্লিতে গিয়ে সুখে ঘর করছেন। বাংলাদেশের ছায়া সুনিবিড় পল্লীর এক টুকরো সংসার কৃষ্ণ মহাদেশের কোলে এক মরু উপত্যকাতে গিয়ে ছিটকে পড়েছে।

খাওয়া শোয়ার সময়টুকু ছাড়া পটল আর পল্টু সব সময় আমারই আশে পাশে ঘুরঘুর করে বেড়ায়। পল্টু এক একবার ক্লান্ত হয়ে মেঝের ওপর ঘুমিয়ে পড়ে, বিছানায় তুলে নিই। পটল তার মায়ের ইসারা পেয়ে কখনও কখনও চলে যায়, ডেকের দোকান থেকে সোডা দেশলাই সিগারেট কিনে আনে। দুপুরে যখন মহিলাটি গাঙ্গুলীমশায়ের সঙ্গে স্নানাগারের দিকে যান, পটল তখন বসে বসে জিনিসপত্র পাহারা দেয়, পল্টুর ওপর চোখ রাখে।

দিন কাটছিল। আর কটাই বা দিন? গাঙ্গুলীর অসামাজিকতায় ক্ষুন্ন হয়েছিলাম সত্যি, কিন্তু পটল আর পল্টু সেটা ভালভাবেই মিটিয়ে দিচ্ছে। দিন-রাত সমুদ্রের একটানা কলোচ্ছ্বাস, কান ও মন দুই বধির হয়ে যায়। পল্টু ও পটল আচমকা এসে মিঠে কলরব জাগিয়ে তোলে। একটু স্বজনতা পাই, তাতেই মন ভরে ওঠে!

পটল ছেলেটা বড় কাজের। খিচুড়ী রান্না করা থেকে বিছানা করা পর্যন্ত প্রত্যেকটি কাজে সে তার মাকে সাহায্য করে। ভাবছি, এত বুদ্ধিমান ছেলেটা, লেখাপড়া শিখছে তো? নইলে হয়তো কপালে কুলিগিরি আছে। যে সাংঘাতিক দেশে থাকে! পটল এসে ডাকল—মিষ্টার, কি করছ?

জিজ্ঞাসা করলাম—পটলবাবু, তুমি লেখাপড়া কর না?

—হ্যাঁ, আমি আর মা পড়ি!

—কে পড়ায়?

—বাবা। পল্টুও পড়বে আর একটু বড় হলে।

চুপ করে এদের কথা ভাবছি। গাঙ্গুলীর সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ের সৌভাগ্য হয় নি। পটলের সঙ্গে এমনি ধরনের খণ্ড খণ্ড আলাপের ভেতর দিয়ে ওদের পরিচয় ক্রমশ প্রত্যক্ষ হয়ে উঠছে।

পটল বলল—জান মিষ্টার, আমি বিলাত যাব পড়তে। বাবা বলেছে। বললাম—তাই নাকি? বেশ বেশ, নিশ্চয়ই যেও, পটলবাবু।

পটল আবার বলল—আমার বিয়ে হবে মেমের সঙ্গে, মা বলেছে। লজ্জিত হয়ে পটল বালিশে মুখ গুঁজে রইল।

আদর করে পটলের মাথাটা ঝেঁকে দিয়ে বললাম—বিয়ের সময় আমাকে নেমন্তন্ন করতে ভুলো না যেন। পটল একটু সিরিয়াস হয়ে সাগ্রহে বলল—তবে তোমার নাম লিখে দিয়ে যাও। চিঠি দেব।

নাম লিখে দিতে হল।

দেখছি। স্থিরদৃষ্টি নিয়ে দেখছি ঐ মহিলাটিকে। মহিলা? মিসেস গাঙ্গুলী?

পটলের মা ?

চোখ দুটোকে লোহার শিক দিয়ে যেন নির্মমভাবে খুঁচিয়ে দিল। এ তো মহিলা-টহিলা নয় ! এ যে আমাদের ভৈরবমালীর মেয়ে, মালতী।

এই মালতী, যে জেঠামশায়ের বাড়ীর ঝি ছিল। কথাবার্তা নেই হঠাৎ জেঠিমার গয়না চুরি করে পালাল শিশির বেয়ারার সঙ্গে। ধরা পড়ে জেলে গেল। ফিরে এসে ঘর নিল কাশীর এক কুখ্যাত পাড়ায়। তার প্রণয়ের সেই শিশির বেয়ারা তারই হাতে খুন হল একদিন। তারপর থেকে সে ফেরার। পুলিশ এতদিন খোঁজাখুঁজি করেও হদিস পায়নি।···সব জানি। আমি ওর সাক্ষাৎ চিত্রগুপ্ত। ওর পাপ-জীবনের সব ঘটনার ফর্দ আমার প্রায় মুখস্থ আছে।

এখন বুঝেছি ঐ আধহাত ঘোমটার অর্থ। ছি, ছি, এতদিন মনে মনে এত স্তুতি করে এসেছি, ঘটনার মধ্যে এরকম সাংঘাতিক একটা ঠাট্টা লুকিয়েছিল প্রহেলিকার মত !

গয়নার শোকে জেঠিমার বুকফাটা চীৎকার যেন শুনতে পাচ্ছি। ডাকব পুলিশ। আমি শুধু ওর চিত্রগুপ্ত নই, আমি এবার ওর যম।

···সোজা জিজ্ঞেস করব—ভাল চাস তো মাগি জেঠিমার গয়নাগুলো ফিরিয়ে দে। তাহলে ছেড়ে দেব, নইলে রেহাই নেই।

···আরো জানবার আছে। সুস্পষ্ট উত্তর চাই—শিশিরকে খুন করলি কেন ? গাঙ্গুলীর সঙ্গে কতদিন আছিস ?

···না হয় একবার সামনে আসুক ! ক্ষমা চা'ক, অকপটভাবে স্বীকার করুক অপরাধ। তারপর বিচার করা যাবে, ছেড়ে দেওয়া যায় কিনা।

···কানটা ধরে একবার জিজ্ঞাসা করলে হয়—এখনো পিরিতের ব্যবসা ছাড়তে পারলি না ? গাঙ্গুলীর কাঁচা মাথাটা না খেলে চলছিল না ?

অনেক কিছুই বলবার ছিল কিন্তু আজ আর বলা হল না। একটা অজ্ঞাত সঙ্কোচে মনের সমস্ত উদ্ধত বাচালতা স্তব্ধ হয়ে গেল।

কিন্তু বলতেই হবে।

কিংকর্তব্য গুলিয়ে গেল। একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে দেখলাম, পণ্টু তার অর্ধভুক্ত বিস্কুটের গুঁড়ো ছড়িয়ে আর বসে বসে আমার বিছানাটাকে নোংরা করছে। টেনে নামিয়ে দিলাম—যা এখান থেকে এক্ষুনি চলে যা।

পটল আমার বিছানার কাছে বসে ছবির বই দেখছিল। বললাম—এই ছোঁড়া, ভাগ হিঁয়াসে। আর আসিস না।

পটল আর পণ্টু চলে গেল।

···গাঙ্গুলীকে ডেকে একবার সাবধান করে দেব। ওর ভবিষ্যৎ ভাবতে গিয়ে শঙ্কিত হয়ে উঠছি। না হয় রক্ষিতাই রেখেছে, কিন্তু বোকাটা কি আর কাউকে পায়নি ? এমন একটা বিষকন্যাকে করেছে জীবনপথের সহচরী। ওর একটি ছোবলে যে গরল উগ্‌রে আসবে, তাতে কয়টি মুহূর্ত টিকে থাকবে বোকা ভদ্রলোকের এই

সংসারবিলাস ?

…শিশির বেয়ারা ঘটিত কহিনীটা শুনিয়ে দেব, তাতেও যদি মূর্খ লোকটার হুঁস হয়। কিন্তু সন্দেহ হচ্ছে, ওকে বলেও কোন সুফল হবে কি ? এই গাঙ্গুলীই হয়তো একটি রসাতলচারী নবরূপী সরীসৃপ। জেনে শুনেই কালনাগিনীর সঙ্গে এক বিবরে বাসা বেঁধেছে।

…নাঃ, কিছু একটা করতে হবে। এই বাজে মেয়েমানুষটার এত নিখুঁত পাতি-ব্রত্যের অভিনয় আর সহ্য হয় না।

পটল আর পন্টু এদিকে আর আসে না। নিশ্চিন্ত হলাম। আর যেন না আসে। এখন কি করা কর্তব্য সেইটাই ভাবি।

…যাক্, যা হবার হয়ে গেছে। দুজনকে ডেকে নিয়ে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বলব— আর যেন ভবিষ্যতে কোন কেলেঙ্কারী না করে। যেন দুজনে মিলে মিশে ভালভাবে থাকে। আর ছেলে দুটোকে যেন আর্যসমাজের অনাথ আশ্রমে দিয়ে দেয়, যাতে ভবিষ্যতে মানুষ হতে পারে।

মাথার কাছে খসখস একটা শব্দ হতেই তাকিয়ে দেখি পটল এসে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিনের মত বিছানা ঘেঁসে নয়—একটু দূরে। তাকাতেই বলল—মিষ্টার, তুমি আমাদের মারবে কেন ?

—কে বলেছে, আমি তোদের মারব ?

—হ্যাঁ, মা বলেছে তোমার কাছে গেলে তুমি মারবে। বড় পাকা পাকা শোনাল ছেলেটার কথা। বললাম—যা নিজের জায়গায় যা, বেশি বক্‌বক্ করবি না এখানে।

পটল পন্টু নিজেদেরই বিছানায় বসে সারাদিন খেলে, আবোলতাবোল বকে, খায় আর ঘুমোয়। মালতীর মাথায় এই কদিন আর ঘোমটার বালাই নেই। এ দৃশ্য দেখি, চক্ষু পোড়ে, অন্তর্দাহও হয়।

…আজই তলব করব দুজনকে। শেষ সাবধান বাণী শুনিয়ে ছেড়ে দেব।

পটল অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে দৌড়ে এসে বলল—মিষ্টার, তোমার দেশলাইটা দাও তো। স্টোভ জ্বালতে হবে, শিগগির দাও। পটলের মুখ শুকনো শুকনো দেখাচ্ছে। প্রশ্ন করলাম—কেন পটল, কি হয়েছে ? এত হাঁপাচ্ছ কেন ?

—তেল কর্পূর গরম করব। বাবার হাঁপানি ধরেছে, বুক ব্যথা করছে।

দেখলাম গাঙ্গুলীমশায় শুয়ে শুয়ে ছটফট করছেন। সাঁ সাঁ করে হাঁপাচ্ছেন বুকে হাত রেখে। মালতী একহাতে তাঁর বুকে হাত বুলোচ্ছে, অপর হাতে পাখার বাতাস দিচ্ছে।

পটল স্টোভ ধরিয়ে বাটিতে তেল কর্পূর চড়িয়ে দিল।

ওদিকে আমার কিছু করবার নেই। ভাজা কর্পূরের সুগন্ধ ভেসে আসছে। পন্টু সবেগে হামা দিয়ে ঘরে এসে ঢুকল। এর সঙ্গেও আজ আমার কোন কাজ নেই!

হাঁপানির জোর বেড়ে চলেছে ক্রমশ। এবার সাঁ সাঁ শব্দ ছেড়ে দস্তুর মত আর্ত-নাদ শুরু হল। মালতী গাঙ্গুলীর পায়ে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে চুপ করে।

দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে বাইরের দিকে তাকালাম। জল আর আকাশের নীলঘন রূপ ফিকে হয়ে এসেছে। এডেন বোধহয় আর বেশীদূর নয়।

শেষ কথাটা শুনিয়ে নেমে পড়তে হবে। কিন্তু কখন বলি ?

পটল আস্তে আস্তে এসে কানের কাছে ফিস ফিস করে বলল— ডাক্তারকে বলে দিও না, মিষ্টার। আমাদের নামিয়ে দিলে খুব কষ্ট হবে, বুঝলে ?

কর্তব্য আর স্থির হল না। একটা অলক্ষ্য ভীরুতা এসে শেষ কথাটাকেও একেবারে চাপা দিয়ে দিল। বলা আর হল না।

ভাবছি পটল ও পল্টু বড় হবে, বিলেতে যাবে। মেম বিয়ে করবে। এদের জীবনশোণিত নিশ্চিহ্ন হয়ে মিলিয়ে যাবে মহামানবের সহস্র স্রোতে।

ভাবছি—মালতী আর গাঙ্গুলী। কোথায় তারা ? আদিম নীহারিকার মত সব অন্ধকারের বোঝা নিয়ে তারা মুছে গেছে অনেকদিন। আজ যাদের দেখছি তারা কেউ নয়। তারা শুধু পটলের মা আর পটলের বাবা।

চিন্তার আবেশের সঙ্গে সঙ্গে একটা সুখতন্দ্রা ধীরে নেমে আসছিল, কিন্তু হঠাৎ চমকে উঠতে হল, শিশুর আক্রমণে। পল্টু তার দন্তহীন মাড়ি দিয়ে কামড়ে ধরেছে আমার নাক ; তার মুখের লালায় আমার সমস্ত মুখ প্রলিপ্ত করে তুলেছে।

তুলতুলে কচি মানুষের মুখ, জেলির মত নরম ঠোঁট। নতুন মানুষের গন্ধ পাচ্ছি পল্টুর দুধে মুখে। পল্টুকে বুকের ওপর তুলে নিলাম।

এডেনের গ্যারিসন আর কয়লার স্তূপ দেখা যাচ্ছে। যাত্রীদের কোলাহল শুনছি —এডেন এডেন। এডেন এসে পড়েছে।

মনে পড়ল, আমাকেও নামতে হবে। কিন্তু পল্টু তখন অঘোরে ঘুমোচ্ছে আমার বুকের ওপর। সুখসুপ্ত মানুষের ভবিষ্যৎ কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে রয়েছে।

পল্টুর ঘুম ভাঙাতে হবে। ভাবতে কষ্ট হচ্ছে।

ত ম সা বৃ তা

ধুলগড়া হলো বাউরী চাষী আর বোষ্টম তাঁতীদের একটা গাঁ। তাঁতীরা তাঁত ছেড়েছে দু'পুরুষ আগে। এখন তারাও সবাই চাষী, কিন্তু বাউরীদের মত এত খাটিয়ে পিটিয়ে পাকা চাষা তারা নয়। তাঁতীদের কাছে বাউরীরা হলো সত্যিকারের চাষা চোয়াড। রঙীন গামছা কাঁধে ঝুলিয়ে যতদূর সম্ভব তারা নিজেদের আভিজাত্য বজায় রাখার চেষ্টা করে।

বাউরীদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর ছেলেটির নাম দয়ারাম। সে মারা গেছে আজ ক'বছর হ'লো, সবচেয়ে সুন্দর মেয়েটিকে বিধবা করে, যার নাম জবা। জবার বাপ কুঞ্জ বাউরী মেয়ের আবার বিয়ে দিতে চায়। জবাও জানে, আজ হোক কাল হোক তাকে বিয়ে করতেই হবে। গাঁয়ের সবার ইচ্ছে এ গাঁয়েই কারও সঙ্গে জবার বিয়ে হোক। জবার বাপও তাই বলে।

কিন্তু জবাকে ঘরণী করার মতো যোগ্যতা এ গাঁয়ের কোন্ ছেলের আছে ? দয়ারামের সঙ্গে রূপগুণের তুলনা করলে তাদের নিতান্তই দীনহীন মনে হয়। এক এক করে প্রায় সবকটি বিয়ের যুগ্যি ছেলের কথা মনে পড়ে। জয়, মতি, মধু, গুণধর…। বয়সের দিক দিয়ে এদের মধ্যে যে কোনো একজনের সঙ্গে জবাকে ভালই মানাবে। চেহারার দিক দিয়েও এরা কিছু কম নয় ; সুগঠন ও সুশ্রী চেহারা। তবু সকলেরই অভিমত, দয়ারাম নাকি সবচেয়ে সুন্দর ছিল।

দয়ারাম ছিল সৌখীন ও সুবেশ। তার গামছা পরিষ্কার, ধুতি ফর্সা, চুল পরিপাটি করে আঁচড়ানো। সেই দয়ারাম আজ নেই। তার শুভ্র সুন্দর স্মৃতিটুকু এখনো রাজহাঁসের মত ডানা মেলে গাঁয়ের আকাশে উড়ে বেড়ায়।

দয়ারামের কথা উঠলেই তার চেহারাটা আজও সকলের চোখে ভেসে ওঠে। ঘরেই থাক বা বাইরে থাক, ক্ষেতে কাজ করার সময় পর্যন্ত দয়ারামের পরিধানে থাকতো সাদা ধোলাই ধুতি। অনেক দূর থেকে দেখলে মনে হতো, ক্ষেতের মাঝখানে কাদাজলের মধ্যে একটা বড় সাদা শালুক ফুটে আছে।

কাজের সময় সবাই পরতো ছেঁড়া গামছা বা পুরানো কাপড়ের একটা টুকরো। বুড়ো গোছের চাষীরা কোমরে নিছক একটা কাপড়ের ফালি ঝুলিয়ে কাজে নামতো। তাদের চেহারাগুলিও কেমন মেটে মেটে হয়ে গেছে। দূর থেকে দেখলে চেনা যেত না। মেঠো তিতিরের মত তারা যেন রঙ ফাঁকিয়ে মাটির সঙ্গে মিশে আছে।

বিধবা হবার পরও জবা বাপের সঙ্গে ক্ষেতে খাটতে গিয়েছিল কয়েকবার ; মাঝে মাঝে আলের পাশের ক্ষেতে তার দৃষ্টি ছুটে যেত, নিড়েনে বসে আছে মতি। সামান্য একটা লেংটি কোমরে, চওড়া কালো পিঠটা রোদে পুড়ে চকচক করছে। জবা বিরক্ত হয়ে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। হলোই বা পুরুষমানুষ, গরু ঘোড়ার মত এরকম নিবসন হয়ে থাকা জবার কাছে বড় বিদ্ঘুটে মনে হয়।

ঘাট থেকে জল নিয়ে ফিরতে জবা দেখতো, পথের পাশে গাছ কাটছে গুণধর। এমন একটা ছেঁড়া গামছা পরা যে সেটা না থাকলেও কোনো ক্ষতি হতো না। জবা হেঁট মুখে ও চোখ নামিয়ে চলে যায়। গুণধর একবার টাঙ্গিটা নামিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে জবার দিকে তাকায়, স্বেদাক্ত কালো শরীরটা থরথর করে।

জবার বিয়ে দেওয়া উচিত। প্রস্তাবটা এই পর্যন্ত এসে থেমে থাকে আর অগ্রসর হয় না। পাত্র হিসাবে কারও নাম করতে সহসা কেউ সাহস করে না। কে না জানে দয়ারামকে জবা কত ভালবাসতো। সেই জবার কপালে সিঁদুর যে দেবে তাকে অন্তত দয়ারামের কাছাকাছি রূপগুণ পেতে হবে। একটু সৌখীন সুবেশ কোনো জোয়ান হলেই ভাল। কিন্তু সে-রকম পাত্র কই ?

এ বছরের মত ফলান ধুলগড়ায় সাত বছরের মধ্যে হয়নি। ক্ষেত-ভরে ফসল ফলেছে ; রাত জেগে গানে গানে খড়িয়ান সেরেছে তারা। নতুন খড়ে গরুগুলির হাড়ে মাংস লেগেছে। সারি সারি ধান বোঝাই গাড়ি ধুলগড়ার ধুলো থেকে তোলা

সম্পদ গঞ্জে নিয়ে গিয়ে বেচে এসেছে দু'গুণ দরে। কিন্তু মাত্র তিনটি মাসের মধ্যে ধুলগড়ার স্বাচ্ছন্দ্যের উল্লাস ধীরে ধীরে নেতিয়ে পড়তে লাগলো। বিয়ে পরব উৎসবের কল্পনা দূরে সরে গেল বেলাশেষের ছায়ার মত। দু'মাসের মধ্যেই তারা বুঝেছে, দোষ কারও নয়। তারা নিজেই নিজের পেটে পাগলা শুয়োরের মত দাঁত বসিয়েছে। ধুলগড়ার গাড়ি বোঝাই সোনা ফেলে দিয়ে এসেছে গঞ্জের চাল-কলের কালিমাখা পায়ের কাছে। ছেঁড়া গামছায় বাঁধা যত কোমরের ট্যাঁকে কাগজের টাকা কুঁকড়ে পড়ে আছে—অসার অর্থহীন আবর্জনা।

খেতে হবে সারা বছর, টাকায় সাড়ে চার সের চাল। আবার গঞ্জের গোলায় কাঙ্গালের মত ঘুরে ফেরা। ঘামে ভেজা নোংরা নোটগুলিকে মুঠো করে ধরে তারা মর্মে মর্মে বোঝে, এর চেয়ে ধুলগড়ার একমুঠো মাঠের কাদার দাম বেশি।

শুধু ধুলগড়া নয়, চারদিকের আরও বিশটা গাঁ একই ভুল করেছে। ওরা দর চেয়েছিল, পেয়েছে দর। ভাল করেই পেয়েছে। চার টাকা দু'আনা মণ ধান। সুতরাং কারও বিরুদ্ধে তাদের কিছু বলবার নেই। ওরা নিজেরাই সোনা ফেলে আঁচলে গেরো দিয়েছে। তিনটি মাস না ফুরোতেই সারা গাঁয়ের প্রাণ একটা অভাবের আতঙ্কে খাবি খেতে থাকে। আবার সাতটি মাস আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকা।

তাঁতী চাষীদের অবস্থাও তাই। তাদের কাঁধের রঙীন গামছা একে একে খসে পড়েছে। বড় আশা ছিল, খুঁটিতে ঝোলানো সাধের মৃদঙ্গগুলি আবার বেজে উঠবে। বুড়োদের মধ্যে কেউ কেউ ভেবেছিল, ঘরের অন্ধকারের মধ্যে ঠেলে রাখা তাঁতের হাড়গোড়গুলিকে হয়তো আবার টেনে তুলে জিয়ানো যেতে পারে। সামান্য কিছু টাকার পুঁজি—তারপর ঘটা করে একটি ব্রত—ঘট সিঁদুর পাঁচালি গান। আজও তাদের জপাজীর্ণ শিল্পীসত্তা আবার সাড়া দিয়ে উঠতে পারে। ঘরে ঘরে নাটাই ঘুরবে, মাকু নাচবে—বেশে বাসে বৈভবে ধুলগড়ার যৌবন হয়তো আবার সেজে উঠবে। সে স্বপ্ন মিলিয়ে গেল। তাঁতীরা বুঝেছে, ভুল হয়েছে তাদের।

অসহায় ধুলগড়া যেন তার অনুশোচনার ভারে নিঝুম হয়ে গেল। এরই মধ্যে হঠাৎ একটা চাঞ্চল্য জেগে উঠলো। এর প্রথম সাড়া এসেছে তাঁতী পাড়ায়। দীনবন্ধু তাঁতীর ছেলে মোহনবাঁশি অনেকদিন গাঁ-ছাড়া হয়েছিল, শোনা যেত সে নাকি সদরে কি-সব ফেরি কারবার করে। আজ সে ফিরে এসেছে আবার নিজের গাঁয়ে।

ধুলগড়ার সব পাড়া একবার ঘুরে গেল মোহন। গায়ে নতুন নীল উর্দি, বাবরি-করা তেলা চুলের উপর আলগোছা নীল মুরেঠা বসানো। কোমরে চামড়ার পেটি, তার ওপর পেতলের তকমা। মোহন চৌকীদার হয়েছে। চারটে গাঁ নিয়ে চৌকী, সাত টাকা মাইনে। টাঙ্গিটা আলগাভাবে কাঁধে ঝুলিয়ে মুখভরা হাসি নিয়ে মোহন সব পাড়া ঘুরে বেড়ায়।

যে পাড়া দিয়ে যায় মোহন, সে পাড়াতে তার পেছনে ন্যাংটো ছোট ছেলেদের দল ধাওয়া করে চলে। দাওয়া থেকে গামছা-পরা প্রৌঢ় প্রবীণেরা প্রথম বিস্ময়ের

অভিভাব কাটিয়ে কুশল প্রশ্ন করে। বড় বড় মেয়েরা আড়চোখে দেখে নিয়েই মুখ ঘুরিয়ে নেয়। তাদের ছেঁড়া-কাপড়ের ফাঁকে ফাঁকে মোহনের দৃষ্টিটা গায়ে এসে বেঁধে। বহুড়িরা বৃথা ঘোমটা টানবার চেষ্টায় একবার ঘাড়ের দিকটা হাতড়ায়। খাটো কাপড়ে ঘোমটা কুলোয় না।

বাউরীপাড়ার বাথানের কাছে গোবর নেবার জন্য ছোটবড় অনেকগুলি মেয়ে দাঁড়িয়েছিল। আর ছিল জবা। আঁকাবাঁকা অনেক পথ মাড়িয়ে মোহন সেখানে এসে থামলো। মনে হলো, এতক্ষণ এই উদ্‌ভ্রান্তির পর সে যেন একটা অভীষ্ট লাভ করে ক্ষান্ত হলো।

মেয়েরা বাথান থেকে গোবর কুড়িয়ে নিয়ে তালপাতার ওপর জড়ো করে রাখছে। এক জবা ছাড়া আর সবারই চেহারা যেন ঐ পচা গোবরের মত বীভৎস। কারও কোমরে একটা কাঁথা জড়ানো, কেউ একটা চট একপাক জড়িয়ে নিয়েছে। কেউ প'রে আছে একটা বহুপ্রাচীন রঙীন শাড়ীর ধ্বংসাবশেষ। দেখতে কুরূপ বোধহয় কেউ নয়। পরিধেয় এই কদর্য বস্তুগুলিই ওদের চেহারাকে কদর্য করেছে। এরচেয়ে নিশ্চয় ওরা অনেক সুন্দর।

জবার কথা আলাদা। তার গায়ের শাড়িটা খাটো হলেও আস্ত। তবে বহু-ব্যবহারে স্থানে স্থানে ফেঁসে গেছে। দেখে মনে হয়, জবা এখনো যেন কোনো মতে যৌবনের প্রথম সঙ্গী, সুশ্রী সুবেশ দয়ারামকে শ্রদ্ধার শেষ সঞ্চয়টুকু দিয়ে বুকে ধরে রেখেছে।

চৌকীদার মোহনকে চিনেছে সবাই। তবে আর কেন? এতক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে থাকার অর্থ কি? হয়তো আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতো মোহন, কিন্তু প্রায় সবকটি মেয়ে একসঙ্গে মুখ ঝামটা দিয়ে উঠলো। বিরক্তি ও বিদ্রূপে গলার স্বর বিষিয়ে নিয়ে তারা শুনিয়ে দিল—বুঝেছি, বেশ বুঝেছি, চৌকীদার হয়েছে। নীল কবুতরটি সেজেছে। তবে আর এখানে খাঁড়া নিয়ে সবাইকে ডবাচ্ছ কেন? নিজের ঘরকে যাও না এবার, পথে তো বাঘ বসে নাই।

মোহন তাড়াতাড়ি অন্য পথে সরে পড়লো।

শুধু জবা চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখে মোহনকে, যতক্ষণ না অদৃশ্য হয়ে যায়। ওকে ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দেবার মত অহঙ্কার কোথা থেকে পায় এই মেয়েগুলি? সে তাঁতী, সে চৌকীদার, সে ভিন্‌-পাড়ার ছেলে, তবু আজ সে-ই গাঁয়ের একমাত্র সুবেশ ও সুপরিচ্ছন্ন মানুষ। জবার সঙ্গে মেয়েদের একটা ঝগড়া হয়ে গেল।

জবা—তোরা ওকে দেখে অমন ঘেউঘেউ করে উঠলি কেন?

মেয়েরা—কেন করবো না? লোকটার লাজ-সরম নাই, তাকাবেক কেন আমাদিগের পানে?

জবা—খুব হয়েছে, চুপ কর। কার লাজ-সরম নাই, নিজের পানে চেয়ে দেখ।

ধুলগড়ার বিপর্যয়ের বিলাপ যেন বাতাসে ভেসে গেছে দূরান্তরে। এসেছে, এক-

পাদরী ; সুর করে শুনিয়ে যায়—গরীবের জন্য স্বর্গের দ্বার খোলা আছে। এসেছে একজন সন্ন্যাসী ডাক্তার। গোবীজের শিশি আর ছুঁচ নিয়ে টিকে দেবার জন্য গাঁয়ের ছেলেবুড়ো সবাইকে তাড়া করে বেড়ায়। ভাগ্য গণনা করতে এসেছে এক গণক-ঠাকুর। গাঁয়ের গ্রহশান্তি করতে এসেছে এক সন্ত বাবাজী। আর, ঘনিয়ে এসেছে পঞ্চমীর পূজো, বটতলার শিলাদেবীর কাছে জোড়া-পাঁঠার বলি না দিলে রেহাই নেই। সব দেবতার খোরাক যোগাতে নিঃস্ব ধুলগড়ার রক্ত শুকিয়ে আসে।

আহত ধুলগড়ার রক্তমাংসের গন্ধে গন্ধে কোথা থেকে এক লোন-অফিস এসে জুটেছে! লোন অফিসের আমলা আর সরকারেরা প্রায় সাতদিন ধরে খোঁজখবর নিল। বাউরীপাড়া আর তাঁতীপাড়ার যত কুঁড়েঘর চুঁড়ে, গরু আর মহিষের চেহারা দেখে, যেন ক্ষেতের মাটি চেখে চেখে তারা কিছু একটা স্থির করে নিল। বোঝা গেল তারা খুশি হয়েছে।

ক'দিন পরেই দেখা গেল দু'পাড়ার মাঝখানে একটা কুশে জমির ওপর নতুন টিনের একচালা উঠেছে। দাদনের ঝুলি নিয়ে বসলো লোন-অফিস। আকাশের দিকে চোখ রেখে ওরা সাবধানে ঋণ ছাড়ে। আমন রবি রেহান দিয়ে চাষীরা কবলায় টিপসই মারে। শুধু নিজেরা নয়, মাটির ভবিতব্যের নাড়ীতে কোটি কোটি শস্যভ্রূণ এই ঋণের বন্ধনে খাতক হয়ে যায়।

দৈবের এই পীড়ন গ্রামের সকল উৎসাহকে চেপে ধরছে পাকে পাকে। শুধু ভরসা হয় মোহনকে দেখে। মোহন যদি একবার তাদের সব দুঃখ দুর্গতির বার্তা নিয়ে ইউনিয়নের হৃদয় গলাতে পারে, ইউনিয়ন যদি সার্কেল কর্তাদের মর্জি মজাতে পারে, তবে সদরের কৃপা ডুকরে উঠতে কতক্ষণ?

ধুলগড়ার বটতলায় এক সন্ধ্যায় তাঁতী বাউরী সকলেই মোহনকে তাদের প্রস্তাব যথামিনতির সঙ্গে জানালো। এই একটি দিনের পরীক্ষায় মোহনের চরিত্রের চরম যাচাই হয়ে গেল। মোহন বললো—না, সে হতে পারে না। আমি গাঁয়ের চাকর নই। আমি চোর ধরব, বদমাস ঠেঙ্গাব।

তাঁতীদের সস্তা স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। ওদেরই গাঁয়ের ছেলে মোহন, সেই দীনবন্ধুর ছেলে। কিন্তু সে আজ ফিরে এসেছে কাবুলী আর ইংরেজের চেয়েও বেশী বিদেশী হয়ে। ধুলগড়ার ভাষা ওর মুখে বাজে না; ধুলগড়ার অভাব অপমান ও চিনতে পারে না।

তবু সারা গাঁয়ের মধ্যে একমাত্র পরিচ্ছন্ন হল মোহনবাঁশী, তারই শুধু পরিচ্ছদ আছে। গাঁ-ভরা মানুষ ও গরুর ভিড়ের মধ্যে ওর বেশভূষা ওকে এক ভিন্ন জাতের মর্যাদা দিয়েছে।

ভয় পেয়েছে বেশি বাউরীপাড়ার লোকেরা। জয় মতি মধু আর গুণধর দূর থেকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে দেখে মোহনকে। চোখাচোখি হলেই অপরাধীর মত মুখ নামিয়ে নেয়। ছেলেবেলায় একদিন যে ওরা আর মোহন একসঙ্গে হারাণ-পুরের মেলায় চুরি করে সরবৎ খেয়েছিল, সে ঘটনাও আজ একেবারে মিছে হয়ে

গেছে।

তবু আবার হাল ধরে সবাই। রোদেপেটা এঁটেলমাটি লাঙ্গলের মুখে উল্টে-পাল্টে দেয়। কড়া মই চালিয়ে ঢেলা ভাঙ্গে, চাষী মেয়েরা পাশে দাঁড়িয়ে আগাছা বাছে, কঞ্চি দিয়ে ক্ষেতের ধুলো চৌরস করে। সব ক্ষুধা রোগ তাপ ফাঁকি হতাশার ষড়যন্ত্রকে উপেক্ষা করে ওরা আবার লেগে যায় অদৃষ্টকে শক্ত মুঠোয় ধরে রাখতে।

শুধু জবা বেঁকে বসেছে, ক্ষেতে কাজ করতে সে নারাজ। ক্ষেতভরা এক পাল মরদ, কোনো লজ্জা বালাই নেই তাদের। গায়ে একটা সুতো কুটো আছে কি না আছে, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই।

বুড়ো কুঞ্জবাউরী বার বার বুঝিয়ে বলে—তোর ওসব চিন্তে কেন? তুই কাজ করবি মাটির সাথে। মাটির দিকে তাকিয়ে থাকবি।

জবা—না, আমি পারবো নাই।

কুঞ্জ—পারতে হবে।

জবা—না, পারবো নাই।

জবা সদর্পে স্পষ্ট জানিয়ে দেয়। বুড়ো কুঞ্জ তার মেয়ের দেমাকের দাপট দেখে প্রথমে একচোট মেজাজ দেখিয়ে ফেলে। গালাগালি করে। কিন্তু পরক্ষণেই মমতার আবেশে শান্ত হয়ে আসে। সত্যিই তো, ও চেহারা রোদে জলে খাটবার জন্য নয়। ভগবান ওকে বুদ্ধি দিয়েছে, ভদ্রলোকের মত রুচি দিয়েছে। কষ্টে পড়লে কেঁদে ফেলে, অভিমান করে। ও ঠিক কানিপরা চাষার মেয়ে নয়। আসলে, ও হলো দয়ারামের বৌ। এই পরিচয় জবা ভুলতে পারে না। জবা এখনো সিঁদূরের টিপ পরে; পান খায়, ছেঁড়াফাটা যে দু' একটা শাড়ি আছে, তাই দিয়ে সে আজও রোজ সাজ করতে ভোলে না।

জবা কখনো কখনো ঘরের দাওয়ায় বসে চিরুণী নিয়ে চুল আঁচড়ায়! ঝুমকোর বেড়া ঘেঁষে, চুবড়ি কোদাল কাঁধে নিয়ে মতি বাউরী ভীরু চোখে তাকিয়ে চলে যায়। মতির গায়ে একটা মোটা বিলিতি পশমের কোট। কোথা থেকে যেন যোগাড় করেছে, বোধহয় শহরের কোনো বাবুর বাড়ি থেকে ভিক্ষে মেগে নিয়ে এসেছে। বেঢপ জামাটার ঝুল ছেঁড়া-গামছার ক্ষুদ্র অধোবাসটুকু ঢেকে ফেলেছে। তবু ঘামে ভিজে জলটোপা হয়ে চলেছে মতি। জবা অপাঙ্গে দেখে নিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। বিদ্রূপের হাসিতে কুটিল ঠোঁট দুটো একবার নড়ে উঠলো শুধু। মতির সমস্ত মুখ চকিতে ফ্যাকাশে হয়ে যায়, চোখ দুটো আবার পরক্ষণেই জলে ওঠে।

সকালবেলা থেকে বটতলায় ছায়ায় এক কাপড়ের ফিরিওয়ালা এসে তার পসরা সাজিয়ে বসেছে। গাছের ডালে দড়ি টেনে ঝুলিয়ে দিয়েছে হরেক রকমের শাড়ি। কোরা ও ধোলাই, নানা মাপের ধুতি ভাঁজ করে থাক লাগিয়ে রেখেছে। একপাশে ছাট-কাপড়ের একটা ঢেরি লাগানো—ছিট আদ্দি শালু মলমল নয়নসুখ। আর একপাশে বিবর্ণ কতগুলি জামার স্তূপ।

খদ্দেরের সমাগম দেখে ফিরিওয়ালা প্রথমে খুশি হয়ে উঠেছিল। ভুল ভাঙলো তাদের চেহারার রকম দেখে। এই প্রায়-উলঙ্গ অকিঞ্চনের জনতা—এদের রোদ-পোড়া চামড়ায় লম্বসাটপটাবৃত পৃথিবীর লজ্জাবাদ বোধহয় এখনো সত্য হয়ে উঠতে পারেনি। এরা সত্যিই কি কিছু কিনবে? সন্দেহ হয়।

ছোট ছোট ন্যাংটো ছেলেগুলির মাতামাতি, ছোকরাদের দর হাঁকাহাঁকি, বয়স্কা মেয়েদের প্রশ্ন, জনতার চোখভরা প্রখর দৃষ্টির উল্লাস—ফিরিওয়ালা কেমন ভয় পেয়ে গেল। তাড়াতাড়ি করে সব বেঁধেছেঁদে উঠে দাঁড়ালো সে। মাতব্বর চরণ-বাউরী ও আরও দু'একজন বয়োবৃদ্ধ ফিরিওয়ালাকে অনুরোধ জানালো—এবার পূজায় এ-গাঁয়ে কেউ সওদা লিবে না হে। তুমি এইসো হোলির সময়। তখন অনেক মাল লিব আমরা।

—হাঁ, আসবো। সোনার সাজ নিয়ে আসবো তোমাদের জন্য, যত খুশি নিও।

ফিরিওয়ালা কাপড়ের বোঝাটা ঘাড়ে তুলে ঠোঁটের এককোণে একটু হাসি মুচকে নিয়ে পথে নেমে পড়ে।

পঞ্চমীর পরবে বটতলার দেবতার পায়ের কাছে মাটিটুকু শুধু রঙীন হয়ে উঠলো। জন প্রতি পাঁচ পয়সা চাঁদা ধরে একজোড়া পাঁঠা কিনে বলি দেওয়া হয়েছে। এ উৎসবের রূপ চোখে পড়ে না। শুধু শোনা যায় তার শব্দ। শুধু উদ্দাম ঢাকের বাজনা, বিবশ ক্ষুধাজীর্ণ ধুলগড়ার শূন্য পাকস্থলী ও ফুসফুস যেন গর্জন করছে। বুড়ো বুড়ী বহুড়ী—প্রায় তিন-শো মানুষের একটা জনতা। লেংটি কানি ফালি ন্যাকড়া চটের টুকরো, তার ওপর এক-আধটু হলুদের ছিটে; ওদের মুখের সমস্ত হাসিরই মত বেদনা-করুণ এই উৎসব-সজ্জা। চারদিকের বাসি ও বিবর্ণ ফুল, শুকনোপাতা আর রুক্ষমাটির সঙ্গে ওরা ছন্দে ছন্দে মিলে গেছে।

জবার কথা আলাদা। শিউলি-গোলা দিয়ে রঙানো একটা চওড়া-পাড় শাড়ি পরিপাটি করে পরেছে জবা, সিঁদুর তো আছেই, চোখে কাজলও দিয়ে ফেলেছে।

রাজনন্দিনী! অন্যমেয়েরা জবাকে দেখে ফিসফিস করে উঠলো, মুখ টিপে টিপে হাসলো। জবা যেখানে দাঁড়ায়, সেখান থেকে তারা সরে যায়। আগে জবাকে পেলেই মেয়েরা তাকে সাগ্রহে ঘিরে দাঁড়াতো। জবার গায়ের শাড়ি আর খোঁপার ফিতে ধরে তারা টানাটানি করতো। শতমুখে প্রশস্তি গুঞ্জন করে উঠতো। কিন্তু আজ তারা যেন জবার কাজল লেপা চোখের চাউনিতে ক্রূর বিদ্যুতের ছায়া দেখতে পেয়েছে। জবা তাদের কাছ থেকে সরে গেছে বহু দূরে। সব কাহিনী শুনেছে তারা। দয়ারামের জন্য আজ ওদের মন কেঁদে ওঠে। বুড়ো কুঞ্জ বাউরীর কথা ভেবে দুঃখ হয়। মেয়েরা যেন জবার ছায়া বাঁচিয়ে যায়। ওরা সবাই যেন মনে মনে এই ধিক্কার দিচ্ছে—জানি কী নিয়ে তোমার এই গরব।

কুঞ্জ বুড়ো নির্বোধ। কোদাল দিয়ে কুপিয়ে একটা ভাঙা আলে মাটি দিচ্ছিল কুঞ্জ। জানকী বাউরী জিজ্ঞাসা করলো—কি গো কুঞ্জ দাদা, তোমার বিটি খাটতে আসছে নাই কেনে?

কুঞ্জ—তোমরা কি আর মানুষ বট হে ? জানোয়ারের মত নেড়া-ন্যাংটা হয়ে থাকবে, লাজ সরম নাই তো তোমাদের। মেয়েমানুষ হয়ে কি করে এখানকে আসবে বল ?

প্রায় দশ-বারজন একসঙ্গে কোদালের হাতল চেপে গর্জে উঠলো—কি বললি রে বুড়ো ? তোর জবা হলো মেয়েমানুষ ? আর হোই যে এতগুলি বিটি মাগ মাতারী খাটছে, ওরা মেয়েমানুষ লয় ? যা ঘরকে গিয়ে একবার দেখ। মোহন তাঁতী যে জাত লুটে নিচ্ছে রে কানা বুড়া। দেখ গিয়ে যা।

কুঞ্জবুড়োর পাঁজরার ভেতর দমটা যেন আটকে গেল। বুড়ো দাঁড়িয়ে ঝিরঝির করে কাঁপতে লাগলো। এই বিদ্রূপের নিদারুণ একটা অর্থ ওর পঞ্চান্ন বছরের বউরী জীবনের দর্পকে যেন হঠাৎ লাথি মেরে ভূমিসাৎ করে দিল।

কোদালটা শক্ত মুঠোয় আঁকড়ে ধরে, বুড়ো এক লাফে আল থেকে উঠে পাগলা ঘোড়ার মত ছুটলো ঘরের দিকে। বুড়োর পেছনে সবাই চিৎকার করে ছুটে এল—থাম্—বুড়ো থাম্।

জবা সেজেগুজে বসেছিল নিকানো আঙিনার ওপর একটা তুলসী পিঁড়ার কাছে। এখন বিকেল, তারপর সন্ধ্যা। কাজের মধ্যে কিছু কাঠের চেলি যোগাড় করা। বুড়োর জন্য ফেনভাত ফুটিয়ে রাখতে হবে। কিন্তু তারপরেই তো নিশুতি রাত। এই আঙিনায় সুবেশ ও সুন্দর এক জোয়ান মরদের ছায়া দেখা দেবে। তার আকুল অনুনয় দু'হাতে ঠেলে রাখতে জবা যেন আর জোর পায় না। কিন্তু ঘরের বেড়ার ফাঁক দিয়ে ঘুমন্ত কুঞ্জবুড়োর আর্ত নিঃশ্বাসের শব্দ কানে আসে। অন্ধকারের আহ্বান ব্যর্থ হয়ে যায়।

মোহন বলে—তোর জন্য আমি জাত ছাড়ছি, তোর অত জাতের মায়া কেন ?

জবা—আমি তো তোকে জাত ছাড়তে বলছি না।

মোহন—তবে কি করে হবে ? খাবি কি ?

জবা—কেন, আমি কি খাই না ? আমার কি বাপ নাই ?

মোহন—পারবি কি ? এবার কি কানি পরে থাকবি ? আর ক'টা কাপড় আছে তোর ?

জবা—এই একটা।

মোহন—তারপর ? কি করে তোর মান থাকবে ?

জবা—তুই তো দিতে পারিস।

মোহন—আমি দিব কেনে ?

জবা—বেশ, দিস না।

প্রতি রাত্রে আঙিনার তুলসীপিঁড়ার কাছে এক সুস্বপ্ন একসঙ্গে ভিক্ষা ও দানের ছলনা নিয়ে আসে। আজ অনেক কষ্টে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ঢাকাঢুকি দিয়ে এই জীর্ণ শাড়িটাকে জবা গায়ে জড়িয়েছে। কিন্তু একটু অসাবধানে ওঠাবসা করলেই ফেঁসে

যায়। কাপড়ের আধহাত ফাঁকটা বেসামাল হয়ে ঠিক হাঁটুর ওপরেই নির্লজ্জ হয়ে ওঠে। এ লাঞ্ছনা জবার পক্ষে দুঃসহ।

কাল রাত্রে মোহন বলেছিল—যেদিন তুই কানি প'রে পথে বের হবি জবা, সেদিন থেকে সব খতম। আমি আর আসবো না। আর ভাল লাগবে না তোকে।

ঠিক এইরকম কথা বলতো দয়ারাম। বেশভূষায় জবাকে উদাস দেখলে দয়ারাম এমনিভাবেই তাকে শাসাতো। অন্ধকারে মোহনের চৌকীদারী মুরেঠার ঝালরটা, দয়ারামের মাথায় বাবরীর মত যেন দুলে ওঠে। জবা তার হাত দুটিকে তবু সামলে রাখে। একটু ভুল হলেই হাতটা হয়তো মোহনের গলা সবেগে জড়িয়ে ধরবে এখনি।

মোহন যাবার সময় বলে যায়—তোর রূপ আছে। সাজবি না কেনে জবা?

জবা বলে—এখনি যেও না, আর কিছুক্ষণ থেকে যাও…

জবার ভাবনার আমেজ ছুটে যায়। একটা চিৎকারের তাণ্ডব যেন হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে।

মাথার ওপর কুঞ্জবুড়োর হাতের কোদালটা হিংস্র হয়ে লাফিয়ে ওঠবার আগেই সকলে মিলে তার হাত চেপে ধরলো। কুঞ্জ কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়লো। লোকের ভিড, মন্তব্য, ধমক আপসোস ও ধিক্কারের সেই সোরগোলের মধ্যে জবা ঘটনাটির অর্থ বুঝে নিল। বুঝে নিল জবা—তার প্রতি রাতের সেই তমসাবৃত কাহিনী সারা গাঁয়ের গোচরে এসে গেছে। সবাই বুঝে ফেলেছে, পঞ্চমীর বটতলায় তারা তাই মুখ টিপে হেসেছে।

জবা ঘরের ভেতর ঢুকে দরজায় আড টেনে দিল।

ভিড সরে গেছে। কুঞ্জবুড়ো পা-ভাঙা বলদের মত ঘরের বাইরে অন্ধকারের মধ্যে কাৎ হয়ে পড়েছিল। জবা এসে কেঁদে পডলো—চল, ঘরে চল।

কুঞ্জবুড়ো—না।

জবা—এই ধরিত্রী ছুঁয়ে দিব্যি লিচ্ছি, আর কখনও আমি দোষ করবো না; আর ভুল হবেক নাই।

জবার হাতে ভর দিয়ে উঠে কুঞ্জ ঘরের ভেতর গিয়ে শুয়ে পডলো। জবা একটা চট টেনে শুয়ে পড়লো বুড়োর পায়ের কাছে মাথা রেখে। এই ধরিত্রীর কোল থেকে কে যেন তাকে ঠেলে দিয়েছিল ক'দিনের জন্য। সেই হারানো ঠাই আবার পাওয়া গেছে। এক ভাবনাহীন তৃপ্তির আবেশে জবা অঘোরে ঘুমিয়ে পডলো।

তাঁতীপাড়া জেনেছে মোহন তাদের কেউ নয়। সে শুধু চৌকীদার। বাউরী-পাড়া জানে, জবা তাদের জাতের অপমান। দু'পক্ষেই বিদ্বেষ ঘনিয়ে ওঠে, কোন পক্ষের কেউ ভুলতে পারে না তাদের গোষ্ঠী-অভিমান। তাঁতীরা মনে করে, জবা তাদের পাড়ার ছেলেকে খারাপ করেছে। বাউরীরা মনে করে, মোহন তাদের সংসারে এনেছে কলঙ্কের ছাপ। সময় সময় বাউরী পাড়ার সবাই বোঝে—এ শুধু

মোহনের দোষ নয়। জবা যদি একটু কড়া হত তাহলে তাদের জাতের মান এভাবে সস্তায় ও সহজে খোয়া যেত না। জবাব বাপও যেন কেমন। মেয়ের ওপর শাসন নেই। সব বুঝেও চুপ করে আছে! তারও কি জাত হারাবার ভয় নেই? তবু সবাই চুপ করে এই অপমানের মার হজম করে। দৈন্যে হাহাকারে জাতের দেমাক আজ লাঠিমারা সাপের মত মাথা গুঁজে পড়ে আছে।

কুঞ্জবুড়ো আবার খাটতে আরম্ভ করে। আজকাল ওকে সকলে একটু দয়ার চক্ষে দেখে। আর ক'টা দিনই বা ওর আছে? ওকে জাতের বার করে আর লাভ কি? এমন জোয়ান মেয়ে ঘরে থাকতে ভাঙা কোমর নিয়ে বুড়ো বাপকে ধুঁকে ধুঁকে খাটতে হয়! কিন্তু মোহন তাঁতীর এ দুঃসাহস ওরা ক্ষমা করবে না। এই রোপাইটা শেষ হয়ে একবার ক্ষেত ফলে নিক, একটু সুদিন পড়ুক, তারপর দেখে নেবে তারা —তাঁতীর হাতে টাঙির কত তেজ।

তিন দিন থেকে কুঞ্জবুড়ো একটা বিসদৃশ ব্যাপার লক্ষ্য করছে। কোনো চাষী-কামিন ক্ষেতে খাটতে আসছে না। চাষীদের মুখভরা একটা অপ্রসন্নতা থমথম করে। নতুন জল নেমেছে। চটপট রোপাই সেরে ফেলতে হবে। কিন্তু আল বাঁধতেই সময় ফুরিয়ে যায়। আঁটি-আঁটি ধানের চারা ক্ষেতের জলে হাবুডুবু খেয়ে পড়ে থাকে।

হৃদয় বাউরীকে পাশে পেয়ে কুঞ্জ প্রশ্ন করলো—তোমাদের ঘরের লোক কই হে? কেন আসছে নাই বলতো? ব্যাপার কি?

হৃদয়কে চুপ করে থাকতে দেখে কুঞ্জ আবার চোয়াল কাঁপিয়ে একটা হিংস্র হাসি টেনে জিজ্ঞাসা করে—মোহন তাঁতী কি সবারই···

হৃদয় জবাব দিল—তোমার বুদ্ধিতে মরণ এসেছে বুড়া। তুমি বুঝবে না। ঘরে গিয়ে নিজের বিটিকে শুধায়ে দেখ।

কুঞ্জ—তোমাদিগেরই বা বলতে এত লাজ কেনে?

হৃদয়—ঘরের লোক সবাই আসবে গো আসবে। না হলে রোপাই সারবো কি করে? তুমি কিছু বুঝবে না, চুপ কর।

কুঞ্জ কি বুঝলো তা সেই জানে। বিশ্রী রকমের একটা হাসি আর হাই তুলে আবার কাজে মন দিল।

বাঁশবনের ডোবাটা দুপুর বেলাতেও একেবারে নির্জন। কাটা তালগাছের একটা খণ্ড ডোবার কিনারায় জলের মধ্যে কাছিমের মত পিঠ ভাসিয়ে পড়ে থাকে। জবা সেখানে বসে বসে দুধিয়া মাটি দিয়ে তার শেষ শাড়িটাকে খুব সাবধানে কেচে নিল। শাড়ির পাড়টাতে এখনো কিছু জোর আছে, কিন্তু সুতোগুলি থেৎলে তুলোট হয়ে গেছে, তালি সেলাই আর ধরে না। খুব সামলে কাচতে গিয়েও আবার দু'জায়গায় ফেটে গেল।

শাড়িটাকে আঙিনায় মেলে দিয়ে জবা ঘরের ভেতর বসে রইল। নিজের কাছ থেকেই সে যেন লুকিয়ে ফিরছে। ঘরের কোণে বসে যেন একটা লজ্জার জ্বরের

জ্বালায় জবা ছটফট করতে থাকে।

শাড়িটা শুকিয়ে গেলে তুলতে এসে জবা দেখলো—খড়খড়ে কাগজের মত হয়ে গেছে। অনেক চেষ্টা করেও কাপড়টাকে অন্যদিনের মত আর ছাঁদ করে গায়ে জড়ানো গেল না। পুরানো পলকা চাটাইয়ের মত ভেঙে ভেঙে যায়। দারুণ ঘৃণায় এক টান মেরে শাড়িটাকে সরিয়ে ফেলে দেয় জবা। না, আর সহ্য যায় না, উলঙ্গ ধূলগড়ার ষড়যন্ত্র এতদিনে বোধহয় চরম হয়ে উঠেছে।

রাত্রি একটু গভীর হয়ে আসতেই জবা ঘরের বাইরে আঙিনার ওপর এসে দাঁড়ায়। মোহনের পায়ের শব্দে অনেকদিন পরে আবার অন্ধকারে রোমাঞ্চ জাগায়।

মোহন—কি হয়েছিল তোর জবা? এতদিন দেখা দিলি নাই কেনে? তুই দেখছি, হয় আমাকে মারবি, নয় পাগল করে ছাড়বি।

জবা—তুই রোজ এসে ফিরে গেছিস, না?

মোহন—তবে? সেদিন বিছা কামড়ে শরীরটা জ্বালায়ে দিলে, তবুও দাঁড়িয়ে-ছিলাম।

মোহনের উত্তরগুলি জবাব সব সংশয় দ্বিধা বিবেচনার ওপর যেন মন্ত্রপড়া জল ছিটিয়ে তাকে বিবশ করে আনে। একটা টাল খেয়ে মাটির ওপর বসে পড়লো জবা। মোহন ব্যস্ত হয়ে ধরে তুলতে যেতেই শাড়ির একটা ভাগ খুলে গিয়ে তার মুঠোর ভেতর ঝুলতে লাগলো।

মোহন—একি জবা, তুই কানি পরেছিস!

জবা—হ্যাঁ।

মোহন—এই তোর ইচ্ছে?

জবা—না।

মোহন—আনবো শাড়ি? নিবি তো? বল, তুই একবার হাঁ বলে দে।

জবা—হ্যাঁ।

মোহন—কালই নিয়ে আসছি।

মোহন চলে গেলে তুলসীপিঁড়ার কাছে সংজ্ঞাহীনের মত জবা বসে রইল অনেকক্ষণ। বসনে ভূষণে প্রসাধনে চর্চিত এক আন-দুনিয়ার আলোকের ধাঁধায় ধূলগড়ার পথ হারিয়ে গেছে তার—চিরদিনের জন্য। জাত-মান, ক্ষেত, বাগান, বট-তলার শিলা—সরে গেছে বহুদূরে। কোনো মমতা তাকে আর ধরে রাখতে পারলো না।

ঝুমকোর বেড়ার ধার দিয়ে যেন অনেকগুলি ছায়ামূর্তি দল বেঁধে যাচ্ছে। পায়ের শব্দে চমকে উঠলো জবা। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর জবার ভীত বিস্মিত ও অলস চোখের ঝাপসা দৃষ্টি ক্রমে স্বচ্ছ হয়ে এল। মুক্তির পথ পাওয়া গেছে, খোলা পড়ে রয়েছে। সবাই সে পথে চলেছে। রাত্রিচর পাখির মত উল্লাসে যেন ডানা ঝাপটে ঝুমকোর বেড়াটা ডিঙিয়ে গিয়ে জবা তাদের সঙ্গে মিশে গেল।

গঞ্জ থেকে ফিরতে অনেক রাত হয়ে গেল। সারাদিনের মধ্যে সামান্য একটু জল-বাতাসাও পেটে পড়েনি মোহনের। পয়সা ছিল না। তের টাকা নগদ দিয়ে আর কিছু ধার বাবদ লিখিয়ে পালবাবুদের দোকান থেকে একজোড়া শাড়ি কিনে এনেছে মোহন। নক্সাকরা একটা নকল বারাণসী, আর একটা মিলের মিহি শাড়ি। সারা দুপুর রংরেজের ঘরে বসে নতুন ছুপিয়ে নিয়েছে, যার জন্য খরচ পড়েছে সাত টাকা। খুব ইচ্ছে হচ্ছিল, নিজের জন্য একটা বুটিদার তোয়ালে কেনে। কিন্তু সব সঞ্চয় তার নিঃশেষ হয়ে গেছে। ভালই হয়েছে। যাকে পাওয়া যাবে, পেতে হবে, তার দাম কখনই সামান্য নয়। কাজেই উচিত শুল্ক দিতেই হবে। এ এক আত্মহারা আনন্দ, নিঃশেষে ফুরিয়ে যাওয়ার সুখ।

রাত্রির মাঝ প্রহরে ফেউয়ের দল একবার চিৎকার বন্ধ করলো। গুঁড়ো বৃষ্টির ছাট মোহনের চোখে মুখে লাগছে। তুলসাপিঁড়ার কাছে পাট করা একজোড়া শাড়ি—যেন তার একজোড়া ইহ-পর পরিণাম সঁপে দিয়ে মোহন আঙিনার চারদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। জবা তখনো বুঝি ঘরের ভেতর আছে।

আঙিনার কোণে কোণে জলেভেজা পাতার গাদায় মরা জোনাকীরা আলো ছাড়ে। মোহন অস্থির হয়ে ওঠে। এই রাতের সব গভীরতা, সব মুহূর্ত যে জবার প্রতিশ্রুতির ছোঁয়ার পরম মূল্য লাভ করেছে।

মোহন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শোনে—বেড়ার ফাঁকে কুঞ্জবুড়োর শ্বাসবায়ু ফাটা হাপরের মত হাঁসফাঁস করছে। আর ধৈর্য ধরার সাধ্যি নেই, মোহন দরজার আড় সরিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়লো। চকমকি ঘষতেই দেখা গেল—ঘরে আর কেউ নেই। শুধু ঘুমোচ্ছে কুঞ্জ বাউরী। জীর্ণ কদর্য অস্থিপেশীর একটা কৃত্রিম মানুষী সজ্জা বৃথা দম টেনে টেনে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে।

মোহনের মাথায় শিরায় যেন পাগলামির বান ডেকে গেল। এক লাফে ঘর থেকে বার হয়ে একটা থাবা দিয়ে শাড়ি জোড়া তুলে নিল মোহন। আর, এক হাতে টাঙিটা শক্ত করে ধরে আঙিনা পার হয়ে পথের অন্ধকারে মিশে গেল। জবা কোথায়?

বাউরীপাড়ার প্রত্যেকটি কুঁড়ের দুয়ারে, বেড়ার ফাঁকে, মেটে পাঁচিলের মাথায়, মরাই মাচানের অন্ধকারে মোহনের চোখ কান আর ধারালো টাঙি উঁকি-ঝুঁকি দিয়ে ঘুরে গেল। জবার সন্ধান পাওয়া গেল না।

মনে পড়লো, মতি বাউরীকে। তাগড়া চেহারা ছোঁড়ার, ওরই সঙ্গে জবার সাঙ্গা-বিয়ের কথা উঠেছিল একবার। কোথায় সে?

মতি শুয়েছিল একটা ছোট খড়ের বোঝা বুকে আঁকড়ে, বাথানের বাইরে। মতি একাই বাথান পাহারা দেয়। নেকড়ে হায়নার ভয় নেই ওর—যেমন গরীব তেমনি সাহসী। মোহন তাকে স্বচক্ষে একবার দেখে নিয়ে তবে শান্ত হলো।

জীবনে এই প্রথম সত্যিকারের পাহারা দিল মোহন, শুনে গেল ঘরে ঘরে ক্ষুধার্ত হাড়েরা ঘুমের ঘোরে দাঁত পিষছে। কোন ঘরে একটিও প্রদীপ জেগে নেই।

কোনো নিভৃতে বীতনিদ্র প্রণয়ের সম্ভাষ অসাবধানে বেজে ওঠে না। শুধু কাঁদে শিশুর দল—তৃষ্ণার্ত ছোটছোট জিভের বিলাপ রাত্রির স্থৈর্যকে শব্দাতুর করে তোলে। কিন্তু তাদের সান্ত্বনা দিতে কেউ জেগে ওঠে না কেন ?

ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে এল মোহন। জবা পালিয়েছে। তবু মনে হয়, এই জলো হাওয়া আর অন্ধকারের মত সে যেন কাছেই আছে, অধরা হয়ে। বস্তি পার হয়ে গাঁয়ের সীমানায় একটা করঞ্জগাছের তলায় মোহন এসে দাঁড়ালো।

মোহন বোধহয় ঝিমিয়ে পড়েছিল। চোখ মেলে চাইতেই বুঝলো সে গাছে ঠেসান দিয়ে আছে। অবসাদে সমস্ত শরীরটা একটা মরা ডালের মত বেঁকে চুরে গাছের গায়ে নেতিয়ে লেগে আছে। রাত্রি শেষ হয়ে আসছে।

ক্ষেতের আল ধরে কারা যেন আসছে। এক—দুই—তিন—অনেক। হেমন্তের শিশিরে উদ্‌ভ্রান্ত একদল শৃঙ্গারার্দ্রা হরিণী যেন ত্রস্তপদে ছুটে আসছে, গাঁয়ের দিকে।

রাত্রির অন্ধকারের আড়ালে ক্ষেতে রোপাই সেরে ফিরছিল বাউরী মেয়েরা। আজ রাত্রের মত কাজ শেষ, আর সময় নেই।

ওরা আসছিল—বিবসনা মৃত্তিকাবধূর দল। টুকরো টুকরো কানি চট কাঁথা—মধ্যদিনের যত রুচি-পরমাদ, আজ রাত্রের মত পরম অবহেলায় ওরা ঘরেই ফেলে রেখে এসেছে, ওদের লজ্জা ঘিরে রেখেছে লক্ষ কালোসূতোর জালে তৈরী এই নিঃসীম অন্ধকারের পরিচ্ছদ।

চৌকাদার মোহন অনিমেষ চোখে, জোড়া শাড়ি বুকে আঁকড়ে করঞ্জ তলায় নির্জীবের মত পড়েছিল। জলকাদা মাখা সেই মূর্তিগুলি তারই সুমুখ দিয়ে দল বেঁধে হেঁটে চলে গেল তর্‌তর্‌ করে। ওদের বেণী-ভাঙা রুক্ষ চুলের ভার পিঠের ওপর ঘষা খেয়ে শব্দ করছে। নিরাবরণ দেহের প্রতিটি পেশী মাংসের নূপুরের মত অদ্ভুত শব্দ করে বেজে চলে যাচ্ছে।

—বেলা চমকাচ্ছে যে গো। জলদি কর। তাদেরই ভিড়ের মাঝখান থেকে জবা বলে উঠলো।

পূব আকাশের দিকে একবার চকিতে চোখ চেয়ে, করঞ্জতলা দিয়ে ব্যস্তত্রস্ত হয়ে হন্‌ হন্‌ করে চলে গেল গাঁয়ের মেয়েরা। খগ মৃগ মধুপের সাড়ায় এখনি জেগে উঠবে পৃথিবী। ওরা শুধু ভয় পাচ্ছিল, এখুনি বুঝি সূর্য উঠে পড়ে।

স ব লা

গাঁয়ের ডোমদের বড় মোড়ল এলাচি ডোম। যৌবনের জলুস উবে গেছে কবে, ছুরির মত সে-জীবনের ধার গেছে ক্ষয়ে, পরমায়ুর প্রান্তে এসে ঠেকেছে আজ। জরা আর ভীমরতির পাকে পড়ে জীবনটা ধুকপুক করছে শুধু। যাই যাই করেও যেন আর যেতে চায় না।

মোরগের ডাকের সঙ্গে এলাচির ঘুম ভাঙে। জেগে উঠেই পরিত্রাহি চেঁচাতে

থাকে—টুকিয়া, ওরে টুকিয়া, শিগগির ভাত দে।

—এক লাথি মেরে সব গলাবাজি বন্ধ করে দেব বুড়ো। শুধু খাই আর খাই। নিজের গায়ের মাংস ছিঁড়ে খা না।

টুকিয়াও ঘুম ছেড়ে রাগে গরগর করে বেরিয়ে যায়। মোড়ল এলাচি তার অষ্টাবক্র গ্রন্থিল দেহভার তুলে দাওয়ার খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসে। কঞ্চি দিয়ে গা চুলকোয়। মাথাটা ঘড়ির কাঁটার মত প্রতি সেকেণ্ডে ঠক ঠক করে কাঁপে। গাল দেয় টুকিয়াকে, গাল দেয় টুকিয়ার মৃতা মাকে, যার চরিত্র নাকি কোন্ এক কোলিয়ারির সাহেবের কাছে বাধা ছিল। নিশ্চয়, এ মেয়ে নিশ্চয়ই বেজন্মা, নইলে বুড়ো বাপকে এত অবহেলা!

এলাচির গালাগালি আর অভিশাপের প্রবাহ অবিরল ধারায় গড়িয়ে চলে দুপুর পর্যন্ত। শ্রান্তিতে ঘুণধরা ধড়টা ক্রমে নিশ্চল হয়ে আসে। ডাঙায় তোলা মাছের মত খাবি খায়।

এমনি সময় ঘরে ফিরে আসে টুকিয়া। বুড়োর সুমুখে ঠেলে দেয় এক থালা ভাত আর এক হাঁড়ি তাড়ি বা মদ। বুড়ো জুত করে উঠে বসে। শীর্ণ ঘাড়টা সারসের মত ঝুঁকিয়ে অনুভব করে, এক হাঁড়ি তরল প্রাণের গন্ধ। এই জন্যেই তার বেঁচে থাকা।

—জিতা রহো বেটি। বুড়ো টুকিয়াকে আশীর্ব্বাদ করে!—তুই আছিস বলেই তোর বুড়ো বাপটা বেঁচে আছে। বুড়ো ডুকরে কেঁদে ফেলে।—আর তোর মা। অমন বউ দেবতারও হয় না রে টুকিয়া! বুড়ো ভাতের থালা সামনে টেনে নেয়।

দু'তিন মুঠো ভাত গিলে ক্লান্ত ঘোড়ার মত তাড়ির হাঁড়িতে ঠোঁট নামিয়ে দেয়। ঢকঢক করে খেয়ে ফেলে। থেমে নিয়ে তামাক টানে।

তাড়ি ভেজা নোংরা দাড়িতে মাছি উড়ে এসে বসে ঝাঁকে ঝাঁকে। ঠাণ্ডা ভাতের থালার গা বেয়ে পিঁপড়ের সারি উঠতে থাকে। বুড়ো বুঁদ হয়ে ঝিমোয়। তার সাদা ভুরু দুটো চোখের কোটরের ওপর পর্দার মত ঝুলে পড়ে।

এত দীনতা এলাচির সংসারে আজই দেখা দিয়েছে, চিরটা কাল এমন ছিল না। সেণ্ট্রাল জেলের জহ্লাদ ছিল এলাচি। মাইনে ছিল ভাল, উপরি আয়ও মন্দ হত না। সবচেয়ে মোটা দক্ষিণা আদায় হত ফাঁসির আসামীর মায়েদের কাছ থেকে।

মায়েরা বলত, দোহাই বাবা জমাদার! টানা-হ্যাঁচড়া করে ছেলেটাকে শেষ সময়ে আর কষ্ট দিস্‌নি বাবা!

—তা একটু করতে হবে বৈকি। সহজে কি আর কেউ তক্তায় উঠতে চায়, মায়িজী।

—না রে বাবা জমাদার। নে, বিশটা টাকা রাখ, এই রূপোটা নে। কিন্তু কথা রাখিস।

এলাচি খুশি হয়ে আশ্বাস দিত।—বেশ, বেশ, দড়িটা না হয় চর্বিতে ভিজিয়ে নেব ভাল করে, যাতে গলার চাম টাম ছ'ড়ে না যায়। তবে আরও দুটো টাকা

দাও, আমার মেয়ে মেঠাই খাবে।

এ-সব অনেকদিন আগের কথা। টুকিয়া তখন দু'বছরের মা-মরা শিশু।

ভাত আর তাড়ি। এই সামান্য অন্নপানটুকু মোড়ল হিসাবে তার প্রাপ্য দক্ষিণা। কিন্তু কেই বা আর শ্রদ্ধা করে খুশী মনে দেয়! ডোম গৃহস্থদের দ্বার হতে দ্বারে ঘুরে, অনুনয় করে, চোখ রাঙিয়ে, ঝগড়া করে টুকিয়া আদায় করে আনে মোড়লের এই সম্মানী।

ভিক্ষাজীবী ডোম মেয়েরাও টুকিয়াকে অনুকম্পার চোখে দেখে। তাদের বরাতেও ডালরুটি জোটে। টুকিয়া সম্মানী যা পায় তা দেখে তারাও লজ্জা পায়।

সমবয়সী ভিখিরী মেয়েরা ঠাট্টা করে বলে—বুড়োকে এবার একটি জামাই আনতে বল না টুকিয়া। তা হলেই তো তোর এ মেহন্নতের জ্বালা দূর হয়।

টুকিয়া তাদের গালে ঠোনা মেরে জানিয়ে দেয়—বুড়োর দেওয়া জামাই আমি নেব কেন? আমার বর বাছব আমি।

টুকিয়া চলে গেলে ভিখারী মেয়েরা আলোচনা করে। তারাও সে কথাটা শুনেছে। টুকিয়া জাতের বাইরে কার সঙ্গে ফেঁসেছে। পঞ্চের বৈঠকে এর নিষ্পত্তি হবে। টুকিয়াকে শাস্তি পেতে হবে।

গাঁয়ের সবারই চোখে টুকিয়া সুন্দর। পরবের দিনে খোলা মাঠে নৃত্যপরা টুকিয়ার তনুশোভা আড্ডার চোখে চোখে শোভা কুহকবাষ্প বুলিয়ে দেয়। বয়োবৃদ্ধেরাও আফসোস করে—ভাল নাচনী হত হে মেয়েটা, চাল-চলন যদি একটু নরম সরম হত। ঠিক কথা, সব মাটি করেছে ওর ঐ রুদ্রা স্বভাব, কনকধুতুরার মত। দূরে দাঁড়িয়ে শুধু তাকিয়ে থাকা যায়।

নতুন এক জোয়ান এসেছে এ গাঁয়ে। মঙ্গল তাঁর নাম। গাঁয়ের ওঝা তাকে আশ্রয় দিয়েছে। কিন্তু ধরা পড়ে গেল মঙ্গল। আসলে সে ডোম নয়, জংলী মুণ্ডা। তার ওপর আরও খবর পাওয়া গেছে, সে হলো ডাইনীর ছেলে। দেশ ছেড়ে এসে এখানে ডোম সেজে রয়েছে; চাকরি জোটাবার ফন্দিতে।

এ হঠকারিতার যথোচিত শাস্তি পেতে হল মঙ্গলকে। ডোমেরা নিদারুণভাবে পিটিয়ে তাকে গাঁয়ের বার করে দিল। ডাইনীর ছেলে গেল বটে, কিন্তু যাবার আগে তুক্ করে রেখে গেল গাঁয়ের সেরা জিনিসটিকে, যুবক-ডোমদের কামনার ধন ওই টুকিয়াকে। এ ব্যাপারে সমস্ত গাঁ জুড়ে যে বিক্ষোভের ঝড় উঠল, তার জের আজও মেটেনি, মিটছেও না।

গাঁয়ের সীমানার বাইরে, নালার ওপারে এক শিমূলগাছের তলায় কুঁড়ে বাঁধলো মঙ্গল। নড়বার নাম নেই, মঙ্গল যেন দুষ্টগ্রহের মত ঝুলে রইল ডোমগাঁয়ের দিগন্তে। কুকুর-মারা ঠ্যাঙ্গা হাতে ডোমেরা ক'দিন রইল তাকে-তাকে। বাগে পেলে এক বাড়িতে মঙ্গলের প্রণয়কলাপ আর ইহলীলা একই সঙ্গে ঘুচিয়ে দেবে। কিন্তু বেটা জংলী বড় জবরদস্ত, তার ওপর সর্বদা খোঁপায় ঝোলানো একগোছা বিষ-মাখানো

তীর। উড়ন্ত সাপের মত অলক্ষ্যে কখন কাকে এসে ছোবল দেবে কে জানে! কাজেই সংঘর্ষটা তেমন জমে উঠল না। ওঝার বহুদিনের মন্তরবন্দী অশরীরী পিশাচটাও জংলীকে ঘায়েল করতে পারল না।

প্রতিবেশীরা দলে দলে এসে বুড়ো এলাচিকে শুনিয়ে দিয়ে গেল—ও মোড়ল, হয় মেয়ের বিয়ে দিয়ে দাও, নয় মেয়েকে সামলাও। নইলে তোমাকে জাতে রাখা আর সম্ভব হবে না। আমাদের অন্য মোড়ল দেখতে হবে।

প্রতিবেশীদের হাত ধরে সকাতরে বুড়া বলে—কেন বেরাদার, তোমরা এত চটেছ কেন? কি করেছে মেয়েটা?

—কি করেছে? রাত বেরাতে মঙ্গলের সঙ্গে ঘুর ঘুর করছে। ওকে ভাত পৌঁছয়, শলা-পরামর্শ দেয়, সমস্ত পঞ্চ বিগড়ে উঠেছে এসব কুকাণ্ড দেখে। জাতের বাইরে···ছি ছি।

পঞ্চের গুপ্তবৈঠকে সিদ্ধান্ত হল, মঙ্গলকে জব্দ করা হোক। টুকিয়া ওকে ভাত পৌঁছতে পারবে না। বুড়ো মোড়লকে জানিয়ে দেওয়া হোক যে, এর ব্যতিক্রম হলে তারা একজোটে সম্মানী দেওয়া বন্ধ করবে।

মোড়ল এলাচিও ক্ষেপে গেছে। গেল গেল, সব গেল। বন্ধ হল তার ভাত আর মদ। ওঝার হাত ধরে মিনতি করে বলে—সবুর কর দোস্ত। সব ঠিক হয়ে যাবে। বুড়াকে পেটে মেরো না বেরাদার। ধর্ম ভুলে যেও না।

প্রত্যুত্তরে ওঝা আশ্বাস দিয়ে জানায়—সে ধর্মজ্ঞান আমাদের আছে। কিন্তু বেটিকে বুঝিয়ে দাও, জংলী শালা যেন মোটা না হতে থাকে, আমাদেরই ভাত মেরে।

—টুকিয়া, শোন্ বেটি। এলাচ আদর করে ডাকল।—পঞ্চের সভা এল বলে। তোর বর বাছাই হবে সেদিন। ওঝার ছেলের সঙ্গেই ঠিক করেছি। পঞ্চের সামনে গিয়ে কবুল করে নিবি। বুঝলি?

টুকিয়া সংক্ষেপে জানিয়ে দিল—সে আমি পারব না।

—কি পারব না? বুড়ো দারোগাই মেজাজে গলার স্বর চড়িয়ে প্রশ্ন করে।

—কি আবার রে বুড়া? যেন জানিস না কিছু? আমি মঙ্গলকে কথা দিয়েছি।

—কি? মঙ্গল? জাতের বাইরে? হুঁসিয়ার হো যাও হারামজাদী! নইলে এই বেত দিয়ে ফাঁসিয়ে ঘাড়টা একেবারে মুচড়ে দেব।

নিমীলিত চক্ষু বুড়োর মুখের সামনে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ তুলে টুকিয়া বলে—এই দেখ, হেই বুড়া! এই করবি তুই।

বুড়ো অবশ হাতে তার দু'পাশে হাতড়ে খুঁজতে থাকে, চেলাকাঠ, লাঠি বা ইট-পাটকেল। ততক্ষণে টুকিয়া ঘরের বাইরে।

সমস্তদিন মাঠে মাঠে ঘুরেছে মঙ্গল। গেরুয়া ধুলোয় শরীর ছেয়ে গেছে। মাটিতে একেবারে লুটিয়ে শুয়ে সে টুকিয়ার কথাগুলো গিলছিল। সামনে পলাশের একটা নীচু ডাল ধরে টুকিয়া হেলেদুলে বকে চলেছে।

—কাল থেকে তোর ভাত বন্ধ।

—বেশ তো, জঙ্গলের ডুমুর খাব।

—হাঁ, তাই খাবি।

—বলছি তো, তাই খাব। রোজ ডুমুর খাব। কিন্তু একদিন এসে দেখবি আমি মঙ্গল নই। ভালুক হয়ে ঝুলছি ডুমুরের ডালে। এই রোঁয়া, এই নখ, এই থাবা…

মঙ্গলের করুণ হাসি আর অভিমানের প্রলাপ থামিয়ে দিল টুকিয়া। পায়ের চেটো দিয়ে মঙ্গলের ধুলো ছাওয়া পিঠটা আস্তে আস্তে ঘষে দিয়ে বলল—বড় ঘাবড়ে গিয়েছিস, না রে মঙ্গল? ভয় কি তোর? আমি আছি! তবে তোকে কাজ করতে হবে।

চারদিকে সাবধানী দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিয়ে আর গলার স্বর নামিয়ে টুকিয়া বলে—রোজ রাত্তিরে একটু দৌড়াদৌড়ি করতে হবে। বল, রাজি আছিস?

-হুঁ।

—মাঠে মাঠে যাবি। খবরদার, সড়ক ছুঁস না যেন। লোহার পুলটা পেরিয়ে দেখবি ফুলের বাগিচা। পেছনের ঘেরান ভেঙে আস্তে আস্তে ঢুকে পড়বি। বেছে বেছে লাক্ষার গুটিভরা একবোঝা ডাঁটা নিয়ে আসবি। মারোয়াড়ী ঠিক করেছি। এক-এক বোঝা পাঁচ-পাঁচ টাকা।

মাঝরাত্রে মঙ্গল ফিরে এল হাঁপাতে হাঁপাতে। তার রক্তমাখা দেহটা পলাশতলায় কাঁটাগাছের মত লুটিয়ে পড়ল। পিঠে বল্লমের খোঁচা-লাগা একটা সুগভীর ক্ষত।—দারোয়ানে ঘিরেছিল রে টুকিয়া। উঃ, কোন মতে পালিয়ে এসেছি।

চালে ভুল হয়েছে। টুকিয়া ভাবনায় ডুবে রইল কতক্ষণ। এ পথে চলবে না রোজগার। প্রতিপদে মরণ আর জেল। জংলীর ওপর এতটা নিষ্ঠুর সে হতে পারবে না।

নতুন রোজগারের হদিস দিল টুকিয়া।—রিজার্ভ জঙ্গল থেকে মরা জানোয়ারের হাড় কুড়িয়ে নিয়ে শহরে গিয়ে বেচে আয়।

ভোর থেকে বিকেল পর্যন্ত তন্নতন্ন করে অরণ্যের জঠর হাতড়ে বেড়ালো মঙ্গল। একটা পুরনো উঁইঢিবি খুঁড়ে বার করল গোটা চারেক পাহাড়ী ডোমনার মেরুদণ্ড। মরা কেঁদগাছের ঝোপে পেল দু'ঝাড় হরিণের শিং। স্রোতের ধারে বালিতে আধ-পোঁতা নীলগাইয়ের পাঁজরাও পেল একটা।

হাড়ের বোঝা মাথায় নিয়ে জঙ্গলের গাছের ভিড় ঠেলে খোলা জমিতে পা দিতেই মঙ্গলের একেবারে মুখের ওপর এসে ঠেকল একটা ফেনসিক্ত ঘোড়ার মুখ। অশ্বারূঢ় জঙ্গল-দারোগা।

—লাইসেন্স?

হতভম্ব মঙ্গল হাড়ের প্রকাণ্ড বোঝাটা মাথায় নিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

—কি রে শ্বশুরকা নাতি? এটা তোর বাপের জঙ্গল?

মঙ্গলকে সদরে চালান করা হল। সপ্তাহ পরে খবর এল, কয়েদ, ছ' মাসের জন্য।

মঙ্গলের কুঁড়ের খুঁটি ধরে টুকিয়া কাঁদল।—বড় বেইজ্জৎ হল বেচারা। আর হয়তো আসবে না। বয়েই গেল তাতে। ডোমগাঁয়ে কি আর জোয়ান নেই? সূর্য, বংশী, বিদেশী…।

মঙ্গল জেলে। ডোমগাঁয়ের প্রজ্জ্বলিত সামাজিক উষ্মা ক্রমে স্তিমিত হয়ে আসে। টুকিয়ার পাণিপ্রার্থী ডোমমহলে সুপ্তভরসা আবার চাড়া দিয়ে ওঠে। সাপ সরে গেছে মালঞ্চ ছেড়ে। ফুল ধরতে অনেকগুলো হাত এগিয়ে এল এক সঙ্গে।

এল ওঝার ছেলে সূয ডোম। হাসপাতালের টি, বি, ওয়ার্ডের জমাদার। মোড়লের পা টিপে দিয়ে নিবেদন করলো—বাবা, এইবার ব্যাপারটা চুকে যাক্। আর দেরী নয়।

এল মশান মজুর বিদেশী ডোম। মড়ার লেপ-তোষকের তুলো আর নেবানো-চিতের কাঠকয়লা বেচে পয়সা জমেছে কিছু। ঘরে বসে রেজগি-ভরা পেতলের ঘটি ক'টার দিকে তাকায় আর একটি গৃহলক্ষ্মীর জন্যে মন আনচান করে। বুড়োকে একবোতল বিলিতি মদ প্রণামী দিল।—এইবার মন্তর পড়ে, টুকিয়ার সঙ্গে আমার হাত মিলিয়ে দাও, বাবা।

ময়নাঘরের দারোয়ান বংশী ডোমও এল। কত কচি ছেলেমেয়ে, মাগী-মরদ, ইংরেজ বাঙালীর লাস পার হয়েছে তার হাত দিয়ে। বেওয়ারিশ লাসের গা থেকে খুলে নেওয়া হাঁসুলি, চুড়ি, তাগা, হার—কত সামগ্রী! জমা হতে হতে তার তামার গাগরিটা প্রায় ভরে এসেছে। সটান বুড়োর পা জড়িয়ে ধরে প্রস্তাব জানাল।—একটু তাড়াতাড়ি কর বাবা।

বুড়ো এলাচিও মর্মে মর্মে বুঝে নিয়েছে যে তার বার্দ্ধক্যের একমাত্র নির্ভর একজন সুযোগ্য জামাই। নইলে, মদের অভাবে তার সুমুখের এই এমন সরস পৃথিবীটা শুকিয়ে গুঁড়ো হয়ে যাবে। কাউকেই হাতছাড়া করতে চায় না বুড়ো। সবাইকে সাগ্রহে আশ্বাস দেয়—সবুর সবুর, সব ঠিক হয়ে যাবে।

মঙ্গলের মুক্তির দিন এগিয়ে এল। ডোমগাঁয়ের প্রসুপ্ত বিক্ষোভ আবার শত শিখায় জ্বলে উঠল। পঞ্চের বড় বৈঠক হবে। চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হবে এইবার।

এলাচির যুক্তি যেটুকু ছিল তাও এল ঘোলা হয়ে। চোখের সামনে জাত ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে মেয়েটা। তাও কি না আবার একটা জংলা শেয়ালের সঙ্গে। হায় পরমাত্মা। কোন কাজেই আসবে না। মোড়লের আসন এবার সত্যিই টলে উঠল।

নেশাতে আজকাল আর সে আমেজ আসে না। মাথায় কেমন জ্বালা ধরে।—ভেজাল মেরেছে শালারা সব! জল মিশিয়েছে। বুড়ো মদের ভাঁড় লাথি মেরে হটিয়ে দেয়।

আগামী পঞ্চের বৈঠকেই হবে তার মৃত্যু। গত্যন্তর নেই। ঘরে একটা চণ্ডা মেয়ে আর বাইরে ক্ষমাহীন পঞ্চ।

এলাচির মনে পড়লো, হিজরে কাশী ডোমের পরামর্শটা। হ্যাঁ, কাশী কথাটা মন্দ বলেনি।

—টুকিয়া, টুকিয়া, টুকিয়া। বুড়ো গলা চিরে ডেকে ডেকে কেঁদে ফেলল।—জাত ছাড়বি তুই ?

—হ্যাঁ।

—আমি খাব কি ?

—তা আমি কি জানি ? মরিস না কেন ?

—অবুঝ হোস্ না বেটি। যদি জাতই ছাড়বি তো জংলীটার জন্যে কেন ?

—কার জন্যে ছাড়ি বল্তো ?

—কাশী একটা খবর দিচ্ছিল। শুনবি ? বুড়ো যথাসাধ্য তার গলার স্বর কোমল করে নিয়ে বলল—ব্যানার্জী ডাক্তারের বাড়ী কাজ করবি ? টাকা পয়সা ভালই পাবি। সামান্য ঝাড়ু-টাড়ু দিতে হবে।

—ওসব আমি পারব না বুড়া। মঙ্গলের ছেলে রয়েছে আমার পেটে।

—আহত নেকড়ের মত বুড়ো বিশ্রী চিৎকার ছাড়ে—কি ? কি বললি রে ধর্ম-হারা মেয়ে ?

এবার টুকিয়া হেসে ফেলল।—নে বুড়ো, খুব হয়েছে, থাম এবার। যত মদ খাবি, যত তামাকু খাবি সব দেব। তোর আর পঞ্চকে অত ভয় করতে হবে না ! কিছু ভাবতে হবে না তোকে। ওদের জবাব দিয়ে দে।

—জিতা রহো বেটি। বুড়ো টুকিয়াকে আশীর্বাদ করে। অবসন্ন বুড়ো ক্রমে ঘুমের ঘোরে নেতিয়ে আসে। টুকিয়া এক টুকরো চট পাকিয়ে এলাচির মাথার তলায় গুঁজে দেয়। গামছা দিয়ে বুড়োর গা মুছে হাত পায়ের আঙুল টেনে বাজিয়ে দেয়।—ঘুমো বুড়ো, ঘুমো। দুটো ভাত আর মদ, এই তো ? এইটুকু যদি না করতে পারি তবে আমি ডোমিন নই।

টুকিয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে। যেন তার চেতনা ছাপিয়ে হঠাৎ জেগে উঠেছে পুরামানবীর প্রাণের সেই কঠোর গর্ব।

গাঁয়ের সীমানা ছাড়িয়ে টুকিয়া মাঠের ধারে এসে দাঁড়াল। আজই তো তার খালাস হবার কথা।

সূর্য ডুবেছে অনেকক্ষণ ! ধানকাটা ক্ষেত ছেড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে তিতির উড়ে চলেছে। হায় হায়, পলাশতলার কুঁড়েটা একেবারে ধসে গেছে।

মৌরীবনের কিনারায় দাঁড়িয়ে গুল্তি ছুঁড়ছে কে ? হ্যাঁ, সেই তো !

—আর বসে বসে গুল্তি ছুঁড়লে চলবে না। রোজগার করবি তো কর। নইলে আমার আশা ছাড়।

এতদিনের অদেখার পর এই রূঢ় সম্ভাষণ। মঙ্গল টুকিয়ার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো।

—আচ্ছা, ভাবিস না। কাল আমার সঙ্গে সহরে যাবি। হাসপাতালে পাংখা

কুলির দরকার।

সদর শহর। জংলীর মুখে শব্দ নেই। সব ঝঞ্ঝাট টুকিয়াকেই একা ভুগতে হল।
—যা, ঐযে বাবুটি বসে আছে দোকানে, তাকে গিয়ে একটা দরখাস্ত লিখে দিতে বল। এমনি করে হাত তুলে আদাব জানাবি।

টুকিয়া সবই শাসিয়ে শিখিয়ে দেয়, মঙ্গল এগিয়ে যায় আর বিমুখ হয়ে ফিরে আসে।—অপদার্থ জংলী কোথাকার? আয় আমার সঙ্গে।

—বাবুজী! ঠোঁট দুটো পাতলা হাসিতে রাঙিয়ে নিয়ে, কালো চোখের তারা দুটো নাচিয়ে বাবুটির প্রায় গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে টুকিয়া বলে—বাবুজী! একটা দরখাস্ত লিখে দাও।

লেখা দরখাস্তটা নিয়ে টুকিয়া মঙ্গলের হাতে দিল—এই নে, এবার হাসপাতালে চল।

হাসপাতালের কেরাণীবাবুর সামনে দরখাস্তটা সঁপে দিয়ে মঙ্গল দাঁড়াল।

—অ্যাঁ, মুণ্ডা? তোম্ মুণ্ডা হায়?

—যাও, থানাসে সার্টিফিকেট লে আও। আচ্ছা দাঁড়াও।

টেলিফোনের চোঙটা তুলে নিয়ে কেরাণীবাবু ডাকলেন—হ্যালো সাবইনস্পেক্টর একবার রেজিস্টারটা দেখুন তো। নাম মঙ্গল মুণ্ডা, কোন ব্যাড ক্যারেক্টার কি না।

—ওরে বাবা! এ যে দেখছি সর্বগুণাধার নরোত্তম সি ক্লাস দাগী। সাব-ইনস্পেক্টরের প্রত্যুত্তর এল।—বাঘ ভালুকের মতিগতি তবু বোঝা যায় মশাই, কিন্তু এসব জংলী ফংলী…

ফোন নামিয়ে কেরাণীবাবু বললেন,—এই মঙ্গল মুণ্ডা, কেটে পড বাবা। তোম দাগী হ্যায়! নোকরি নেহি হোগা।

মঙ্গলের বর্ব্বর মস্তিষ্কে বোধগম্য হল না কিছু! টেলিফোনের চোঙটার দিকে তাকিয়ে তার সমস্ত শরীর ভয়ে ঝিম্ ঝিম্ করে উঠল। প্রেতের ভোঁতা মুখের মত ঐ বস্তুটা এখনি এক ফুঁয়ে যেন তার চোখের সব আলোটুকু নিবিয়ে দেবে।

অন্তরালবর্ত্তিনী টুকিয়া দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনল! আচমকা এসে কঠমুষ্টিতে মঙ্গলের হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল বাইরে।—চল্ বন বিড়ালের বেটা। তোকে আর চাকরী করতে হবে না।

নিঃশক্তিনীর প্রত্যেকটি অভিযান নিদারুণ নিষ্ফলতায় একে একে লুটিয়ে পড়ছে ধুলোয়। টুকিয়া ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে অনেকক্ষণ কেঁদে গুম হয়ে বসে রইল।

মঙ্গল হঠাৎ টুকিয়ার হাত ধরে বলে উঠল—এবার আমায় ছাড় টুকিয়া। তুই আর কাউকে বিয়ে কর। যাবার আগে তোদের ওঝা আর ঐ কেরাণীবাবুটাকে আমি বিঁধে দিয়ে সরে পড়ি।

—না, তোকে যেতে হবে না কোথাও। চল ঘরে, একটা কথা আছে।

বুড়ো এলাচি সগর্বে ও সহুঙ্কারে পঞ্চের হুকুম প্রত্যাখ্যান করেছে। মোড়লের পদ সে পরম তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ছেড়ে দিয়েছে। সে ও তার মেয়ের ওপর পঞ্চের কোন নির্দেশ চলবে না।

ওঝা শাসিয়ে গেছে—এবার ভূত লেলিয়ে তোদের বুকের কলজে চুরি করাব।

বুড়ো বেঁচেছে। খুশী হয়ে কন্যাটিকে আশীর্ব্বাদ করে আর দিনরাত স্বচ্ছ সুগন্ধ মদ খায়। কোথা থেকে আসে, কেমন করে আসে, সে খবরে তার তিলমাত্র ঔৎসুক্য নেই।

টুকিয়া আর মঙ্গলের ব্যস্ত সংসারযাত্রা সুরু হয়েছে এদিকে। ভোরে উঠেই মঙ্গল একবোঝা শাল আর নিমের দাঁতন মাথায় নিয়ে সহরে যায়। অত বড় জোয়ানের ঘাড়টাও দাঁতনের ভারে বেঁকে যায়। এর একটু রহস্যও আছে। বোঝার ভেতরে প্রচ্ছন্ন থাকে কমপক্ষে দশটি বোতল মদ—বাড়িতে লুকিয়ে চোলাই করা। সহরের একটা আড্ডায় এগুলির গতি করে মঙ্গল ট্যাঁক ভারী করে ফিরে আসে।

সিকি আধুলি টাকা। মঙ্গল জীবনে এই প্রথম নিজ হাতে রূপো ছুঁয়ে দেখলো। অপূর্ব এর স্পর্শসুখ, এ এক ধাতুময়ী মায়া। একটা নতুন নেশা। জংলীও আজকাল গোলাপী গেঞ্জী গায় দেয়। টুকিয়া সাবান দিয়ে গা ধোয় আর চুমকি বসানো কালো কালো শাড়ী পরে।

চন্দ্রগ্রহণের দিন। আজ সন্ধ্যে থেকেই ডোম-গাঁ প্রায় জনশূন্য। সবাই গিয়ে জড়ো হয়েছে সহরে। গ্রহণ লাগলেই গৃহস্থদের ঘরে ঘরে তারা দান কুড়িয়ে ফিরবে।

রাত্রিকালে বুড়ো এলাচিকে খাইয়ে শুইয়ে টুকিয়া মঙ্গলের ঘরে এল। দুজনে একসঙ্গে খেতে বসল—ভাত মাংস মদ। চোলান মদের জালাটা আর গোটা কয়েক বোতল সম্মুখে রাখা। আগামীকালের পণ্যসম্ভার আজ রাত্রেই গুছিয়ে রাখতে হবে।

পাহাড়ী ঝর্ণার মত কল কল করে হেসে টুকিয়া মঙ্গলের মাথা জড়িয়ে ধরে। একান্তভাবে তারই দাক্ষিণ্যের ওপর যাদের নির্ভর, এমন দুজনকে সে দুর্গতির হাত থেকে ছিনিয়ে এনেছে। ভাঙা সংসারকে সে আবার নিজের মহিমায় জুড়ে দিয়েছে। বুড়ো সুখী, মঙ্গল সুখী, সে সুখী, আরও একজন—সেও আজ তার রক্তের অন্ধকারে সুখসুপ্ত।

মঙ্গল বলে—মাঝে মাঝে আমার ভয় করে রে টুকিয়া। কখন আবার ধরা পড়ে যাই। বাঁচাবি তো?

—হ্যাঁ রে হ্যাঁ, বাঁচাব।

—তা তুই পারিস। তুই জাদু জানিস টুকিয়া। মঙ্গলের মনের মেঘ কেটে যায়, ও হাসতে থাকে।

—মঙ্গল মুণ্ডা হাজির হ্যায়! ঘরের বাইরে দরজার কাছে কনষ্টেবলের গলার হাঁক শোনা গেল। মঙ্গলের চোখ থেকে মুহূর্তপূর্বের নির্ভরতার আভাটুকু নিবে

গেল। টুকিয়া মুখে আঙুল ছুঁইয়ে জানিয়ে দিল—চুপ।

দেয়াল ধরে আস্তে আস্তে দাঁড়ালো টুকিয়া। নেশায় পা বেসামাল। বিস্রস্ত শাড়ীটাকে একটু গুছিয়ে জড়িয়ে নিয়ে দুয়ার খুলে বাইরে এসে দাঁড়ালো। কপাটের শেকলটা তুলে দিল।

গ্রহণের অন্ধকারে ছেয়ে রয়েছে পৃথিবী, বাইরের কিছু স্পষ্ট ঠাহর হয় না। টুকিয়া ডাকলো—কে?

—সতের নম্বরের বদমাস মঙ্গল মুণ্ডার ঘর এইটা না?

—হাঁ।

—তুই কে? একজন কনষ্টেবল এগিয়ে এসে টুকিয়ার মুখের ওপর লণ্ঠনটা তুলে ধরলো।

—আমি মঙ্গলের জরু।

—মঙ্গলকে বাইরে আসতে বল।

—সে তো ঘরে নেই, শিকারে গেছে।

—বেশ, তাহলে তুই সরে যা, ঘরের ভেতরটা দেখে রিপোর্ট লিখেনি।

—ঘরের ভেতর কেন যাবি? আমি যা বলছি, তোরা তাই লিখে নে।

—ও, বুঝেছি! একজন কনেষ্টবল পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢুকতে উদ্যত হল।

টুকিয়া বললো,—দাঁড়া সিপাহিজী, একটা কথা আছে। কনষ্টেবলটা টুকিয়ার মুখের দিকে জিজ্ঞাসুভাবে তাকিয়ে রইল।

—এঃ, নেশাতে যে একেবারে গলে রয়েছে গো! অপর কনষ্টেবলটাও এগিয়ে এল।

চালার খুঁটোতে বিলোল দেহভার হেলিয়ে দিয়ে চোখ বুজে দাঁড়িয়ে রইল টুকিয়া। ঠোঁটে সূক্ষ্ম শ্লেষশিখা, দুর্বোধ্য হাসির একটু ছায়া। বললো—বড় মেহের-বান আপনি সিপাহিজী। গরীবকে একটা বিড়ি খাওয়ান দেখি।

বিশ্লথ শাড়ীর আঁচলটায় হঠাৎ একসঙ্গে দুটো প্রলুব্ধ হাতের ক্রুর আকর্ষণ। টুকিয়া অনুভব করলো শুধু। প্রতিরোধের দুরাশায় তার অবশ হাতটা মাত্র একবার চমকে উঠেই স্থির হয়ে রইল।

ঘরের ভেতর একটা শব্দ! পাথুরে মেজেতে ঠোকর-লাগা শানিত টাঙির হিংস্র নিক্কণ।

টুকিয়া হঠাৎ অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে কনষ্টেবল দুজনের হাত দুটো ধরে বললো—শীগগির চলো এখান থেকে। একটু দূরে, আরো অন্ধকারে।

শান্ত রাত্রির বাতাসে সহরের দিক থেকে ভেসে আসছে ভিক্ষার্থী ডোমদের কলরব। গ্রহণকা দান! গ্রহণকা দান!

গ্রহণ ছেড়ে গেছে অনেকক্ষণ। আবার চাঁদের মুখ খুলেছে। চারদিকে ফুটে উঠেছে নতুন শুক্লিমার স্ফূর্ত শোভা।

একদল বনশূয়োর নামলো আলুর ক্ষেতের ওপর ! হুঁস হলো টুকিয়ার। তাড়াতাড়ি নালার জলে স্নান সেরে নিয়ে ক্ষেতের আল ধরে হেঁটে হেঁটে ঘরের দিকে চলল।

ভেজা কাপড়ে আস্তে আস্তে ঘরের ভিতরে ঢুকে দেখতে পায়, মঙ্গল অঘোরে ঘুমোচ্ছে। টুকিয়া ঠেলে ঠেলে তার ঘুম ভাঙালো।

কো টে শ ন

আমরা তিনজনই খুব ভাল করে দেখতে পেয়েছিলাম আর খুব স্পষ্ট করে শুনতেও পেয়েছিলাম ; তাই, যদিও দশটা বছর পার হয়ে গিয়েছে, তবু, সেই ঘটনার ছবিটা আজও আমাদের মনে পড়ে যায়। আমাদের ছাত্রজীবনের সেই ছোট শহরটি, যার একদিকে পাহাড় আর বন, আর একদিকে কলিয়ারী। সেই কলেজটি, যার একপাশে ইউক্যালিপটাস, সামনে একটা লেক—যার কালো জলে পাহাড়ের ছায়াটা টলমল করত। মিশন রোডের ধারে প্রভাদিদের সেই বাড়িটি, যার বারান্দার কাছে তারের জাল জড়িয়ে মাধবীলতা দুলত।

আমাদের কলেজের জন্মদিবসের উৎসবে প্রভাদি গান গাইতে রাজী হবেন কি ? রাজী করাতেই হবে।

প্রভাদিকে রাজী করাবার প্রতিজ্ঞা নিয়ে আমরা তিনজন একসঙ্গে ব্যস্ত হয়ে প্রভাদিদের সেই বাড়ির গেটের কপাট ঠেলে ভিতরে ঢুকে সেই মাধবীলতার কাছে এসেই থমকে গিয়েছিলাম। মাধবীলতার আড়ালের ওদিকে কে যেন কার কাছে কী যেন বলছে।

—বলতে সাহস পাচ্ছি না, কি বলব তাও বুঝতে পারছি না, কিন্তু তুমি বুঝে নাও—

দমকা বাতাসের একটা ঝড় কোথা থেকে ছুটে এল। মাধবীলতাও উতলা হয়ে দুলতে শুরু করে দিল। হলুদবরণ ছোট ছোট প্রজাপতিগুলি মাধবীলতার গা থেকে ছিটকে গিয়ে আর এলোমেলো হয়ে উড়ে চলে গেল। বাতাসের সাঁ-সাঁ শব্দটা যেন আড়ালের সেই কথাগুলির শেষদিকটা ছিঁড়ে নিয়ে উধাও হয়ে গেল। আর কিছু শুনতে পেলাম না।

এইবার খুব সাবধানে মাধবীলতার আড়ালের ওদিকে একটু উঁকি দিতেই দেখতে পেলাম, বিনয়দা আবার কী যেন বলবার চেষ্টা করছেন, আর তাঁর চোখের সামনে একটা থামের গায়ে হেলান দিয়ে ও মাথা নীচু করে মেঝের দিকে তাকিয়ে প্রভাদি কী যেন ভাবছেন।

প্রভাদির মুখটা কী অদ্ভুত রকমের লালচে হয়ে উঠেছে ! মনে হচ্ছিল, প্রভাদির খোঁপাটা যেন থর থর করে কাঁপছে। প্রভাদির সারা মুখ জুড়ে একটা নিবিড় তৃপ্তির হাসি বিহ্বল হয়ে রয়েছে। কিন্তু চোখের চাউনিটি করুণ। মাথা হেঁট করে মেঝের

দিকে তাকিয়ে যেন দু'চোখের এই করুণতা লুকিয়ে ফেলবার চেষ্টা করছেন প্রভাদি।

বোধহয় আমাদের দেখতে পেয়েছিলেন বিনয়দা।

—আচ্ছা, আমি এবার যাই। গলার স্বর চেপে খুব আস্তে কথাগুলি বলে, প্রভাদির নীরব মুখের দিকে তাকিয়ে, যেন একটা আশার আনন্দকে নীরবে হাসিয়ে নিয়ে বিনয়দা চলে গেলেন। প্রভাদি তেমনিই হেঁটমাথা হয়ে আর চুপ করে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন।

তারপর আমাদের হঠাৎ দেখতে পেয়ে চমকে উঠলেন প্রভাদি, কিন্তু বেশ হেসে হেসে আমাদের ডাক দিলেন: কী ব্যাপার। নরেন কী মনে করে? ওকি? অমিয় আর জীবেনও এসেছ দেখছি!

অনেক অনুরোধ করবার পর প্রভাদি শেষ পর্যন্ত রাজী হলেন। আমাদের কলেজের জন্মদিবসের উৎসবে তিনি মাত্র একটি গান গেয়ে চলে আসবেন।

জীবেন বলে, কিন্তু আপনি খুব ঠকবেন প্রভাদি, যদি—

প্রভাদি। কি?

জীবেন। যদি ভাস্করদার বক্তৃতা না শুনে চলে আসেন।

প্রভাদির চোখ দুটো যেন হঠাৎ আশ্চর্য হয়ে চমকে ওঠে: তোমাদের ভাস্করদা বুঝি খুব ভাল বক্তৃতা করেন?

অমিয় বলে, অদ্ভুত?

ভাস্করদা আমাদের কলেজের প্রফেসর, তিনি আমাদে. শহরের কেউ নন। তিনি কলকাতা থেকে এসেছেন। জীবেনের মামাবাড়ির সম্পর্কে তিনি জীবেনের দাদা হন বলেই আমরা সবাই তাঁকে ভাস্করদা বলে ডাকি। অমিয় অবশ্য এখনও মাঝে মাঝে ভাস্করদাকে সার্ বলে ডেকে ফেলে। দেখেছি, তাতে ভাস্করদা অখুশী না হয়ে বরং একটু খুশীই হন। তিনি শুধু আমাদের মত ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্রদের বাংলা আর ইংরেজী পড়ান। জৈন-মহল্লায় ছোট একটা বাড়ি ভাড়া নিয়ে তিনি সেখানে থাকেন। ভাস্করদার বাড়িতেও আমাদের আনাগোনা আছে।

কলেজের সে বছরের জন্মদিবসের উৎসবটা পার হয়ে বোধহয় ছ'টা মাসও পার হয়নি, আর একটা ঘটনা দেখে আমরা তিনজনেই আবার একসঙ্গে আশ্চর্য হয়েছিলাম। ভাস্করদার সঙ্গে প্রভাদির বিয়ে হয়ে গেল। মিশন রোডের বাড়ির মাধবীলতার ছায়ার কাছ থেকে সরে এসে প্রভাদি জৈনমহল্লার সেই বাড়ির একটি ঘরের ভিতরে এসে ঢুকলেন, যে ঘরে একটি আলমারিতে গোটা পঞ্চাশ বই আছে।

কিন্তু··· তবে···কেন যে প্রভাদি মাধবীলতার আড়ালে দাঁড়িয়ে অমন একটি লালচে মুখ আর অমন একটি নিবিড় হাসি নিয়ে বিনয়দার কথাগুলি চুপ করে শুনছিলেন···যাক্‌গে, যা হবার তা তো হয়েই গিয়েছে। বিনয়দা এখনও সেইরকম জেলাবোর্ডের অফিসে টাইপিস্টের কাজ করছেন, আর ভাস্করদাও তেমনই কলেজের ক্লাসে সাহিত্য পড়িয়ে যাচ্ছেন। এদিকে-ওদিকে, দাদাদের আর কাকাদের গল্পের বৈঠকের দরজায় আড়ি পেতেও এমন কোন কথা আমরা শুনতে পেলাম না, যাতে

মনে হতে পারে, কোথাও কোন গোলমাল হয়েছে, কিংবা কারও মনে কোন খট্‌কা লেগেছে।

প্রভাদিকে দেখেও বুঝতে পেরেছি, তিনি বেশ খুশী হয়েছেন। প্রভাদির বাড়ির মানুষেরাও বেশ খুশী। বিয়ের পরে প্রভাদি একদিন আমাদের তিন-জনকেই হরিণের মাংস খাবার নেমন্তন্ন করেছিলেন। প্রভাদিকে দেখে মনে হয়েছিল, জৈনমহল্লার এই বাড়িতে গোটা পঞ্চাশ মোটা-মোটা বইয়ের কাছে বসে-থাকা জীবনটা প্রভাদির কাছে যেন বেশ একটু গর্বের জীবনও হয়ে উঠেছে।

পেট ভরে হরিণের মাংস খাওয়ার স্বস্তি নিয়ে আর ঢেঁকুর তুলে আমরা যখন চলে যাবার জন্য তৈরী হচ্ছি, ঠিক তখন প্রভাদি আমাদের কাছে এসে কি-যেন ভেবে আর এদিক-ওদিক তাকিয়ে আমতা আমতা করে বললেন, কি খবর তোমাদের? কোন নতুন খবর আছে?

অমিয়। না, কোন নতুন খবর নেই।

প্রভাদির চোখ দুটো হঠাৎ উদাস হয়ে যায়। আনমনার মত বিড়বিড় করেন: কেউ কিছু বলছে না? কিছু শুনতে পাওনি?

আমি প্রশ্ন করি, কিসের কথা বলছেন প্রভাদি?

প্রভাদি। এই ধর, আমাদের বিয়ের কথা।

জীবেন হেসে ফেলে: মাসিমা বলছিলেন।

প্রভাদি। কী?

জীবেন। মাসীমা বললেন, বাপ রে বাপ, বাসরঘরে জামাই কী ইংরেজী কথাই না গর্জালে!

প্রভাদি হাসতে চেষ্টা করলেন। আমরাও রওনা হলাম। পথে যেতে যেতে জীবেনকে জিজ্ঞাসা করলাম, সত্যি নাকি রে? বাসরঘরেই ভাস্করদা—

জীবেন। হ্যা। আমিও শুনেছি।

—কী বলছিলেন ভাস্করদা?

জীবেন। অই—যে-সব কথা আমরা ভাস্করদার ক্লাসে রোজই শুনি। রিল্‌কে, কাফ্‌কা, ভেরলেঁ, মায়াকোভস্কি।

অমিয়। তারপর?

জীবেন। তারপর আর কি? বাসরঘরে যত মুখ্যুদের ভিড়, ওসব বড় বড় আই-ডিয়ার কথা ওরা বুঝবেই বা কী? আর ভাস্করদার ভাষাই বা বুঝবে কী? সবাই বোবা গবেটের মত শুধু চুপ করে শুনেছে।

শুনে আমরা একটুও আশ্চর্য হইনি। কারণ, ভাস্করদাকে আমরা যতটা চিনতে আর বুঝতে পেরেছি, ততটা চিনতে আর বুঝতে অন্তত এ শহরে আর কেউ পেরেছে কিনা সন্দেহ। ভাস্করদাকেও মাঝে মাঝে বলতে শুনেছি, এই শহরের মানুষগুলো আইডিয়ার দিক দিয়ে অত্যন্ত ব্যাকওয়ার্ড। মেডিইভ্যালও নয়, একেবারে স্টোন-এজ।

একদিন ক্লাসে সাহিত্য পড়াতে পড়াতে ভাস্করদা একটা অদ্ভুত কথা বলে উঠলেন, নেশন কিংবা সমাজের কালচারে তখনই অবক্ষয় অর্থাৎ ডেক্যাডেন্স দেখা দেয় যখন তাদের রুচি জেলাবোর্ডের কেরাণীদের রুচির মত হয়ে যায়।

একদিন কালচার নিয়ে প্রভাদির সঙ্গে তর্ক করতে করতে আমরাও ঠিক এই কথাগুলির প্রতিধ্বনি করেছিলাম। শুনেই চমকে উঠলেন প্রভাদি : এরকম কথা কে তোমাদের শোনালে ?

—ভাস্করদা নিজের মুখে আমাদের কাছে এ কথা বলেছেন।

কিছুক্ষণ গুম হয়ে থেকে প্রভাদি হেসে ফেললেন : আমিও একদিন তাই মনে করেছিলাম ?

—করেছিলাম। তার মানে ? আপনি কি এখনও তাই মনে করেন না ?

প্রভাদি আলমারিটার দিকে তাকিয়ে, যেন গোটা পঞ্চাশ বইয়ের ভিতরে গোপন-করা একটা প্রচণ্ড শূন্যতার দিকে তাকিয়ে বিড বিড করেন : এখন আর মনে না করলেই বা কী আসে যায়।

এর পর কিছুদিন ধরে আমরা প্রভাদিকে দেখতে পাইনি, কারণ দেখা করতে যাবার আর কোন দরকারও হয়নি। কিন্তু আমরা জানতাম যে, প্রভাদি এখন আর জৈনমহল্লার বাড়িতে নেই, মিশন রোডের বাড়িতে আছেন। দূর থেকে দেখেছি, মাধবীলতার ছায়ার কাছে ঘুরে বেড়াচ্ছেন প্রভাদি। জীবেনের কাছ থেকেই শুনতে পেয়েছিলাম, ভাস্করদার কাছ থেকে রোজই একটি করে চিঠি আসে প্রভাদির কাছে।

জীবেন বলল, একটা চিঠি আমি তোদের দেখাতেও পা... । ছোড়দি প্রভাদির টেবিল থেকে চুরি করে নিয়ে এসেছে।

—সত্যি ! চিঠিটা একবার দেখতে দে মাইরি, তোর পায়ে পড়ি জীবেন।

জীবেন দেখিয়েছিল চিঠিটা। আমরাও দেখে আশ্চর্য হয়েছিলাম। পুরো আট পাতার একটা চিঠি। চিঠি ভরে যত বড় বড় ভালবাসার কবিতার কোটেশন গিজ-গিজ করছে। তা ছাড়া আরও অনেক কথা। বিয়াত্রিচের উদ্দেশে দান্তে কী লিখে-ছিলেন। চোখের প্রথম দেখাতেই মেরিকে কেন ফ্যাণ্টম অব ডিলাইট বলে ওয়ার্ড-সোয়ার্থের মনে হয়েছিল। আরও ছিল ; ফরাসী ও জার্মান ভাষার কোটেশন। চিঠিটা পড়তে পড়তে হাঁপিয়ে উঠেছিল অমিয়।

আমি বললাম, ভাস্করদা নিজে কী লিখেছেন, সেগুলো আগে পড় অমিয়।

জীবেন বলে, সে-সব কিছু নেই। সবই বড় বড় কবি আর মনীষীদের কথার কোটেশন।

ভাস্করদা নিজের কোন আইডিয়ার কথা কি—

জীবেন। না, ও-রকম একটি কথা নেই।

যাক গে, শুধু জানতে ইচ্ছে করছিল, চিঠিগুলো প্রভাদির কেমন লাগছে। আর কারও ভাল লাগুক বা না লাগুক, অন্তত প্রভাদির তো ভাল লাগবে। ভাস্করদার মত মানুষকে বিয়ে করে প্রভাদি যে গর্বিত হয়েছিলেন, সে সত্যের প্রমাণ তো

প্রভাদির ঝকঝকে চোখের হাসিতেও একদিন দেখতে পেয়েছিলাম।

কিন্তু অনেকদিন পরে, প্রভাদির সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে যখন শুনলাম যে, তিনি আবার জৈনমহল্লার বাড়িতে চলে গিয়েছেন, তখন মাধবীলতার কাছে ছোট ছোট ঘাসের মাথার উপর একটা কাগজের টুকরো পড়ে থাকতে দেখে আবার আশ্চর্য হয়েছিলাম।

কাগজের টুকরোটা ভাস্করদার লেখা চিঠিরই একটা পাতা। চিঠিতে ল্যাটিনভাষার একটা কবিতার কোটেশন ধেবড়ে রয়েছে, বোধহয় রাতের শিশিরে ভিজে গিয়ে থাকবে।

প্রভাদিকে ঠিক বুঝতে গিয়ে কেমন যেন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ভাস্করদাকে দিন দিন আরও ভাল বুঝতে পারছি।

প্রভাদির সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা করি। প্রশ্ন করি, ভাস্করদা কোথায়?

প্রভাদি। ও ঘরে আছেন।

—কি করছেন?

—বই থেকে কোটেশন টুকছেন।

—কেন?

প্রভাদি। কার যেন আসবার কথা আছে।

—সেজন্যে কোটেশন কেন?

প্রভাদি। সেইজন্যেই তো কোটেশন দরকার। কোন কথা উঠলেই উনি ভাল ভাল আইডিয়ার রেফারেন্স দিয়ে অনায়াসে বুঝিয়ে দিতে পারেন যে—

—কী বুঝিয়ে দেন?

প্রভাদি। জানি না। তোমরা আবার আমার সঙ্গে তর্ক বাধিয়ো না।

প্রভাদির সঙ্গে আমরা তর্ক করিনি। দরকারও মনে করিনি। কারণ আমরা নিজেরাই দেখছি, ভাস্করদা কি-ভাবে শুধু আইডিয়ার মানুষ হয়ে চলতে চান! কারও বাড়িতে নিমন্ত্রণ হলেও ভাস্করদা রওনা হবার আগে কয়েকটা বই না হাতড়ে আর কিছু-না-কিছু…তত্ত্ব মনস্থ না করে যেতে পারেন না।

দয়ালবাবুর শ্রাদ্ধের উপাসনা শেষ হবার পর অনেকক্ষণ পর্যন্ত ঘরের ভিড় গম্ভীর ও নীরব হয়েছিল। আমরা বাইরের বারান্দায় চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলাম। হঠাৎ শুনতে পেলাম, কে যেন সেই নীরবতা প্রথম ভেঙে দিয়ে কথা বলে উঠলেন, ডেনিশ ফিলসফার কিয়েরকেগার্ড বলেছেন—

—কে রে? কে রে? মনে হচ্ছে ভাস্করদা কথা বলছেন। জীবেন ঘরের ভিতরে উঁকি দিয়েই দেখতে পায়, হ্যাঁ, এক প্রৌঢ় ভদ্রলোকের হতভম্ব মুখের দিকে তাকিয়ে ভাস্করদা কথা বলছেন।

ঘরের অনেকেই তখন কথা বলতে শুরু করেছেন, কাজেই আর শুনতে পেলাম না ভাস্করদা আর কী কী কথা বললেন। শুধু শুনতে পেলাম, আমাদের পাশ কাটিয়ে চলে যেতে যেতে হরিশবাবু বললেন, প্রফেসর ভদ্রলোক সত্যিই সাংঘাতিক বিদ্বান।

আমরাও প্রভাদির কাছে গিয়ে খবর দিতে দেরি করিনি : সত্যি প্রভাদি, ভাস্করদা যে একজন খাঁটি ইনটেলেকচুয়াল, এ কথা এ শহরে যাদের একটু রুচি টুচি আছে তারা সবাই স্বীকার করে।

ভাস্করদার ইনটেলেকচুয়াল দুঃসাহস দেখে আমরা মাঝে মাঝে চমকে উঠি! শহরের লাইব্রেরিতে রবীন্দ্র জন্মোৎসবের সভাতে একদিন সভাপতি হয়ে ভাস্করদা কত সহজে বলে দিলেন, রবীন্দ্রনাথের ভাষা নিতান্ত রুক্ষ ও শ্রীহীন, শেক্সপীয়র ড্রামা বুঝতেন না, জহরলালের ইংরেজী শুনলে হাসি পায়, আর মহাত্মা গান্ধীর অহিংসা মূলত কাউন্টার রেভল্যুশনারি ক্লৈব্য।

সভার শেষে অময় ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, আপনি কি করে এত নির্ভয়ে এসব কথা বলে দিতে পারলেন সার্?

ভাস্করদা বললেন, কেন বলে দিতে পারব না? আমার চিন্তার মধ্যে এক ফোঁটা ডগ্‌মা নেই। তা ছাড়া খাঁটি ওরিজিন্যাল কিছু বলতে হলে এ সব কথাই বলতে হয়।

পর পর আরও এমন কয়েকটা ঘটনা হয়ে গেল, যার পর বুঝলাম, ভাস্করদা কত অসাধারণ।

আমাদের কলেজের ফটকের সামনে একটা চলন্ত মোটর গাড়ীর ধাক্কা লেগে জটার মা নামে ভিক্ষুক বুড়িটা মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। বুড়ির মুখ দিয়ে গলগল করে রক্ত উথলে উঠল। কোথা থেকে হঠাৎ বিনয়দা ছুটে এসে জটার মাকে কোলে তুলে নিলেন, আর অপরাধী মোটরগাড়ীটার ভিতরে উঠে চেঁচিয়ে উঠলেন, চল হাসপাতাল।

আমরাও ছটফট করে বলাবলি করছিলাম, বিনয়দা, বিনয়দা, সত্যিই বিনয়দার মনটা—

ভাস্করদা গম্ভীরভাবে বললেন, রিপ্রেসড ডিজায়ার। নিতান্ত মর্বিডিটি। লোকটা ফ্রয়েডের পেশেন্ট।

অমিয়। এ কথা কেন বলছেন সার্?

ভাস্করদা। একে বলে ঘটনার অবজেক্‌টিভ ভিউ। ঘটনার মায়ায় পড়ে যে ধারণা হয়, সেটা ভুল ধারণা।

আমরা দেখেছি, অমিয়র সাত বয়সের ভাগ্নে নেপু প্রায়ই অমিয়কে জড়িয়ে ধরে অনুরোধ করে, সেই কাঠের গল্পটা আর একবার বল না মামা।

কাঠের গল্প আবার কি?

অমিয় বলে—আলিবাবার গল্প।

আলিবাবার গল্পটা কাঠের গল্প হবে কেন?

অমিয়। ওই যে, প্রথমেই আছে, আলিবাবা রোজ কাঠ নিয়ে শহরে ঘুরে ঘুরে বিক্রি করত।

নেপুর গল্পবোধের রকম দেখে আমরা হেসে ফেলেছিলাম।

কিন্তু ভাস্করদার কথা শুনে আমরা একদিন উলটো লজ্জা পেলাম। পড়াতে গিয়ে সাহিত্যের নানারকম সমালোচনা করছিলেন ভাস্করদা। ভাস্করদা বললেন, মাইকেলের মেঘনাদবধ কাব্যের মূল সুর হল যমবাদ।

যমবাদ?

ভাস্করদা। হ্যাঁ, যম, অর্থাৎ মৃত্যুর উপাসনা।

অমিয়। কেন এ কথা বলছেন স্যার্?

ভাস্করদা। সম্মুখ সমরে পড়ি বীরচূড়ামণি বীরবাহু চলি যবে গেলা যমপুরে। প্রথমেই যমের কথা আছে।

ভাস্করদা। ওটা রাবণের লিবিডো। রামায়ণ না বলে রাবণায়ন বলা উচিত। একটা নন-আরিয়ান পুরুষ একটা আরিয়ান নারীকে জোর করে ইয়ে করতে…এই তো গল্প।

একদিন প্রফেসর মহিমবাবু বার বার তিনবার আমাদের বাংলা ক্লাসের ঘরের কাছে ঘুরঘুর করে চলে গেলেন। ক্লাস শেষ হবার পর ভাস্করদা বললেন, উনি প্রিন্সিপ্যালের কাছে আমার নামে চুগলি করবার চেষ্টা অনেকদিন থেকে করছেন। তা না হলে এভাবে বার বার এখানে এসে উঁকিঝুঁকি দিয়ে—

কিন্তু সেই মুহূর্তে মহিমবাবু আবার ফিরে এসে ভাস্করদাকে বললেন, কাল আমার ছেলের অন্নপ্রাশন। কষ্ট করে অবশ্যই একবার যাবেন।

ভাস্করদা। অ্যাঁ?

মহিমবাবু। এইটুকু বলবার জন্যেই বার বার এসে…আপনি ক্লাস নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন তাই ফিরে গিয়েছিলাম।

মহিমবাবুর চলে যেতেই অমিয় বলে উঠল, আপনি মিথ্যে মহিমবাবুর নামে একটা অপবাদ দিয়ে—

ভাস্করদা। না, অপবাদ নয়।

অমিয়। তবে কি?

ভাস্করদা। একে বলে ডিট্যাচড্ ভিউ। এই নেমন্তন্নটা আমার ক্ষতি করবার চেষ্টা। উনি আমাকে জব্দ করতে চান। উনি জানেন, আমি এ ধরনের নেমন্তন্নে যাই না, যাবও না। কাজেই উনি এই কথা রটাবার সুযোগ পেয়ে যাবেন যে, পাঁচ টাকা আশীর্বাদী দেবার ভয়ে আমি নেমন্তন্নে যাইনি।

একটা সাধুকে ছেলেধরা সন্দেহ করে পাড়ার লোকেরা নির্মম প্রহার দিয়ে সাধুটাকে ভাস্করদার বাড়ির সামনে আধমরা করে রেখে দিয়েছিল। পুলিস এসে ভাস্করদাকে জিজ্ঞাসা করে, আপনি অন্তত কয়েকটা নাম বলুন, যারা এ কাণ্ড করেছে।

ভাস্করদা বললেন, আমি এ সব মারামারির কিছুই দেখিনি।

প্রভাদিকে আমরা জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ভাস্করদা স্বচক্ষে সব দেখেও এ রকম একটা মিথ্যে কথা কেন বলে দিলেন?

প্রভাদি বললেন, তোমাদের ভাস্করদাই জানেন।

—আপনি ভাস্করদাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন?

প্রভাদি। হ্যাঁ।

—কি বললেন ভাস্করদা?

প্রভাদি। তোমাদের ভাস্করদা বললেন, উনি, সমাজ-সচেতন মানুষ। তা ছাড়া সব ব্যাপারকে তিনি অ্যানালিটিক্যালি বিচার করেন।

কথাগুলি বলতে বলতে প্রভাদি হেসে ফেললেন। আর হাসতে গিয়ে প্রভাদির মুখটাও শুকনো খটখটে হয়ে গেল। অমন সুন্দর মুখখানা দেখতে কেমন বিশ্রী হয়ে গেল। মনে হল, প্রভাদির চোখের কোণে কী যেন ধিকধিক করে জ্বলছে।

ভাস্করদা প্রায়ই বলেন, তিনি চেষ্টা করলেও কখনও কমনপ্লেস হতে পারেন না। কারণ তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী, তাঁর ইনটেলেক্ট, তাঁর ইমোশন—সবই তাঁব নিজস্ব, সেণ্ট-পারসেণ্ট ওরিজিন্যাল। কলকাতায় বিলিতী সদাগরী আফিসে হাজার টাকা মাইনের চাকরি তিনি নাকি অনেকবার পেয়েছিলেন। কিন্তু টাকাকে ঘৃণা করেন বলেই তিনি মোটা মাইনের সেসব চাকরি নিতে পারেননি। দু শো টাকা মাইনের প্রফেসারী নিয়েও তিনি এই কারণে সুখী যে, তিনি ইচ্ছামত তাঁর আইডিয়ার জীবন যাপন করতে পারছেন। আইডিয়ার কথা বলতে পারছেন। এবং একদিন কথায় কথায় বেফাঁস বলেও ফেললেন—অন্তত প্রভার জীবনকে আমি অ্যান্টি ইণ্টেলেকচুয়াল মতলবের ফাঁদ থেকে, একটা বাজে জীবনের মেডসার্ভেণ্টপনা থেকে উদ্ধার করতে পেরেছি, এই আমার সান্ত্বনা—আমার গর্বও বলতে পার।

প্রভাদি তৎক্ষণাৎ ঘর ছেড়ে বারান্দার দিকে চলে গেলেন। আর ভাস্করদাও অদ্ভুত এক গর্বের হাসি হেসে আমাদের দিকে তাকিয়ে একটা হাঁপ ছাড়লেন: তারপর? তোমাদের থিয়েটার কবে?

কিন্তু মাত্র তিন দিন পরে আবার আশ্চর্য হলাম। হরিশের কাকা ছুটিতে কলকাতা থেকে এসে আমাদের কাছে খোঁজ দিলেন: তোমাদের কলেজে ভাস্কর রায় নামে কোন প্রফেসর আছে নাকি হে?

—আছে।

—লোকটা এ রকম চাকরির কাঙাল কেন?

—কি করেছেন ভাস্করদা?

—কি না করেছে? রাসেল অ্যাণ্ড এলগিনের আলকাতরা ডিপার্টমেণ্টে তিন শো টাকা মাইনের একটা চাকরির জন্য বার বার সাতবার দরখাস্ত পাঠিয়েছে। তার ওপর, আমি ইংরাজ জাতিকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি বলে মনে করি, আমি কোনকালে দেশের স্বাধীনতার হাঙ্গামায় যোগ দিইনি, ইত্যাদি হেন-তেন কত বাজে কথাই না লিখেছে। পড়ে সাহেবগুলো কী ভয়ানক লজ্জা পেয়েছে!

খবরটা প্রভাদির কাছে পৌঁছে দিতে আমরা দেরি করিনি। আর প্রভাদিও কয়েকদিন পরে আমাদের বললেন, হ্যাঁ, আমি তোমাদের ভাস্করদাকে জিজ্ঞাসা

করেছিলাম।

—সত্যিই কি ভাস্করদা এসব কথা লিখে দরখাস্ত করেছেন?

প্রভাদি। হ্যাঁ।

—কেন?

প্রভাদির গলার স্বর তপ্ত হয়ে উঠল: তা আমি জানি না।

—একবার ভাস্করদাকে একটু জিজ্ঞাসা করে যদি জানতে পারেন, তবে—

প্রভাদি। বেশ তো, এখনই জিজ্ঞেস করছি।

বারান্দার উপর চুপ করে দাঁড়িয়ে আমরা শুনলাম, প্রভাদি ঘরের ভিতরে ঢুকে বেশ শান্ত স্বরে কথা বলছেন: এরকম দরখাস্ত করবার কী দরকার ছিল? কেন করলে?

আমরা শুনলাম, ভাস্করদাও বেশ শান্তস্বরে বলছেন, জেম্‌স বলেছেন—

প্রভাদির গলার স্বর হঠাৎ যেন কঠোর আর্তনাদের মত বেজে উঠল: জেম্‌স কী বলেছেন জানতে চাই না। তুমি কী বলতে চাও, তাই বল। আমি তোমার কথা শুনতে চাই।

বুঝতে পারছি, ভাস্করদা আস্তে আস্তে হাসছেন আর কথা বলছেন: আমি জেমসের কথা দিয়েই আমার কথা বলছি, এটা হল প্র্যাগমেটিক ভিউ অব লাইফ। যদি বুঝতে না পার, তবে চুপ করে থাক। জেলাবোর্ডের কেরানীরা যে-ভাষায় কথা বলে, আমিও কি—

আর শুনতে পেলাম না। ঘরের ভিতরে ঝন্‌ঝন্‌ করে একটা শব্দ যেন আছাড় খেয়ে পড়েছে।

কি হল? দরজার কাছে এসে খুব সাবধানে উঁকি দিয়ে দেখতে পেলাম, প্রভাদি স্তব্ধ হয়ে টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে বইয়ের আলমারিটার দিকে তাকিয়ে আছেন, আর টেবিলের ফুলদানিটা মেঝের উপর চুরমার হয়ে পড়ে রয়েছে। মনে হচ্ছে, হঠাৎ প্রভাদির হাতের ঠেলা লেগে ফুলদানিটা পড়ে গিয়েছে।

আর দাঁড়িয়ে থাকবার সাহস ছিল না। তা ছাড়া, আমাদের যা জানবার ছিল তা তো জানাও হয়ে গেল।

কিন্তু পা টিপে টিপে চলে যাবার সময়, সেদিন প্রায় সারাক্ষণ ধরে, এবং তার পরেও বেশ কিছুদিন ধরে, প্রভাদির এই স্তব্ধ চেহারাটা মনে পড়তেই আমাদের কানের কাছে যেন ফুলদানের আছাড়-খাওয়া শব্দটা ঝন্‌ঝন্‌ করে বেজে উঠত। মনে হত, প্রভাদি যেন এখনও জৈনমহল্লার সেই বাড়ির একটি ঘরে, একটা বইয়ের আলমারির দিকে তাকিয়ে আর স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, আর বুকের ভিতরে একটা ভাঙনের ঝন্‌ঝন শব্দ শুনছেন।

ভাস্করদার জন্য অবশ্য আমাদের মনে কোন চিন্তা নেই, দুঃখও নেই। তিনি যেমন ছিলেন, তেমনই আছেন। বড়দিনের ছুটি পার হয়ে যাবার পর প্রথম যেদিন ভাস্করদার বাড়িতে গেলাম, সেদিনও শুনতে পেলাম, ভাস্করদা ঘরের ভিতরে বসে

গম্ভীর স্বরে বলছেন, মার্ক্স বলেছেন—

একটা পালটা জবাবের স্বরও শোনা গেল : না না, আপনি বলুন আপনি কি বলতে চান ?

টুলুর দাদামশাই হন, সেই বুড়ো বেদান্তশাস্ত্রী মশাই এসেছেন। ঘরের ভিতরে ভাস্করদার সঙ্গে কথা বলছেন।

ব্যাপারটা একটু পরে বুঝলাম। বেদান্তশাস্ত্রী মশাই রামানুজ সম্বন্ধে লেখা তাঁর ছোট বইটি প্রায় সারাক্ষণ হাতে নিয়ে বসে থাকেন, আর সুযোগ পেলেই যাকে-তাকে সেই বইটি পড়ে শোনান। সেই বইটি হাতে নিয়ে বেদান্তশাস্ত্রী মশাই আতঙ্কিতের মত ভাস্করদার মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলছেন।

ভাস্করদা বললেন : ভূমিকাতে আপনি হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে যা বলেছেন, তা নিতান্ত ভুল। আসল কথাটাই লেখেননি। মার্ক্স বলেছেন—

—কি বলেছেন ?

ভাস্করদা। মার্ক্স বলেছেন, হিন্দুধর্মের এসেন্সিয়াল অর্থাৎ সার কথা হল বানর-পূজা।

বেদান্তশাস্ত্রীমশাই ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে বিড়বিড় করেন : আপনি ওভাবে পরের কথা তুলে—

ভাস্করদা। পরের কথা কেন মনে করছেন ? মনে করুন না, আমার কথাই মার্ক্স অনেকদিন আগে···হ্যাঁ, আসুন তা হলে।

বেদান্তশাস্ত্রীমশাই চলে গেলেন। আর, অমিয় ভাস্করদার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ মেজাজ হারিয়ে কি যেন চেঁচিয়ে বলে ফেলার চেষ্টা করতেই আমরা অমিয়কে এক ঠেলা দিয়ে বারান্দা থেকে নামিয়ে দিলাম। অমিয় কিন্তু শান্ত হয়েও বলতে ছাড়ল না : সার্ মশাই কিন্তু এখনও বুঝতে পারছেন না যে—

—কি ? কি বলতে চাস তুই ?

অমিয় আবার আস্তে আস্তে গরগর করে : কিচ্ছু বলব না। আমাকে মেরে ফেললেও বলব না।

প্রভাদিকে দেখে মনে মনে চমকে উঠতে হল। রান্নাঘরের দাওয়ার উপর একটা মোড়ার উপর চুপ করে বসে যেন শুধু আকাশটাকে দেখছেন। প্রভাদির হাতের কাছে এক পেয়ালা চা জুড়িয়ে ঠাণ্ডা হয়ে রয়েছে। জট পাকানো উলের একটা দলা প্রভাদির কোলের উপর পড়ে আছে। মনে হচ্ছে, উলের জট খুলতে বৃথা চেষ্টা করছেন প্রভাদি।

অমিয়টা যেন নিষ্ঠুর হিংসুকের মত প্রভাদির চেহারার এই উদাস শান্ততা খুঁচিয়ে ব্যথিত করে দেবার মতলবে প্রভাদির কাছে এসে বলতে থাকে, আপনিও শুনেছেন নাকি প্রভাদি ?

প্রভাদি। কি ?

—মার্ক্স বলেছেন যে—

প্রভাদি কিন্তু শান্তভাবে হাসতে থাকেন : হ্যাঁ জানি, কাল দেখেছি, ভদ্রলোক একটা বই থেকে কথাগুলো টুকে রাখছেন।

জীবেন তবু বোকার মত প্রশ্ন করে, কে ? কে ?

প্রভাদি গম্ভীর হয়ে যান : কে আবার ? তোমাদের বিদ্বান ভাস্করদা।

প্রভাদি আনমনার মত চুপ করে কিছুক্ষণ কী যেন ভাবলেন। ভাস্করদার ঘরের দরজাটার দিকে তাকালেন। কী আশ্চর্য, প্রভাদির চোখের কোণ দুটো যেন জ্বলছে!

তারপর মোড়া থেকে উঠে ভাস্করদার ঘরের দিকে চললেন প্রভাদি। আমরাও বললাম, আজ তবে আসি প্রভাদি।

প্রভাদি আমাদের কথা শুনতেই পেলেন না বোধ হয়। কোন উত্তর দিলেন না। চলে যাবার রকম দেখিয়েও কিন্তু আমরা চলে যাইনি।

আর, অমিয় তো আমাদের কানের কাছে ফিসফিস করে বলেই ফেলল : শুনতে হবে।

ভাস্করদার ঘরের পিছনে দেয়াল ঘেঁষে জানলার কাছে দাঁড়িয়ে আমরা সবই শুনতে পেলাম।

ভাস্করদা বিস্মিত হয়ে বলছেন, কি বললে ?

প্রভাদি। খুব স্পষ্ট করেই তো বলছি, শুনতে পাচ্ছ না কেন ? তুমি শুধু একটি কোটেশন।

ভাস্করদা। তার মানে ?

প্রভাদি। তুমি বুঝে দেখ।

ভাস্করদা। তুমি বলতে চাও, বই পড়ে আমার মাথা—

প্রভাদি। না, বই তোমার মাথা খায়নি, তুমি বইয়ের মাথা খেয়েছ।

—তার মানে ?—ভাস্করদা এইবার চেঁচিয়ে উঠলেন।

প্রভাদি কিন্তু একটুও দমলেন না : বেশ তো, যদি সাধ্যি থাকে তবে বল না কেন, নিজের মন দিয়ে, নিজের কথা দিয়ে বল। এই এক বছরের মধ্যে ঘরের মানুষের কাছে বসেও মনের কোন্ কথাটা বলতে পেরেছ শুনি ? তোমার নিজের মনে কি কোন কথা নেই ? তোমার নিজের মুখে কি কোন কথা ফোটে না ?

ঘরের ভিতরটা বেশ কিছুক্ষণ যেন বোবার ঘরের মত নীরব ও স্তব্ধ হয়ে রইল।

কাজেই ভয়ে ভয়ে আর খুব সাবধানে জানালা দিয়ে উঁকি দিতে হল।

প্রভাদির চোখ থেকে ঝরঝর করে জল ঝরে পড়ছে। আর ভাস্করদা বিরক্ত হয়ে বিড়বিড় করছেন : টিয়ার্স, আইড্‌ল টিয়ার্স।

প্রভাদির সেই জলভরা চোখও যেন দপ করে জ্বলে উঠল : বা, বেশ সুন্দর কোটেশন। ছিঃ!

ভাস্করদা। কি বললে ?

প্রভাদি। আজও পারলে না। ঘরের মানুষকে নিজের ভাষায় একটা সান্ত্বনাও দিতে পারলে না। ছিঃ!

প্রভাদি ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। কোন্ দিকে গেলেন জানি না, বোধহয় রান্না-ঘরের দাওয়ার উপর পড়ে-থাকা সেই জট-পাকানো উলের দিকে। আমরাও পা টিপে টিপে সরে গিয়ে একেবারে গেট পার হয়ে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ালাম।

এখন আর জৈনমহল্লার বাড়িতে নয়, প্রভাদি অনেক দিন ধরে মিশন রোডের বাড়িতেই আছেন। আমরা পথ দিয়ে যেতে দেখতে পাই, মাধবীলতার গা ছুঁয়ে ছুঁয়ে আবার হলুদবরণ প্রজাপতি ফুরফুর করে উড়ছে।

আমাদের উৎসাহও যেন একটা ধাঁধায় পড়ে থিতিয়ে যাচ্ছিল। না জৈনমহল্লার বাড়িতে, না মিশন রোডের বাড়িতে, কোথাও যাবার আর কোন তাগিদ ছিল না।

তবু একদিন ভাস্করদার বাড়িতে যেতে হল। কারণ পথ দিয়ে যেতে যেতে ভাস্করদার বাড়ির ফটকের কাছে একটা নতুন দৃশ্য দেখে আমরা একটু আশ্চর্য হয়েছিলাম।

এত বড় বিদ্বান ভাস্করদা, যিনি বুড়ো বেদান্তশাস্ত্রী মহাশয়ের দিকে তাকিয়ে একটা নমস্কারের ভঙ্গীও করতে পারেননি, তিনি একেবারে কুঁজো হয়ে একজন ছোকরা-বয়সের ভদ্রলোককে নমস্কার জানাচ্ছেন।

অমিয় বলে, এই ভদ্রলোক হলেন টুলুর জামাইবাবু, ভুলুবাবু। কলকাতার একটা সাপ্তাহিক কাগজের সম্পাদক। টুলু বলেছে, ভুলুবাবুকে নেমন্তন্ন করেছেন ভাস্করদা।

ভুলুবাবুকে সঙ্গে নিয়ে ঘরের ভিতরে ঢুকলেন ভাস্করদা। আমরাও আমাদের সেই পুরনো চোরা কৌতূহলের অভ্যাসে ভাস্করদার ঘরের জানালার কাছে এসে চোরের মত আড়াল হয়ে দাঁড়ালাম।

ঘরের টেবিলের উপর ভাল ভাল খাবার সাজানো। বুঝতে পারছি, সম্পাদক ভুলুবাবুর জন্যেই টেবিল ভরে সমাদর সাজিয়ে রেখেছেন ভাস্করদা।

তারপরেই দেখলাম, গ্রেট আইডিয়ার আর বিদ্যার একজন সুপারম্যান বলে আমরা যাঁকে এতদিন জেনে এসেছি, সেই ভাস্করদার চোখে মুখে যে কী করুণ আবেদন আর আকুলতা। বার বার বললেন: দয়া করে আমার একটা লেখা ছাপুন স্যার্।

ভুলুবাবু বলেন, দয়ার প্রশ্ন নয়। কথা হল, ছাপবার যোগ্য লেখা হলেই ছাপাব। আপনি শুধু বড় বড় পণ্ডিতদের লেখা থেকে একগাদা কোটেশন দিয়ে যে-লেখা লেখেন, সে লেখা তো ইচ্ছে করলে যে-কোন স্কুল-বয়ও লিখতে পারে।

ভাস্করদা। কিন্তু—

ভুলুবাবু। এর মধ্যে কোন কিন্তু-টিন্তু নেই ভাস্করবাবু। নিজের মনের বাজে কথাও যদি কেউ গুছিয়ে লেখে, তবু সেটা লেখা হয়, আর্ট হয়। আপনি আগে লিখতে শিখুন, তারপর বড় বড় তত্ত্বের কথা লিখুন। তা না হলে মাপ করবেন। —বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালেন, ভুলুবাবু। এক চুমুকে এক গেলাস জল খেয়ে নিয়ে বললেন, নমস্কার, আসি তা হলে।

ভাস্বরদার চোখ-মুখের চেহারা দেখে আমাদের যে লজ্জা হচ্ছিল সেটা বড় কষ্টের লজ্জা। তার উপর অমিয় আবার একটা ঠাট্টার কড়া ফোড়ন দিয়ে সে লজ্জাকে যেন একেবারে তেতো করে দিল : সিংহচর্মে আবৃত·· থাক আর বলে কাজ নেই।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা, অমিয়র অনুরোধের চাপে পড়ে মিশন রোডে প্রভাদির বাড়িতে যেতে হল। কে জানে, অমিয়র কী যেন দেখবার দরকার হয়েছে। মুখ খুলে কিছু বলে না অমিয়, শুধু বলে, চল্ না, আজ গেলেই দেখতে পাবি।

—কী দেখতে পাব?

অমিয় বলে, জানি, কিন্তু বলব না।

বেশ গাঢ় অন্ধকারের সন্ধ্যা। তারাভরা আকাশ। শালবনের দিক থেকে যে ঝড়ো বাতাসটা ছুটে আসছে, সেটাও বেশ মিষ্টি। প্রভাদিদের বাড়ির গেটের কাছে এসে আমরা দাঁড়ালাম।

হ্যাঁ, প্রভাদির বারান্দায় আলো জ্বলছে। মাধবীর লতাগুলি যেন উতলা এক কুহকিনীর এলোচুলের মত ছটফটিয়ে দুলছে।

কি? তোমরা কি মনে করে?—পিছন থেকে গম্ভীর প্রশ্নের বাধা পেয়ে চমকে উঠে দেখলাম, ভাস্বরদা এসেছেন।

অগত্যা ভাস্বরদার পিছু পিছু হেঁটে আমরা এগিয়ে চললাম। কিন্তু বেশী দূর আর যেতে হল না। মাধবীলতার কাছে এসে ভাস্বরদা যেন থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন, অগত্যা আমরাও থমকে গেলাম।

সেই সেখানে, যেখানে প্রায় এক বছর আগে প্রভাদিকে হেঁটমাথা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম, ঠিক সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন প্রভাদি। আর সেই বিনয়দা, প্রায় এক বছর আগের সেই দিনে যেখানটিতে দাঁড়িয়ে প্রভাদির সঙ্গে কথা বলছিলেন বিনয়দা, তিনিও ঠিক সেখানটিতে দাঁড়িয়ে আছেন।

বিনয়দার মুখের কথাগুলিও শুনতে পেলাম। মনে হল, এই কথাগুলিকে সেদিনও বোধহয় বলেছিলেন বিনয়দা। একটা ঝড়ো বাতাস সোঁ সোঁ করে কথাগুলিকে হঠাৎ ছিঁড়ে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল বলেই আমরা সেদিন শুনতে পাইনি।

বিনয়দা বলছেন : আমি জানি, তুমি কোন ভুল করনি। যা করা উচিত, তুমি তাই করেছ। আমিও জানি, আমি ঠকিনি। আমার মনে সেদিন যে ছিল, সে আজও আমার মনেই আছে। একটু দূরে চলে যাওয়া, একটু চোখের অদেখা হওয়া, এই তো? সেজন্যে সে আমার পর হয়ে গেছে বলে আমি মনে করি না।

প্রভাদির চোখ দুটো করুণ, কিন্তু মুগ্ধ মুখটা যেন নিবিড় এক তৃপ্তির হাসিতে বিহ্বল হয়ে রয়েছে।

ভাস্বরদাও সবই দেখছেন আর শুনছেন। হতভম্ব চোখ দুটোকে একবার কাঁপিয়ে নিয়ে বিড়বিড় করেন ভাস্বরদা : আশ্চর্য, তোমাদের প্রভাদি হাসছেন বলে মনে হচ্ছে?

অমিয়। হ্যাঁ স্যার্।

ভাস্করদা। কিন্তু এ কী রকমের হাসি?

অমিয়। খুব রি-অ্যাকশনারী হাসি বলে মনে হচ্ছে সার্।

নির্বন্ধ

দামোদর বাঁকের ওপর চিত্রপুর থানা। কত ভদ্রলোক এখানে বেড়াতে এসে বিমুগ্ধ মন্তব্য করেছেন—'এ তো থানা নয়, এ যে স্যানাটোরিয়াম।' বাস্তবিক চিত্রপুরের জল এত মিঠে, আকাশ এত নীল, বাতাস এত গা-জুড়ানো, এত স্বাস্থ্যপ্রাণ এর রূপালী রোদ।

কেউ বা বলেছেন—'এ তো থানা নয় এ যে আশ্রম।' হঠাৎ দেখলে তাই মনে হয়। সুগন্ধ ও সুবর্ণ দেশী বিদেশী ফুলে ভরা থানার বাগান, কাঠগোলাপের বেড়া দিয়ে ঘেরা। সামান্য বাতাসে গন্ধামোদে ভরে ওঠে। নানা জাতের বাহারে লতা মাচান বেয়ে উঠছে থানাবাড়ির চালার ওপর। টালির চালা ছেয়ে গেছে সবুজ পাতার আস্তরণে।

অনেক নীচে নেমে দামোদর। দু'পাশে গেরুয়া পলিমাটি ছড়িয়ে দামোদরের পাথুরে শিরদাঁড়া এঁকে বেঁকে মিলিয়ে গেছে দক্ষিণের পাহাড়ের ভিড়ে।

দারোগা বিভূতির ছ'বছর হয়ে গেল চিত্রপুরে। এত সুন্দর জায়গাটা, কিন্তু তবুও—ছ'বছর থাকার পর আর মন টেঁকে না। অন্য থানায় বদলী হবার চেষ্টা করে। তার ওপর রয়েছে আর একজনের তাগিদ—বিভূতির স্ত্রী মায়া। সবচেয়ে বেশি অতিষ্ঠ হয়েছে মায়া। শুধু একটানা একঘেয়ে ছ'বছর এক জায়গায় থাকাটাই তার কারণ নয়। স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে এ প্রসঙ্গ নিয়ে ছোটখাট বচসা প্রায়ই হয়।

মায়া বলে—বদলী হও এখান থেকে।

বিভূতি—কোথায় যাবে? মির্জাবাদে? কালাজ্বরে গিলে খাবে।

মায়া—তবুও ভাল। দিনরাত্তির মারধর, 'বাপ-রে মা-রে' আর শুনতে পারি না।

বিভূতি—যেখানেই যাও, এ শুনতেই হবে।

মায়া—তাহলে আমায় পাঠিয়ে দাও ধানবাদ, বাবার কাছে।

বিভূতি এবার ভাল করে তর্কের জন্য প্রস্তুত হয়ে নেয়—বাবার সঙ্গে হাসপাতালের কোয়ার্টারে এতদিন ছিলে কি করে, যেখানে যখন তখন মানুষ চেড়াফাঁড়া চলেছে? সেখানে 'বাপ-রে মা-রে' নেই?

মায়া—কিসের সঙ্গে কিসের তুলনা? সেখানে মানুষের ভালোর জন্যে, রোগ সারাবার জন্যে চিকিৎসা হয়। সে বাপ-রে মা-রে অন্য রকম।

বিভূতি—এখানে বুঝি রোগ বাড়ানো হয়? গুঁতোগুঁতি এমনিতে দেখতে বড় খারাপ, কিন্তু কেসগুলো কেমন চটপট পরিষ্কার হয়ে যায়। এটা থানা, বজ্জাতি সারানো হয় এখানে। তোমার হাসপাতাল এমন কিছু স্বর্গ নয়।

মায়া—আইনে যখন আসামীকে মারধর করার নিয়ম নেই, তখন তোমার অত

মাথা ব্যথা কেন ?

বিভূতি—তা জানি। রাত্তিরে তুমি যে আসামীদের জন্য খিচুড়ি রেঁধে দিলে, সেটাও আইনে নেই। এ'রকম দু'চারটে আটপৌরে আইন তৈরী করে নিতে হয়। নইলে থানা চালানো চলে না।

মায়া—বেশ, এবার থেকে খিচুড়ি রেঁধ তুমি! আমার দ্বারা নিত্য ও ঝঞ্ঝাট সহ্য করা আর চলবে না। সরকার আমায় মাইনে দেয় না, আমি পেন্সন পাব না।

দারোগা বিভূতি, ছোট দারোগা ও বড জমাদার—চিত্রপুর থানার প্রায় সকলেরই মন চিত্রপুরের ওপর অপ্রসন্ন হয়ে উঠেছে। আকর্ষণ শুধু এর জলহাওয়াটুকু। নইলে এই এলাকাটা যত রকম চুরি, বজ্জাতি খুন-খারাপির আড়ত বিশেষ। দিনরাত তদন্ত, তল্লাস, গ্রেপ্তার আর চালান নিয়ে উগ্র রকমের ব্যস্ততা। সাধারণ মানুষের মত বেঁচে থাকার আনন্দ লোপ পেতে বসেছে। সকাল সন্ধ্যা মূর্তিমান পেনাল কোডের মত এই উর্দিভূষিত জীবন। বদলীর জন্যে প্রত্যেকেই ছটফট করে।

কিন্তু একেবারে নির্বিকার ছোট জমাদার কড়ে খাঁ। থানাবাড়ি যখন প্রথম তৈরী হয় তখন থেকে কড়ে খাঁ এখানে—সে আজ পনের বছরও হতে পারে। ওর মুখে আজও কোনো আক্ষেপ শোনা যায় না। ওর বদলি হবারই বা কি প্রয়োজন? পেন্সন নিয়ে চলে যাওয়াই উচিত। কড়ে খাঁ বেশ বুড়ো হয়েছে।

কড়ে খাঁ বলে, যাব কেন? বাঘ চলে গেলে জঙ্গলে আর রইল কে?

ছোট জমাদারের 'কড়ে খাঁ' নামটি কার দেওয়া সেটা আজ আর সঠিক জানা যায় না। সই করবার সময় লেখে আকবর খাঁ। কিন্তু এ নাম বললে বিভূতিও চট করে বুঝতে পারবে না, লোকটা কে? কিন্তু বলা হোক—কড়ে খাঁ, সদরের পুলিশ-মহল থেকে শুরু করে চিত্রপুর এলাকায় যত গাঁ গঞ্জ আর বস্তির ছেলেবুড়ো প্রত্যেকে চিনে ফেলবে—ছোট জমাদার।

কড়ে খাঁ রোহিলা পাঠান। বুড়ো মানুষ। প্রশান্ত সৌম্যমূর্তি একজন হাজী সাহেবের মত ধর্মপ্রাণ চেহারা। দাড়িতে মেদি পাতার রঙের ছোপ ফিকে বাদামী হয়ে এসেছে। পাকা ভুরু। লালচে গায়ের রঙ এত বয়সেও ময়লা হয়নি। তবে চামড়া কুঁচকে গেছে, শ্লথ হয়ে গেছে মাংসপেশী। তবুও কড়ে খাঁ সোজা হয়েই চলে, লাফালাফি করতে কোনো জোয়ানের চেয়ে কম যায় না। সে শুধু ওই পেটাই করা লোহার মত হাড্ডির জোরে। এই জীর্ণ খাপের ভেতর ক্রূরতার যে ছুরি লুকিয়ে আছে, তার ধার আজও কমেনি।

চিত্রপুরের শিশুরা দেব দানব ভূত প্রেতের উপকথার মত ঠাকুরমার মুখে শুনেছে, কড়ে খাঁ সাঁড়াশি তাতিয়ে জিভ টেনে ধরে, আলকাতরা মাখিয়ে গাছে ঝুলিয়ে তলায় আগুনের ধুনি জেলে দেয়। লোকের গলায় বাঁশ চেপে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নাচে, মুখে থুথু দেয়। কাস্তে দিয়ে পুঁচিয়ে পুঁচিয়ে হাত কেটে নেয়—যত রক্ত ঝরে তত হাসে।

এই হলো কড়ে খাঁ—বড্ড কড়া—ক্রূর!

অরণ্যরাজ্য জুড়ে চিত্রপুর এলাকা। সড়কের ওপরে চিত্রপুরের গঞ্জ। সবচেয়ে বড় বাড়িটা—আধুনিক ঢঙের যেটা—চিত্রপুরের টিকাইত ধনঞ্জয় গোঁসাইয়ের। গোঁসাই শুধু জমিদার নয়, ব্যবসায়ীও। ঐ যে সেগুন কাঠের ইয়ার্ড, পঞ্চাশটা করাত চলছে—সেটা গোঁসাইয়ের। মাঠের ওপর যতগুলি পাঁজায় ইট পুড়ছে, যতগুলি ভাঁটার চুণের ঘুটিং পুড়ছে, ওসব গোঁসাইয়ের। গঞ্জের এত বড় গালার কারখানাটা, সেটারও মালিক গোঁসাই। গোঁসাইয়ের এক পুরুষেই আমলকীর জঙ্গলে এত ঐশ্বর্য গজিয়ে উঠলো কি করে? ব্যবসায়ী বুদ্ধি ও ফৌজদারী প্রতিভা একই আধারে আশ্রয় নিলে যা হয় তাই হয়েছে। অন্য সরিকের গোঁসাইরাও তো রয়েছে, তাদের মাটির দেয়াল এক বর্ষায় ধসে গেলে এক পুরুষেও আর সারানো হয় না।

চিত্রপুরের বস্তিতে থাকে দোসাদরা আর ডিহিগুলোতে মুণ্ডারা। অর্ধেক চিত্রপুরী গোঁসাইয়ের খামারে খাটে, বাকী অর্ধেক গোঁসাইর জমি চষে আধবাট্টায়। যে যার সামর্থ্য মত কুলগাছে কিছু কিছু লাক্ষাগুটি ফলায়। বেচতে হয় সবাইকে গোঁসাইয়ের গদ্দিতে। সারা চিত্রপুরে হেন মুণ্ডা-দোসাদ নেই যে টিকাইত গোঁসাইয়ের কবলায় বাঁধা নয়।

চিত্রপুরের ছেলেবুড়ো ভয় খায় থানাকে—যে থানায় কড়ে খাঁর মত নরসিংহ বিরাজমান। আর চিত্রপুরের থানা ভয় খায় টিকাইত ধনঞ্জয় গোঁসাইকে। সদরের উকীলমহল থেকে শুরু করে মার্চেণ্ট ও অফিসারমহল পর্যন্ত গোঁসাইয়ের গতিবিধি অবারিত—সর্বত্র খাতির আর আপ্যায়ন। যে কোনো উদ্যোগে চাঁদার খাতায় গোঁসাইয়ের সই পড়ে মোটা অঙ্কের প্রতিশ্রুতির সঙ্গে। গুনে গুনে দেড় হাজার ভোট খেলে গোঁসাইয়ের পাঞ্জায়। ইলেকসনের লড়াইয়ে যার দিকে চলে গোঁসাই, তার ভাগ্য প্রসন্ন হয়। দেড় হাজার হাতি পুষলেও এখন আর এতটা প্রতিপত্তি কেউ পায় না—এটা গণতন্ত্রের যুগ।

প্রথম প্রথম বিভূতি তার অফিসারি স্পর্ধা নিয়েই চলতে শুরু করেছিল। গোঁসাইয়ের মাত্র দু'একটি প্যাঁচের দাপটে সে স্পর্ধা নুইয়ে এল মন্ত্রশান্ত ভুজঙ্গের মত। গোঁসাই এ পর্যন্ত চারজন দারোগার চাকরী খেয়েছে। গোঁসাইয়ের নতুন মোটর গাড়ির চাকাটার দিকে তাকিয়ে বিভূতি নিজেকে শান্ত করে আনে—অসম্ভব নয়, ঐ চোদ্দ-হাজারী গাড়ির চাকার তলায় নব্বই টাকার দারোগাগিরি গুঁড়ো হয়ে যেতে কতক্ষণ?

টিকাইত গোঁসাইয়ের কথা মনে পড়লেই বিভূতির যেন যন্ত্রণা আরম্ভ হয়। সমস্ত অন্তর দিয়ে সে তখন বদলী প্রার্থনা করে। মাছ ধরার সখ ছিল। গোঁসাইয়ের পুকুরে মাছ ধরতে গিয়ে যে-সব কথা শুনে সে ফিরে এসেছে, তার চেয়ে জংলীদের বিষমাখা তীরের আঘাত ভাল। গা থেকে ইউনিফর্ম খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিতে ইচ্ছে করে। এমন দারোগাই ছেড়ে দিয়ে টোলের পণ্ডিতী ধরাই উচিত।

কড়ে খাঁ হেসে হেসে বলে, শেখো দারোগাজী, শেখো। আমি আজ পনর বছর

ধরে দেখে আসছি। দেখি আর কতদিন। পেন্সন নেব না হুজুর—জিন্দেগি পর্যন্ত দেখবো, এই বেইজ্জতির মার কতদিন চলে, কবে ইনসাফ হয়।

সকালবেলায় থানার বারান্দায় চৌকিদারেরা হরেক রকমের আসামী নিয়ে বসে থাকে। বিভূতি ডায়েরী আর রিপোর্ট লেখে। চিত্রপুর থানা চালানো সোজা ব্যাপার নয়। অনেক দারোগা এখান থেকে চরম দুর্গতি নিয়ে ফিরেছে। তবে ছোট জমাদার কড়ে খাঁ যতক্ষণ আছে, কাজ একরকম চলে যাবেই। অন্তত অপরাধ কবুল হবে ও অপরাধী ধরা পড়বেই। চুরি, ডাকাতি, খুন, ডাইনী-পোড়ানো, নরবলি, বিষ খাওয়ানো বা মদচোলাই—প্রত্যেকটি কেস অতি পরিষ্কারভাবে প্রমাণসহ ধরা পড়ে যায়। এর মূলে ছোট জমাদার কড়ে খাঁ—তার হাতের মারের মহিমা। কড়ে খাঁর মারে কবুল করবে না এমন দাগী আজ পর্যন্ত দেখা যায়নি।

কড়ে খাঁ প্রায়ই আপসোস করে বলে, আরে আমার এক চড়ে বড় বড় শের বাপের নাম বলে দেয়, কিন্তু কোনো ব্যাটা আসামী কি বিনা মারে কবুল করলো? আমার হাতের মার খেতে নিশ্চয় ওদের ভাল লাগে।

চৌকীদারেরা একে একে তাদের রিপোর্ট লেখাবার পর বিভূতি ডাকে, কড়ে খাঁ।

টুলের ওপর বসে বসে কড়ে খাঁ ঝিমোচ্ছিল, বিভূতির ডাকে উঠে দাঁড়িয়ে হাই তুলে একবার দাড়িতে হাত বুলিয়ে নিল। তারপর নির্লিপ্তভাবে মুঠো করে ধরলো তার মোটা সিঙ্গাপুরী বেতের লাঠিটা।

বিভূতি কতবার বলেছে, কড়ে খাঁ, রিপোর্টগুলো একবার কান দিয়ে শুনে নিও আগে, তারপর যাকে যেমন উচিত তেমনি মারধর করো।

—যা মাইনে, তাতে অত মেহনত আর দেমাক খরচ করা পোষায় না হুজুর। রিপোর্ট আবার কি শুনবো। সব শালা চোর।

কবুল করাবার সময় বিভূতি একটু সতর্ক থাকে। কড়ে খাঁর মাত্রাজ্ঞান নেই। মুর্গী চোর বা খুনের আসামী দু'জনকেই কড়ে খাঁ সমানভাবে পিটিয়ে ঠাণ্ডা করে। তার কারণ, কার কি অপরাধ সে খোঁজ সে রাখে না।

বিভূতি ডাকলো, কড়ে খাঁ।

কবুল করাতে হবে।

আসামী একটা ঢ্যাঙা গোছের দোসাদ ছোঁড়া। রূপোর হুকো চুরি করেছে। দোষ স্বীকার করছে না, চোরাই মালের হদিসও দিচ্ছে না।

দোসাদ ছোঁড়াটাকে পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার কড়ে খাঁ তার ঘোলাটে চোখের দৃষ্টি বুলিয়ে দেখে নিল। ছোঁড়াটা খুব রোগা, তবে হাড়গুলো মজবুত। খালি গা, বড় বড় চুল, গলায় একটা কুঁচের মালা। একটা নোংরা গামছা কোমরে জড়ানো, ট্যাঁকে একটা খৈনির ডিবে।

কবুল করাবার আগে কড়ে খাঁ কতগুলি প্রক্রিয়া পালন করতো, রাগের গ্যাস চড়িয়ে নেবার জন্য। ছোঁড়াটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে কড়ে খাঁ দাঁতে দাঁত

চেপে বললো, হুঁ, বুঝেছি, এ শালা দেখছি একটা সাপ, বিলকুল সাপ!

সপং—কোমরের ওপর পড়লো কড়ে খাঁর সিঙ্গাপুরী বেতের বাড়ি। কোথায় গেল বৃদ্ধ আকবর খাঁর সেই প্রশান্ত সৌম্য হাজী সাহেবের মূর্তি। একটা কেশর-ফোলা রুষ্ট সিংহ যেন শিকারের ওপর লাফিয়ে পড়েছে। যেন নিজেকে অনুপ্রাণিত করার জন্য কড়ে খাঁ মাঝে মাঝে হুংকার ছাড়ছে, মারো, শালা সাপকো মারো!

ছোঁড়াটা দোষ কবুল করে ফেলেছে, মাল কোথায় আছে তাও বলে দিয়েছে। কড়ে খাঁর বেতের বিদ্যুৎস্ফূর্তি শান্ত হয়ে এল।

আর একজন আসামী—বুধু ওঁরাও। বারাণ্ডার মেঝের ওপর ঠকাস্ করে মাথাটা ঠুকে, বুকে হাত দিয়ে বললো, ভগবান জানে হুজুর, আমি ওদের শুয়োর চুরি করে খাই নাই।

বিভূতি ডাকলো, কড়ে খাঁ।

বুধু ওঁরাও আদুড় গা, সমস্ত শরীরে কালো কালো কুঁদো মাংসের চাপ। মাথার বাবরী চুলে একটা চিরুণি গোঁজা, হাতে কাঁসার বালা, ঝক্‌ঝকে সাদা দাঁত।

—এ শালা ভালুক, বিলকুল ভালুক। মারো শালা ভালুককো! কড়ে খাঁ বেত হাতে ঝাঁপিয়ে পডলো বুধু ওঁরাওয়ের ওপর। দু'মিনিটেই স্পষ্ট কবুল আদায় হয়ে গেল।

বিকেলের দিকে থানার ফটকে শোনা গেল গোঁসাইয়ের মোটরের হর্ন। চৌকীদারদের মধ্যে একটু ব্যস্ততার সাড়া পডে গেল। বিভূতি মুখে হাসি টেনে কিছুদূর এগিয়ে গোঁসাইকে অভ্যর্থনা করলো, আসুন, আজকাল যে এদিকে ভুলেও আসেন না। আশ্রিতজনকে এ উপেক্ষা কেন?

—বড নাম খারাপ করছো বিভূতিবাবু।—গোঁসাই বিভূতির তোষামোদের কোনো প্রশ্রয় না দিয়েই বললো। বিভূতিকে নিরুত্তর দেখে নিজেই আবার প্রসঙ্গ টেনে চললো,—শুধু মুর্গীচোর ঠেঙিয়ে থানা চালানো যায় না। সেই গ্যাং কাল আবার আমার দু'গাডী গুড লুট করেছে। চিত্রপুরের দারোগাগিরি চেম্বারে বসে হয় না। বাইরে বের হতে হয়।

গোঁসাইয়ের দৃষ্টি পডলো কড়ে খাঁর দিকে। কড়ে খাঁ তার নিজেরই চোখ দুটো নামিয়ে নিল। এতক্ষণ সে শুধু দেখছিল গোঁসাইকে, ক্রুর লুব্ধ দৃষ্টি দিয়ে।

গোঁসাই বললো, কি বুড়ো, একটা আদাব বন্দেগী করাও ভুলে গেছ দেখছি।

কড়ে খাঁ ভ্যাবাচাকা খেয়ে জানালা, বন্দেগী হুজুর!

তারপর হুকুম হলো, বিভূতিবাবু, ওই চোট্টা দলটার উপদ্রবের একটা হেস্তনেস্ত করে ফেলো, এস-পি জিজ্ঞাসা করলে যাতে আমি জবাব দিতে পারি। আর—এই বুড়ো, তুমি এবার পেন্সন নাও বাবা, শুধু বসে বসে লাঠিবাজি আর চলবে না।

ফটক পর্যন্ত এসে নমস্কার জানিয়ে বিভূতি গোঁসাইকে বিদায় দিল।

সন্ধ্যেয় থানাবাড়ি একটু নিঝুম হয়। বারান্দায় টিমটিম করে কেরোসিনের বাতি

জ্বলে। বিভূতি একবার চারিদিক ঘুরে ফিরে তার দিনের প্রোগ্রাম শেষ করে।

কড়ে খাঁর নমাজ শেষ হয়। রুটি তৈরী করে। খাওয়া শেষ করে বারান্দায় একটা কম্বলের আসন পেতে বসে। চৌকীদারেরা উনুন জ্বেলে ভাত চড়ায়। গল্প আলাপ আরম্ভ হয়।

কড়ে খাঁ চোখ বুজে শোনে চিত্রপুরের দুরন্ত দুঃখের ইতিহাস। চৌকীদারেরা মন খুলে সব কথাই আলোচনা করে। —সবই তো জানি। গুড় লুট করেছে কারা, তাও জানি। মুণ্ডাদের কাজ। কেন করবে না জমাদার সাহেব? বড়দিনের সময় একমাস ধরে ওরা শুধু জঙ্গল ঝালোয়া করেছে। টিকাইতজী যত অফিসারের ছেলে নিয়ে শিকার ফুর্তি করেছে। মজুরী এক সের ছাতুও পায়নি মুণ্ডারা।

ডোমন চৌকীদার বলে, দোসাদেরা সাতদিন ধরে টিকাইতজীর একটা জঙ্গল কেটেছে। ঘোড়ার মত খেটেছে বেচারারা। এক পয়সা নগদ মজুরী পায়নি। সব কবলায় সুদ বাবদ কাটিয়ে দিয়েছে।

ইয়া আল্লাহ্—একটা হাই তুলে নিয়ে কড়ে খাঁ যেন ধমক দিল।—আরে ছাড় ওসব কথা। একদিন এর বিচার হয়ে যাবে।

নানু চৌকীদার বললে, তুমিও আজব মানুষ জমাদার সাহেব। বুড়ো হয়েছ, আর কেন? এবার পেন্সন নিয়ে বাড়ি যাও। এখন আর কি? তোমার তো শুধু মাটি নেওয়া বাকী আছে। তা নয়, এখানে বসে আসামী নিয়ে শুধু মারধর আর কাটাকাটি!

কড়ে খাঁ রেগে উঠল, উল্লু নেহি তো। আমি বুড়ো, আর এইসব জোয়ানদের চেহারা দেখ! কাউয়াভি দেখে ভয় পায় না।

কড়ে খাঁর উষ্মায় চৌকীদারদের মধ্যে হাসির সোর পড়ে গেল। ডোমন বলে—ছোট জমাদারের মেজাজ এই রকম, পেন্সনের কথা বললেই বিগড়ে ওঠে।

লণ্ঠন নিয়ে বিভূতি একবার হাজত ঘরটা ঘুরে যায়। এর পর ঘরে ফিরে তাকে আরও একটা পরীক্ষা পার হতে হয়। এ পরীক্ষায় একমাত্র গতি মায়া।

মায়া বিছানা ছেড়ে উঠতে চায় না, যাও আসামীদের ওপর অত দয়াধর্ম যদি দেখাতে হয় তবে যাও তোমার সাকরেদ কড়ে খাঁর কাছে। ওই মাঝরাত্তিরে উঠে খিচুড়ি রেঁধে দেবে।

এসব অভিযোগের উত্তরে বিভূতির মুখে এ সময় নিছক সকরুণ অনুনয়ের ভাষা ছাড়া আর কিছু বার হয় না। একটানা মিনতির পালা চলে—দাও, দাও লক্ষ্মীটি। সেই কাল বিকেলে সদরে পৌছে তবে ব্যাটারা খেতে পাবে। শুধু চালেডালে একটু ফুটিয়ে দাও। তা হলেই হবে।

শেষপর্যন্ত কিন্তু মায়াকে উঠতেই হয়, রাতদুপুরে হাঁড়ি ঠেলে খিচুড়িও রাঁধতে হয়।

চিত্রপুর থানার এই একটি চিত্র। আজ ছ'বছর ধরে চিত্রপুরের দারোগাপদে সমাসীন বিভূতি এই অভিনয়ে অভ্যস্ত হয়েছে। ক্লান্তি তেমন হয়নি, তারচেয়ে

গ্লানিই বেশি! বদলি হতে ইচ্ছে করে, এখনি পেন্সনের সম্ভাবনা থাকলে আরও ভাল হত। কিন্তু ছোট জমাদার কড়ে খাঁ—নিত্যদিনের এই সংহারধর্ম যেন তার সত্তার সঙ্গে মিশে গেছে। বয়সে বুড়ো হয়েও লোকটা এখনও একটুও কাবু হয়নি। পেন্সন নেবার কথাও বোধহয় সে ভুলে গেছে!

মায়া সকালে উঠে জানালা খুলেই কৌতূহলী চোখ দুটোকে আরও বড় বড় করে তাকিয়ে রইল। বন্দুক কাঁধে ছোট দারোগা ফিরছে, সঙ্গে গোটাকয়েক চৌকীদার আর সেপাই। সঙ্গে আসামীও আছে—একটি যুবতী মেয়ে, ছেঁড়া খাটো কাপড়ে শরীর ঢাকা, গলায় একটা গিলে আর ভেলার মালা। আরও আছে, বছর আটেকের একটা ছেলে ও গোটা দশেক গাঁজার চারা আর মদ চোলাইয়ের হাঁড়ি। মায়া নিবিষ্ট দৃষ্টি দিয়ে আর একবার মেয়েটাকে দেখে নিয়ে ষ্টোভ ধরাতে চলে গেল।

চা খেয়ে ইউনিফর্ম চড়িয়ে বিভূতি বাইরে যাবার উদ্যোগ করতেই মায়া বললো, শোন, আজ যে আসামী এসেছে, তাকে কিন্তু মারধর করতে পারবে না, সাবধান!

বিভূতি, সকালবেলা আবার কি আরম্ভ করলে? আজ একটা গ্যাংয়ের আসামীরা এসেছে, লাই দিলে কেস ফেঁসে যাবে। আমার চাকরীর দফা সেরে দেবে গোঁসাই।

মায়া—আমি দিব্যি দিলাম, আসামীর গায়ে হাত তুলো না, আসামী পোয়াতি মানুষ।

বিভূতি দরজার বাইরে পা বাড়াতেই মায়া আবার কি যেন বলে। বিভূতি মুখ ঘুরিয়ে তর্জন করে উঠলো, চুপ রও, ডোণ্ট···

উর্দি গায়ে চড়ালেই বিভূতির মুখে ইংরেজী ফুটে ওঠে।

মায়া ব্যর্থ রোষে লাল মুখে একবার শুধু বলে, আচ্ছা।

তারপর নিষ্ফল অভিমানে বিছানায় গিয়ে লুটিয়ে পড়ে মায়া। সশব্দে বন্ধ করে দেয় জানালাটা, থানার বারান্দাটা যেন চোখে না পড়ে। পেয়ালার চা কিছুক্ষণ বাষ্প ছেড়ে ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

মাঝরাত্রে। খুব বড় রকম একটা বর্ষণ হয়ে সবেমাত্র থেমেছে। দামোদরে জেগে উঠেছে সুস্বন কলরোল। শত শত ঝরনা জঙ্গলের ভেতর হঠাৎ মুখর হয়ে উঠেছে।

থানার ফটক ডিঙিয়ে একটা লোক চিৎকার করে দৌড়ে এল। বিভূতি, কড়ে খাঁ, ছোট দারোগা আর চৌকিদারেরা ঘুম ছেড়ে বারান্দায় এসে জমা হলো।

হন্তদন্ত হয়ে বিভূতি ঘরে এসে ঢুকল একবার। মায়ার ত্রস্ত মুখের দিকে তাকিয়ে বললো, আমার বেল্ট আর রিভলভারটা দাও শিগগির। তুমি দরজা বন্ধ করে রাতটুকু জেগেই কাটিয়ে দাও। আমি আসছি।

অন্ধকারে থানার পুলিশদল এগিয়ে চললো চিত্রপুরের গঞ্জের দিকে। টিকাইত গোঁসাইয়ের বাড়ির কাছে এসে তারা থামল।

কিছুক্ষণ পরে বাড়ির ভেতর থেকে বিভূতি আর ছোট দারোগা ফিরে এল। সঙ্গে আসামী, চিত্রপুরের বিধাতা ধনঞ্জয় গোঁসাই।

গোঁসাই একবার বললো, 'বুঝে কাজ করছো তো বিভূতিবাবু?'

বিভূতির কণ্ঠস্বরে ধ্বনিত হলো ছোট্ট একটি শব্দ, 'ইয়েস্!' সে আজ যেন সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে অনুভব করছে, সত্যিই সে দারোগা।

গোঁসাই তার কেরাণীবাবুকে ডেকে বললেন, সব দেখলে তো? গাড়ি বের করো। ভোরেই সদরে চলে যাও। আমি চললাম বিভূতিবাবুর অতিথি হয়ে। —গোঁসাইজী ঠোঁটে বিদ্রূপের বাঁকা হাসি ফুটে উঠলো।

ভোর হয়েছে. থানার ফটকের বাইরে কাতারে কাতারে লোক দাঁড়িয়ে গেছে। খুনের আসামী টিকাইত ধনঞ্জয় গোঁসাই বসে আছে বিভূতির সামনে টুলের ওপর। বিভূতির ফার্ষ্ট ইনফরমেশন রিপোর্ট লেখা হয়ে গেছে। ছোট হিস্সার গোঁসাই যেমন গরীব, তার বউ তেমনি সুন্দরী। তাকে খুন করেছে ধনঞ্জয়। লাস গুম করা হয়েছে, এখনও পাত্তা হয়নি।

বিভূতি কলম ধরলো গোঁসাইয়ের স্টেটমেণ্ট লিখতে। কড়ে খাঁ এরই মধ্যে দু'বার নমাজ সেরেছে। তার বহুদিনের বন্ধু পুরানো টুলটার ওপরে গিয়ে বসলো দূর বারান্দার কোণে। কড়ে খাঁ আজ ঝিমুতে পারছে না। মোটা সিঙ্গাপুরী বেতের লাঠিটা হাতের গোড়ায় টেনে রেখে আকাশের দিকে ঘোলাটে চোখের স্থিরদৃষ্টি তুলে বসে আছে। বহু প্রতীক্ষার, বহু কামনার এক দূর স্বপ্নছবি আজ মূর্ত হয়ে উঠেছে সম্মুখে।

গোঁসাই বলে, স্টেটমেণ্ট আমি যা দেব, তাই লিখবে তো বিভূতিবাবু?

বিভূতি—গো অন।

গোঁসাই, ছোট হিস্সার গোঁসাইয়ের বউকে খুন করেছে দারোগা বিভূতি বোস, লাস গুম করেছে দারোগা বিভূতি বোস...।

গলার স্বর নামিয়ে গোঁসাই বলে, যা বলছি বিভূতিবাবু, সবই বর্ণে বর্ণে সত্য প্রমাণিত হয়ে যাবে। তুমি এ-কথা অবিশ্বাস কর?

নির্বোধ বিস্ময়ে বিভূতি গোঁসাইয়ের দিকে তাকালো। গোঁসাইয়ের বিদ্রূপের হাসির জ্বালায় ধীরে ধীরে বিভূতির চোখ দুটো কুঁচকে ছোট হয়ে এল ভীরুতার প্রতিবিম্বের মত।

গোঁসাই বলে, শোন বিভূতিবাবু, সোজা কথা, সোজা রাস্তা। নগদ নগদ দিয়ে দিচ্ছি, দু'হাত ভরে দিচ্ছি। রাজি হও তো বল, নইলে কেরাণীবাবু চললো সদরে। তোমার আমার লড়াইয়ে কে জিতবে, এ-বিষয়ে কি তোমার কোনো ধারণা নেই?

বিভূতি মুখ নামালো, কলমও নামিয়ে রাখলো। গোঁসাই উৎসাহ দিয়ে বলে, বাস্ এবার কাউকে ডাকো। কেরাণীবাবুকে খবর দিক যে সদরে যেতে হবে না। একটু তাড়াতাড়ি কাউকে পাঠাও, নইলে ওদের গাড়ি বেরিয়ে যাবে।

অনেকক্ষণ পার হয়েছে। বুড়ো কড়ে খাঁর গায়ে যেন জ্বরের জ্বালা ধরেছে। দারোগাবাবু করছে কি এতক্ষণ ধরে? কি এত কলমবাজি? সত্যিই সে বুড়ো

হয়নি। তার স্থবির শরীরের শিরা উরশিরায় এতদিন ধরে সে লালন করে এসেছে ঐ প্রখর সংহারতৃষ্ণাকে ; এই পরম লগ্নে আজ তার মহানির্বাণ হবে।

বিভূতি ডাকে, কড়ে খাঁ !

এই সেই আহ্বান, যার জন্যে কড়ে খাঁর যৌবনের ধার ছুরির মত ঐ জীর্ণ খাপে এতদিন অটুট হয়ে আছে। সমস্ত চিত্রপুরের রক্তাক্ত বেদনার রূপ তারই ক্রুরতার ভেতর এই দীর্ঘ দিন ধরে প্রতিমূর্ত হয়ে এসেছে। তারই পরিসমাপ্তি আসন্ন। কবুল করাবার আনন্দের আস্বাদ আজ চরম হয়ে উঠবে।

সিঙ্গাপুরী বেতের লাঠি হাতে তুলে এগিয়ে এল কড়ে খাঁ।

বিভূতি একটা চিঠি তুলে নিয়ে বলে, কড়ে খাঁ, একটু তাড়াতাড়ি দৌড়ে যাও। গোঁসাইজীর কেরাণীবাবুর হাতে দিও।

কাঁপতে কাঁপতে চিঠিটা নিয়ে কড়ে খাঁ নেমে এল বারান্দা থেকে। একটা চৌকীদারের ওপর এই কাজের ভার চাপিয়ে দিয়ে কড়ে খাঁ বারান্দার কোণে টুলের ওপর এসে বসে পড়লো।

অলস অবসন্ন কড়ে খাঁ স্থির হয়ে বারান্দার কোণে বসে আছে। বাদামী দাড়ির গুচ্ছ ফুর ফুর করে বাতাসে উড়ছে। পাকা ভুরু দু'টো ঝুলে পড়েছে চোখের কোটরের ওপর।

বিভূতি একবার উঠে দাঁড়ালো। চোখ দুটো বাষ্পান্বিত আকাশের মত ম্লান। বিভূতির মনে হলো, কড়ে খাঁ এইবার সত্যিই পেন্সন নেবে। ও শরীরে আর শক্তি সামর্থ্যের কোনো নিশানা নেই। জরাগ্রস্ত, লোলচর্ম বিগলিতপেশী এক অশীতিপর বৃদ্ধের শব কুঁকড়ে পড়ে আছে বারান্দার কোণে।

স্না ন যা ত্রা

মেলাটা শুরু হয় বৈশাখী পূর্ণিমার কাছাকাছি কোন একটা দিনে ; শেষ হয় এসে জ্যৈষ্ঠের পূর্ণিমাতে, স্নানযাত্রার শুচিতাময় উৎসবটা যেদিন বটেশ্বরপুরের মহাসমারোহের মধ্যে শেষ হয়ে যায়। এই এক মাস ধরে মেলাটা যেন বটেশ্বরপুরের জীবনটাকে রকমারি জিনিস আর মানুষের ভিড় দিয়ে, আর রকমারি আনন্দের কোলাহল দিয়ে মাতিয়ে রাখে।

নাগরদোলা দোলে, এঁটো সরবতের জলে কাদা হয়ে যায় মাটি ; সেই সঙ্গে বাউলের একতারা বাজে। কোলাহলের মধ্যে গান, আর গানের মধ্যে কোলাহল। ছাইমাখা মৌনীবাবা আর ঊর্ধ্ববাহু সাধু চুপ করে বসে থাকেন, আর হরিদ্বারী সাধু নানারকম আসন ও প্রাণায়ামের কসরত দেখান।

শুধু যত মনোহারীর আর অমনোহারী খোল-ভূষির দোকান নয়, সোনা-রূপো বেচা-কেনারও দোকান বসে। পাইকারী ব্যাপারীদের বড়-বড় লেনদেন হয় ; তেজারতী মহাজনদের বন্ধকী কারবারও চলে। সবচেয়ে বড় কারবারী কাজ করে ভাগল-

পুরী গোয়ালার দল। এক মাসের মধ্যে প্রায় হাজার দুই গরু-মহিষ বিক্রী করে, আর স্নানের শেষে ঢোলক বাজিয়ে ওরা চলে যায়।

এ জেলার এদিকে-ওদিকে প্রায় চারদিকে ঘুরে অনেকবার রিলিফের কাজ করেছে ইন্দুনাথ, কিন্তু বটেশ্বরপুরে কোনদিন আসতে হয়েছে বলে মনে পড়ে না। কলকলি, জটাবাহিনী আর পটলেশ্বরী, তিনটে নদী তিনদিকে থাকতেও, ঐ তিন নদীর বন্যার জল বটেশ্বরপুরের ধানক্ষেতে গড়িয়ে আসতে পারেনি। বানের জল শুধু নদীগুলির ও-পার ছাপিয়ে ফকিরবাড়ি, জয়কালীগঞ্জ আর কুমীরমারিকে ডুবিয়ে দিয়েছিল।

বটেশ্বরপুরের ডাঙ্গাতে একটি বুড়ো বট আছে, সেই বটের কাছে পুরনো মন্দি-রের আঙ্গিনায় বেশ পুরনো আর নড়বড়ে একটি রথ রাখা আছে; আর, সেই আঙ্গিনা থেকে সামান্য একটু দূরে বাসুদেব সরোবর নামে একটা বড় ডোবা আছে। তাই বিশ্বাস করতে অসুবিধে নেই, বটেশ্বরপুরের ডাঙ্গার বুকে এতগুলি পুণ্যি বাঁধা পড়ে আছে বলেই তিন নদীর বানের জল এদিকে গড়িয়ে না এসে ওদিকে গড়িয়ে যায়।

ইন্দুনাথের কাছে বটেশ্বরপুর জায়গাটা চেনা চেনা না মনে হলেও নামটা যেন শোনা-শোনা মনে হয়। মেলা শুরু হবার সাতদিন আগে থেকে একটি কর্মীদল নিয়ে সড়কের পাশে ক্যাম্প করেছে ইন্দুনাথ। সবশুদ্ধ ওরা বিশজন। এদের মধ্যে বলতে গেলে একমাত্র ইন্দুনাথ ছাড়া আর সবাই বয়সে এখনও অযুবক, প্রায় ছেলেমানুষ বলা যায়। এখানে ইন্দুনাথই কর্মীদলের নেতা।

ইন্দুনাথের কাছে যিনি নেতা, যিনি এ জেলার প্রায় সকলজনের শ্রদ্ধার মানুষ, সকল রকমের স্বদেশী কাজ আর সেবার কাজের যিনি প্রেরণাদাতা, সদরের উকীল সভার প্রেসিডেণ্ট সেই কাঞ্জিলালমশাই কর্মীদলের এ বছরের বার্ষিক সভায় প্রস্তাবটা তুলেছিলেন। প্রস্তাবে কেউ আপত্তি করেনি। প্রকাণ্ড একটা চরিত্রবাদিতার প্রস্তাব নয়। প্রকাণ্ড একটা পাপমোচন যজ্ঞ করবার প্রস্তাবও নয়। প্রস্তাব হলো, ধর্মের নামে যেখানে মেলা বসবে সেখানে ওরকম একটা কুৎসিত কাণ্ড চলবে কেন? ওটা খুব খারাপ একটা প্রথা নয় কি? ওরকম একটা প্রথা চলতে দেওয়া সমাজের মানু-ষের পক্ষে কি একটা অপমান নয়?

প্রতি বছর বটেশ্বরপুরের মেলা যেখানে বসে, তারই প্রায় গা ঘেঁষে আর পুরনো মন্দির থেকে খুব সামান্য দূরে আর-এক রকমের একটা উপনিবেশও গড়ে ওঠে। এটা হলো মানুষেরই একটা অমানুষিক মেলা। ছোট-বড় প্রায় শতাধিক ছাউনি-ঘর আর প্রায় শতাধিক পতিতা। কোথা থেকে, যেন একটা অদৃশ্য জগতের আনাচ-কানাচ থেকে বের হয়ে আর ছুটে এসে ওরা এই স্নানযাত্রার মেলাতে এক মাস ধরে রোজগারের একটা ভয়ানক উৎসব সমাপন করে আবার অদৃশ্য হয়ে যায়। বাজারের কোন কোন লোকের মুখে এমন গর্বের কথাও শোনা গিয়েছে, শুধু হেঁজি-পেঁজি হাভাতির দল নয়, কাশীওয়ালী দেবীদাসী আসে, গাজিপুরের নাচুনী বাঈজীও

আসে।

কাঞ্জিলালমশাই-এর প্রস্তাব, পিকেটিং করে এই খারাপ প্রথাটাকে বাধা দিতে হবে। কিন্তু কার উপরে একাজের ভার দেওয়া যায়?

ইন্দুনাথ আশ্চর্য হয়েছিল—কেন? আমার উপর ভার দিতে আপনার কি কোন আপত্তি আছে?

কাঞ্জিলালমশাই বিব্রতভাবে বলেন—না না, কোন আপত্তি নেই। তবে কিনা …এ কাজে একটু বেশি সাহস দরকার; কারণ এ কাজের বাধাগুলি বেশ একটু অদ্ভুত রকমের কিনা, সেইজন্যেই।

ইন্দুনাথ—তাহলে আমিই তৈরী হই।

ইন্দুনাথের ইচ্ছার এই ব্যস্ততা যেন ইন্দুনাথের একটা অভিমানের ব্যস্ততা। কঠিন বাধা তুচ্ছ করতে এত ভালবাসে যে, শান্ত দুঃসাহসের মানুষ বলে এত সুনাম রটে গিয়েছে যার, তাকে চিনতে এখনও দেরি করেন কেন কাঞ্জিলাল মশাই?

কাঞ্জিলালমশাইও জানেন, এম-এ পড়ার শেষ বছরটাকে পূর্ণ হতে না দিয়ে গ্রামে চলে এসেছিল ইন্দুনাথ। দেশের উপর একটা মায়ার নেশা বলা যায়, কিংবা একটা সৎ কাজের জন্য প্রাণ দিয়ে খাটবার নেশাও বলা যায়, ইন্দুনাথের মন আর প্রাণ দুই-ই মেতে উঠেছিল। ছোট শরিকের কাকার কাছে বসতবাড়িটা বন্ধক দিয়ে টাকা যোগাড় করে, আর প্রায় দু'বছর ধরে অনেক খাটুনি খেটে রাজীবনগরের স্কুলটা গড়ে তুলেছিল ইন্দুনাথ।

প্রত্যেকটি প্রতিজ্ঞার কাজকে জয়ী না করে ক্ষান্ত হয়নি ইন্দুনাথ। জেলার সদর শহরে বিলাতী কাপড় অচল হয়েছে, রঘুনাথপুরের বাজার থেকে আবগারী মদের দোকান উঠে গিয়েছে, বড়গাছিয়ায় চাঁড়ালপাড়ার প্রত্যেকটি পুরুষ কৃত্তিবাস পড়তে আর নিজের নাম লিখতে শিখেছে, রানীহাটের কুমোরেরা একটা কো-অপারেটিভ করেছে, এই সবই তো ইন্দুনাথের এক একটি সংপ্রতিজ্ঞার সফলতা।

ইন্দুনাথের সব বিষয়সম্পত্তি একে একে বাগিয়ে ফেলেছেন ছোট শরিকের কাকা, আর যত আর্তত্রাণ ও আন্দোলনের কাজে বেহিসাব টাকা বিলিয়ে দিচ্ছে ইন্দুনাথ। বাপ নেই মা নেই, সম্পত্তিটা তবু তো ছিল। কিন্তু সর্বস্ব খুইয়ে কাঙ্গাল হয়ে যাবার ভয়টাও ইন্দুনাথের জীবনে যেন কোন ভয়ই নয়। কাকাও বলে দিয়েছেন, তোমার বিষয়-আশয় বলতে বিশেষ আর কিছু নেই কিন্তু ইন্দু, শুধু আছে রানীহাটের মেটে বাড়িটা, দাম বড়জোর তিন হাজার হবে।

সদরে ট্রেজারির সামনে একশো চুয়াল্লিশ তুচ্ছ করবার জন্য সবার আগে এগিয়ে গিয়েছিল যে, সে হলো ইন্দুনাথ। রাইফেল তুলে দাঁড়িয়েছিল গোরা সোলজারের যে দুরন্ত পিকেট, আস্তে আস্তে হেঁটে তাদের চোখের সামনে গিয়ে দাঁড়াবার সময় ইন্দুনাথের চোখের দৃষ্টি একটুও অশান্ত হয়নি।

বন্যার সময় রিলিফের কাজে খাটতে গিয়ে কর্মীদলের ছেলেরা দেখে চমকে উঠেছে, ইন্দুদার সত্যিই কোন ভয়-ডর নেই; বোধহয় ঘৃণাবোধও নেই। কুষ্ঠী

বুড়োটার পায়ের ক্ষতগুলোকে একেবারে হাত দিয়ে ছুঁয়ে আর ধুয়ে-মুছে ব্যাণ্ডেজ করে দিলেন ইন্দুদা, হাতটা একটুও কাঁপল না।

ইন্দুনাথের সুশ্রী মুখটাও জানিয়ে দেয়, ওর মনটা কত সুশ্রী। ক্যাম্প যেন সব সময় ফিটফাট থাকে, বিছানাগুলিকে এলোমেলো হয়ে পড়ে থাকতে দেয় না। কেউ যদি ভুল করে কম্বলটাকে মেঝের উপর ফেলে রাখে, ইন্দু এসে নিজেই সেই কম্বলকে ধুলো-ঝাড়া করে আর পাট করে বাঁশের ভারার উপর তুলে রাখে।

কলেরার সময় রিলিফ খাটতে গিয়ে দেবীডাঙ্গায় এসে একবার বেশ অপ্রস্তুত হয়েছিল কর্মীদল। গ্রামে কোন মানুষ ছিল না, কলেরার ভয়ে সবাই পালিয়েছে। কর্মীদলের ছেলেরা দেখেছিল, একটা শূন্য বাড়ির বাগানের ভিতরে ঢুকে অদ্ভুত রকমের একটা রিলিফের কাজে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন ইন্দুদা। আম গাছের একটা মরা ডাল ভেঙ্গে পড়ে কচি শিউলিটাকে চেপে রেখেছিল। মরা আমডাল সরিয়ে দিয়ে শিউলিটাকে দাঁড় করিয়ে দিলেন ইন্দুদা। অপরাজিতার লতা মাটির উপর কাদা-মাখা হয়ে লুটিয়ে পড়েছিল। ইন্দুদা লতাগুলিকে বেড়ার গায়ে তুলে দিলেন। তুলসী-টার চারদিকে ঘাসের জঙ্গল ঘন হয়েছিল। চটপট হাত চালিয়ে ঘাসের জঙ্গলটা উপড়ে ফেলে দিলেন ইন্দুদা।

পাঁচজনে ভাল চোখে দেখেনি, এরকমের দুঃসাহসের কাজও কত শান্তভাবে করে দিতে পারে ইন্দুনাথ। রাজীবনগরের স্কুলবাড়ীর খেলার মাঠের উপর রাতা-রাতি একটা চালা তুলে নিয়ে মা শীতলার মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিল চক্রবর্তী ঠাকুর নামে একজন সাধুগোছের আগন্তুক। দেখে একটুও বিচলিত না হয়ে, আর ভাল-মন্দ কোন কথা না বলে ইন্দুনাথ সেই শীতলাকে তুলে নিয়ে পুকুরের জলে ফেলে দিয়েছিল।

স্নানযাত্রার মেলাতে ভয়ানক কুপ্রথাটাকে বাধা দেবার জন্য পিকেটিং চালাবার সব দায়িত্ব নিয়ে বটেশ্বরপুরে এসেছে এই ইন্দুনাথ।

সারাদিন আর সারারাত, জেগে থাকে আর দাঁড়িয়ে থাকে পিকেট। কাদাটে খালটার উপরে সুপুরিগাছ ফেলে যে সাঁকোটা বাঁধা হয়েছে, ঠিক তারই মুখে দাঁড়িয়ে থাকে কর্মীদলের ছেলেদের একটা সতর্ক ভিড়। এই সাঁকোটা পার না হয়ে ওদিকে, সারি সারি চালাঘর দিয়ে সাজানো সেই নোংরা পৃথিবীটার দিকে এগিয়ে যাবার আর কোন পথ নেই। পিকেটিং-এর একটা সচল দল ঘুরে বেড়ায়, কাদাটে খালের কিনারা ধরে আসশেওড়ার বাদাড় পর্যন্ত; কোন বিল্বমঙ্গল যেন খাল সাঁতরে ওদিকে গিয়ে উঠবার সুযোগ না পেয়ে যায়। রাত্রিবেলা কর্মীদলের টর্চের আলো মাঝে মাঝে ঝলসে উঠে অন্ধকারটাকেও শাসিয়ে রাখে।

পিকেটিং-এর প্রথম দিনটা পার হয়ে যেতেই বুঝতে পারে ইন্দুনাথ, কাঞ্জিলাল-মশাই কত মিথ্যে আশঙ্কা করেছিলেন। উপদ্রব পিকেটিং-এর কাছে এগিয়ে আসেনি। এই পিকেটিংটাই যেন একটা কঠোর চক্ষুলজ্জার শাসন। কাউকে বাধা

দেবার দরকারই হলো না, কারণ কোন নির্লজ্জতা এই পিকেটিং তুচ্ছ করবার জন্য এগিয়ে এল না।

কিন্তু দ্বিতীয় দিনেই সন্দেহ করতে হলো, না, যেন আড়ালে গা-ঢাকা দিয়ে রয়েছে একটা বিদ্রোহ। সে রাত্রে ক্যাম্পের বেড়াতে আগুন লাগলো।

পরের রাতটাও বাদ গেল না। কিচেনের ভিতরে রাখা সব চাল-ডাল চুরি হয়ে গেল। তার পরের রাতটাও বাদ গেল না। কর্মীদলের মধ্যে সবচেয়ে বেশি উৎসাহ নিয়ে টহল দিয়ে বেড়ায় যে জনার্দন, তারই মাথার উপর ঝামা-ইটের একটা ঢিল এসে আছড়ে পড়লো। টহল ছেড়ে দিয়ে ক্যাম্পে ফিরে আসে জনার্দন। —না ইন্দদা, এখানে আর টিঁকতে পারা যাবে না।

—খুব পারা যাবে। সারারাত আমি একাই টহল দেব। আস্তে আস্তে কথা বলে ইন্দুনাথ, কিন্তু গলার এই শান্ত স্বরটাই বুঝিয়ে দেয়, বাধা পেয়ে ইন্দুনাথের প্রতিজ্ঞার উৎসাহটাই মেতে রয়েছে।

জনার্দনের কপাল ফেটে রক্তের ধারা ঝরছে। কপালের ক্ষত আইডিন দিয়ে ধুয়ে আর কাপড়ের পটি দিয়ে বেঁধে দিয়ে জনার্দনের টর্চটা হাতে তুলে নিয়ে ক্যাম্পের বাইরে এসে দাঁড়ায় ইন্দুনাথ। চোখের দৃষ্টিটা তবু শান্ত। একটা শান্ত প্রতিজ্ঞার দৃষ্টি। আজ সারারাত ইন্দুনাথ একা টহল দিয়ে ঘুরবে।

হঠাৎ ইন্দুনাথের মুখের উপর একটা টর্চের আলোর ঝলক ছুটে এসে পড়ে। তারপর মচমচ করে জুতোপরা পায়ের একটা শব্দও এগিয়ে আসতে থাকে। ইন্দুনাথের কাছে এসে থেমে যায় শব্দটা।

—কে আপনি? জিজ্ঞাসা করে ইন্দুনাথ।

ইন্দুনাথের মুখের উপর আবার টর্চের আলো পড়ে, আর, একটা গভীর স্বর যেন রাগ চেপে চেপে কথা বলে—এ তল্লাটে সবাই যাকে চেনে আর জানে, সেই আমি। আমি জিজ্ঞেস করছি আপনি কে?......ও হরি...এ যে তুমি,...আমাদের সেই ইন্দুনাথ।

এইবার নিজেরই মুখের উপর টর্চের আলো ফেলে আগন্তুক মানুষটা হেসে ওঠে। —দেখ তো চেয়ে আমারে তুমি চিনিতে পার কি না?

চিনতে পারে ইন্দুনাথ। বর্ধমান কলেজে পড়বার সময় বটেশ্বরপুরের জমিদারবাড়ির ছেলে যে চিরঞ্জীব ইন্দুনাথের এককক্লাসের বন্ধু ছিল, সেই চিরঞ্জীব। কিন্তু সেই চিরঞ্জীবের একটা নতুন পরিচয়ও পেয়ে যায় ইন্দুনাথ। মুখ ভরা হাসি হেসে যেন বুক ভরা মদের গন্ধ উথলে দিচ্ছে চিরঞ্জীব।

চিরঞ্জীব বলে—নেই কাজ, তো খই ভাজ; এটা যে তোমার জীবনের আদর্শ, সেটা আমি সেই কলেজ যুগেই ধরতে পেরেছিলাম হে ইন্দুনাথ। কিন্তু তুমি যে শেষে আমার আদর্শকে দাগা দেবার জন্য আমরাই রাজ্যে এসে ঢুকবে, এ তো বুঝতে পারিনি রে বাবা।

ইন্দুনাথ—তোমার রাজ্য মানে কি?

চেঁচিয়ে হাসে চিরঞ্জীব—আমি যে এখন বটেশ্বরপুরের মেজকর্তা, এই সত্যটা কি তুমি জানতে না?

—না।

—জানলে বোধহয় আমার দশ হাজার টাকার তোলা আদায়ের লক্ষ্মীস্বরূপা এই মেলাটিকে বিরক্ত করতে তুমি আসতে না।

—আসতাম বই কি।

—কেন? তোমার আদর্শের চরণে কোন্ অপরাধ করেছে মেলাটা?

—এই মেলাতে একটা খারাপ প্রথা চলে, সেটা বন্ধ করতে এসেছি।

—খারাপ প্রথা? প্রথাটা যে তোমাদের স্বর্গধামেও চলে ইন্দুনাথ।

—মর্ত্যধামে না চললেই ভাল।

—কিন্তু মর্ত্যধামের চরিত্র শুদ্ধ করবার হুকুমনামা তোমাকে দিলে কে?

—তুমি ভুল বুঝেছ চিরঞ্জীব। স্নান-যাত্রার নামে একটা মেলা বসেছে, সেখানে এসব প্রথাকে প্রবেশ না করতে দেওয়াই ভাল।

—বেশ তো, এবার তুমি বল, ওরা তাহলে খাবে কি?

—কি বললে?

—ওরা এখানে রোজগারের জন্য এসেছে। ওদের রোজগারের উপায় বন্ধ করে দিয়ে তুমি ওদের ভাতে মারছো। এটা কেমনতর আদর্শ হলো, আমাকে একটু বুঝিয়ে দাও দেখি।

চিরঞ্জীবের মূর্তিটা যেন আহ্লাদের দোলায় দুলতে থাকে, পায়ের চকচকে পাম্পসু মচমচ করতে থাকে। মদের গন্ধে ভরা হাসিটাকেও দুলিয়ে দিয়ে চিরঞ্জীব বলে—ব্রেথা চেষ্টা ইন্দুনাথ। বুঝিয়ে দেবার সাধ্যি নেই তোমার।

ইন্দুনাথ নীরব হয়ে গিয়েছে। চিরঞ্জীবের হাসির শব্দটা যেন সত্যিই একটা কঠিন ঠাট্টার ঝামা ইট হয়ে ইন্দুনাথের কপালের উপর আছড়ে পড়েছে। ওরা খাবে কি? সত্যিই তো, ওদের ভাতে মারবার কি অধিকার আছে ইন্দুনাথের?

চিরঞ্জীব বলে—তুমি যে মস্ত পিকেটিং-বিশারদ, সেটা আমার অজানা নয় ইন্দু-নাথ। তুমি একটা বাজারকে মদ-ছাড়া করেছ, একটা শহরকে বিলাতী-কাপড়-ছাড়া করেছ, কিন্তু বটেশ্বরপুরের মেলাটাকে প্রথা-ছাড়া করতে পারবে না বন্ধু। ব্রেথা চেষ্টা। অতএব, অবিলম্বে প্রস্থান কর। বন্ধুভাবেই তোমাকে এই উপদেশ দিয়ে গেলাম।

ইন্দুনাথ—আমি যাব না চিরঞ্জীব, তুমি বৃথা উপদেশ দিও না।

চিরঞ্জীব—তার মানে, তোমার ইচ্ছা করিবে পূর্ণ আমার জীবন মাঝে?

ইন্দুনাথ—জানি না?

চিরঞ্জীব—আচ্ছা কিন্তু, শেষ যেন আমারই ইচ্ছা না হয় পূর্ণ তোমার জীবন মাঝে।

চলে গেল চিরঞ্জীব। কিন্তু চিরঞ্জীবের উপদেশ যেন ইন্দুনাথের প্রতিজ্ঞার প্রাণ-

টার উপর কাঁটায় মত বিঁধতে থাকে। সত্যিই কি চলে যেতে হবে?

সকাল হতেই ইন্দুনাথের প্রতিজ্ঞার প্রাণটাকে ভয় পাইয়ে দেবার জন্য সাঁকোর ওদিকের মুখের কাছে আর একটা বিদ্রোহের ভিড় দেখা দিল। এক গাদা হিংস্র-শিক্কার বিলাপ অভিশাপ আর গালাগালির ভিড়। কর্মীদলের ছেলেরা মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে থাকে; আর ইন্দুনাথ স্তব্ধ হয়ে সেই ভিড়ের দিকে তাকিয়ে থাকে। জীবনে বোধহয় এই প্রথম, ইন্দুনাথের সেবাব্রত শান্ত মন একটা অবুঝ দুশ্চিন্তার পীড়নে অশান্ত হয়ে ওঠে।

—কি গো বাবু, স্বদেশী করবার কি আর জায়গা ছিল না? এখানে মরতে এলে কেন?

—ধম্মের বক ঠাকুর এয়েছেন।

—জীব তরাতে এয়েছেন দয়াবিষ্টুর অবতার।

—ঝাঁটা মার্; এঁটো ছুঁড়ে মার্; বোতলপেটা করে ধম্ম ছুটিয়ে দে।

—ভাত দেবার ভাতার নয়, কিল মারবার কশাই।

শাড়ির আঁচলটা শক্ত করে কোমরে জড়ানো, চোখের কোলে কাজলের মোটা প্রলেপ, খোঁপাটা এলোমেলো হয়ে ঝুলছে, এইরকম একটি মূর্তি কয়েক পা এগিয়ে একেবারে ইন্দুনাথের চোখের সামনে এসে দাঁড়ায়।—রাগের কথা বলছি না মশাই, দুঃখের কথা বলছি। আপনি একটু বুঝে দেখুন।

ইন্দুনাথ—বলুন, কি বুঝতে বলছেন।

—আপনি আমাদের রোজগার এভাবে বন্ধ করে দিলে আমাদের পেট চলবে কি করে?

—রোজগারের জন্যে এখানে এসেছেন কেন আপনারা?

—কেন? এখানে এসে কোন্ ভুলটা হলো?

—এখানে লোকে ধর্মের নামে আসে, একটা স্নানযাত্রার মেলা।

—আমরাও তো সেই জন্যে এখানে এসেছি গো মশাই। ধম্মের নামে এসেছি।

সাঁকোর ওপরে একটা বুড়ো পাকুড়ের গোড়ায় সিঁদুর মাখানো একটা পাথরকে দেখিয়ে দিয়ে আর হাত তুলে কপালটাকে ছুঁয়ে ভক্তিনত একটা ভঙ্গী করে চেঁচিয়ে ওঠে কাজল-লেপা চোখের সেই নারী।—চোখভুলানি মায়ের আদেশ আছে, পুণ্যি-স্থানে রোজগার করতে হয়। মাগিরা চিনিসিঁদুর দিয়ে মাকে পূজো করে আর আদেশ নিয়ে তবেই না রোজগারে নেমেছে।

—ওসব কথা ছেড়ে দিন। তবে…হ্যাঁ…।

—বলুন তাহলে, আমরা কি করি?

—স্নানযাত্রা পর্যন্ত রোজগার বন্ধ রাখুন।

—তারপর?

—তারপর যা ইচ্ছে হয় করবেন।

—তা তো করবোই। তারপর থাকলেও করবো, চলে গেলেও করবো। কিন্তু

একটা মাস পেটে খেয়ে বাঁচবো, তবে তো ?

—সে ব্যবস্থা যদি করে দিই ?

—তাহলে…। চুপ করে কি-যেন ভাবে, কোমরে শক্ত করে আঁচল জড়ানো সেই উগ্রতা।

পতিতাদের ভিড়টাও হঠাৎ চুপ করে কি-যেন ভাবে। তারপর, যেন একটা অনিচ্ছাময় স্বীকৃতির গুঞ্জন গুন গুন করে।—তবে তাই হোক। স্বদেশীবাবু যদি একটা মাসের খোরাক দিতে পারেন, তবে রোজগার না হয় বন্ধ রাখাই যাবে ; পূর্ণিমার দিনটা পেরিয়ে যাক্।

চিরঞ্জীবের উপদেশের ঠাট্টাটা মিথ্যে হয়ে গিয়েছে। সাঁকোর মুখে পিকেটিং তেমনই দাঁড়িয়ে থাকে। আর সেই সঙ্গে রিলিফের কাজও চলে।

কর্মীদলের তিন-চারজন ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে পতিতা উপনিবেশের প্রতি চালা-ঘরের দরজার কাছে সিধে পৌঁছে দিয়ে যায় ইন্দুনাথ। চাল ডাল আলু আর নগদ দু' আনা।

কোন বাধা ইন্দুনাথের শান্ত মনের প্রতিজ্ঞাকে দমিয়ে দিতে পারেনি। সবচেয়ে কঠিন হয়ে দেখা দিয়েছিল যে বাধা, সেটা হলো নিজেরই মনের একটা বেদনাকর অপরাধবোধের বাধা, পিকেটিং-এর ফলে মানুষগুলির ভাত বন্ধ হবে। টেলিগ্রাম করে রানীহাটের মেটে বাড়িটাকে, ইন্দুনাথের বিষয়-আশয়ের শেষ চিহ্নটাকেও কাকার কাছে বন্ধক দেবার ইচ্ছা জানিয়ে দুটি হাজার টাকা আনিয়েছে ইন্দুনাথ।

এইসব বাধাকেই বোধহয় অদ্ভুত রকমের বাধা মনে করে একটু ভয় পেয়েছিলেন কাঞ্জিলালমশাই। কিন্তু চিঠি পেয়ে সব জানতে পেরে তিনি খুশি হবেন যে, এইসব অদ্ভুত বাধা ইন্দুনাথকে একটুও দমিয়ে দিতে পারেনি। পিছিয়ে আসতে হবে, এগিয়ে যাবার সাহস হবে না, ইন্দুনাথের জীবনে এমন ট্র্যাজেডির স্থান নেই।

এই অদ্ভুত রকমের সেবার কাজটাও ভাল লাগে। আর ভাবতে অদ্ভুত লাগে, অধঃপতিত জীবনের এই উপনিবেশের মধ্যে এমন একজন আছে, যে মানুষটা রিলি-ফের চাল ডাল নিতে আপত্তি করেছিল !

সে নারীর ঘরটাকেও দেখে একটু আশ্চর্য হয়েছে ইন্দুনাথ। বেশ সাজানো গোছানো একটা সৌখীন ঘর। তার চালাঘরের মধ্যে ঘড়ি আছে, ঝকঝকে আয়না আছে। ঘরের বেড়ার গায়ে উর্বশীধরনের এক নৃত্যময়ীর রঙীন ছবিও আছে। আরও অদ্ভুত, খোঁপায় ফুল গুঁজে আর ঠিক ছবিটারই সেই উর্বশীধরনের মূর্তির মত সাজ করে দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিল সেই তরুণী।

প্রথমদিনে পিছন থেকে ডাক দিয়ে আর খিলখিল করে হেসে বাধা দিয়েছিল কতকগুলি কৌতুকের কণ্ঠস্বর—ওদিকে আপনার যেয়ে কাজ নেই গো বাবু। উনি হলেন দেবদাসী। আপনার দানের চাল ডাল আলু উনি ছোঁবেন না।

সত্যিই, রিলিফের চাল-ডালের দিকে একটা ভ্রূক্ষেপও না করে, বেশ গর্বিত

ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আর ঘাড় হেলিয়ে দিয়ে, শুধু ইন্দুনাথের মুখের দিকে তাকিয়েছিল সেই নারী।

এখানে কোন দরজার কারও সঙ্গে কথা বলবার দরকার হয়নি ইন্দুনাথের। ইন্দুনাথের সঙ্গে কেউ কোন কথা বলতে চেষ্টাও করেনি। কিন্তু এই দরজার কাছে কথা বলতে হলো।—আপনি কি সাহায্য নেবেন না?

—না।

—কেন?

—দরকার নেই।

—কেন?

—আমার খোরাক আমি নিজেই কিনে নিতে পারবো।

—কিন্তু জানেন তো, কি নিয়ম করা হয়েছে?

—কি?

—স্নানযাত্রা চুকে না যাওয়া পর্যন্ত এখানে কোনরকমের···।

—শুনেছি। সেইরকম গর্বিত ভঙ্গীতেই দাঁড়িয়ে থাকে আর একটা তুচ্ছতার ভ্রূকুটি হেনে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নেয় সেই নারী। যেন তাজা বয়স আর তাজা রূপের একটা উদ্ধত দেমাক ইন্দুনাথের এই রিলিফকে একটা কাঙালপনা মনে করে আর ঘৃণা করে মুখ ফিরিয়ে নিল।

রিলিফের দান সেই সিধে তুলে নিয়ে চলে আসছিল ইন্দুনাথ। কিন্তু তরুণী হঠাৎ বলে ওঠে—আচ্ছা, রেখে যান।

ইন্দুনাথ—আপনার যখন পয়সা আছে, তখন এসব জিনিস আপনি নাই বা রাখলেন।

উর্বশীধরনের সেই ভঙ্গীর মূর্তিটা হঠাৎ যেন লজ্জিত হয়ে, আর একটু কুণ্ঠিত-ভাবে হাসে—একটা মাস না হয় নিজের পয়সা খরচ না করে আপনার দানের চাল-ডাল খেলাম।

সকালবেলায় একবার আর বিকেলবেলায় একবার রিলিফের চাল-ডাল সেই উপনিবেশের প্রতি ঘরের দরজায় পৌঁছে দিতে গিয়ে বুঝতে পেরেছে ইন্দুনাথ, সাঁকোর ওপারের ঐ অদ্ভুত ক্লেদাক্ত দুঃখের ইচ্ছাটা যেন কোনমতে ধৈর্য করে একটা মুক্তির লগ্নের অপেক্ষায় দিন গুনছে। স্বদেশীবাবুর উপদ্রবটাকে ওরা মনে মনে ঠিক ক্ষমা করতে পারেনি; একটু ভয় পেয়েছে বলেই ওরা চুপ করেছে। রিলিফের চাল-ডালকে একটা ভয়ের দান হিসাবে ওরা মেনে নিয়েছে। না নিলে চলে না, হাজত-ঘরে যেমন কঠিন করুণার ছাতু-রুটি না খেলে চলে না।

কিন্তু এই দান না নিলেও যার চলতো, সে নিলে কেন? ভরা-সুখের ছবির মত ওরকম একটা দর্পিত চেহারা কি সত্যিই রিলিফের এই চাল-ডাল খাবে? না, শুধু একটা তামাসা করবার মতলবে একটা কথার কথা বলে দিল আর মুখ টিপে হাসলো?

এর বেশি আর কোন প্রশ্ন ইন্দুনাথের মনে দেখা দেয়নি। এমন কোন ঘটনা নয়

যে, চিন্তা করে বুঝতেই হবে। সারাদিন আর রাতের মধ্যে আর একটিবারও কুশ্রী জগতের সেই হাস্যময়ীর মুখের ছবি ইন্দুনাথের মনের ধারে কাছেও আসেনি।

কিন্তু পরের দিন সকালবেলায় রিলিফের সিধে পৌঁছে দিতে গিয়ে আশ্চর্য হতে হয়। সে ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে যে, তার খোঁপাতে কোন ফুলবিলাস নেই। ছবির উর্বশীধরনের সাজও নয়, ভঙ্গীও নয়। অভদ্র জীবনের কালি দিয়ে কাজলাক্ত করা একজোড়া প্রগল্‌ভ চক্ষুও নয়। ঘরের দরজার কাছে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে যে, সে একটি নিতান্ত স্নিগ্ধ চেহারা। সাধারণ একটা রঙীন তাঁতের শাড়ি জড়ানো একটা পরিচ্ছন্ন মূর্তি।

ইন্দুনাথ বলে—উনি কোথায় গেলেন?

মেয়েটি মুখ টিপে হাসে।—আমি কি জানি?

—আপনি কে?

—কাল জিজ্ঞেস করলে বলতাম, আমার নাম সোনালী। আজ কিন্তু ভাবছি, কি নাম বলা যায়?

ইন্দুনাথ হেসে ফেলে—বুঝলাম, আপনার নাম জানবার কোন দরকার অবশ্য আমার নেই। কিন্তু…।

—কি?

—একটা কথা মনে হচ্ছে।

—বলুন।

—মনে হচ্ছে, আপনার এখানে আর না থাকাই ভাল।

—কেন?

—এখানে আপনাকে মানায় না।

—ওদের সবাইকে বুঝি খুব মানায়?

—না, সেকথা বলছি না। কাউকেই মানায় না, তবে…মনে…হয়…আপনাকে একটুও মানায় না।

—কেন?

—আপনাকে দেখে কে বলবে যে, আপনি এখানকার মানুষ?

—চিরকাল তো এখানকার মানুষ ছিলাম না।

—সেই কথাই তো বলছি। ঘরে চলে যান।

—ঘরে?

—হ্যাঁ।

—ঘর কোথায়? আমাকে ঘরে নেবে কে?

—চেষ্টা করে দেখুন। ঘর পাওয়া যাবে না কেন?…হ্যাঁ, রিলিফের চাল-ডাল সত্যিই খেয়েছিলেন তো? না, আপনি আবার কাউকে দান করে দিলেন?

—না, খেয়েছি।

—চল জনার্দন—ডাক দেয় ইন্দুনাথ।

ঘরের দরজার চাল-ডাল আলু আর দু' আনা পয়সা রেখে দিয়ে জনার্দন বলে—চলুন।

অদ্ভুত এক শিবিরের ভিতরে ঢুকে রিলিফের চাল-ডাল পৌঁছে দেবার জন্য দিনে দু'বার করে আসা আর চলে যাওয়া ; আর অদ্ভুত এক শাসন জাহির করে পিকেটিং-এর কাজে সাঁকোর মুখের কাছে সারাদিন আর সারারাত পালা করে দাঁড়িয়ে থাকা, কাজটা কর্মীদলের ছেলেদের কাছে প্রথম কয়েকটা দিন বেশ বিচিত্র বলে মনে হলেও উৎসাহটা যেন ক্রমেই থিতিয়ে আসতে থাকে। বিচিত্র কাজ বটে, কিন্তু বড় একঘেয়ে এই বিচিত্রতা। ঘটনাও থিতিয়ে গিয়েছে, বিচিত্রতাও থিতিয়ে গিয়েছে।

—দূর্, পরেশ আর গুরুদাস একদিন ক্যাম্পের দাওয়ার উপর অলসভাবে বসে আর প্রায় একসঙ্গে একটা আক্ষেপ করে বলে ওঠে—দূর্, সত্যিই ভাল লাগে না ; এর চেয়ে ভাল ছিল, যদি আরও দু'চারটে ঝামা ইট পড়তো।

শুনতে পেয়ে হেসে ফেলে আর ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে আসে ইন্দুনাথ—কি হলো পরেশ, কাজটার ওপর চটে গেলে কেন?

পরেশ আর গুরুদাস লজ্জিতভাবে হাসে—এই একটা কথার কথা বলে ফেললাম। তা বলে সত্যিই কি···।

ইন্দুনাথ—আমার কাছে কাজটা কিন্তু একটুও একঘেয়ে বোধ হচ্ছে না। বরং, ভাবতে বেশ ভাল লাগছে, এ কাজে এসে বেশ একটা নতুন রকমের আনন্দ পাওয়া গেল।

ইচ্ছে করে বলা কোন কথা নয়, চিন্তা করে বলা কোন কথাও নয়, কথাগুলি যেন ইন্দুনাথের মুখের এই হাসিটার মত নিজের খুশিতে মুখর হয়ে উঠেছে।

কিন্তু সেই অদ্ভুত রিলিফের কাজে রোজ ব্যস্ত হয়ে ওঠবার কোন দরকার আছে বলে মনে করে না ইন্দুনাথ। একাজে রোজ যায়ও না ইন্দুনাথ। বরং মেলার ভিতরে ঢুকে আর ঘুরে বেড়িয়ে দিনটা পার করে দেয়।

রিলিফের কাজটা সত্যিই যে কেমন বিচিত্র ঘটনা ঘটাতে পারে, একদিন তাও দেখতে হলো, আর, আবার হেসে ফেলতেও হলো। না বলেও পারলো না ইন্দু-নাথ—দেখলে ত পরেশ, কী বিচিত্র ব্যাপার! তোমরাই না বলেছিলে, বড় একঘেয়ে লাগছে?

রিলিফের চাল-ডাল পৌঁছে দিতে গিয়ে সেদিন কর্মীদলের ছেলেদের সঙ্গে ইন্দু-নাথও ছিল। কিন্তু সেই অদ্ভুত শিবিরের ভিতরে ঢুকতেই দশ-বারজন নারীমূর্তির রুষ্ট ও উতলা একটা দল অদ্ভুত এক অভিযোগের সোরগোল তুলে ইন্দুনাথের পথ রুখে দাঁড়াল।—কি গো বাবু, আমাদের ওপর এত বিষনজর কেন, আর সোনালীর ওপরেই বা এত খোশনজর কেন?

—এ কিরকম বাজে কথা বলছেন আপনারা? কী হয়েছে?

—সোনালী বড় সিধে পাবে কেন?

—তার মানে ?

—তার মানে, শুধু সোনালীর সিধের জন্য চা-চিনি বরাদ্দ করলে কেন গো বাবু ? আমরা কি চা খাই না, না খেতে জানি না ? না হয় আমরা দেবদাসীটির মত সোহাগী ঢঙীটি নই।

—ভুল বুঝেছেন আপনারা।

—একটুও ভুল বুঝিনি। চোখে দেখছি, ছুঁড়ি দিব্যি দুবেলা আকাশপানে চেয়ে চা খাচ্ছে। কেন ? সোনালী কি তোমার সাধের পরানটিকে চাঁপাফুল করে খোঁপায় পরবে বলেছে ?

চুপ করে কী-যেন ভাবে ইন্দুনাথ ; তারপর ব্যস্তভাবে বলে—আচ্ছা, আপনারা এখন চুপ করুন। আমাকে একটু খোঁজ নিয়ে বুঝতে দিন, সত্যিই কী ব্যাপার।

তারপর সেই ঘর। আর ঘরের দরজার কাছে সেই নারী। দেখতে একটু চোখেও ঠেকে, সত্যিই যেন একটা শান্ত প্রতীক্ষার মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু প্রতীক্ষার চোখ দুটো একটু উদ্বিগ্ন।

ইন্দুনাথ বলে—আপনার পয়সা আছে, আপনি দু'বেলা চা খাবেন। তাতে আমাদের কিছু বলবার নেই।

—না, কিছু বলবেন না। আমি সবই শুনেছি।

—কিন্তু আমাদের তো মিছিমিছি কতগুলি কটু কথা শুনতে হচ্ছে।

—না আর শুনতে পাবেন না।

না, আর শুনতে পায়নি ইন্দুনাথ। কেমন করে আর কেন সেই অদ্ভুত অভি-যোগটার সন্দেহ মরে গেল, তাও বুঝতে কোন অসুবিধে নেই। সে বেচারী চা খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে।

সেদিন ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দেখতেও পাওয়া গেল, ঘরের মধ্যে চা-এর কোন সরঞ্জাম নেই। ঘরের মেজের উপরে চুপ করে বসে আর মাথা হেঁট করে কী-যেন ভাবছে মেয়েটা, আর আস্তে আস্তে হাত চালিয়ে একটা কুলোর উপর রাখা মোটা চালের ঢেরি ভেঙ্গে ভেঙ্গে বোধহয় খড়কুটো বাছছে। দেখে বুঝতে পারা যায়, ও চাল রিলিফেরই দানের চাল।

কিন্তু সে হঠাৎ একবার ইন্দুনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে নিয়েই মুখ নামিয়ে নিল, মাথা হেঁট করা ভঙ্গীটা যেন হঠাৎ একটা সাহস করতে গিয়ে হঠাৎ ভয় পেয়েছে।

ইন্দুনাথ বলে—আপনি সত্যিই চা খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন মনে হচ্ছে।

মাথা হেঁট করা ভঙ্গীটা একটু দুলে ওঠে।—হ্যাঁ।

—কিন্তু আপনার ঘরে এই সব ছবি-টবি আর ওসব আয়না-টায়না একটুও মানাচ্ছে না···আচ্ছা চলি···চল গুরুদাস।

পরদিন আবার এই ঘরের দরজার কাছে রিলিফের চাল নামাবার সময় ইন্দু-নাথের চোখ দুটো যেন অপ্রস্তুত হয় ; ঘরটা যেন নেই বলে মনে হয়।

ঠিকই, বদলে গিয়েছে ঘরের চেহারাটা। সেই ছবি-টবি নেই, আয়না-টায়নাও নেই। আরও কতগুলো আসবাব ছিল, জঁাকাল-রকমের একটা বিছানা ছিল, সবই ঠেলে-ঠুলে ঘরের একদিকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, আর ছেঁড়া কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে।

ঘরের ভিতরে জ্বলছে ছোট্ট একটা উনান। তার পাশে ঘটি বাটি আর থালা। মেজের উপর পাতা একটা মাদুরের উপর বসে এক গোছা উল আর দুটো কাঁটা নিয়ে বোনাবুনির কী একটা কাজ করছে যে, তার মুখের দিকে তাকিয়ে ইন্দুনাথ যেন বিচিত্রতার আর-এক বিস্ময় দেখতে থাকে। বোধহয়, ভোরে উঠেই স্নান সেরে নিয়েছে একটা নতুন কাজের আনন্দে। ভেজা-ভেজা কালো চুলের গোছা পিঠের উপর ছড়িয়ে দিয়ে বসে আছে। গায়ের শাড়িটাও একটা লালপেড়ে সস্তা মিলের শাড়ি।

—বাঃ, তুমি যে আজ দেখছি একেবারে……। খুশির সুরে প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে ইন্দুনাথ।

চমকে ওঠে স্নান সেরে নেওয়া সেই আনন্দের শান্ত চোখ দুটো।—কি বললেন?

ইন্দুনাথ—দেখে মনে হচ্ছে, তুমি একটা ব্রত-ট্রত শুরু করে দিয়েছ।

রিলিফের কাজে তিনটে দিন কামাই দিতে হয়েছে। ক্যাম্পের বাইরে বের হতে পারেনি ইন্দুনাথ। অনেক চিঠির উত্তর দিতে হয়েছে। অনেক খরচের হিসেব লিখতে হয়েছে। কাকা পাঠিয়েছেন নতুন একটা বন্ধকী কবলা, সেটা একবার পড়ে নিয়ে সই করতে হয়েছে।

বিজয় এসে বলে—উনি একটা কথা বলছিলেন…।

ইন্দুনাথ—কে?

বিজয়—ঐ যে, সেই মহিলা, যার নাম পূর্ণিমা।

—পূর্ণিমা কে?

—ঐ যে, যিনি আগে চা-টা খেতেন।

—কি বলছিলেন?

—বলছিলেন, যদি আমাদের ছেঁড়া জামা-টামা সেলাই করবার দরকার হয়, তবে উনি…।

—তোমরা ওর সঙ্গে এসব কথা আলোচনা কর কেন?

—আমরা করিনি, উনিই করেছেন।

—উনিই বা কেন করেন?

—দোষ হলো জনার্দনের।

—তার মানে?

—কাঁধছেঁড়া আর পিঠছেঁড়া একটা কামিজ গায়ে দিয়ে জনার্দন রোজই রিলিফ পৌঁছতে যায়, তাই দেখে উনি বলছিলেন…।

কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে আনমনার মত চুপ করে বসে থেকে ইন্দুনাথ বলে—তা, তোমরা যদি ভাল মনে কর, তবে দিয়ে এস তোমাদের যত ছেঁড়া জামা-টামা। দিক শেলাই করে। মনে হচ্ছে, এটা একটা সদিচ্ছার কাজ।

কর্মীদলের ছেলেদের ছেঁড়া জামার একটা স্তূপ বাঁধাছাঁদা করে সদিচ্ছার কাছে পৌঁছে দেওয়া হলো। জামাগুলি কয়েকদিন পরে শেলাই হয়ে ফিরেও এল। রিলিফের চাল পৌঁছতে আবার সদিচ্ছার ঘরের কাছে এসে যখন দাঁড়ায় ইন্দুনাথ, তখন আবার একটা অদ্ভুত বিচিত্রতার রূপ দেখে বিহ্বল হয়ে যায় ইন্দুনাথের শান্ত চোখের দৃষ্টি। পূর্ণিমার গায়ের শাড়িটার তিন জায়গায় তিনটে ছেঁড়া শেলাই করা; কিন্তু পূর্ণিমার সেই ভীরু হাসিটা যেন নতুন একটা সাহসের গর্বে রঙীন হয়ে গিয়েছে। পূর্ণিমার মুখটাকে খুবই অদ্ভুত বলে মনে হচ্ছে।

রিলিফের চাল নামিয়েছে বিজয়। ইন্দুনাথ বলে—চল বিজয়। কিন্তু বিজয় চলে গেলেও যেন আনমনার মত চলা ভুলে গিয়ে আর চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে ইন্দুনাথ।

বেশ কিছুক্ষণ পরে কথা বলে ইন্দুনাথ—একটা কথা ছিল।

—বলুন।

—তুমি যে আমাদের জন্য একটা কাজ করে দিলে, সেজন্যে কি কিছুই নেবে না?

—যদি দেন তবে নেব।

—কি নেবে বল?

—যা দেবেন।

—আচ্ছা।...আচ্ছা, তুমি কি বই-টই পড়তে পার?

—সামান্য পারি।

দেরি করেনি ইন্দুনাথ। মেলার ভিতরে ঘুরে ঘুরে আর অনেক খোঁজ করে এমন একটা দোকানও পাওয়া গেল, যেখানে পাঁজি পাঁচালি আর আরও কয়েকরকম বই ছিল। তারই ভিতর থেকে একটা বই বেছে নিল ইন্দুনাথ। সামান্য বইটা কিনতে গিয়ে যে দুপুর পার হয়ে এসেছে, ক্যাম্পের খিচুড়ি ঠাণ্ডা আর শক্ত হয়ে গিয়েছে, তাও বোধহয় বুঝতে পারেনি ইন্দুনাথ।

আর, বিকাল শেষ হয়ে যাবার সামান্য একটু আগে, চোখভুলানি মা'র পাকুড়-গাছের উপর যখন ক্লান্ত কাকের ঝাঁক শান্ত হয়ে বসে গিয়েছে, তখন পূর্ণিমার ঘরের কাছে এসে ডাক দেয় ইন্দুনাথ...বই নিয়ে যাও পূর্ণিমা।

যেন উপহার নেবার একটা উতলা পিপাসা ঘরের ভিতর থেকে অনেক ব্যস্ত-ভাবে ছুটে বের হয়ে আসে।—দিন, কি বই আনলেন?

—ধর্মের বই-টই নয়। তোমার হাতে মানায় যে বই, সে বই।

বইটার নাম মলাটের উপর লেখা আছে—সহজ শিশুপালন। বইটা হাতে নিয়ে কিন্তু আর বইটার দিকে নয়, ইন্দুনাথেরই মুখের দিকে পূর্ণিমার চোখ দুটো বিহ্বল হয়ে তাকিয়ে থাকে।—আমাকে এ বই দিতে আপনার কি সত্যি ভাল লেগেছে?

—ভাল লেগেছে বই কি।

—কেন, বলবেন ?

—কি বললে ?

—আপনি তো সাহসী মানুষ, যা ভাল বোঝেন তাই করেন, আপনি কুষ্ঠী মানুষকেও ছুঁতে ঘেন্না করেন না, কোন ভয়ডর আপনার নেই, কোন বাধা আপনি গ্রাহ্য করেন না, গোরার বন্দুককেও আপনি তুচ্ছ করতে জানেন, অপরাজিতা লতা কাদার উপর পড়ে থাকলে তাকে আপনি বেড়ার উপর তুলে দেন…।

যেন বাঁধভাঙ্গা জলের একটা আশার কলরোল। হঠাৎ মুখর হয়ে বুকের ভিতরের একটা বদ্ধ প্রলাপ মুক্ত করে দিয়েছে মুখচোরা পূর্ণিমা। বার বার হাত তুলে চোখ দুটোকেও মুছতে চাইছে।

ইন্দুনাথ বিব্রতভাবে হাসে।…এসব গল্প তুমি শুনলে কোথায় ?

—আপনার কর্মী ছেলেরাই বলেছে। মিথ্যে কথা বলেনি নিশ্চয়।

—না, মিথ্যা কথা বলবে কেন ?

—তবে ?

—আর বলতে হবে না, আমি বুঝেছি।

চোখ নামিয়ে নেয় পূর্ণিমা। সে চোখে একটা আশ্বস্ত আশার শান্ত হাসি ছড়িয়ে পড়ে, যেন গোপন ব্রতের মানসটা এতদিনে সফল হয়েছে।

স্নানযাত্রার দিনটা এসেই পড়েছে। আজ বাদে কাল। মেলার ভিড়টাও প্রচণ্ড হয়ে উঠেছে।

আজই শেষ রিলিফের দিন। সকালবেলায় রিলিফের চাল ডাল পৌছে দিয়ে এসেছে বিজয় পরেশ আর গুরুদাস। অন্য কাজের ব্যস্ততায় ইন্দুনাথ যেতে পারেন। বিকেলের রিলিফ চুকে গেলেই সাঙ্গ হয়ে যাবে কর্মীদলের সেবাকাজের শেষ পালা। তারপর শুধু একটা রাত সজাগ থেকে সাঙ্গ হয়ে যাবে পিকেটের সজাগ শাসনের শেষ পালা।

তারপর, ইন্দুনাথের এই ক্যাম্পের জীবনটাও এক মাসের ধূলোময়লা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে, ব্রতসাঙ্গ আনন্দে ব্যস্ত হয়ে রঘুনাথপুরের বাস ধরবে আর উধাও হয়ে যাবে।

আগেই কথা হয়ে আছে, স্নানযাত্রার আগের দিন চলে যাবে ইন্দুনাথ। না গেলে নয়। কাকা লিখেছেন, বন্ধকী কবলাটা রেজিষ্টারী হবে; স্নানযাত্রার একদিন আগে না পৌছলে সকালবেলার কাছারীতে হাজির হওয়া সম্ভব হবে না। সুতরাং আজ দুপুরেই রওনা হতে হয়।

ইন্দুনাথের বিছানা বাঁধাছাঁদা হয়ে প্রস্তুতও হয়ে থাকে। কাগজপত্র আর জামা-কাপড় ভরে দিয়ে বাক্সটাকেও বন্ধ করে প্রস্তুত করিয়ে রাখে ইন্দুনাথ।

আর তো কোন কাজ নেই। হ্যাঁ, কাজ বলতে একটা কাজের কথা মনে হয়। দোষ কি ? যাবার আগে একবার শেষ অনুরোধের কথাটা বলে দিলেই হয়—তুমি এবার চলে যাও, পূর্ণিমা।

রৌদ্রতপ্ত জ্যৈষ্ঠের একটা মধ্যাহ্ন, এ সময়ে ঐ উপনিবেশে প্রবেশ করা রিলিফেরও নিয়মে নিষিদ্ধ আছে। কিন্তু ইন্দুনাথের মন আজ আর এসব খুঁটিনাটি বিচার করবার দরকার আছে বলে মনে করে না। পূর্ণিমাকে যে কথাটা শেষবারের মত বলে দিতে হবে, সেটাও তো একটা পরম রিলিফের বাণী।

পৌঁছে যেতে পনর মিনিটও সময় লাগে না।

পূর্ণিমার ঘরের দরজা খোলা। মেঝের উপরে কোন মাদুর পাতাও নেই। মেঝের মাটির উপরে শুয়ে আছে, ঘুমিয়ে আছে পূর্ণিমা। সত্যিই পূর্ণিমা তো?

পূর্ণিমা বলেই তো মনে হয়। মুখটা স্পষ্ট দেখা যায়। স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে পূর্ণিমার সারা শরীরটাই। শাড়িটা এলিয়ে পড়েছে, তার চেয়ে বেশি এলিয়ে পড়েছে পূর্ণিমার হাত দুটো। পূর্ণিমা যেন কথাবলা কোন প্রাণ নয়, শুধু বুকভরা কোমলতার কতগুলি নিঃশ্বাস। কী ভয়ানক বেহুঁস হয়ে ঘুম দিচ্ছে পূর্ণিমা।

যেন নিজেরই উপর হঠাৎ বিরক্ত হয়ে অপলক চোখ দুটোকে ফিরিয়ে নেয় ইন্দুনাথ; খোলা দরজার কাছ থেকে একটু আড়ালে সরে গিয়ে ডাক দেয়—পূর্ণিমা!

বোধহয় এই ডাক শোনবার জন্য ঘুমের মধ্যেও পূর্ণিমার প্রাণটা জেগেছিল। এক ডাকেই ধড়ফড় করে জেগে উঠে দরজার কাছে এসে দাড়ায় পূর্ণিমা—আমি তৈরী হয়েই আছি।

দেখতে পায় ইন্দুনাথ, সত্যিই তৈরী হয়ে আছে পূর্ণিমা। জামাকাপড়ের ছোট্ট একটা পোঁটলা, একটা হাতবাক্স আর একটা বই; একটা আয়োজন যেন যাত্রার অপেক্ষায় প্রস্তুত হয়ে দরজার একপাশে জড়ো হয়ে আছে।

ইন্দুনাথ—কিন্তু যাবার জন্য আজই কেন তৈরী হয়েছ?

—আজই তো। তাই তো শুনলাম।

—কি শুনলে?

—বিজয়দা বললেন, আপনি আজই চলে যাবেন বলে ঠিক করেছেন।

—ঠিকই বলেছে! কিন্তু সেজন্যে তুমি তৈরী হলে কেন?

যেন হঠাৎ বোবা হয়ে যাওয়া একটা বিস্ময়ের জ্বালা নিয়ে ইন্দুনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে পূর্ণিমা। তারপর চোখ নামিয়ে নেয়—আপনি তাহলে আজই চলে যাচ্ছেন?

—হ্যাঁ।

—আচ্ছা।

মুখ ফিরিয়ে নিয়ে একেবারে সুস্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে পূর্ণিমা। আর কোন কথাও বলে না।

চলে যায় ইন্দুনাথ।

স্নানযাত্রা। রথ চলেছে। হাজার হাজার লোকের চিৎকার মাতিয়ে দিয়ে আর ধুলো উড়িয়ে উড়িয়ে রথটা বাসুদেব সরোবরের দিকে চলে গিয়েছে।

ক্যাম্পের বাইরে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে ইন্দুনাথ, এক-একটা স্নানের মিছিল হুল্লোড় করে ছুটে গিয়ে বাসুদেব সরোবরের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। যেন কাদার বাষ্প উথলে উঠছে। সে জায়গার আকাশটাও ঘোলা হয়ে গিয়েছে।

রঘুনাথপুরের বাস কাল দুপুরে ঠিক সময়ে এসেছিল, কিন্তু ইন্দুনাথ যায়নি। বিজয় বলেছিল, কেন আর একটি দিনের জন্য আমাদের নেতৃত্বহীন করবেন ইন্দুদা? থেকে যান, স্নানযাত্রার পরের দিন সকালে সবাই রওনা হওয়া যাবে।

ইন্দুনাথেরও কাজছাড়া প্রাণটা আজ যেন একেবারে অলস হয়ে গিয়েছে। বাইরে বটেশ্বরপুরের মেলার ধুলো রোদে পুড়ে আর গনগনে আগুনের নিঃশ্বাসের মত হলকা হয়ে ছুটে বেড়ায়, আর ইন্দুনাথ ক্যাম্পেরই ভিতরে একটা ঠাণ্ডা জায়গা বেছে নিয়ে বিছানার উপর অলস হয়ে শুয়ে পড়ে থাকে। বিকেল কখন ফুরিয়ে গেল আবার কখন যে বটেশ্বরপুরের ধুলোভরা সন্ধ্যার আকাশে জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমার এতবড় একটা চাঁদ ভেসে উঠল, তাও বুঝতে পারেনি ইন্দুনাথ। ঘুমের মধ্যেই হঠাৎ চোখ কুঁচকে, যেন একটা স্বপ্নকে নিংড়ে দিয়ে, যখন জেগে ওঠে আর চোখ মেলে তাকায় ইন্দুনাথ, তখন সেই নিরালা ক্যাম্পের ভিতরে বটেশ্বরপুরের শান্ত জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়েছে।

চোখের সামনে কেউ নেই, কোন কাজের ছায়াও নেই। কিন্তু ইন্দুনাথের মনটা এই কাজ-ফুরানো আলস্য সহ্য করতে গিয়ে ছটফট করছে। এতক্ষণ ধরে যেন ঘুমের মধ্যেও ছটফট করছিল বটেশ্বরপুরের একটা মায়া-জ্যোৎস্না।

পূর্ণিমা নিশ্চয় ধারণা করেছে, এতক্ষণে বটেশ্বরপুর ছেড়ে চলে গিয়েছে ইন্দুনাথ। কিন্তু ইন্দুনাথকে এ সন্ধ্যায় আচমকা দেখতে পেলে বোধহয় একটু আশ্চর্য হবে আর খুশি হয়ে হেসে ফেলবে পূর্ণিমা।

কিন্তু ভাবতে গিয়ে চমকে ওঠে ইন্দুনাথের মন, পূর্ণিমাই যে চলে গিয়েছে! চলে যাবার জন্য কালই তো তৈরী হয়েছিল পূর্ণিমা। স্নানযাত্রা চুকে যাবার পর, সে কি এখনও সেই ঘরের ভিতর চুপ করে বসে আছে? বিশ্বাস হয় না।

যদি থাকে? বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে, আছে বোধহয়।

ক্যাম্প থেকে বের হয়ে, যেন একটা স্বপ্নালু বিশ্বাসের আবেশে বটেশ্বরপুরের জ্যোৎস্নামাখা ধুলো মাড়িয়ে, সাঁকো পার হয়ে, চোখ-ভুলানি মা'র সিঁদুরমাখা পাথরটার কাছ দিয়ে নিজেরই একটা অদ্ভুত ছায়াকে যেন টেনে টেনে নিয়ে যেতে থাকে ইন্দুনাথ।

—পূর্ণিমা।

ডাক শুনেই ঘরের ভিতর যেন লজ্জাহত একটা ভীরু আর্তনাদ শিউরে ওঠে। দেখতে পায় ইন্দুনাথ, দু' হাত দিয়ে চোখ-মুখ ঢেকে আর স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, ছবির উর্বশীর মত সাজ করা সোনালী।

ঘরের ভিতর একটা ল্যাম্প জ্বলছে। ঝকঝক করছে আয়নাটা। বেড়ার গায়ে বিবসনা অপ্সরার ছবি ঝুলছে। খাটের উপর পাতা ফুলবাহার চাদরের রংদার ঝালর

ঝুলছে।

সোনালীর মুখটা দেখা যায় না; দেখা যায় খোঁপার ফুলগুলি। ইন্দুনাথ বলে—আজও যাওয়া হলো না, তাই তোমাকে দেখতে এলাম।

কোন উত্তর না দিয়ে দু'হাত দিয়ে মুখ ঢেকে রেখে সোনালী যেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলে— আমি জানতাম না যে আপনি আসবেন।

—তাতে কি হয়েছে?

মুখের উপর থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে দুটো তীব্র বিস্ময়ের চোখ তুলে এইবার ইন্দুনাথের মুখটাকে দেখতে থাকে সোনালী।

ঘুমন্ত মানুষের গলায় স্বরের মত অদ্ভুত স্বরে ইন্দুনাথও যেন একটা নতুন আবিষ্কারের বিস্ময়ের সঙ্গে ফিসফিস করে।—তুমি সত্যিই সুন্দর।

সোনালীর চোখে একটা মৃদু ভ্রুকুটি শিউরে উঠে।—আজ আমাকে সুন্দর মনে হলো?

—হ্যাঁ। নিশ্চয়।

ঘরের দরজা পার হয়ে একেবারে ঘরের ভিতরে ঢুকে সোনালীর মুখের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে ইন্দুনাথ বলে—মিথ্যে বলছি না, তুমি বিশ্বাস কর।

কোন কথা না বলে, খোঁপাটাকে এক হাতে যেন শক্ত করে খিমছে ধরে আর স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সোনালী।

ইন্দুনাথ—তোমার ঘরটিও বেশ সুন্দর।

রংমাখানো নরম ঠোঁটের উপর সাদা সাদা শক্ত দাঁতের ধার বসিয়ে দিয়ে আর ইন্দুনাথের মুখের দিকে কটমট করে একবার তাকিয়ে নিয়ে সোনালী বলে—এঘরে আমাকে মানিয়েছে সুন্দর, তাই না?

ইন্দুনাথ—কি বললে?

সোনালী—আপনি আর কতক্ষণ থাকবেন?

ইন্দুনাথ—থাকি কিছুক্ষণ। এখন আর তো কোন কাজ নেই আমার। তা ছাড়া তোমার সঙ্গে আর তো কখনো দেখা হবে না।

সোনালীর দুই ঠোঁটের ফাঁকে যেন একটা সর্বনাশা কুহকের রঙীন হাসি লতিয়ে উঠতে থাকে। ল্যাম্পটাকে যেন ছোঁ মেরে এক হাতে তুলে নিয়ে ইন্দুনাথের মুখের দিকে তাকায় সোনালী।—আলো থাকবে, না নিভিয়ে দেব? কি পছন্দ করেন আপনি?

ইন্দুনাথ—তোমার যা পছন্দ।

সোনালীর হাতটা একবার শুধু কাঁপে। তারপর মাথা হেঁট করে সোনালী। তারপর ল্যাম্পটা হাতে নিয়েই ঘর ছেড়ে একেবারে দরজার বাইরে গিয়ে দাঁড়ায়।

দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ডাক দেয় সোনালী—শুনুন।

ইন্দুনাথও বাইরে এসে দাঁড়ায়। কিন্তু সোনালীর মুখের দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য হয়।—এ কি? তুমি কাঁদছ কেন পূর্ণিমা?

—আমি পূর্ণিমা নই। কিন্তু আমার একটা কথা শুনুন। ফিসফিস করে যেন একটা নিবিড় মায়ার আবেশে কথা বলে সোনালী।—আপনি চলে যান।

—কেন ?

—আমার এখানে এখন মেজকর্তা আসবেন।

—কে মেজকর্তা ? চিরঞ্জীব ?

—হ্যাঁ।

—চিরঞ্জীব এখানে আসবে কেন ?

—চিরঞ্জীব আসবে। আপনার আসতে নেই।

—কেন ?

নিষিদ্ধ দুনিয়ার সেই উপনিবেশের ঘরে ঘরে তখন প্রচণ্ড হাসি-হররা আর হুল্লোড়ের নেশাক্ত উৎসব জেগে উঠছে। ছুটোছুটি করছে যত ব্যস্ত লুব্ধ আর দুরন্ত ছায়াশরীর। আর ধুলোমাখা জ্যোৎস্নার গুমোট ঝলসে দিয়ে একটা টর্চের আলো সরু পথের উপর দিয়ে যেন আছাড় খেয়ে খেয়ে এগিয়ে আসছে।

সোনালী বলে—শিগগির চলে যান। নইলে, ধরা পড়ে যাবেন।

—কি বললে ?

—আসুন আমার সঙ্গে।

—কোথায় ?

—চলে যাবার জন্য একটা রাস্তা আছে। কিন্তু গাছপালায় ভরা সে রাস্তায় বড় অন্ধকার।

—তবে ?

—আমি আলো ধরছি, আসুন।

সে রাস্তার প্রথম সুপুরিগাছটার কাছে এসেই আলো তুলে ধরে সোনালী—চলে যান।

চলে যেতে থাকে ইন্দুনাথ।

—শুনুন, ডাক দিয়ে আর দু'পা এগিয়ে এসে ফিসফিস করে সোনালী—দিব্যি দিয়ে বলছি, আমার কথাটা তুচ্ছ করো না লক্ষ্মীটি। ঘরে ঢুকবার আগে একবার স্নান করে নিও।

—কেন ?

—তুমি ভুল করে আমার ঘরে ঢুকেছিলে।

চমকে ওঠে ইন্দুনাথ। যেন একটা সাপের ছোবল পড়েছে ইন্দুনাথের বুকের উপরে, চওড়া একটা বাজে বুক, বটেশ্বরপুরে এসে যে বুকের সাহস ভীরু হয়ে গেল, আর দুঃসাহসী হয়ে উঠল ভীরুতা। এক মুহূর্তও দেরি না করে, সরু পথের অন্ধকারের সঙ্গে একটা ভীরু ছায়ার মত ছটফট করে মিশে গেল ইন্দুনাথ।

সারা বাড়ির ব্যস্ততা আর চঞ্চলতার রকম দেখলে মনে হবে, যেন স্বপ্নে পাওয়া একটা ঘটনার পরিণাম এখনি স্বচক্ষে দেখে নিয়ে এখনি শাঁখ বাজাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে এই বাড়ির মন। কাজগুলি যেন দৌড়াদৌড়ি করছে, তর সইছে না।

যেভাবে হন্তদন্ত হয়ে মালতীর ঘরের দিকে ছুটে এলেন বড়-বৌঠান, তা'তে আর বুঝতে বাকী থাকে না যে, কিসের জন্য আর এক মুহূর্তও তর সইছে না এবং সইতে চাইছেও না এই বাড়ির মন।

বড বৌঠানের হাতে একটি লালপেড়ে শান্তিপুরী শাড়ি, নতুন পয়সা-রঙের একটি ব্লাউজ, একটি সিল্কের সায়া, আর, আরও নানা রকমের মেয়েলী সাজের উপচার। মালতীর ঘরের দরজার কাছে এসে একবার হাঁপ ছাড়েন বড-বৌঠান, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর হাত-পায়ের উল্লাস যেন আপন খুশিতে ছটফটিয়ে ওঠে। এক ধাক্কায় ভেজানো কপাট ঝনঝনিয়ে খুলে দিয়ে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করেন বড-বৌঠান। —ধর ধর ; শিগগির ধর। তোমাকে আর এক মুহূর্তও ঐ সাজে আমি থাকতে দেব না।

ঘরের জানালাটাকে খোলা পেয়ে বিকেলের এক ঝলক রোদও যেন সেই মুহূর্তে লুব্ধ হয়ে এসে লুটিয়ে পড়ে লালপেড়ে শান্তিপুরীর উপর। রঙীন হয়ে ওঠে মালতীর মুখ। দেখে মনে হয়, বিকেলের রোদ ঐ শান্তিপুরীর লালপাড়ের আভা তুলে নিয়ে মালতীর মুখে মাখিয়ে দিয়েছে।

মালতীর ঐ সাদা সাজের রিক্ততা ধ্বংস করে মালতীকে এই মুহূর্তে রঙীন করে দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন বড-বৌঠান। বিশ বছর ধরে মালতীর জীবনে ঐ সাদাটে রূপ অনেক কষ্টে সহ্য করেছে এই বাড়ির মন। কিন্তু আর না। আর এক-মুহূর্তও না। মালতীর গায়ে ঐ সাদা থান আর সাদা আদ্দির জামাটাকে আর এক মুহূর্তও দেখতে রাজি নয় এই বাড়ির কোন চক্ষু।

বড়-বৌঠান বলেন—নাও নাও, এখুনি প'রে ফেল।

কিন্তু বড-বৌঠান এত ব্যস্ত হয়ে উঠলেও মালতীর হাত দুটো হঠাৎ এত ব্যস্ত হয়ে উঠবে কেমন করে? মালতীর মুখের উপর রঙীন আভা চমকে উঠলেও হাত দুটো যে বিশ বছরের অনভ্যাসের শাসনে কুণ্ঠিত হয়ে রয়েছে। আজ হঠাৎ লাল-পেড়ে শান্তিপুরীকে জীবনে বরণ করে নেবার জন্য এত অলজ্জ ব্যস্ততা সে মেয়ের হাতে চঞ্চল হয়ে উঠবেই বা কি করে, যে মেয়ের জীবন বিধবারই জীবনের মত আজ, বিশ বছর ধরে সাদাটে রিক্ততার মধ্যে ডুবে রয়েছে? ইচ্ছা থাকলেও হাত দুটো যে লজ্জা কাটিয়ে উঠতে পারে না।

মালতী বলে—তুমি এরকম ডাকাতের মত কাণ্ড কেন করছো বড়ো-বৌঠান? ওগুলো এখন রেখে দাও।

মালতীর কথাগুলিকেও বোধহয় একটা লাজুক হাসির শিহর জড়িয়ে ধরেছে। লালপেড়ে শান্তিপুরীকে বিছানার উপর রেখে দিয়ে চলে গেলেন বড় বৌঠান।

ঘুম ভেঙে চোখ মেলে তাকালেই চোখ থেকে স্বপ্ন সরে যায়; এই তো ঘুমের জীবনের নিয়ম। কিন্তু মালতীর ভাবতে আশ্চর্য লাগে, তার জীবনটা বিশ বছরের ঘুম থেকে হঠাৎ জেগে উঠে চোখ মেলতেই স্বপ্নটাকে দেখতে পেয়েছে। বিশ বছর পরে স্বামী ফিরে এসেছে যার, তার মন বিস্ময়ের আনন্দ সহ্য করতে গিয়ে একবার না কেঁদে থাকতে পারবেই বা কেন? চোখ মুছে লালপেড়ে শান্তিপুরীর দিকে তাকায় মালতী। হেসে ওঠে মালতীর চোখ।

এ যেন নতুন করে আর একবার ফুলশয্যার আহ্বান, একই প্রিয়জনের বুকের কাছে। বিশ বছর আগে এই বাড়ির আর-একটি ঘরে ঐ বৌঠানই ঠিক এমনি করে রঙীন শাড়ি হাতে নিয়ে মালতীর চোখের সামনে দাঁড়িয়ে ঠিক এইরকমই ডাকাতের মত ভঙ্গীতে হুমকি দিয়েছিলেন। মালতীর সে দিনের মনের মিষ্টি-বেদনা ওর চোখ দুটোকে ঠিক এইরকমই ভিজিয়ে দিয়েছিল।

আজ বিশ বছর পরে ফিরে এসে উঠোনের ঐ শেষ কোণের করবীর কাছে ঘরের ভিতরে বসে ছোটকাকার সঙ্গে এখন কথা বলছে যে মানুষটি, সে যে মালতীরই জীবনের এক ফুলছড়ানো উৎসবের উপহার, মালতীর স্বামী ইন্দুপ্রকাশ, যার কোল ঘেঁষে বসে জীবনের এক অদ্ভুত ভয় লজ্জা আর মধুরতা প্রথম সহ্য করেছিল মলতী।

ফিরে এসেছে মালতীর স্বামী। আজই এই বিকেলে, মাত্র এই দশ মিনিট হলো পৌঁছেছে। আগেই জানা ছিল, ইন্দপ্রকাশ আজ আসবে। বেশিদিন আগে নয়, মাত্র তিনদিন হলো, গত বুধবারের সন্ধ্যায় কলকাতা থেকে ইন্দুপ্রকাশের চিঠি পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন ছোটকাকা। তারপরেই দোতলার ঠাকুরঘরে বেজে উঠলো শাঁখ। গঙ্গার এক ভাঙ্গা ঘাটের কাছে, ত্রিবেণীর এই পুরোনো এক দালান বাড়ির বুকের ভিতরে যেন এক উল্লাসের গঙ্গা হঠাৎ জোয়ারের ঢেউ আর কলরোল ছড়িয়ে দিল।

আজ তিনদিন ধরে ঠানদি সেই একই কথা বার বার বলছেন—মালতীর তপিস্যের ফল ফললো। ফলবে না কেন? ভগবান বোধহয় মালতীর তপিস্যে দেখে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছেন।

বাড়িয়ে বলেননি ঠানদি। এই বিশ বছর ধরে মালতী যা করেছে, তাকে তপস্যাই বলতে হয়। ঐ একটি ছোটঘরের ভিতরে বসে স্বামীর ফটো পূজা করেছে মালতী। সকাল সন্ধ্যা রাত্রি, স্বামীর ফটোর সম্মুখে বসে স্বামীর মুখ ধ্যান করেছে মালতী। মানুষ ওভাবে শুধু দেবতাকেই পূজা করতে পারে।

মালতীর এই ছোটঘরের ভিতরে পূজার ঘরের গন্ধ থমথম করে। কখনো ধূপ জ্বলে, কখনো ধুনো পোড়ে, এবং কখনো বা জ্বলে কর্পূর। রক্তচন্দনে মাখা ফুলের স্তূপের মধ্যে স্বামীর ফটো। এই ফটো যেন মালতীর প্রাণের চেয়েও প্রিয় এক ইষ্ট-দেবতার বিগ্রহ; বিশ বছর ধরে মালতীর সকল ক্ষণের ভাবনা ও কল্পনার সেবা পেয়ে এসেছে।

বড়-বৌঠান দেখে আশ্চর্য হয়েছেন, মাঝে মাঝে যখন রাতের বাতাসে সাদা করবীর ডালপালা বড় বেশি ছটফট করে, আর একফালি চাঁদের আলোতে ঝিকি-মিকি করে উঠানের স্যাঁৎসেঁতে শ্যাওলা, তখন স্বামীর ঐ ফটোর দিকে তাকিয়ে গুনগুন করে গান করে মালতী। বৈশাখের দুপুরে এক-একদিন মালতীর ঘরে হঠাৎ ঢুকে দেখতে পেয়েছেন ঠানদি, চুপ করে বসে মালতী তার স্বামীর ফটোকে আস্তে আস্তে পাখার বাতাস দিচ্ছে।

মালতীর এই তপস্যার অনেক আশ্চর্য রীতিনীতির মধ্যে যেটি সবচেয়ে বেশি আশ্চর্যকর, তার পরিচয়ও বুঝে ফেলতে দেরি হয়নি বড়-বৌঠানের। বিছানার উপর মালতীর বালিশের পাশে আর একটি বালিশ। প্রতি রাত্রিতে ঐ বিছানায় মালতীর পাশে সত্যিই একজন শুয়ে থাকে, সে হলো ঐ ফটো। ভোর হলেই স্বামীর ফটোকে বিছানা থেকে তুলে নিয়ে আবার রক্তচন্দনে মাখা ফুলের স্তূপের মাঝখানে বসিয়ে দেয় মালতী।

বড়-বৌঠানের সঙ্গে বিশ বছরের মধ্যে কতবার ঝগড়া করেছে মালতী।—আমার দিকে ওভাবে চোখ ছলছল করে কখ্খনো তাকাবে না বড়-বৌঠান। কে বললে আমি শূন্য হয়ে আছি? মিথ্যে কথা। আমি বেশ আছি। আমি স্বামীর সঙ্গেই আছি।

—তবে এসব অলুক্ষণে সাজ কেন? সধবা মানুষ সধবার মত সেজে থাকবে। সাদা থান পরা তোমার একটুও উচিত নয় মালতী।

মালতী বলে—পুজো করতে হলে এইরকমেরই সাজ হওয়া উচিত।

সত্যিই ঐ সাদা থান হলো মালতীর পূজার সাজ, মালতীর মনের রঙীনতার বিরুদ্ধে মালতীর সুন্দর শরীরটার অভিযোগ যেন অভিমান করে সাদাটে হয়ে গিয়েছে। সত্যিই বিধবা তো নয় মালতী, ওকে শুধু ঐ সাদাটে সাজের জন্য বিধবার মত দেখায়। ওর মনের সিঁথিতে সিঁদুর আছে, নিজেকে বিধবা বলে মনে করে না মালতী।

কিন্তু মালতীকে বিধবা মনে করতে ইচ্ছা না করলেও মনে করতেই হয়। এই বিশ বছরের মধ্যে ছোটকাকা তাঁর মনের রাগ সহ্য করতে না পেরে ছোটকাকীর কাছে কতবার আক্ষেপ করেছেন—ওকে বিধবা সেজেই থাকতে দাও, থাকাই উচিত। স্বামীর সন্ন্যাসী হয়ে যাওয়া যা, স্বামী মরে যাওয়াও তা। তা ছাড়া, ইন্দু আজও সত্যিই বেঁচে আছে কিনা, তাই বা কে বলতে পারে?

আজ সেই ইন্দুই ছোটকাকার সঙ্গে ঐ ঘরের ভিতরে বসে গল্প করছে। এই বিশ বছরে মধ্যে শতবার খোঁজ করেও ইন্দুর কোন খবর এই ভারতের কোন প্রান্ত থেকেও পাওয়া যায়নি। হঠাৎ বিয়ের পর এক মাস যেতে না-যেতে সংসার ছেড়ে কোথায় যে চলে গেল মানুষটা! এত বিষয়-আশয় যার, ত্রিশ বছর বয়েসের স্বাস্থ্যো-জ্জ্বল সুন্দর যৌবনের একটি তরুণ-রূপ, এত শিক্ষিত একটি জীবন, কে জানে কোন্ এক বৈরাগ্যের তাড়নায় কুড়ি বছর বয়সের স্ত্রীকে সংসারজনতার মাঝখানে একলা

জীবনের অভিশাপে স্তব্ধ করে দিয়ে হঠাৎ পালিয়ে গেল ! ছোটকাকা সেই দুঃখ সহ্য করতে না পেরে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন—ছি-ছি, কোন্ এক বদ্ধপাগলের সঙ্গে মেয়েটার বিয়ে দিয়ে মেয়েটার সর্বনাশ করলাম !

আশ্চর্য, একেবারে সূর্য পশ্চিমে ওঠার চেয়েও আশ্চর্য, কুড়ি বছর বয়সের মালতীই ছোটকাকার কাছে এসে শান্ত দুই চক্ষুর দৃষ্টি তুলে বলেছিল—তুমি মিথ্যে দুঃখ করছো, কাকু। সে মানুষ বদ্ধপাগল নয়, আর আমারও কোন সর্বনাশ হয়নি !

ছোটকাকা—তার মানে ?

মালতী বলে—সে পালিয়ে যায়নি, আমি চলে যেতে দিয়েছি বলে সে যেতে পেরেছে।

ছোটকাকা—তাহলে বুঝলাম, তুইই একটা বদ্ধপাগল। কোন্ বুদ্ধিতে তুই ইন্দুকে চলে যেতে দিলি ? স্বামীকে গেরুয়া পরতে সাহায্য করে যে মেয়ে, সে মেয়ের মাথা খারাপ হয়েছে নিশ্চয়।

ছোটকাকা বিশ্বাসই করতে পারেননি যে, মালতী শেষপর্যন্ত সব রাগ অভিমান ছেড়ে দিয়ে, বেশ খুশি হয়ে ইন্দুকে চলে যেতে দিয়েছিল।

বিশ বছর আগের সেই রাত্রি, যে রাত্রিতে একটি ঘরের শান্ত নিভৃতে ফুল-ছড়ানো বিছানার উপরে বসেই প্রথম দেখতে পেয়ে চমকে উঠেছিল মালতী, ত্রিশ বছর বয়সের একটি সুন্দর মুখের উপর বসানো উজ্জ্বল অথচ ভেজা ভেজা দুটি চোখ মালতীর মুখের দিকে তাকাতে না পেরে অন্য দিকে তাকিয়ে রয়েছে। স্বামীর সেই চোখের ভাষা সেই রাত্রিতে কিছুই বুঝতে পারেনি মালতী, বুঝেছিল আর কয়েক-দিন পরে। স্বামীর কথা শুনে আতঙ্কে শিউরে উঠেছিল, চেঁচিয়ে কেঁদে ফেলেছিল মালতী। এবং সব কথার আগে জ্বালাভরা আক্ষেপের মত অসহ্য এক অপমানের বেদনা ধিক্কার দিয়ে বেজে উঠেছিল মলতীর মুখে—তবে আমাকে বিয়ে করলে কেন ? একমাস আগে ভগবানের টানে সংসার ছেড়ে গেলেই তো ভাল করতে।

হ্যাঁ, অপমান বৈকি। জীবনের প্রথম এক উৎসবের মাঝখানে যে মুহূর্তে আশা করছে মালতীর মন, পানের লালে রাঙানো তার পাতলা দুটি ঠোঁটের মায়া প্রথম জয়ের গর্বে আত্মহারা হবে, ঠিক সেই মুহূর্তে স্বামীর মুখের কথাগুলি যেন ধুলো ছিটিয়ে দিল মালতীর মুখের উপর।

ইন্দুপ্রকাশ বলে—ভেবেছিলাম, নিতান্তই ভুল ভেবেছিলাম যে, তোমার কাছে এসে দাঁড়ালে সংসারকে ভালবাসতেই ইচ্ছা করবে।

মালতী—সত্যিই ভালবাসতে ইচ্ছে করছে না ?

ইন্দুপ্রকাশ—না মালতী।

মালতী—ভাল লাগছে না ?

ইন্দুপ্রকাশ—একটুও না।

মালতী—থাকলে খুব খারাপ লাগবে বলে ভয় হচ্ছে ?

ইন্দুপ্রকাশের চোখ দুটো আধমরা মানুষের অসহায় চোখের মত, আনন্দহীন

হয়ে যেন দুঃসহ এক ভয়ের দিকে তাকিয়ে কাঁপতে থাকে।—খুব খারাপ লাগবে। আর তুমিও আমাকে সহ্য করতে পারবে না।

মালতী—ভগবানকে খুঁজতে কোথায় যাবে তুমি?

ইন্দুপ্রকাশ—কোথায় যাব বলতে পারি না, তবু জানি জীবনটাকে একেবারে একলা করে দিয়ে ভগবানের কথা চিন্তা করবো।

আহত মানুষের মত ছটফট করে হঠাৎ আবেদন করে ইন্দুপ্রকাশ—ঐ একলা জীবনের আনন্দ আর শান্তির মধ্যে আমাকে চলে যেতে দাও।

অকস্মাৎ মালতীর চোখ দুটো যেন সব জ্বালা হারিয়ে শান্ত হয়ে যায়। ত্রিশ বছর বয়সের এই সুন্দর একটি পুরুষের চোখের দৃষ্টিতে এ কী অদ্ভুত কাতরতা! মুখের ভাষায় এ কি অদ্ভুত ব্যাকুলতা! খেয়ালের ক্ষেপামি নয়, ইন্দুপ্রকাশের চোখে যেন কোন্ এক আকাশের হাতছানির ছবি চঞ্চল হয়ে উঠেছে। সত্যিই যে এক মহাপুরুষের জীবনের সাধ মালতীর মত মেয়ের চোখের সামনে দাঁড়িয়ে মুক্তি প্রার্থনা করছে। অন্যায় হবে পাপ হবে মালতীর, যদি এমন মানুষের জীবনকে একটা মেয়ের আলতা-সিঁদুরের কাছে জোর করে বেঁধে রাখা হয়।

মালতী বলে—তাহলে যাও।

ইন্দুপ্রকাশ—ওভাবে নয়, ক্ষমা করে আর খুশি হয়ে আমাকে যেতে বল, তা না হলে চলে যাবার অধিকার আমার নেই।

হেঁট হয়ে ঝুঁকে পড়ে মালতীর মাথাটা। মাত্র একমাস হলো বিয়ে হয়েছে, কিন্তু এরই মধ্যে স্বামীর জীবনের উপর কত বড় অধিকার পেয়ে গিয়েছে মালতী! নিজের মুখে স্বীকার করেছে ইন্দুপ্রকাশ, মালতী খুশি হয়ে অনুমতি না দিলে এত বড় পুণ্য-জীবনের পথে এক পা এগিয়ে যেতে পারছে না মালতীর স্বামী। কোথায় অপমান? অদ্ভুত এক গর্বে ও গৌরবে যে ভরে উঠলো মালতীর মন। যে মেয়েকে ভালবাসতে পারেনি, ভালবাসতে পারবে না বলে ভয় করছে, সেই মেয়েকে তুচ্ছতার বদলে শ্রদ্ধা দিয়ে অভ্যর্থনা করছে এক মহাপুরুষের মন। গঙ্গার জোয়ার যেন জলের উপর নুয়ে পড়া একটা লতাকে বলছে, তুমি যেতে দাও, নইলে যেতে পারছি না।

চোখ মুছে হেসে ফেলে মালতী—যাও, খুশি হয়েই বলছি।

এর পর আর বোধহয় মাত্র তিন-চারটে দিন মালতীর চোখের কাছাকাছি ছিল ইন্দুপ্রকাশ। শ্বশুরবাড়ির মানুষেরা হেসে মালতীকে কতবার প্রশংসা করেছে, এমনকি ধন্যবাদও জানিয়েছে।

বড়-জা বললেন—এবার আমরা নিশ্চিন্ত হলাম মালতী।

—কেন বড়দি?

—তুমিই পারবে, তুমিই ওকে ধরে রাখতে পারবে। যতই উদাস মানুষ হোক, তোমার ঐ মুখটির মায়া তুচ্ছ করে আর সন্ন্যাস নেবার জন্য ছুটতে পারবে না।

—আগেও ছুটতে চেষ্টা করেছিলেন নাকি?

—কতবার চেষ্টা করেছে। ওর মনটাই যেন কি রকমের। আর সেইজন্যই তো,

ওর সব চেষ্টার ইতি করে দেবার জন্য তোমার মত এক রূপেশ্বরীকে নিয়ে এসেছি।

—ভুল করেছেন।

রাগ করে নয়, হেসে হেসে বড়জা-এর সব কথার উত্তর দিয়ে চলে যায় মালতী। ঘরের ভিতর যখন একলা হবার সুযোগ পায়, তখন মনে মনে প্রার্থনা করে মালতী —যেন শেষপর্যন্ত মনের জোর থাকে। ঐ মানুষকে যেন খুশি মনে চলে যেতে দিতে পারি।

জানতেও পারেনি মালতী, সেদিনের কখন্ ঠিক কোন্ সময়ে চলে গেল ইন্দু-প্রকাশ। সকাল হতেই ইন্দুকে আর বাড়ির ভিতরে কোথাও কেউ দেখতে পায়নি। যখন বিকাল হলো, তখন মালতীর টেবিলের এক কোণ থেকে একটি চিঠি তুলে নিয়ে পড়লেন আর চেঁচিয়ে উঠলেন বড়-জা। তারপর বাড়ির আর সবাই। রাত দুপুর পর্যন্ত চাপা কান্নার বোলে যেন গলে পড়তে থাকে কলকাতার সেই বাড়ির বাতাস। কিন্তু মালতী তার একলা ঘরের ভিতরে আলোর সামনে বসে শুকনো খট-খটে দু'টি চক্ষু নিয়ে শান্তভাবে তাকিয়ে থাকে একটি ফটোর দিকে। মসৃণ কাগজের বুকে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে রয়েছে মালতীর স্বামী ইন্দুপ্রকাশের ছবি। বড় বড় দুটি টানা চোখে যেন একটা আচমকা বিস্ময়ের গভীর ছায়া। পিছনে টেনে আঁচড়ানো চুলের স্তবক ফেঁপে রয়েছে। শুধু ঠোঁটের রেখায় নয়, চিবুকের দু'পাশে ছোট্ট দুটি খাঁজের মধ্যেও যেন মৃদু হাসির একটি মিষ্টি শিহর ফুটে রয়েছে।

যাবার আগে ঐ চিঠিটা মালতীর জন্য লিখে গিয়েছিল ইন্দুপ্রকাশ, এবং সেই চিঠির কয়েকটা কথা মনে পড়তেই আপন মনে হেসে ওঠে মালতী।

—যদি কোন দিন বুঝতে পারি যে, তোমার কাছে গিয়ে থাকতে ভাল লাগবে, তবে আমি তোমার কাছে ফিরে যেতে এক মুহূর্তও দেরি করবো না। মনের মধ্যে ফাঁকি রেখে আমি ভুয়ো সন্ন্যাসী হতে পারবো না।

মনে মনে হেসে যেন ইন্দুপ্রকাশের মনটাকে ঠাট্টা করে মালতী। এক মাস ধরে যে মেয়েকে চোখের সামনে পেয়েও তার কপালের কুমকুমের ফোঁটার দিকে তাকাতে পারলেন না, এক মুহূর্তের মতও ভাল লাগলো না যে মেয়েকে, দূরে চলে গিয়ে সেই মুখটাকে যে মনেও করতে পারবে না ঐ মানুষ, ভালো লাগা তো একেবারে অসম্ভ-বের গল্প।

বেশ তো, ভালই তো, তুমি তোমার চোখে পুরুষের দৃষ্টির বদলে মহাপুরুষের দৃষ্টি পেয়েছে। তুমি তোমার একলা জীবনের শান্তি নিয়ে আনন্দভরা এক আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সুখী হও। ভালই করেছি, বাধা দিইনি তোমাকে। কিন্তু আমি তো মহামানবী নই, আমি যে তোমার ঐ মুখটিকেই ভালবেসে ফেলেছি।

অনেক রাত। আবছা ঘুমের মধ্যে চোখ বন্ধ করে যেন বিড়বিড় করে মালতী। তারপর চমকে উঠেই আলো জ্বালে, আর অপলক চোখের তৃষ্ণা নিয়ে ফটোর দিকে তাকিয়ে থাকে, জীবনের প্রথম ভাললাগা একটি মুখের ছবির দিকে।

কদিন পরে শ্বশুরবাড়ি থেকে বিদায় নিয়ে ত্রিবেণীর বাড়িতে চলে এল মালতী

এবং তারপর এই বিশ বছর ধরে অশান্ত অক্লান্ত এক ফটোপূজার জীবন এবং তারপর এই বিকাল। রঙীন হয়ে ফুটে উঠেছে বিকালের মালতীর মন।

ফুটে উঠবেই বা না কেন? ঠানদি বলেন, এতদিনে মালতীর তপিস্যের ফল ফলেছে। কিন্তু মালতী যে বিশ্বাস করছে, এতদিনে জয়ী হয়েছে মালতীর কপালের সেই কুমকুম। মালতীর মত মেয়ের মনের সাধ আর কাজলকালো চোখের মায়া ছেড়ে দূরে-সরে থাকা একলা জীবনের দুঃসহতা থেকে ছুটে চলে এসেছে মালতীরই স্বামী। মালতীর কাছে থাকতে ভাল লাগবে, সেই ভাল লাগার জন্য লুব্ধ হয়ে ফিরে এসেছে সেই মানুষ।

মন ভরে এই অহংকার নিয়ে আজ খেলা করতে পারে মালতী। ছোট একটা লতার মত মানুষ হয়েও গঙ্গার জোয়ারকে ফিরিয়ে আনবার আর বেঁধে রাখবার মত শক্তি তার আছে। নইলে আনন্দভরা আকাশের লোভ ছেড়ে দিয়ে মালতীর মায়া-ভরা চোখের কাছে বাঁধা পড়বার জন্য ছুটে আসবে কেন এ'রকম এক মানুষ?

সন্ধ্যা হতে আর দেরী নেই। বড়-বৌঠানও বোধহয় তাড়া দেবার জন্য ছুটে আসছেন। লালপেড়ে শান্তিপুরীর দিকে একবার তাকিয়েই ফটোর দিকে তাকায় মালতী। রক্তচন্দন মাখানো ফুলের স্তূপের মধ্যে বসে এখনও চোখে সেই গভীর বিস্ময়ের ছাপ নিয়ে হাসছে ইন্দুপ্রকাশের চিবুকের দুই পাশে দু'টি ছোট্ট খাঁজ। এই ফটোর সঙ্গে বিশ বছরের কত সন্ধ্যায় মনে মনে কত কথা বলেছে মালতী। আজ এই মুহূর্তে মুখের হাসি দু'হাতে চেপে, ভ্রূকুটি করে আর ধমক দিয়ে শুধু বলতে ইচ্ছা করে—এতদিন পরে মনে পড়লো আর সময় হলো তোমার? হঠাৎ এসে সারা বাড়ির মনকে ব্যস্ত করে দিয়ে, মালতীকে বিশ্রী লজ্জা পাইয়ে দিয়ে···দুষ্টু···অসভ্য ···লোভী কোথাকার!

বাড়ির ভিতরে উৎসবের মত চাঞ্চল্য। নানা জনের মুখে মুখে, এঘর থেকে ওঘর কত রকম কলরবের ভাষা ছুটাছুটি করে। ছোটকাকীর সঙ্গে বড়-বৌঠানের কথা-বার্তার কিছু কিছু সরব স্পর্শ এই ঘরের ভিতরে মালতীর কানের কাছে এরই মধ্যে পৌঁছে গিয়েছে। শুনে নাকি আশ্চর্য হয়ে গিয়েছেন জামাই, বিশবছর ধরে স্বামীর ফটো পূজা করেছে মালতী। মালতীর চোখ দুটোও চঞ্চল হয়ে ওঠে। এখনি গিয়ে একবার আড়ালে দাঁড়িয়ে ইন্দুপ্রকাশের বড় বড় সেই উজ্জ্বল চোখের আশ্চর্যকে দেখে আসতে ইচ্ছা করে।

এরই মধ্যে বাড়ির লোকের কথাবার্তার টুকরো টুকরো আভাস পেয়ে আরও অনেক কথা জেনে ফেলতে পেরেছে। সত্যিই সন্ন্যাসী হতে পারেনি ইন্দুপ্রকাশ, বার বার সন্ন্যাস নেবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু বার বার সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। কেন? কিসের জন্যে? বার বার মালতীর কথাই মনে পড়েছে, তাই। জোর করে মনকে ফাঁকি দেবার চেষ্টা না করে শেষ পর্যন্ত মালতীকে দেখবার জন্য ফিরে এসেছে ইন্দু-প্রকাশ। মনে মনে আবার হেসে ফেলে মালতী, আমার মনটা যেমন ভুয়ো বিধবা, তেমনি তোমার মনটাও একটা ভুয়ো সন্ন্যাসী।

উঠানের উপরে যেন নতুন এক কণ্ঠস্বরের রেশ ভেসে বেড়ায়। শুনতে পেয়ে চমকে ওঠে মালতীর কান, তার চেয়ে বেশি চমকে ওঠে চোখের এক পিপাসা। ঘরের জানলার কাছে আড়াল হয়ে শুধু চোখের দৃষ্টিটাকে দুর্বার এক কৌতূহলের আবেগে উঠানের দিকে ভাসিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে মালতী। ঠিকই বুঝতে পেরেছে মালতী, ছোটকাকার সঙ্গে গল্প করতে করতে উঠানের উপর পায়চারী করছে মালতীরই স্বামী ইন্দুপ্রকাশ। বারান্দা থেকে বেলোয়ারী ঝাড়ের রঙীন কাঁচের ঝালর কেঁপে কেঁপে আলো ছড়াচ্ছে উঠানের উপর।

হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যায় মালতীর চঞ্চল চোখের আবেগ। কে এই ভদ্রলোক? হ্যাঁ, ইন্দুপ্রকাশই বটে, কিন্তু কত চেষ্টা করে চিনতে হয়! চিবুকের দু'পাশে সেই মিষ্টি হাসির খাঁজ দুটো ভরে গিয়ে একেবারে গম্ভীর হয়ে গিয়েছে। পিছনে টেনে আঁচড়ানো সেই চুলের ফাঁপানো স্তবক কী অদ্ভুতভাবে মিইয়ে গিয়েছে। তার মধ্যে সাদা চুলের ছিটেও যে স্পষ্ট দেখা যায়। বেশ সৌম্য ও শান্ত এক ভদ্রলোকের বেশ রাশভারি একটি শরীর আস্তে আস্তে ছোটকাকার পাশে পাশে হেঁটে বেড়াচ্ছে।

জানালা বন্ধ করে দেয় মালতী। নিথর হয়ে চুপ করে বসে থাকে। এ কি বিশ্রী অস্বস্তি! মালতীর বুকের ভিতর লোভচঞ্চল নিঃশ্বাসগুলি যেন হঠাৎ ঠকে গিয়ে হাঁসফাঁস করে কাতরাতে আরম্ভ করেছে। বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ে মালতী।

দরজার কপাট ঝনঝনিয়ে ঠেলে দিয়ে ঘরে ঢোকেন বড়-বৌঠান।—এ কি, তুমি আজও আমার কথার অবাধ্যতা করছো মেয়ে? এখনো ঐ অদ্ভুত সাজ ছাড়লে না?

মালতী বলে—আমাকে কিছুক্ষণ একা শুয়ে থাকতে দাও, বড়-বৌঠান।

বড়-বৌঠান হাসেন—একা শুয়ে থাকবার অনেক সময় পাবে, এখন মাত্র সন্ধ্যা। তুমি শুধু এই শান্তিপুরীটা প'রে মাথায় একটু সিঁদুর ঘষে নিয়ে আমার সঙ্গে চল।

—কোথায়?

—ওই ঘরে জামাইকে একটি প্রণাম করে এখনি চলে আসবে। তারপর একা শুয়ে থাক না রাত দশটা পর্যন্ত, কেউ বাধা দেবে না।

—এখন থাক।

—কেন?

মালতী চেঁচিয়ে ওঠে—রাত দশটার পরেও তো প্রণাম করতে পারা যায়, তাতে কি মহাভারত অশুদ্ধ হবে?

—বেশ তাই করো। কথাগুলি বেশ অপ্রসন্ন স্বরে বলতে বলতে চলে চলে যান বড় বৌঠান।

সন্ধ্যাটা মোটেই বিষণ্ণ নয়, কিন্তু বড় বিষণ্ণ এই সন্ধ্যার মালতী। লাল পেড়ে শান্তিপুরী বিছানার এক কোণে চুপ করে মালতীর শরীরটাকে জড়িয়ে ধরবার জন্য ওৎ পেতে অপেক্ষা করছে। দেখতে ভয় করে, এক ঠেলা দিয়ে ঐ লালপেড়ে শাড়িটাকে সরিয়ে দিতে ইচ্ছে করে। সন্ধ্যার মালতীর মুখে সেই রঙীন আভার কোন

চিহ্ন নেই। সন্ধ্যার মালতীর মন যেন স্বপ্ন হারিয়ে তার জীবনের এক রিক্ততার দিকে তাকিয়ে বিশ বছরের ক্লান্তি নিয়ে হাঁপাতে থাকে। স্বামী নামে এক গুরুজন এসেছেন এতদিন পরে। তাঁকে শুধু প্রণামই করা যায়, এবং শুধু প্রণাম করতে হলে লালপেড়ে শান্তিপুরী পরবার কোন দরকার হয় না।

সন্ধ্যার মালতীর মন যেন আর্তনাদ করে উঠতে চায়। মনে হয়, না এলেই ভাল করতেন ভদ্রলোক। এলেনই যদি, তবে ওরকম একটি মূর্তি নিয়ে কেন এলেন? মহাপুরুষ হতে না পেরে একেবারে যে কাপুরুষ হয়ে ফিরে এসেছেন ভদ্রলোক।

মালতীর জীবনের সেই অসমাপ্ত ফুলশয্যার আশা যে এই বিশ বছরের রক্ত-চন্দনের স্পর্শে আরও সুরভিত হয়ে উঠেছে! সেই আশার নিবেদন নিয়ে ঐ ভদ্র-লোকের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেই বা কি হবে? কি বুঝবেন, কতটুকুই বা বুঝতে পারবেন ভদ্রলোক? মালতীর মুখের দিকে তাকিয়ে ওই গম্ভীরতার চোখে সেই আগ্রহ কতটুকুই বা দুরন্ত হয়ে উঠতে পারবে? মালতী তার মনের সব মুগ্ধতা দিয়ে বিশ বছর ধরে যার মূর্তিকে বুকের কাছে রেখে তার রক্তের উত্তাপ দিয়ে পূজা করে এসেছে, সে মানুষ ঐ মানুষ নয়।

ফটোর দিকে তাকায় মালতী। ঐ তো সেই মুখ, চিবুকের দু'পাশে দুটি খাঁজের মধ্যে মিষ্টি হাসির শিহর ফুটে রয়েছে। এই বিশ বছরের মধ্যে কম করেও মালতীর তপ্ত ঠোঁটের হাজার ছাপ পড়েছে ছবির ঐ চিবুকের উপর। এর বদলে···না অসম্ভব···অসাধ্য, ভাবলে গা বমি বমি করে, মালতী তার এই মুখকে একটা নতুন লোকের রাশভারি চোখের গম্ভীর আগ্রহের কাছে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না।

রাত দশটা। রাতের মালতীর মন যেন মরিয়া হয়ে বিদ্রোহ করবার জন্য তৈরী হয়ে উঠেছে।

ঝনঝনিয়ে কপাট ঠেলে ঘরে ঢুকলেন বড়-বৌঠান। এবং ডাকাতের মত ভঙ্গী ধরে হুমকী দিলেন—আর এক মুহূর্তও এভাবে পড়ে থাকতে পারবে না, ওঠ, শিগ্‌-গির কর, মুখটা ধুয়ে নাও, ঝটপট পরে ফেল এই শান্তিপুরী।

লালপেড়ে শান্তিপুরী, নতুন পয়সা রঙের ব্লাউজ আর সিল্কের সায়া হাতে তুলে নিয়ে বেশ মিষ্টি গলা করে আবার সাধতে থাকেন বড় বৌঠান,—একটু তাড়াতাড়ি কর লক্ষ্মী, রাত হয়েছে অনেক, বেচারা একা ঘরের ভিতর বসে রয়েছে।

মালতী বলে—একটা প্রণাম করে আসতে হবে, এই তো?

বড়-বৌঠান হাসলেন—আসতে হবে মানে? প্রণাম করবে আর থাকবে। যদি বেশি লজ্জা করে তো বল, আমিই না হয় এক ঠেলা দিয়ে বরের কোলের উপর বসিয়ে দিয়ে চলে আসবো। কপাটে খিল দিতে লজ্জা যদি করে তো খিল দিও না। আমিই কপাটের শিকল তুলে তালা বন্ধ করে দেব।

মালতী—তা হতে পারে না।

বড়-বৌঠান—তবে কি হতে পারে?

মালতী—আমি গিয়ে শুধু একটা প্রণাম করে চলে আসতে পারি।

বড-বৌঠান—এই থান পরে ?

মালতী—হ্যাঁ।

বড-বৌঠান রাগ সামলাতে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন—খবরদার, ওভাবে তুমি যেতে পারবে না। বিশ বছর ধরে মিথ্যে থান পরে অনেক অভিমানের খেলা খেলেছ, আজ ঐ খেলা ভদ্রলোককে না দেখালেও চলবে।

হাত-পা গুটিয়ে বিছানার উপর স্থির হয়ে বসে থাকে মালতী। বড়-বৌঠান কী যেন ভাবেন, তারপর বেশ শান্ত স্বরে বলেন—আচ্ছা বেশ, যদি শুধু প্রণাম করেই চলে আসতে চাও, তাই করে এস। কিন্তু সিঁথিতে সিঁদুর ঘষে আর এই লালপেড়ে শান্তিপুরীটা পরে যাও।

মালতী বলে—না, তা হয় না। যদি যাই তো এই সাদা সাজেই যাব আর চলে আসবো।

বড-বৌঠান গলা ছেড়ে চিৎকার করেন।—আমি বলছি, তোমাকে এই লাল-পেড়ে শান্তিপুরী পরতে হবে, স্বামীর কাছে এখনই যেতে হবে, আর স্বামীর ঘরেই সারারাত থাকতে হবে। ভদ্রলোককে অপমান করবার তোমার কোন অধিকার নেই।

মালতী—না, পারবো না।

লালপেড়ে শান্তিপুরী হাতে নিয়ে জোর করে পরিয়ে দেবার জন্য মালতীর কাছে এগিয়ে আসেন বড-বৌঠান, এবং একটা হাত শক্ত করে চেপে ধরেন।

বড-বৌঠানের হাত ছাড়িয়ে সরে যায় মালতী, চেঁচিয়ে ওঠে—আমাকে মেরে ফেললেও আমি তোমাদের কথা শুনবো না।

লালপেড়ে শান্তিপুরী যেন একটা রক্তমাখা খড়্গ, মালতীর বিশ বছরের স্বপ্নকে একটা ভুল দেবতার তৃপ্তির কাছে বলি দেবার জন্য বড-বৌঠানের হাতে হিংস্র আহ্লাদে দুলছে। মেঝের উপর লুটিয়ে বসে পড়ে আর নিজেরই দুই হাঁটু শক্ত করে জড়িয়ে ধরে মালতী।

বাড়ির রাত দশটার নীরবতা যেন হঠাৎ উদ্বেগে বিচলিত হয়। মালতীর ঘরের ভিতরের এই হঠাৎ চিৎকারের অর্থ বুঝতে না পেরে সবার আগে ছুটে আসেন ঠানদি। তারপর আর সবাই। ছোটকাকা আসেন, ছোটকাকী আসেন, বড়দাও ব্যস্তভাবে এসে দাঁড়ান—ব্যাপার কি ?

বড-বৌঠান বলেন—ঐ অলক্ষুণে সাজ ছাড়বে না, আর জামাই-এর কাছে যেতেও চাইছে না এই মেয়ে।

কিন্তু সেই মুহূর্তে বড়দা হঠাৎ অপ্রস্তুত হয়ে সরে যান। ছোটকাকা হঠাৎ লজ্জিতের মত হাত কাঁপিয়ে চশমা মুছতে থাকেন এবং ছোটকাকী আর বড-বৌঠান মাথার কাপড় টানেন। নিঃশব্দ ছায়ার মত এসে সকলের পিছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে ইন্দুপ্রকাশ।

ইন্দুপ্রকাশ হাসতে হাসতে বলে—আপনারা যদি এখন চলে যান, তাহলে আমিই

বরং মালতীকে কয়েকটা কথা বলি, এত গণ্ডগোলের কোন মানে হয় না।

ঘর ছেড়ে চলে যায় সকলেই। ঠানদি শুধু যেতে যেতে বলে যান—যার জিনিস সে-ই এখন বুঝে নিক, তাই ভালো।

গঙ্গার জলো-ঠাণ্ডা গায়ে মেখে নিঝুম হয়ে রয়েছে ত্রিবেণীর চৈত্র মাসের মাঝ-রাত। সারা বাড়ির মধ্যে আর কোন শব্দের সাড়া নেই। মেঝের উপর লুটিয়ে বসে তেমনি শক্ত করে দুই হাঁটু জড়িয়ে আর মুখ লুকিয়ে বসে থাকে মালতী। দরজার কাছে যেন হঠাৎ এসে দাঁড়িয়েছে জীবনের অজানা আর মনের অচেনা একটা নতুন মানুষের ছায়া, এখনি ঘরের ভিতর ঢুকে পড়বে। গা শির্ শির্ করে মালতীর। দম বন্ধ করে দুঃসহ মুহূর্তগুলিকে কোনমতে সহ্য করে মালতী।

কিন্তু মালতীর ঘরের ভিতরে ঢোকে না ইন্দুপ্রকাশ। চুপ করে দরজার কাছে বারান্দার উপর দাঁড়িয়ে থাকে।

মালতী যেন তার কান দুটোকেও একটা বধিরতার মধ্যে লুকিয়ে ফেলতে পারে। যেন শুনতে না হয় এই ভদ্রলোকের কোন গম্ভীর লোভের হা-হুতাশ আর কাতরানির শব্দ। দু'হাতের বেড়ার মধ্যে একেবারে কানসুদ্ধ মুখটাকেই লুকিয়ে ফেলে মালতী।

কিন্তু কোন কথা বলে না ইন্দুপ্রকাশ। নিজের অস্তিত্বটাকে সত্যিই যেন ছায়ার মত একেবারে শব্দহীন করে দিয়ে শুধু দাঁড়িয়ে থাকে ইন্দুপ্রকাশ এবং বোধহয় বুঝতেও পারে না যে, নিঝুম রাতও প্রায় শেষ প্রহরে এসে শেষ ঘুমের ক্লান্তিতে একেবারে ঢলে পড়েছে।

মালতীর চোখের আর কানের উদ্বেগও বোধহয় এই একটানা অবাধ নিঃশব্দতার মধ্যে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ চমকে ওঠে মালতীর মন। সে ছায়া কি এখনো আছে, না চলে গিয়েছে? চলেই গিয়েছে বোধহয়।

মাথা হেঁট করে রেখে আর চোখ না তুলেও চকিতে একেবারে দরজার দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারে মালতী, সে ছায়া এখনো দাঁড়িয়ে আছে।

কিন্তু কথা বলে না কেন? কয়েকটি কথা বলবার জন্য কয়েকটি ঘণ্টা চুপ করে দাঁড়িয়ে নষ্ট করে দিলেন ভদ্রলোক। তবে কি সত্যই কথা বলতে আসেননি? তবে কেন এসেছেন? শুধু কি দেখে যেতে? কিন্তু কি দেখতে? কি দেখলেন ভদ্রলোক?

মুখ তুলে আর চোখ তুলে ইন্দুপ্রকাশের মুখের দিকে তাকায় মালতী।

ইন্দুপ্রকাশ—তোমাকে দেখতে এসেছি, এতক্ষণে দেখতে পেলাম, মালতী।

মালতী মুখ ঘুরিয়ে অন্যদিকে তাকায়।

ইন্দুপ্রকাশ বলে—ওঁরা যাই বলুন না কেন, তুমি ভুল করো না। লালপেড়ে শান্তিপুরী পরে আমার কাছে তোমার আসা উচিত নয়!

মালতীর কান দুটো হঠাৎ অপ্রস্তুত হয়। এখনও যে মহাপুরুষের মত কথা বলছেন ভদ্রলোক।

ইন্দুপ্রকাশ—যে যাই বলুক, আমাকে তোমার প্রণাম করাও উচিত নয়।

কেন? মালতীর মনের ভিতরে বিস্মিত একটা প্রশ্ন চমকে ওঠে। মনে হয়, মালতীকে একা ফেলে রেখে বিশ বছর ধরে পালিয়ে থাকা জীবনের ভুল আর ত্রুটির জন্য অনুতাপ প্রকাশ করছেন ভদ্রলোক।

ইন্দুপ্রকাশ—বিশ বছর ধরে নিজের মনের ফাঁকির সঙ্গে লড়তে লড়তে হয়রান হয়ে গিয়েছি। বুঝতে পেয়েছি তোমাকে বড় বেশি ভাল লাগবে বলে ভয় পেয়েছিলাম বলে সেদিন পালিয়ে গিয়েছিলাম! সেদিন নিজেকে নিজেই চিনতে পারিনি।

অবিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে না। কিন্তু মালতীকে ভাল লাগবে বলে মনে করে এভাবে আর ঐ চেহারা নিয়ে সামনে এসে দাঁড়ালে মালতীর ভাল লাগবে কি না, এই প্রশ্নের ভয় নেই কেন এই ভদ্রলোকের মনে? ভদ্রলোকের একটা পুরনো লোভের এই হা-শুনতে একটুও ভাল লাগে না মালতীর।

ইন্দুপ্রকাশ বলে—কিন্তু আজ ভয় পেয়েছি মালতী, বুঝতে পারছি না, সত্যিই তোমাকে ভাল লাগবে কি?

মালতীর চোখ দুটো হঠাৎ বিশ বছর আগের সেই দিনের আহত ও অপমানিত চোখের মত দপ করে চমকে ওঠে। আবার সেই কথা? নির্বোধের মত নিজের মনকে ফাঁকি দেবার কথা?

ইন্দুপ্রকাশ—আমি আশা করেছিলাম, আমি আবার সেই মালতীর চল্লিশ বছর বয়সের জীবনটাকে বুকে জড়িয়ে শান্তি পাব।

মালতীর ঘুমন্ত চোখের উপর কে যেন হঠাৎ একটা আঘাত আছড়ে দিল, তাই যন্ত্রণাক্ত হয়ে ফটফট করতে থাকে মালতীর চোখ। কেঁপে ওঠে মালতীর হাতটা। সাদা থানের আঁচলটাকে গায়ের উপর ভাল করে জড়িয়ে ধরে রাখে মালতী। যেন এতক্ষণে চোখে পড়েছে, বিশ বছর পর হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে মালতী তার চল্লিশ বছরের বয়সটাকে দেখতে পেয়েছে। ছিঃ, এমন করেও নিজের বয়স ভুলে যায় মানুষ!

ইন্দুপ্রকাশ হাসে—তোমার চেহারা কত বদলে গিয়েছে মালতী। তুমি আর সেই রকম সুন্দর নও, কিন্তু…।

হঠাৎ বিব্রতভাবে, যেন ভয় পেয়ে কিংবা অদ্ভুত এক লজ্জার ভয় সইতে না পেরে মাথার উপর সাদা থানের আঁচল টেনে দেয় মালতী।

ইন্দুপ্রকাশ বলে—কিন্তু আর এক রকমের সুন্দর তো বটেই।

মালতীর চোখ ফুটে জল উথলে উঠবে বোধহয়। মুখ ঘুরিয়ে নেয় মালতী।

ইন্দুপ্রকাশ—লোকে বলছে, তুমি বিশবছর ধরে স্বামীর ফটো পুজো করেছ, কিন্তু লোকের কথা বিশ্বাস করো না মালতী।

—কেন? মালতীর মুখে প্রশ্নটা যেন দপ করে জ্বলে ওঠে। মালতীর জীবনের সবচেয়ে বড় গর্বের উপর আঘাত পড়েছে।

ইন্দুপ্রকাশ—স্বামীকে নয়, তুমি ত্রিশ বছর বয়সের একটি ছেলেকে আজও পুজো করছো মালতী।

মালতী—আমার স্বামীরই ত্রিশ বছর বয়সের মূর্তিকে পুজো করছি।

ইন্দুপ্রকাশ—না, তুমি তোমার স্বামীর ত্রিশ বছর বয়সটাকে পুজো করছো। তাই…তাই বলছিলাম, আমাকে তোমার প্রণাম করা উচিত নয়। আমি তোমার প্রণাম নেবই বা কেন?

স্তব্ধ হয়ে যায় মালতীর সব মুখরতা। নিথর হয়ে সাদা থানের আঁচলে মুখ ঢেকে চুপ করে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে মালতী। তারপর কী যেন বলবার জন্য আস্তে আস্তে আঁচল সরিয়ে মুখ তুলে তাকায়।

কিন্তু সে-কথা আর বলা হলো না। নেই, দরজার কাছে কোন ছায়া নেই! চলে গিয়েছে ইন্দুপ্রকাশ।

কিন্তু যাবে কোথায়? মালতীর দু'চোখে যেন নতুন এক প্রতিজ্ঞার আক্রোশ ছটফট করে।

কিন্তু ভোর হয়ে এলো যে!

ভোরের মালতীর চোখে জল।

ফটোর দিকে চেয়ে বসে আছে মালতী। রক্তচন্দন মাখানো ফুলের স্তূপের মধ্যে ত্রিশ বছর বয়সের একটা মুখ মালতীর চল্লিশ বছর বয়সের ভারে অলস দেহের দিকে তাকিয়ে হাসছে। মালতীর মনের বিচিত্র ক্ষোভগুলিকে যেন ঠাট্টা করছে সেই হাসি, ছিঃ, ছটফট করে ওঠে মালতীর হাতটা। সেই মুহূর্তে ফটোটাকে তুলে নিয়ে টেবিলের দেরাজের ভিতরে বন্ধ করে মালতী।

এখনই পাখি ডেকে উঠবে যে!

লালপেড়ে শান্তিপুরীর দিকে তাকায় মালতী। সিঁদুরের কৌটা খোঁজে মালতী। নতুন পয়সা-রঙের ব্লাউজ আর সিল্কের সায়া, মন্দ কি? টিপের কুমকুম গেল কোথায়? দেখতে দেখতে আবার রঙীন হয়ে ফুটে ওঠে ভোরের মালতীর রূপ, নতুন করে আবার এক ফুলশয্যার আশা সত্যিই যে মালতীর মনে ডাক দিয়েছে। ব্যস্ত হয়ে ওঠে, দুই হাতকে দুরন্ত উৎসাহে মাতিয়ে তাড়াতাড়ি রঙীন সাজে সেজে উঠতে থাকে মালতী।

গঙ্গার ভাঙাঘাটের উপর জলের জোয়ার অদ্ভুত এক উচ্ছলতার শব্দ ছড়ায় বাতাসে। ভোর হয়ে এসেছে। চাদর হাতে নিয়ে দরজার কাছে এগিয়ে আসতেই থমকে দাঁড়ায় ইন্দুপ্রকাশ। লালপেড়ে শান্তিপুরীর আভা জড়িয়ে একটা বাধা দাঁড়িয়ে আছে দরজার কাছে।

—এ কি মালতী?

—আমি মালতী ঠিকই, কিন্তু তুমি কী?

উত্তর দেয়না ইন্দুপ্রকাশ। ঘরের ভিতরের ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয় মালতী।

ইন্দুপ্রকাশের বিস্মিত দুই চক্ষুকে আরও বিস্মিত করে মালতী বলে—তুমি মহাপুরুষ নও। তুমি পুরুষ।

—হ্যাঁ, তাই তো তোমার কাছে ফিরে এসেছিলাম।

ছলছল করে মালতীর দুই চোখ।—তবে লালপেড়ে শান্তিপুরীর দিকে তাকিয়ে এখনও চুপ করে রয়েছ কেমন করে?

—কিন্তু তোমার চোখে আমি যে নিতান্ত···

—তুমি ছেলেমানুষের চেয়েও হিংসুটে, সামান্য একটা ফটোকে হিংসে কর। লজ্জা করে না তোমার?

বলতে গিয়ে হেসেই ফেলে মালতী।

শি বা ল য়

সম্মুখে শালের বন, পেছনে তাল আর খেজুরের ছোট ছোট কুঞ্জ, বড় সড়কটা এই-খানে এসে ডানদিকে খুব জোরে বেঁকে গেছে। এই বাঁকের ওপর একটা বস্তি। বস্তির মধ্যে সবচেয়ে বড় ঘরটা হলো মুদি অনন্তরামের দোকান।

এই পথের মোড়, এই নতুন সরাই নামে ছোট বস্তিটার মধ্যেই অনন্তরামের দোকান। পথের উত্তরে ও দক্ষিণে পঁচিশ মাইলের মধ্যে এই একটি পান্থশালার ছায়া ও আলোক।

নামে মুদির দোকান, কিন্তু শুধু চাল ডাল ছাতু আর কেরোসিন তেল নয়—জঙ্গলের পথে যত যাত্রী যায়, সবারই পক্ষে এই দোকানটি সকল প্রয়োজনের কল্প-তরু। এখানে যা আছে, তা তো পাওয়া যাবেই; তা ছাড়া যা আশা করা যায় না, তাও পাওয়া যায়, শুধু অনন্তরামের কাছে অনুরোধ করলেই হলো।

যাত্রী বোঝাই বাস থামে। চা সরবৎ ছাতু, যা দরকার সবই পাওয়া যাবে। কেউ হয়তো জ্বরের জ্বালায় ধুঁকছেন, শুধু বিশ্বাস করে চাইলে অনন্তরামের কাছে দু'চারটে কবরেজী বড়ি পাওয়া যাবে। এক-একদিন মোটর বাস পৌঁছতে অনেক দেরি হয়ে যায়। নিষ্ঠাবান কোন প্যাসেঞ্জার আহ্নিকের সময় পার হয়ে যেতে বসে। কিন্তু চাইলেই অনন্তরামের কাছে পুজোর উপকরণ সবই পাওয়া যায়—কোশা কুশী ঘট গঙ্গাজল।

হ্যাঁ, পয়সা নেয় অনন্তরাম। কিন্তু শুধু পয়সা রোজগারের জন্যই সে সব সময় তৈরী হয়ে রয়েছে, একথা বিশ্বাস করা উচিত নয়। নইলে গ্রীষ্মের সময়, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তৃষ্ণার্ত যাত্রীর জন্য কলসী ভরে এত জল সাজিয়ে রাখতো না অনন্ত। জল দিতে দিতে অনন্তরাম এত ক্লান্ত হয়ে পড়তো না। এই শ্রান্তির বিনি-ময়ে কিছুই সে পায় না। বরং, মাঝরাত্রে যখন ছোট প্রদীপের আলোকে সারাদিনের বিক্রীর হিসাব করতে বসে, তখনই শুধু আবিষ্কার করে অনন্ত—সারাদিন শুধু জল বিলানো সার হয়েছে, বিক্রী ফাঁকিয়ে গেছে, পয়সার বাক্সটা ফাঁকা।

কিন্তু কে বলবে অনন্তরাম সুখী নয়? তার ছোট মুদিখানার দোকানটার মতই তার সুখের রূপ, সবই হাতের কাছে, সবই মুঠোর মধ্যে। তা ছাড়া, প্রমীলার দুটি কালো চোখের ডুবুডুবু বিস্ময় আর দুটি অভিমানভরা ঠোঁটের দিকে তাকালেই অনন্তরামের

সুখী সংসারের আর একটা রূপ চোখে পড়ে, যেন মহাসাগরের একটি টুকরো। সীমা আছে, কিন্তু বৈচিত্র্যের সীমা নেই। কত ঢেউ, কত কলরোল! প্রমীলা যখন অভিমান করে কাঁদে, মনে হয় এ কান্না কখনো শেষ হবে না। যখন খুশি হয়ে হাসে, তখন সে হাসিরও যেন সীমা থাকে না।

আজও এইমাত্র হিসেব শেষ হয়, রাত্রি ঘনায়। প্রদীপের আলো মৃদুতর হয়। কিন্তু অনন্তরাম চুপ করে বসে থাকে। ঘরের ভেতর থেকে কোনো সাড়া আসে না। প্রমীলা এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে। ইচ্ছে করে, অভিমান করে ঘুমিয়ে আছে। আজ আর কোনো সাড়া দেবে না প্রমীলা।

ঘরের ভেতর উঠে যেতে চায় না অনন্ত। পিলসুজের কাছেই হয়তো খাবারের থালাটা পড়ে আছে। এক রাশ পুড়ে-মরা পোকা ছড়িয়ে আছে থালার ওপরে, চারদিকে। এখন মনে হয়, সংসার সাগরের সুখ শুধু লোনা জলের মত। অনন্তের চিন্তায় একটা অকারণ শাস্তি ও অপমানের জ্বালা যেন ধীরে ধীরে বেদনা ছড়াতে থাকে। এতদিনেও যেন প্রমীলাকে ঠিক চিনতে পারা গেল না। প্রমীলা জীবনে কি চায়, কি সম্পদ সে খুঁজে খুঁজে হয়রান হচ্ছে, কোথায় তার শূন্যতা, কি তার না-পাওয়া, আজও তার পরিচয় আবিষ্কার করে উঠতে পারেনি অনন্ত। মুখ ফুটে বলুক প্রমীলা—কি পেলে সে সুখী হবে।

কিন্তু জীবনে কোনদিনই বোধহয় প্রমীলা বলবে না। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কত শত অচেনা নরনারী, কত যাত্রী, সাধু ভিখারী অনন্তের কাছে কত জিনিস দাবী করে—কত আবদারের সুরে, কত আশীর্বাদের ভঙ্গীতে, কত কৃতজ্ঞতায়! কিন্তু প্রমীলা কিছু দাবী করে না। প্রমীলাই শুধু অনন্তের কাছে কিছু চাইতে পারে না!

প্রদীপের সলতে আর-একটু উস্কে দেয় অনন্তরাম। গভীর রাত্রির অন্ধকারে শালবনের জংলী হিংসাগুলি যেন ঘুমিয়ে পড়েছে। মাঝে মাঝে এক-একটা হাল্কা ঝড় ছুটছে। এক অখণ্ড স্তব্ধতার মধ্যে ক্লান্ত পৃথিবীর ফুসফুসটা শুধু হাঁসফাঁস করছে।

তুলসীদাসের রামচরিতখানা সামনে টেনে নেয় অনন্তরাম—

অজহুঁ কছু সংশয় মন মোরে
করহু কৃপা বিনাউঁ কর জোরে

...করজোড়ে মিনতি করি হে কৃপাময়, আজও যে আমার মনে কিছু সংশয় রয়ে গেছে।

বুঝি না, কিসে এই সংশয়? কেন মন অকারণ উদাস হয়ে যায়? এই তো মাত্র দুটি মাস, প্রমীলা হাসতে হাসতে এই সংসারে এসে দাঁড়ালো। কিন্তু কিসের এই মেঘ, অভিমানী চাঁদের মত প্রমীলা যার আড়ালে ক্ষণে ক্ষণে লুকিয়ে পড়ে? কিসের দুঃখ?

অনন্তের গলার স্বরের রেশ ধীরে ধীরে অবসন্ন হয়ে আসে, দু' চোখে ঘুমের আরাম নিয়ে প্রমীলার চুড়ির নিক্কন যেন আর একটা স্বপ্নের ভেতর ছটফট করে পালিয়ে বেড়াচ্ছে—তারই শব্দ শুনতে পায় অনন্ত।

আর একবার মনের শেষ উৎসাহ দিয়ে গলার স্বর সজীব করে তুলতে চায় অনন্তরাম—

রাকারজনী ভকতি তব
রামনাম সোই সোম

তোমার ভক্তি পূর্ণিমা রাতের মত, রামনামই তো চন্দ্র! না, মিথ্যা এ সংশয়, অন্ধকার আসবে না, সবই স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। সব দেখতে পাবে তুমি।

এক শূন্যতার রহস্যকে ধরার জন্য, একটা আশ্বাস ও সান্ত্বনাকে অনন্তরামের মিষ্টি গলার স্বর যেন চারদিক অন্বেষণ করে বেড়ায়। শ্রান্ত ও ক্লান্ত হয়ে পড়ে। ঘুমিয়ে পড়ে অনন্ত।

সূর্য উঠবার অনেক আগেই যেন হঠাৎ একটা আলোর ধাঁধায় জেগে ওঠে অনন্ত। রাত্রি শেষ হয়ে এসেছে। ডাকের গাড়ি আসবার সময় হলো। পোড়া প্রদীপটা আবার নতুন শিখার আলোকে জ্বলে উঠেছে, প্রমীলা উঠে এসেছে, অনন্তের হাত টানছে—ছি ছি, আশ্চর্য মানুষ তুমি! এভাবে আমাকে শাস্তি দিতে হয়?

একটু অপ্রস্তুত হয়ে অনন্ত উঠে বসে। কাঁচা ঘুমের নেশা তখনো চোখ মুখের ওপর ছড়িয়ে রয়েছে। এলোমেলো চুল। অনন্তের মুখটা যেমন সুন্দর তেমনি করুণ দেখায়।

তারচেয়ে করুণ হয়ে ওঠে প্রমীলার মুখ—ছি ছি, তুমি কাল রাত্রে খাওনি। আমাকে এত জব্দ করে তোমার কি সুখ হয়, বল তো?

অনন্তের ক্ষুব্ধ অন্ধ মনটা যেন আবার চক্ষুষ্মান হয়ে ওঠে। আবার তার ছোট সংসারের হৃদয়টার চেহারা নতুন করে চোখে পড়ে। সেই সমুদ্রের মতই তো, সেই নীল জল আর কত ঢেউ। প্রমীলার চোখ দুটো ছলছল করে, তবুও হাসছে, নীল জলের ওপর চাঁদের আলোর মতন। এই তো, সবচেয়ে সত্য যা, তা একেবারে মুখোমুখি দেখা যাচ্ছে।

প্রমীলা অনন্তরামের গলা জড়িয়ে ধরে—ওঠ, ওঠ, এত রাগ করতে নেই, লোকে দুষমনের ওপরেও এত রাগ করে না।

প্রমীলার নজরে পড়লো, তুলসীদাসের রামচরিতখানা সামনে পড়ে রয়েছে। বইটা খোলা। প্রমীলা বইটা বন্ধ করে দূরে সরিয়ে রাখলো। অনুযোগের সুরে কথা বলে—এই বইটাই তো আমার দুষমন।

অনন্তরাম চমকে প্রমীলার দিকে তাকায়। প্রমীলা কিছুমাত্র অপ্রতিভ হয় না। বরং তার প্রতিবাদ আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে—আমার হাতের তৈরি খাবার খেতে তোমার মনে পড়লো না, আমাকে একবার ডাকলে না। সারা রাত তুলসীদাসের দোঁহা খেয়ে পেট ভরিয়েছ। আর এসব চলবে না বলে দিচ্ছি।

অনন্তরাম বিরক্ত হয়ে উত্তর দেয়—তাহলে কি হবে?

প্রমীলা—তাহলে আমিও আমার শিবালয় নিয়ে থাকবো।

অনন্তরাম আশ্চর্য হয়ে বললো—শিবালয়? কোথায় তোমার শিবালয়?

প্রমীলা—কৈলাস ভাইয়া বলেছে, আমার জন্যে ছোট একটি শিবালয় তৈরি করে দেবে। কত টাকা আর লাগবে? তুমি যদি না দাও, কৈলাস ভাইয়া দেবে।

অনন্তের মুখটা ধীরে ধীরে নিষ্প্রভ হয়ে আসতে থাকে। রহস্যটার কোন অর্থ-ভেদ করতে পারে না। কবে এত শিবভক্ত হয়ে উঠলো প্রমীলা? কৈলাসই বা কবে থেকে শিবের মহিমা উপলব্ধি করে ফেললো?

প্রমীলা বলে—কথা বলছো না যে?

অনন্ত—আমার বলবার কিছু নেই।

প্রমীলা—তাহলে আমার শিবালয় তৈরি করে দিচ্ছ?

অনন্ত—আমার সাধ্যি নেই।

প্রমীলা—বেশ, তাহলে কৈলাস ভাইয়াকে বলি।

অনন্ত প্রমীলার মুখের দিকে তীব্রদৃষ্টি ছড়িয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। একসঙ্গে যেন কয়েক শত প্রশ্ন সেই দৃষ্টির ভেতর সুতীক্ষ্ণ শরের মত ছুটাছুটি করছে। তারপর একটু শান্তভাবেই বলে—শিবালয় চাও শিবপূজার জন্য, না শিবকে অপমান করার জন্য?

প্রমীলা—এ কিরকম কথা হলো?

অনন্ত—বেচারা রামচন্দ্রজীর ওপর রাগ করে কি তুমি শিবের পুজো ধরবে?

প্রমীলা চুপ করে রইল। অনন্ত বললো—এরকম ভুল করো না প্রমীলা। রামজী হোক বা শিবজী হোক, মন থেকে যাঁকে চাও, তাঁরই পুজো কর। কিন্তু আমার ওপর রাগ করে কিংবা···

প্রমীলা—কিংবা, কি?

অনন্ত—কিংবা কৈলাস শিখিয়ে দিয়েছে বলেই তোমার শিবালয়ের সখ যদি হয়ে থাকে, তবে···

প্রমীলা একটু বেশীমাত্রায় উত্তপ্ত হয়ে উঠলো—কৈলাস ভাইয়া শিখিয়ে দিলেই কি শিবজী খারাপ হয়ে গেল? কি এমন খারাপ কাজের কথা বলেছে?

অনন্ত—কিন্তু কৈলাস কি সত্যিই···

প্রমীলা চোখ বড় বড় করে একটু বিদ্রূপের ভঙ্গীতে কথা বলে—বুঝেছি, তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না। তোমার মতে, কৈলাস একটা মানুষই নয়। সে কি আর শিবভক্ত হতে পারে?

অনন্ত—কিন্তু সেদিন তো দেখেছি কৈলাসের মুখে মদের গন্ধ।

প্রমীলা যেন দৃপ্তভাবে উত্তর দেয়—হ্যাঁ, তোমার কথা সত্যি। কিন্তু সে কৈলাস আর নেই। সে আর মদ খায় না।

অনন্তকে আরও আশ্চর্য করে দিয়ে প্রমীলা ঘরের ভেতর চলে গেল এবং পর-মুহূর্তে কতগুলি ছোট ছোট স্তোত্রের বই আর একটি বড় বই সশ্রদ্ধভাবে তুলে নিয়ে এসে অনন্তের সামনে রাখলো—এই দেখ শিবের মহিমার, আর এইগুলি সব স্তোত্র আর ভজন।

ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়েছিল অনন্ত। তার সংশয়ভরা প্রশ্নের পাহাড়টা নিজের মিথ্যায় চূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। কৈলাস আর সে-কৈলাস নয়। বোধহয় প্রমীলা আর সে-প্রমীলা নয়। সত্যি সত্যি জীবনের ধূলিকে এক নতুন বিশ্বাসে ভিজিয়ে দিয়ে ওরা শিবালয়ের পথটি তৈরি করে ফেলেছে। যে কৈলাসের মতন মানুষ দেবতার জন্য মদ ছেড়ে দিয়ে আত্মশুদ্ধি করেছে, সে-কৈলাসের নিষ্ঠা ও ত্যাগের মূল্যকে ছোট করবার মত সাহস খুঁজে পায় না অনন্ত।

অনন্তের চোখে পড়ে, প্রমীলার মাথায় বিনুনী নেই। এলোমেলো রুক্ষ চুল ছিন্ন স্তবকের মত ছড়িয়ে রয়েছে। সেই টিপ আলতা পান, গয়না আর রঙীন ওড়নার সমারোহ থেকে যেন বিদায় নিয়ে প্রমীলার মূর্তিটা রক্তশূন্য ও সাদাটে হয়ে গেছে।

তবে কি সত্যি সত্যি যাত্রা শুরু হয়ে গেছে? তবে কি অনন্তের সংসারে শুধু রামচরিতমানসের দোঁহাগুলি চিরকাল গম্ভীর স্বরে বাজতে থাকবে? ক্রীড়াচঞ্চল শিশু-রামের দুষ্টু পায়ের নূপুর এ-ঘরের আঙিনায় কখনো যে বেজে উঠবে, তার কোন আকাঙ্ক্ষার ছায়া নেই প্রমীলার মুখে। এক মহাশ্বেতার উদাস ছায়ামূর্তি প্রমীলাকে যেন অগোচর থেকে ইঙ্গিতে আহ্বান করছে। প্রমীলা সরে যাচ্ছে। ওর আত্মা শুধু উপোস করে থাকতে চায়।

এই সাধনায় প্রমীলা একা নয়। কৈলাসের সাধুতা আর উপদেশের গুণে এই নতুন শুচিতা লাভ করেছে প্রমীলা। ভাবতে গিয়ে সব গোলমাল হয়ে যায়। সমস্ত ঘটনা আরও জটিল হয়ে পড়ে। যেন তার ছোট সংসারে রামের রূপা আর শিবের বরে এক অদ্ভুত সংঘর্ষ বেধেছে। কিন্তু বাধবার কথা তো নয়, শাস্ত্রেও এ-কথা বলে না।

অনন্ত জিজ্ঞাসা করে—কৈলাস কি আজ আসবে?

প্রমীলা—না, আজ তার সারাদিন উপোস। গয়া গেছে, কাল ফিরবে।

অনন্ত—কৈলাসের কারবার?

প্রমীলা—কারবারে আর মন নেই কৈলাস ভাইয়ের। ট্যাক্সিটাকে অন্য লোকের কাছে ঠিকে দিয়ে দিয়েছে।

কিছুক্ষণ যেন সমাধিস্থের মত চুপ করে বসে থাকে অনন্ত। ডাকগাড়ি পৌঁছে গেছে, বাইরে হর্ণ বাজছে। প্রমীলা অনন্তের হাত ধরে আর একবার আগ্রহ করে টানলো—ওঠ, না খেয়ে রয়েছ। কিছু খেয়ে নাও। তাড়াতাড়ি কর, আমার অনেক কাজ আছে।

অনন্ত—কি কাজ তোমার?

প্রমীলা—আজ আমারও উপোস। গয়া থেকে যতক্ষণ না প্রসাদ আসবে, তত-ক্ষণ উপোস করে থাকতেই হবে। এরই মধ্যে পুজোর যোগাড়ও করে রাখতে হবে।

কৈলাস ভাইয়া নামে ও কাজে সত্যিই ভাই। নিকট-সম্পর্কে সে অনন্তরামের ভাই, দূর-সম্পর্কে প্রমীলারও ভাই। কিন্তু এই সম্পর্কের চেয়ে অনেক বড় তার আচরণ। কোথাও ফাঁকি নেই, নিজের সম্বন্ধে তার ধারণা রীতিমত ছোট।

জেলাবোর্ডের আঁকাবাঁকা অফুরান পথের পীচঢালা আবেগের মত কৈলাসের ট্যাক্সি হু হু করে দৌড়ে গড়িয়ে চলে যায়—উত্তর থেকে দক্ষিণে, দক্ষিণ থেকে উত্তরে। কখন যায় কখন আসে কোনো ঠিকঠিকানা নেই। ওর স্থিরতা নেই, নিশ্চয়তা নেই। কৈলাসের জীবনটা যেন পথে পথে ছুটোছুটি করে ফুরিয়ে যাচ্ছে। বিশ্রাম নেবার মত কোন কঠিন ঠাঁই আজও সে খুঁজে পায়নি। আসুক ঝড় বা বর্ষা, মধ্যাহ্নের সূর্য জ্বলে উঠুক মাথার ওপর, শীতের হিম আর কুয়াশায় আড়ষ্ট হয়ে যাক সারা শালবন —কৈলাসের ট্যাক্সির কোন ভাবনা-চিন্তা নেই। হঠাৎ হর্ণ বাজিয়ে, দীর্ঘ দৌড়ের মত্ততায় গোঁ গোঁ করে অরণ্যের বুক চিরে ছুটে আসে এই পথের মোড়ে, ক্ষণিকের জন্য বেগ একটু মন্দ হয়, তার পরেই আবার উধাও হয়ে যায়।

মোড়ের ওপর মাঝে মাঝে কৈলাসের ট্যাক্সি থামতো। কৈলাস কখনো গাড়ি থেকে নামতো না। গাড়ির ওপর বসে বসেই চেঁচিয়ে একটা ডাক দিত—কেমন আছ অনন্ত দাদা?

হেসে ইসারায় জবাব দিত অনন্ত—ভাল আছি।

অনন্ত জানে কৈলাস কখনো গাড়ি থেকে নেমে কাছে আসবে না। কৈলাসের গাড়ির ট্যাঙ্কে যেমন পেট্রল, তেমনি ওর পেটে মদ আর তাড়ি টলমল করছে।

অনন্ত জানতো, ডাকলেও কাছে আসবে না কৈলাস। কৈলাস জানে, অনন্ত ডাকলেও সে তার কাছে যেতে পারে না; বড সাদাসিধে সাত্ত্বিক মানুষ এই অনন্ত দাদা। ঐ ছোট দোকানের দেড়-দু'টাকার বিক্রি, পিপাসিতকে জলদান আর রাম-চরিত মানসের আনন্দে মজে আছে অনন্ত। কেমন একটা শুদ্ধ মনুষ্যত্ব। সজ্জনতা আর শুচিতায় অনন্তদাদা একটু অসাধারণ হয়ে আছে। মদের ঢেঁকুর তুলে এমন মানুষের কাছে এগিয়ে যেতে পারে না কৈলাস, এটা তার নিজের বিবেকেরই বাধা।

অনন্ত এক-একবার ভোরে উঠে দেখেছে, পথের ওপর গাড়ি থামিয়ে, দারুণ শীতের রাত্রিটা গাড়ির সীটের ওপরেই কুকুরের মত ঘুমিয়ে পার করে দিয়েছে কৈলাস, তবু অনন্তের ঘরে এসে আশ্রয় নেয়নি। অনন্ত রাগ করে ধমক দিয়েছে, অনুযোগ করেছে। কৈলাস হেসে চুপ করে থাকতো।

কৈলাসের ট্যাক্সি নতুন সরাইয়ের পথের ওপর অনেকবার থেমেছে আবার চলে গেছে! কিন্তু কিছুদিন আগে একবার থামতে গিয়ে যেন কিছুক্ষণের জন্য স্টার্ট বন্ধ হয়ে গেল। দুপুরে এসে, চলি-চলি করেও চলে যেতে অনেক দেরী হয়ে গেল। অনন্তরামের ঘরেই খাওয়া-দাওয়া সেরে নিল কৈলাস। এই প্রথম!

এই প্রথম দেখলো কৈলাস, প্রমীলা আজকাল এখানেই থাকে।

তারপর আবার অনেকদিন কৈলাসের দেখা নেই। প্রমীলা হঠাৎ একদিন জিজ্ঞাসা করে, কৈলাস ভাইয়ার খবর কি? আর যে একদিনও এল না।

অনন্ত বলে—রোজই তো ওকে দেখতে পাই।

প্রমীলা আশ্চর্য হয়—কোথায়?

অনন্ত—এই পথেই যায়, রোজই ওর ট্যাক্সি যায়।

প্রমীলার চেহারাটা ঈষৎ বিষণ্ণ হয়ে পড়ে। যেন একটা উদাস নিঃশ্বাসকে লুকিয়ে ফেলবার জন্যই বলে ওঠে—রোজই যায়, তবুও আসে না।

অনন্ত—কি করে আসবে বল? যা ভয়ানক মদ খায়! এই লজ্জাতেই আসতে পারে না। বড় দুঃখ হয় ওর জন্য। সবই তো ভাল, দেখতে শুনতে ভাল, পয়সাও ভালই রোজগার করে, কিন্তু ঐ কতগুলি পাপ ঢুকেছে। একেবারে নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে।

এত স্পষ্ট করে শুনেও সমস্ত ঘটনার ঘৃণাগুলি যেন হঠাৎ একটা মমতার ছোঁয়ায় আরও হেঁয়ালি হয়ে ওঠে। আকাশের সুখটা যেন ক্ষণিকের দুঃখে নিবে যায়, জেলা-বোর্ডের সড়কটা অন্ধকারের চাপে মুছে যায়। আর পথ দেখা যায় না। কৈলাসের আসা-যাওয়া বোধহয় চিরদিন এই অন্ধকারের আড়ালে দূরে সরে থাকবে।

কিন্তু অনন্ত জানে না, প্রমীলাও কল্পনা করতে পারেনি, এই আসা-যাওয়ার পথটুকু অটুট রাখবার জন্যেই কৈলাস তখন যেন সবার অগোচরে সরে গিয়ে এক কঠোর তপস্যা করছে, মদ ছাডবার চেষ্টা করছে। গয়া থেকে আসতে আসতে তিন-বার মদের বোতল মুখের কাছে তুলে ধরে তিনবার হাত কাঁপে, নিজেকে হুঁসিয়ার করে। তারপর আর মদ খেতে পারে না। বোতলটা ছুঁড়ে জঙ্গলের মধ্যে ফেলে দেয়।

ঝড়ের মত ট্যাক্সি নিয়ে ছুটে চলে কৈলাস। নতুন সরাই এগিয়ে আসে। গাড়ির গতি অকারণে মন্থর হয়ে আসে। নতুন সরাই পৌছবার আগেই একবার হঠাৎ থেমে যায়। কিছুক্ষণ ছটফট করে কৈলাস, তারপর আর সামলাতে পারে না। একটা মদের বোতল মুখের কাছে তুলে ধরে ঢক্‌ঢক্‌ করে খায়।

কৈলাসের প্রতি শোণিতকণায় ও স্নায়ুতে যেন নিজের দানতার লজ্জাও পালিয়ে যাবার নেশায় চন্‌চন্‌ করে ওঠে। আবার স্টার্ট নিয়ে জোরে এক্সিলেটার চাপে কৈলাস। নতুন সরাইয়ের মোডটুকু কয়েকটি মুহূর্তের মধ্যে পার হয়ে চলে যায়। অনন্ত দোকানঘরের চৌকিতে বসে দেখতে পায়—ঐ, কৈলাস চলে গেল।

যেন নতুন সরাইয়ের ধুলোর ছোঁয়াচ বাঁচাবার জন্যই কৈলাস এভাবে পালিয়ে যায়। কৈলাসের অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা দেখলে তাই মনে হয়। কিন্তু অনন্ত জানে না, প্রমীলা জানে না, নতুন সরাইয়ের মাটিতে স্থির হয়ে দাঁড়াবার জন্য জীবনের যত উদ্‌ভ্রান্ত পথিকতার যাতনার মধ্যে এক সত্যিকারের বিশ্রান্তির গ্যারেজ খুঁজে বেডাচ্ছে কৈলাস। একটা যোগ্যতার লাইসেন্স চাই, যেন তারই জন্য বড় কঠিন ট্রায়াল দিচ্ছে কৈলাস।

দূর গয়া রোডের ধারে, নতুন সরাইয়ের মোড়ে অনন্তরামের দোকানঘরে বাতি জ্বলে। ওদিকে ধানবাদ স্টেশনের ট্যাক্সি-স্ট্যাণ্ডে গাড়ির পর্দা ফেলে দিয়ে পেছনের সীটের উপর কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করে কৈলাস। মদ ছোঁয় না। নিকটেই বাজারের বীভৎস গলিগুলির ভেতর ছোট ছোট কালিমাখা ল্যাম্পের পাশে এক-একটা মেয়েমানুষের শরীর এখনো ফাঁদ পেতে সাগ্রহে দাঁড়িয়ে আছে। ওরা আশা করে আছে, এখুনি কৈলাস ওস্তাদ আসবে এই পথে। কিন্তু রাত গভীর হয়, ওস্তাদ

কৈলাস আসে না।

গাড়ির ভেতর উসখুস করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ে কৈলাস। ভোর হয়। হাত-মুখ ধুয়ে মুসাফিরখানায় চায়ের দোকানে বসে চার কাপ চা খায়।

যেন রোগ থেকে সেরে উঠছে কৈলাস। এইবার যেন চোখ খুলে তাকাতে পারা যায়। তাকালেই পথ চেনা যাবে। যে ক'টি যাত্রী পাওয়া যায়, ভাড়া যা-ই দিক্— এখুনি একটানা দৌড় দিয়ে সোজা পৌঁছে যাওয়া যায় নতুন সরাই। অনন্ত যদি ডাকে, সাড়া দিতে আর কোন বাধা নেই। হয়তো এইবার এগিয়ে যেতেও পারা যায়।

কৈলাসের ট্যাক্সি যাত্রী নিয়ে ছুটতে থাকে। বেলা বাড়ে, রোদ চমকায়, বরাকর নদীর শুষ্ক বালিয়াড়িতে অভ্রের রেণু ঝিকৃঝিক্ করছে।

রামভক্ত সাত্ত্বিক মানুষ অনন্ত এতক্ষণে পুজো সেরেছে, পাঠ শেষ করেছে, পথের পিপাসীদের জলছোলা খাওয়াবার প্রথম পালা শেষ করেছে। নতুন সরাই এসে পড়ে।

হঠাৎ কী ভেবে গাড়ির স্পীড বাড়িয়ে দেয় কৈলাস। না, থামাতে পারা যাবে না। কোন লাভ নেই। অনন্তের ঘরটা বড় বেশী পবিত্র। কোন ধুলো নেই, ধোঁয়া নেই। যেন দেবতাদের সঙ্গে বসে আছে অনন্ত। স্নান না করে, শুদ্ধ না হয়ে ওখানে কোন মতেই যাওয়া উচিত নয়।

সত্যি ওরা দু'জন যেন রামসীতার মত। যেন ইচ্ছে করে এই গরীবানার বনবাস গ্রহণ করেছে। অনন্তের মনটা এত নিষ্কলঙ্ক, এত সাদা—তাই তো প্রমীলা এত রঙীন।

তা ছাড়া, কৈলাস আজ বিশ্বাস করে, একা একা অনন্তের ঘরে ঢুকতে পারা যাবে না। এত শক্তি নেই তার। কোন দেবতার হাত ধরেই এগিয়ে যেতে হবে। নইলে অনন্তের ঘরের কপাট খুলবে না। খুললেও, এক মুহূর্ত টিঁকতে পারবে না কৈলাস।

ধুলো আর ধোঁয়ার একটি ছোট ঘূর্ণি ছুটিয়ে কৈলাসের ট্যাক্সি যেন তার সকল মালিন্যের পশরা নিয়ে পালিয়ে যায়।

অনন্ত প্রমীলাকে ডেকে আর একবার বলে—দেখলে কাণ্ড কৈলাসের, আজও এল না।

প্রমীলা বলে—একটা কথা জিজ্ঞাসা করি?

অনন্ত—বল।

প্রমীলা—তুমি কি ওর কখনো নিন্দে-টিন্দে করেছ?

অনন্ত—কখনো না। নিন্দে করবো কেন? ও তো নিজেই ভয়ে ভয়ে পালিয়ে বেড়ায়।

প্রমীলা—চিরকাল এভাবে পালিয়ে বেড়াবে?

অনন্ত—না। যেদিন রামজীর কৃপা হবে, সেদিনই সুস্থির হয়ে যাবে। সব ভুল

বুঝতে পারবে।

রামজীর কৃপা নয়, মহাদেবের আশীর্বাদ পেয়ে গেল কৈলাস। গয়া পৌঁছে ধর্মশালার আঙ্গিনায় ট্যাক্সিটাকে রেখে দিয়ে পথে বের হলো। এক জোড়া গরদের চাদর আর ধুতি কিনলো। শহরের ভিড় ছাড়িয়ে যেন একটা সঙ্কল্পের আবেগে ধীরে ধীরে পথের পর পথ পার হয়ে বিরাট ফল্গুর বালিয়াড়ির ওপর এসে দাঁড়ালো। অস্ত যাবার আগে পশ্চিমের সূর্য ঠাণ্ডা ও লালচে হয়ে উঠছে। বালিয়াড়ির ওপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে এক জায়গায় এসে থামলো কৈলাস। দু'হাত দিয়ে বালি খুঁড়ে একটা গর্ত তৈরী করলো। যেন এতদিনের ধোঁয়া আর ধূলোর জীবনের সমাধি খুঁড়ছে কৈলাস।

সূর্য ডুবে গেছে। চারিদিক আবছা হয়ে গেছে। কৈলাস হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখলো, তার সমাধির কূপ ঠাণ্ডা জলে ভরে উঠেছে!

স্নান সেরে নিয়ে কৈলাস আবার ফিরে চললো। পথের ওপর একটা মন্দিরের সিঁড়ির কাছে আলো জ্বালিয়ে একটা লোক হরেক রকম ধর্মের বই বিক্রী করছিল। কৈলাস কিছুক্ষণ দাঁড়াল, কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো। তারপরই একখণ্ড শিবমহিমা কিনে ধর্মশালার দিকে ফিরে চললো।

এর পর আর কৈলাসকে ডাকতে হয়নি। কৈলাসের ট্যাক্সি এসে নতুন সরাইয়ের পথের মোড়ে নিয়ম মত থেমে গেছে। গাড়ি থেকে নেমে সোজা অনন্তের ঘরে এসে বসেছে কৈলাস। গল্প হয়, তর্ক হয়, সন্ধ্যা পার হয়ে যায় তবু কৈলাসকে বসে থাকতে হয়, যতক্ষণ প্রমীলার রুটী তৈরী সারা হয়। রুটী-গুড় খেয়ে কৈলাস আবার চলে যায়।

এ-পথে আসতে যেতে আর থামতে কোন বাধা নেই। এমন কি অনন্ত যখন ঘরে থাকে না, তখনো কৈলাস অনায়াসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা এখানে এসে বসে থাকতে পারে। সব ভীরুতার সঙ্কোচ পুরনো ধুলো আর ধোঁয়ার মতই উবে গেছে।

কোন ভয় নেই কৈলাসের, কোন অপরাধের কুণ্ঠা নেই তার মনে। বড় কঠিন পরীক্ষা সহ্য করে, যোগ্য হয়ে, তৈরী হয়ে তবে সে এসেছে।

ধানবাদ ট্যাক্সিস্ট্যাণ্ডে আজও যাত্রীর অপেক্ষায় বসে থাকতে হয় কৈলাসকে। কিন্তু এই সময়টুকুও বৃথা যায় না। সীটের পাশে শিবমহিমার বইটি রাখা আছে। স্টিয়ারিংয়ের ওপর বই খুলে ধরে কৈলাস। মাথাটা ঝুঁকিয়ে এক মনে পড়তে থাকে।

কৈলাসের বেয়াড়া বিবেকটা যেন একেবারে জব্দ হয়ে গেছে। মনের এই ক্ষমাহীন দেবতাটি ভ্রূকুটি করে এখন আর এ-কথা বলতে পারে না—অন্যায় করছো কৈলাস।

কৈলাসের অন্তর জুড়ে এক পরম আশ্বাসের বাতাস বইতে থাকে—হে স্মরহর, তুমি শ্মশানে খেলা করে বেড়াও, পিশাচেরা তোমার সহচর, চিতাভস্ম তোমার অনুলেপ, নরকপালসমূহ তোমার মালা। তোমার আচরণ এই রকমই অপবিত্র। কিন্তু তবুও, হে বরদ শিব, যে তোমাকে স্মরণ করে তার কাছে তুমি মঙ্গলস্বরূপ।

কৈলাস আশ্চর্য হয়, এর চেয়ে আপন কোন্ দেবতা আছেন ? ঘৃণিতের হাত ধরে বুকে টেনে তুলবার জন্য তিনি স্বয়ং ঘৃণার সাজ পরেছেন। তবু ইনিই তো চন্দ্রোদ্ভাসিতশেখর, ইনিই তো গঙ্গাফেনসিতাজটা ! এমন দেবতা আর কে আছেন, যাঁর নয়নে বহ্নি স্ফুরিত হয় ?

চারদিকের চাঞ্চল্য ও কলরবের মধ্যেও কৈলাস যেন এক নিবিড় প্রশান্তির আস্বাদে মুগ্ধ হয়ে থাকে। ধীরে ধীরে শিবভক্তের মনের আকাশে একটা নতুন গর্বের ছটা জেগে উঠতে থাকে। রাম-সীতার যুগলস্বরূপের মধ্যে কি এমন বিস্ময় আছে ? এর চেয়ে বড় রূপ কি আর নেই ?

কৈলাসের বুকের শোণিত হঠাৎ উষ্ণ হয়ে ওঠে। পৃথিবীর যেখানে যত যুগল মূর্তি আছে, তার সব রূপ, রং আর আভরণ আজ চূর্ণ হয়ে যাক্। বড শান্ত, বড় নিষ্ঠুর, বেমানান আর বে-আইনি এই মূর্তিগুলি। শুধু হরগৌরী ছাড়া আর কোনো মিলনের মূর্তিকে আজ পুজো করতে চায় না কৈলাস।

কোথায় তুমি হরগৌরী, পার্বতী পরমেশ্বর ! সেই অঙ্গে অঙ্গে বাঁধা রূপ। অর্ধ অঙ্গে কস্তুরীচন্দন, অর্ধ অঙ্গে শ্মশানভস্ম, অর্ধাঙ্গে মন্দারমালা, অর্ধাঙ্গে করোটিমালা—অর্ধাঙ্গে দিব্যাম্বর, অপরার্ধ উলঙ্গ। অর্ধাঙ্গ স্বর্ণচম্পকের বর্ণ, অপরার্ধ কর্পূরধবল—অর্ধাঙ্গে মেঘশ্যামল কুন্তল, অপরার্ধে বিভূতি-ভূষিত জটা। শিবের অর্ধ এবং শিবার অর্ধ নিয়ে রূপের ঈশ্বর এই মূর্তিতে পূর্ণ হয়ে উঠেছেন।

প্রমীলা উপোস করেই দিনটা কাটালো। রাতটাও উপোসে কাটলো। ভোর-বেলা গয়া থেকে ফিরলো কৈলাস। হাতে একটা ঠোঙায় কতকগুলি ফুল-বেলপাতা আর প্রসাদ। কৈলাসের কপালে একটা ছাইয়ের টিপ, গায়ে গরদের চাদর। শাল-বনের মাথার ভিড ঠেলে সূর্য মাত্র উপরে উঠেছে, কৈলাসের মুখের ওপর আলো ছড়িয়ে পড়েছে।

কী শাণিত পবিত্র ও ভাস্বর হয়ে উঠেছে কৈলাসের মূর্তিটা। সারা মুখটা ঝক-ঝক করছে। কৈলাসের দিকে তাকিয়ে অনন্তর বুকটা হঠাৎ টিপটিপ করে উঠলো। কোথা থেকে একটা ভয়ার্ত স্পন্দন অনন্তের দেহমনে ঠেলে উঠছে—চেষ্টা করেও কিছুক্ষণের মত সুস্থির হতে পারলো না অনন্ত।

প্রমীলাও উঠে এসে বাইরে দাঁড়িয়েছিল। অনন্ত আবার ভাল করে দেখলো, প্রমীলার মাথার চুলগুলি কত রুক্ষ হয়ে উঠেছে। গায়ে কোন গয়না নেই, শুধু হাতে দু'গাছি চুড়ি। প্রমীলার চেহারাটা যেন কৃশ হয়ে আরও প্রখর হয়ে উঠেছে, চোখ দুটো এক নতুন অভ্যর্থনার আনন্দে চিক্‌চিক্ করে হাসছে।

. কৈলাস এগিয়ে আসছিল, অনন্ত এগিয়ে যাচ্ছিল। অনেকগুলি প্যাসেঞ্জার বাস মোড়ের ওপর এসে পৌঁছে গেছে। যাত্রীদের কলরব শোনা যায়।

কৈলাসের দিকে তাকিয়ে অনন্ত একটু ব্যস্তভাবে বললো—শুনলাম, কাল থেকে উপোস করে রয়েছ। একটু জিরিয়ে নাও, না খেয়ে দেয়ে চলে যেও না।

কথাগুলি বলেই অনন্ত যেন ছটফট করে দৌড়ে চলে গেল। মোড়ের কাছে পৌঁছে তার প্রিয় জলছত্রটির কাছে দাঁড়ালো। একটা ঘটিতে জল ঢেলে নিয়ে তৈরী হলো অনন্ত।

তৃষ্ণার্তেরা একে একে ছুটে আসছে। বালক বৃদ্ধ যুবক যুবতী, কেউ অঞ্জলি ভরে জল খায়, কেউ পাত্র পূর্ণ করে নিয়ে চলে যায়। কেউ বা পা ধোওয়ার জন্য লজ্জিত-ভাবে একটু জল চায়। অনন্ত এক ঘটি জল নিয়ে তার পায়ের ওপরেই ঢেলে দেয়। লোকটি অপ্রস্তুত হয়ে পা সরিয়ে নিয়ে কুণ্ঠিতভাবে বলে—থাক থাক। অনন্ত বলে—নাও, একটু জল নাও, ভাল করে ধোও।

একটা জয়ধ্বনির উল্লাস। সকালবেলায় শালবনের শান্তি শিউরে দিয়ে একটা ব্যাকুল হর্ষ যেন দক্ষিণ দিক থেকে ছুটে আসছে। কৌতূহলী হয়ে অনন্তরাম দূর পথের বাঁকের দিকে তাকিয়ে রইল।

একটু পরেই দেখা গেল। সড়কের ঢালু ধরে তারা যেন উর্ধ্বলোক থেকে চলে আসছে। দল বেঁধে তারা আসছে। সম্মুখে একটা বড় পতাকা উড়ছে। দু'পাশে শালবনের সবুজ, পায়ের নীচে শিশিরভেজা কালো পীচঢালা পথ, মাথার ওপর রোদের আভা—তারই মধ্যে এই অভিযাত্রী জনতার খদ্দরের সাজ যেন শুভ্রতায় প্রচণ্ড হয়ে উঠেছে।

মোড়ের যাত্রীরা চেঁচিয়ে উঠল—এসে গেছে,—এসে গেছে। এখানেও তুফান পৌঁছে গেল!

জনতা মোড়ের কাছে পৌঁছে গেল, বার বার জয়ধ্বনি করলো। সবাই ডাক দিল—চল চল, সবাই চল।

আজাদীর লড়াই শুরু হয়ে গেছে। জনতা এক মুহূর্তও অপেক্ষা করলো না। একটা মরণপণ প্রতিজ্ঞা যেন ঝড় হয়ে ছুটে চলে গেল—তসীল-কাছারীর দিকে। পরশাসনের যত গ্লানি আর গ্লানির চিহ্নকে আজ ওরা অগ্নিসাৎ করবে। যজ্ঞের আগুন জ্বালতে ওরা চলে যাচ্ছে।

জনতা চলে গেল। অনন্তরামের কাণে তখনো জনতার মিলিত কণ্ঠের গানের রেশ জাদুমন্ত্রের মত বাজছিল—জান হাজির হ্যায় অগর্ কর্ দো ইসারা গান্ধী!—হে গান্ধী, তুমি যদি মাত্র ইসারা কর, তাহলেই এ প্রাণ উৎসর্গ করতে আমরা প্রস্তুত আছি।

এ যে তার রামচরিতমানসের বাণী! কতবার কী নিবিড় বিশ্বাসে, কী শ্রদ্ধা-ললিত স্বরে এই আত্মদানের গান গেয়েছে অনন্তরাম।

হ্যাঁ, শুধু গান গাওয়াই সার হয়েছে। কিন্তু দেখে হিংসে হয়, এই জনতা যে নিজেরাই গান হয়ে গেছে। গান্ধীজী, গান্ধীজী রামজীর আত্মাটি বুঝি নতুন করে আবির্ভূত হয়েছেন। কী ভাগ্যবান তারা, যারা তাঁর পুণ্য স্পর্শ পেয়েছে, তাঁর বাণীতে আত্মহারা হয়ে গেছে।

অনন্তরামের প্রতিদিনের অভ্যস্ত কাজের জীবনটা যেন আজকের ঝড়ে শুকনো

ডালপালার মত ভাঙবার আগে মড়মড় করে বেজে উঠলো ?

তবু কাজ করে যায় অনন্ত। মোটর বাস, মোষের গাড়ি এসে মোড়ের ওপর থামে। পালকি থামিয়ে ক্লান্ত বেহারার দল হাঁপায় আর হাওয়া খায়। দোকানের চৌকিতে বসে অনন্তরাম বিক্রী করে—আটা, ছাতু, কেরোসিন, কুইনিন, আমলকীর আচার, ভাস্কর লবণ, হরধনুর্ভঙ্গের ছবি। এই বিকিকিনির তুচ্ছ সংসার ক্রমেই নিরাস্বাদ হয়ে আসছে, মোটেই ভাল লাগে না। তবু যেন অন্যমনস্কের মত এই ধরা-বাঁধা কাজের ওপর শুধু হাত ছুঁইয়ে চলে যায় অনন্ত, শুধু নিজের মনকে হাতের কাছে পায় না।

জীবনে এই প্রথম, এক নিঃস্বতার অভিমানে অনন্তরামের চিরকেলে আশা-বিশ্বাসের সত্তাটি যেন কুণ্ঠিত হয়ে রইল। রামচরিত-মানস তো পরশমণি, যার ছোঁয়ায় সব ভাবনা সোনা হয়ে যায়। কিন্তু কই ? মন যে তার ধুলো হয়ে ঝরে পড়ছে। যেন ঘুণ ধরে গেছে।

কংগ্রেস জিন্দাবাদ! আর একটা জয়রোলের স্রোত পথের ওপর আচমকা কোথা থেকে এসে গড়িয়ে পড়ে। বিহ্বলের মত অনন্তরাম পথের মোড়ে তাকিয়ে থাকে, জনতার উল্লাস যেন নতুন সরাইয়ের সকল দীনতার ধুলি-গ্লানি মুছে দিয়ে চলে যায়। ধীরে ধীরে মোড়ের ওপর একটা ভিড় জমে উঠতে থাকে। অনন্ত দেখতে পায়—ঐ রঘুনাথ আহীর, ঐ বুড়ো মাহাতো কাশীনাথ। ঐ যে তাদেরই সঙ্গে রাজপুত বাড়ীর সব ছেলেগুলিও এসে দাঁড়িয়েছে। আরও আসছে। কী অদ্ভুত কাণ্ড! যেখানে শুকনো ডাঙ্গা ছিল, হঠাৎ কোন প্লাবনে সেখানে যেন জলে ভরে উঠলো। আরও দেখতে পাওয়া যায়, সেই জলে ঢেউ জাগছে, মত্ত ফেনিল ঢেউ। নয়া সরাইয়ের জনতা নীল আকাশের দিকে হাত ছুঁড়ে জয়ধ্বনি করলো—স্বতন্ত্র ভারত কি জয়!

অনন্তরাম জানে, লড়াই শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু কী মনোমোহন এই লড়াইয়ের রূপ! স্তবে গানে শুচিতায় ও শুভ্রতায় এক অনুপম উৎসবের মত।

অনন্তরাম তাড়াতাড়ি হাতের কাজ সেরে ফেলতে চায়। ওরা যেন চলে না যায়। একটু অপেক্ষা করুক। আর কিছুক্ষণ। আর একটু সময় দিক অনন্তরামকে। মন স্থির করে নিক অনন্তরাম। কিসের এক ভীরুতায়, কেমন এক লজ্জায় কতগুলি একেবারে নতুন অভিমানে ও মায়ায় তার মন আজ এই ঘরের ভেতরেই যেন হারিয়ে গেছে। ছুটে চলে যাবার আহ্বান পৌঁছে গেছে, সম্মুখে কোন বাধা নেই। এক অবারিত ও আলোকিত পথ। তবু…

তবু পেছন থেকে যেন একটা অন্ধকারের শিকল অনন্তরামের পা দুটোকে জড়িয়ে ধরেছে। প্রমীলাকে চিনতে পারা গেল না, আরও দুর্বোধ্য কৈলাস। আজ ওরা শুধু একবার অনন্তরামের সম্মুখে এসে দাঁড়াক, স্পষ্ট করে নিজের মুখেই বলে দিক, ওরা কে ? তারপর আর কোন বাধা থাকবে না অনন্তরামের। পথের মোড়ে ত্রিবর্ণ পতাকা দুলছে, এক দৌড় দিয়ে এই রঙীন যুদ্ধের আঙিনায় ছুটে চলে যেতে

পারে অনন্ত।

ঘরের ভেতর থেকে ব্যস্তভাবে বের হয়ে এল প্রমীলা—ভাল ধূপ আছে?

অনন্ত—কেন?

প্রমীলা—পাঠ শুরু হয়েছে, ধূপ শেষ হয়ে গেছে, আরও চাই।

অনন্ত—কিসের পাঠ?

প্রমীলা—কৈলাসভাই শিব স্তোত্র পড়ছে। তুমিও এস, একবার শুনে যাও, কী সুন্দর পড়ছে কৈলাসভাই।

এক মুঠো ধূপ তুলে নিয়ে প্রমীলার দিকে এগিয়ে দিল অনন্ত। তার পরেই অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

ধূপ হাতে নিয়ে ব্যস্তভাবে চলে যেতে গিয়েই প্রমীলা থমকে দাঁড়ায়। এক-পা দু'পা করে এগিয়ে এসে অনন্তরামের একেবারে গা ঘেঁষে দাঁড়ায়। অনন্ত আশ্চর্য হয়ে প্রমীলার দিকে তাকাতেই দু'হাত দিয়ে মাথাটা বুকে জড়িয়ে ধরলো প্রমীলা—এত গম্ভীর হয়ে বসে আছ কেন? কি হয়েছে?

অপরাধীর মত সঙ্কোচে হঠাৎ বিব্রত হয়ে অনন্ত উত্তর দিল—না-না, সত্যিই কিছু হয়নি।

প্রমীলা হেসে হেসে চোখ দু'টো বড় করে নকল শাসনের ভঙ্গীতে কথা বলে—কথা সত্যি বলছো তো?

অনন্ত—হ্যাঁ।

ব্যস্তভাবেই আবার ঘরের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল প্রমীলা।

ধীরে ধীরে একটা স্বাচ্ছন্দ্যের টানে কিছুক্ষণ ঘুরে ফিরে পায়চারি করে অনন্ত। বুকের ভেতর যেন এতক্ষণ একটা নির্লজ্জ অবিশ্বাসের বাতাস আটকে ছিল। মনের কপাট খুলছে, বদ্ধ হাওয়ার গ্লানি উড়ে উড়ে সরে যাচ্ছে। প্রমীলাকে একবার ডাকতে ইচ্ছে করে।

কেন?

প্রশ্ন করলে এখনো ঠিক উত্তর দিতে পারবে না অনন্ত। নিত্য দোকানদারীর স্থাবর জীবন যেন নিছক সুস্থিরতার পাপে মরচে ধরে গেছে। ওদিকে রামচরিতের সব মহিমা আজ পুঁথির বন্ধন ছিঁড়ে হিন্দুস্থানের আকাশ বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে। শালবনের চঞ্চল সবুজে, ঘূর্ণিহাওয়ার আবেগে, জয়ধ্বনির গর্বে। প্রমীলাকে একবার আশীর্বাদ করতে চায় অনন্ত।

কেন?

এখনো স্পষ্ট বুঝতে পারে না অনন্ত। মোড়ের ওপর জনতার সামনে দাঁড়িয়ে রাজপুতবাড়ির সবচেয়ে ছোট ছেলেটা বক্তৃতা করছিল—এই ঝাণ্ডা আর এই বুক, এই আমাদের সম্বল। বাস্, এইবার আমরা রওনা হয়ে যাই। এই ঝাণ্ডার গায়ে আমাদের বুকের রক্তের ছিটে লাগবে। স্বরাজ নিতে হবে, আজ প্রাণের হিসাব করতে নেই। চলো চলো চলো···

চলে যেতেই হবে। অনন্তরাম যেন এতক্ষণে মনের ভেতর একটা প্রশ্নের উত্তর শুনতে পায়। কিন্তু আরও অনেক প্রশ্ন যে রয়ে গেল। এখনো উত্তর পাওয়া গেল না।

যাবার আগে রামচরিতখানা আর একবার কোলের উপর তুলে নিল অনন্তরাম। যাত্রার আগে পথিক যেন রত্নপেটিকা খুলে তার পথের সম্বল বেছে বেছে তুলে নিচ্ছে।

গুন্ গুন্ করে পড়তে থাকে অনন্ত, যেন একটা তন্দ্রাচ্ছন্ন স্বর—

রাম সিন্ধু ঘন সজ্জন ধীরা
চন্দন তরু হরি সন্ত সমীরা

রামচন্দ্র তুমি সমুদ্রের মত, সজ্জনেরা মেঘ। হে রাম, তুমি চন্দন তরু, সজ্জনেরা বাতাস।

হ্যাঁ, মোড়ের উপর জনতার মূর্তি প্রতিজ্ঞায় গম্ভীর হয়ে উঠেছে—ওরা মেঘের মত। হ্যাঁ, কোথাও যেন চন্দন তরুর মাথায় ঝড়ের মন্ত্র লেগেছে, ওরা বাতাস হয়ে ছুটে যাচ্ছে।

মনে মনে প্রমীলাকে আশীর্বাদ করে অনন্ত। তাকে চিনতে পারেনি অনন্ত, বড় ভুল হয়েছিল। মন বড় নোংরা হয়ে গিয়েছিল। বড় অহঙ্কার ছিল মনে মনে। আজ হৃদয়ের সব বিশ্বাস সঁপে দিয়ে অনন্ত পড়তে থাকে—

ভয়উ মনোরথ সুফল তব
শুনু গিরিরাজকুমারী
পরিহরু দুসহ কলেস সব
অব মিলিহহিঁ ত্রিপুরারি।

গিরিরাজকুমারী শোন, তোমার ইচ্ছা সফল হয়েছে। এখন সকল দুঃসহ ক্লেশ ছেড়ে দাও, শিবকে পাবে।

তাড়াতাড়ি পুঁথির পাতার পর পাতা উল্টে যায় অনন্ত। রামজীর কৃপা যেন তার জীবনে এতদিনে সত্য হয়ে উঠেছে। সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাচ্ছে, সব সংশয় একে একে দূরে যাচ্ছে—

...ভরত হৃদয় সিয়া রাম নিবাসূ
এহঁ কি তিমির জহঁ তরনি প্রকাসূ

ভাই ভরতের হৃদয়ে সীতারাম বাস করে। সেখানে সূর্য আছে, সেখানে কি অন্ধকার থাকতে পারে?

কৈলাস ভাই। আবেগ রোধ করতে না পেরে চেঁচিয়ে ডাকতে যায় অনন্ত। ছি ছি, কী ভয়ানক ভুল কী নোংরা মনের প্রবঞ্চনা! তাই ভরতকে এতদিন চিনতে পারেনি অনন্ত।

অনন্তের চেয়ে বেশী সুখী কেউ নেই। তার সীতা আছে, ভরত আছে। অন্ধ হয়েছিল বলে এতদিন দেখতে পায়নি, তার ছোট সংসারে রামচরিতের পুণ্য জীবন্ত হয়ে রয়েছে।

করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে! পথের মোড়ে আর একটা ধ্বনি, আর একটি জনতা, আর একটা নতুন জলপ্রপাতের হর্ষ!

অনন্তরামের গলার স্বরও নতুন এক আবেগের বন্যায় একেবারে ভেসে যায়—

…রাম কাজ কারণ তনুত্যাগী
হরিপুর গয়উ পরম বড় ভাগী।

রামের কাজে জীবন বলি দাও। তুমি হরিধামে যাবার মত পরম ভাগ্য লাভ করবে

রামচরিতখানা বন্ধ করে রেখে দোকানের চৌকী থেকে একটা লাফ দিয়ে নেমে পড়ে অনন্ত। খড়ম জোড়া পরে নিয়ে সবুজ ঘাসের ওপর দিয়ে দৌড় দেয়। পথের মোড়ে পৌছে যায়। ত্রিবর্ণ পতাকার প্রমত্ত ছায়া অনন্তরামের মাথার ওপর যেন চরম সমাদরের আবেগে লুটোপুটি করতে থাকে।

শিবপুরাণের একটা অধ্যায় পড়ছিল কৈলাস। ঘরের ভেতর একটা জায়গা পরিষ্কার করে নিকিয়ে দিয়েছে প্রমীলা। তারই ওপর আসন পেতে কৈলাস শান্ত-ভাবে বসেছিল। সামনে একটু তফাতে মুখোমুখি বসেছিল প্রমীলা। ঘরের ভেতর রোদের আলো এসে পড়েছে, তবু একটা ঘিয়ের প্রদীপ জলছিল। ধূপ পুড়ছিল।

কৈলাস পড়ছিল—সেই মহাদেবই ভাস্কর, সেই মহাদেবীই প্রভা। এই শঙ্কর-শঙ্করীই আকাশ ও পৃথিবী, সমুদ্র ও বেলা, বৃক্ষ ও লতা…

প্রমীলা হঠাৎ অনুরোধ করে—একটু থামুন কৈলাসভাই। আমি এখনি আসছি।

পড়া থামিয়ে কৈলাস বলে—কেন?

প্রমীলা ব্যস্তভাবে দাঁড়িয়ে বলে—জল ফুটছে, ডাল ছেড়ে দিয়ে আসি, নইলে রান্না দেরী হয়ে যাবে। ডাকগাড়ী এসে গেলে ওর আবার খাবার সময় হবে না।

প্রমীলা চলে যায়। কৈলাস বইটা একেবারে বন্ধ করে দিয়ে চুপ করে বসে থাকে! এক মুঠো ধূপের গুঁড়ো নিয়ে আগুনের সরার ওপর ছড়িয়ে দেয়। ভুর ভুর করে সুরভিত ধোঁয়ায় ঘরের বাতাস আচ্ছন্ন হতে থাকে। কৈলাসের মূর্তিটা যেন তার মধ্যে অত্যন্ত অবাস্তব ও অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে।

কিছুক্ষণ পরই ফিরে আসে প্রমীলা। নিজের জায়গাটিতে বসে। আগ্রহ করে বলে—পড়ুন।

শিবপুরাণের অধ্যায়টা খুঁজে বের করতে অনেক সময় লাগে কৈলাসের, হাতটা অকারণে কাঁপতে থাকে।

হঠাৎ প্রমীলার দিকে চোখ তুলে তাকায় কৈলাস। দৃষ্টিটা বড় প্রখর, শিব-ভক্তেরও চোখে যেন আগুনের আভা ঝলকায়।

কৈলাস বলে—শিবের আরাধনায় কোন ফাঁকি রাখতে নেই প্রমীলা।

তারপরেই পড়তে আরম্ভ করে কৈলাস—যিনি ভূমি নহেন, জল নহেন, আকাশ নহেন। যাঁর তন্দ্রা নেই, নিদ্রা নেই, গ্রীষ্ম নেই, শীত নেই। যাঁর দেশ নেই, ঘর

নেই, সেই, সেই শিবকে···

কৈলাসের গলার স্বর যেন এক কান্নার আবেগে ভেঙে পড়তে চায়। প্রমীলা স্থির দৃষ্টি তুলে দেখতে থাকে, পাঠ শোনে।

কৈলাস যেন ব্যাখ্যা করার জন্যই বলে—তার কিছু নেই প্রমীলা! সে একেবারে শূন্য।

প্রমীলা বলে—পড়ুন।

কৈলাস পড়ে—সে শুধু বিষপান করে, তাই সে নীলকণ্ঠ। সাপ তার গলা জড়িয়ে ধরেছে। তবু তারই বাম অঙ্গের শোভা হয়ে রয়েছেন স্বয়ং পার্বতী।

পড়তে পড়তে কৈলাস হঠাৎ থেমে যায়। অনেকক্ষণ মুখ নীচু করে বসে থাকে।

প্রমীলা বলে—পড়ুন।

কৈলাস তাকায় প্রমীলার দিকে। অন্তরের সমস্ত বিশ্বাস চরম আবেদনের মত ফুটে ওঠে; বুকভরা আগ্রহ নিয়ে কৈলাস ডাকে—কাছে এস প্রমীলা! পাশে বসো।

প্রমীলা সেইখানেই নিশ্চলভাবে বসে থেকে বলে—পড়ুন।

একটা ধোঁয়ার পুঞ্জ কৈলাসের মুখের ওপর দিয়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে উড়ে চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে কৈলাসের মূর্তিটাকেও বদলে দিয়ে গেল। যেন কৈলাসের মাথায় আগুন ধরে গেছে। মুখটা একেবারে কালো হয়ে গেছে। চোখের দৃষ্টিটা নীরব হাহাকারের মত, এক রিক্ত জগতের চারদিকে অসহায়ের মত ছুটাছুটি করছে।

এত সেয়ানা শক্ত মানুষ কৈলাস যেন ছেলেমানুষ হয়ে গেছে। আবোল-তাবোল বকছে—আমি শিবের পুজো কেন করি, তা আমি নিজেই জানি না প্রমীলা। বোধ হয় জীবনে কোনো গৌরীর মূর্তিকে স্বচক্ষে দেখতে পাব, সেই লোভে···

প্রমীলার নিশ্চল মূর্তিটা যেন একটা আঘাত লেগে আচমকা নড়ে উঠলো। তার পরেই আবার স্থির হয়ে রইল।

কৈলাস বলে—দেবতা হোক আর মহাপুরুষ হোক, জীবনে কারও গৌরী-লাভ হয় না জানি। মহাদেবও গৌরীর অর্ধেকটুকু পেয়েছিলেন প্রমীলা। আমি কোন ছার!

চিরকালের বোকা মেয়ে প্রমীলা চমকে উঠলো। মাথা হেঁট করে মাটির দিকে তাকিয়ে রইল।

কৈলাস যেন বুদ্ধিসুদ্ধি হারিয়ে একেবারে পাগল হয়ে গেছে—অনন্ত ভাইয়ের কাছে আমি কোনো দোষ করতে চাই না প্রমীলা, তার কিছুই কাড়তে চাই না। আমি চোর নই।

মাথা হেঁট করেই ভয়ার্ত স্বরে প্রমীলা বলে—তবে আপনি কি?

কৈলাস—আমি ভক্ত। সত্যিই আমি শুধু ভক্ত, প্রমীলা। শিব আমার ভরসা।

প্রমীলা—আপনার কথা বুঝতে পারছি না, কৈলাস ভাই।

কৈলাস—শুধু তোমার ভালবাসার অর্ধেকটুকু প্রমীলা।

প্রমীলা মুখ তুলে তাকালো—কি বললেন?

কৈলাস—আমার যেটুকু পাওনা, তাই বললাম।

প্রমীলা আর মাথা হেঁট করলো না। যেন একটা জ্বালার আঁচ লেগেছে, চোখ দুটো বন্ধ করে কিছুক্ষণ বসে থাকে প্রমীলা।

প্রমীলার চোখ নিংড়ে বড় বড় জলের ফোঁটা ঝরে পড়ছিল। হঠাৎ ভয় পেয়ে উঠে দাঁড়ালো কৈলাস। কোথায় গৌরী? গৌরীরূপের কোন চিহ্ন নেই এই মেয়ের মুখে। আকুল হয়ে কাঁদছে, এ যে সীতার মূর্তি। অতি বোকা, অতি ছিচকাঁদুনে অথচ অত্যন্ত টিট মেয়ে এই রামায়ণের সীতা।

একটা তাচ্ছিল্যের ঠেলা দিয়ে শিবপুরাণ পাশে সরিয়ে রাখলো কৈলাস, এই ব্যর্থ অপদার্থ মন্ত্রের জঞ্জাল। একটা ছলনার সিঁড়ি, মানুষকে ঝুটা দেবত্বের গাছে তুলে দিয়েই দূরে সরে যায়।

পালিয়ে যাবার আগে প্রমীলার সামনে একবার দাঁড়ালো কৈলাস। কৈলাসের হাত-পা কাঁপছে। শুধু একটা কথা বলার চেষ্টা করতে গিয়ে কৈলাস বুঝলো—গলা কাঁপছে।

আর মুহূর্ত দেরী করলে না কৈলাস। ভেতর ঘর থেকে বারান্দায়, বারান্দা থেকে দোকান ঘর। তারপরেই ছোট মাঠের ওপর দিয়ে এক দমে হন্‌হন্‌ করে হেঁটে পথের মোড়ে এসে পৌঁছাল কৈলাস।

একেবারে নিজন হয়ে রয়েছে মোড়টা। কোনো সাড়াশব্দ নেই। বস্তির ঘরগুলির কপাট বন্ধ। কোনো গাড়ী দাঁড়িয়ে নেই, পাখীর চলাচলও নেই। নতুন সরাইয়ের জীবনের সাড়া যেন শালবন ভেদ করে দূরান্তরে পালিয়ে গেছে। এক বৈরাগীর ছাড়াভিটার মত নতুন সরাইয়ের শব্দমুখর পথের মোড় আরও গভীর শূন্যতায় উদাস হয়ে রয়েছে।

তসীল-কাছারির ফটকটা কেল্লার দরজার মত। কাছারির চারিদিক বেঁটে পাচিল দিয়ে ঘেরা। একটা কাঁচা সড়ক নানাদিক ঘুরে ফিরে ফটকের কাছে এসে শেষ হয়েছে, প্রাচীরে ঘেরা এই ভূখণ্ডের ওপর ছোট ছোট সবুজ ঘাসের আঙিনা আর কাছারি ঘর। শুধু তসীল কাছারি নয়, কাছাকাছি আশেপাশে এক সৌভ্রাত্রের আবেগে অনেকগুলি অফিস দাঁড়িয়ে আছে। একটা থাজনাথানা আর জঙ্গল অফিস, একটা আবগারী অফিস, একটা ডাকঘর। ছোট একটা কৃষি অফিসও আছে—একটা অকেজো ট্র্যাক্টরের মরচে-পড়া কঙ্কাল কাৎ হয়ে পড়ে আছে সম্মুখের ঘাসের ওপর। ফটক পার হয়ে প্রথম দালান হলো থানাবাড়ি। ছোট ছোট অফিস আর ছোট ছোট আমলা, কিন্তু খুব বড় বড় কাজ হয়। এক বছরের ঘুষের টাকা এক সঙ্গে জমা করলে ইটের বদলে তাই দিয়ে আর একটা পাঁচিল তোলা যায়। সার্কেলের পেয়াদাটার মুখে শুধু একটু খুশি মেজাজের হাসি ফুটিয়ে তুলতে হলেও চার আনা ঘুষ দিতে হয়। কথা বলতে আট আনা—আর টেবিলের ওপর দরখাস্ত পৌঁছে দিতে এক টাকা। কয়েকটা গাঁ ডিহি বস্তি আর সরাই, কয়েকটা জঙ্গল পাহাড় ঝর্ণা আর ক্ষেত, কয়েক হাজার দীন মানুষের পাপ-পুণ্য সুখ-দুঃখ শোক ও

উৎসবের মধ্যে নিতান্ত অবান্তর এই তসীল কাছারি। তারই ফটকে কয়েক শত মানুষ আজ হানা দিয়েছে, যেন এক দুঃস্বপ্নের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে, হিসেব নিকেশ করতে।

সমস্ত কাছারি বাড়িটার পাগড়ী আর উর্দি গরম হয়ে উঠেছে। লাঠিধারী পুলিশেরা সার বেঁধে পাঁচিলের ওপর দাঁড়িয়ে আছে যেন পাঁচিল টপকে কেউ ভেতরে না ঢুকতে পারে। ফটকের পথ রুখে প্রথম দফায় দাঁড়িয়ে ছিল একদল গুর্খা সৈনিক, সঙ্গে একজন গোরা মেজর। টেলিগ্রাম পাওয়া মাত্র চটপট মোটর লরী দাবড়িয়ে চলে এসেছে। সদর থেকে এক রায় বাহাদুর এস-ডি-ও পত্রপাঠ চলে এসেছেন। ভুঁড়ির ওপর বেল্ট, বেল্টের সঙ্গে রিভলভার। ভুঁড়িতে যতই স্নেহপদার্থ থাকুক রিভলভারটি একেবারে স্নেহবর্জিত। থানা-ইনচার্জ দারোগাবাবু হাতে বন্দুক তুলে নিয়েছেন।

মাত্র তিন শত গ্রাম্য মানুষের একটা জনতা। কারও হাতে একটা লাঠিও নেই। মনের ভুলে লাঠি ছেড়ে দিয়েছে তা নয়, ইচ্ছে করেই ওরা আজ লাঠি ছোঁবে না। কারও মাথার খুলি ভাঙতে ওরা আসেনি। ওদের দাবীটা বড়ই অদ্ভুত। শুনতে খুবই সামান্য, বলতে খুবই সোজা, বলছেও খুব স্পষ্ট করেই। কিন্তু ভাবতে বড় ভয়ানক! এক চরম বিপর্যয়ের মন্ত্র যেন ওদের দাবীতে গা-ঢাকা দিয়ে রয়েছে। তসীল কাছারির সমস্ত নথিপত্র, কয়েক শত বছরের অপমানের ইতিহাসকে আজ শুধু ওরা হাতের মুঠোয় পেতে চাইছে। এই নথিপত্র নিয়ে ওরা চলে যাবে, কোন্ এক অলক্ষ্য বৈতরণীর জলে চিরকালের মত ভাসিয়ে দেবে কে জানে?

সবচেয়ে আশ্চর্য, অস্ত্রে আয়ুধে ও হিংস্র দম্ভে কণ্টকিত এই ফটকের মুখেই এসে ওরা ভিড় করেছে। থরে থরে সাজানো এই মৃত্যুর ভ্রূকুটী ভেদ করে, এই পথেই ওরা কাছারি এলাকায় ঢুকতে চায়। পাঁচিল টপকে ভেতরে যাবার কোনো স্পৃহা নেই কারও মনে। সস্তা পথে কোনো লোভ নেই, চালাকির কেউ ধার ধারে না। ওরা ফাঁকির তস্কর নয়। পিস্তল বন্দুকের ঔদ্ধত্য অবাধে তুচ্ছ করে, এই দুঃস্বপ্নকে বিদ্রূপে ব্যর্থ করে দিয়ে ওরা চলে যাবে। তাই ওরা এগিয়ে যাবে। এগিয়ে চললো।

থানার জমাদার গর্ গর্ করে গলার রগ কাঁপিয়ে হুঁসিয়ারী চিৎকার ছাড়লেন —হঠ্না হ্যায় তো হঠ্ যাও, নেহি তো মর যাওগে।

ঝটপট সঙ্গীন চড়িয়ে গুর্খা রাইফেলস্ শক্ত হয়ে দাঁড়ালো।

—হঠ্ যাও হিন্দুস্থানসে! মত্ত ঝড়ের গর্জনের মত প্রত্যুত্তর দিয়ে জনতা ফটকের দিকে কয়েক পা এগিয়ে গেল।

—হঠ্না হ্যায় তো হঠ যাও, নেহি তো মর যাওগে। আবার সেই গলার শিরা কাঁপানো মৃত্যুর হুংকার।

টোটাভরা রাইফেলগুলি নিশানা করে যেন ফণা তুলে স্থির হয়ে রইল।

—করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে! নবীন মেঘের ভেরীর মত জনতার সংকল্প আবার প্রত্যুত্তর দেয়।

এস-ডি-ও অর্ডার হাঁকলেন—ফায়ার।

এক রাউণ্ড ছররা গুলি-বারুদের গন্ধ উড়িয়ে সশব্দে ছিটকে পড়লো। জনতা যেন আচম্‌কা ছন্নছাড়া হয়ে সড়কের উল্টো দিকে বহু দূর পর্যন্ত পিছিয়ে গেল। কেউ পথের পাশে দাঁড়িয়ে কাঁপলো, কেউ হতভম্বের মত তাকিয়ে রইল, কেউ আতঙ্কে দৌড় দিল।

বারুদের প্রথম দফা ধোঁয়া আর গন্ধ মিটে যেতে না-যেতেই এই পিছে-হঠে-যাওয়ার দৃশ্যের মধ্যে মাত্র একটি বেপরোয়া আত্মার ছবি ফটকের উপর হানা দেবার জন্য একলা ছুটে এগিয়ে গেল।

—করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে! করেঙ্গে ইয়া—

অনন্তরামের মন্ত্রের অনুচ্চারিত সংকল্প পূর্ণ হলো। মেজরের রিভলবারের গুলি এক নিমেষে ছুটে এসে অনন্তরামের বুকের পাঁজর ফুটো করে দিয়েছে।

কয়েকটি মুহূর্তের মত, এক স্পন্দনহীন মূক পৃথিবীর স্তব্ধতার মধ্যে মাটিতে লুটিয়ে ছটফট করে নিজে রঙীন হয়ে উঠলো অনন্ত, মাটি রঙীন হলো।

এর পরের ঘটনার হিসেব অনন্তরাম জেনে গেল না। সবার আগে কারও কাছে বিদায় না নিয়েই সে চলে গেছে। কিন্তু ঐ জনতা অনন্তরামকে বিদায় দেবার জন্য কিছুক্ষণ পরে আবার ফিরে এসে তসীল কাছারির ফটকে দাঁড়িয়েছে। লাঠি তরবারি বল্লম বন্দুক ইট পাটকেল চালিয়েছে। প্রাণ দিয়েছে, প্রাণ নিয়েছে। তসীল কাছারির ফটকে শোণিতের উৎসব কিছুক্ষণের জন্য ভয়াল হয়ে উঠেছে। সমস্ত কাছারি এলাকা আগুনে পুড়ে গেছে। শুধু দালানের কালো কালো দেয়ালগুলি বিধ্বস্ত প্রেতালয়ের চিহ্নের মত দাঁড়িয়ে থাকে। অঢেল ফুলের স্তবকে শবাধার সাজিয়ে অনন্তরামকে তারা তুলে নিয়ে চলে যায়।

তসীল কাছারির ফটকে ঐ যে একখণ্ড ভূমি, অনন্তরাম যার মাটিকে রঙীন করে দিয়ে গেল, সেই মাটিই এক-এক খাবলা লোকে তুলে নিয়ে গেল। শক্ত পাথুরে মাটি, লোকে জল ঢেলে নরম করে নিয়ে এক-এক মুঠো কাদা নিয়ে যায়, যেন এক মুঠো পুণ্যের পরমাণু।

শোণিত আর আগুনের খেলা থেমেছে। কিন্তু সকাল সন্ধ্যে লোক আসছে তসীল কাছারির ফটকে, এ গাঁ থেকে, ও গাঁ থেকে—ভিন্ন জেলার বাজার ও বস্তি থেকে—মাটি নিতে। শুধু এক মুঠো মাটি।

পোড়া কাছারির ফটকে দিনকয়েক পরে আবার দেখা দিল পুলিশ আর ফৌজের লোক। আর পাহারা দেবার মত কিছু নেই। কিন্তু বাধা দেবার মত আর একটা কাজ তারা পেয়ে গেছে। ঐ একখণ্ড ভয়ানক জমির মাটিকে তারা ঘিরে ধরলো—কেউ মাটি নিতে পারবে না।

সত্যি কেউ মাটি নিতে পারে না। লোকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে সাগ্রহে তাকিয়ে থাকে। তারপর হতাশ হয়ে চলে যায়।

একদিন, দু'দিন, তিনদিন—সপ্তাহ কেটে যায়। তারও পরে শালবনের মাথার ওপর দিয়ে প্রতি রাত্রিতে কৃষ্ণা তিথির ক্ষীণ চাঁদের রূপ ধীরে ধীরে ভরে উঠতে থাকে। হঠাৎ একদিন ভোরের আলোকে দেখা যায়, ঐ একখণ্ড মাটির গায়ে সবুজ ঘাসের আবির্ভাব সাড়া দিয়ে উঠেছে। পুলিশ আর ফৌজের মানুষগুলিকে হঠাৎ দেখতে নতুন রকমের লাগে। যেন তীর্থভূমির পবিত্রতাকে ওরা পাহারা দিয়ে সযত্নে আগলে রেখেছে। ওরা এখনো জানে না যে, ভবিষ্যতের কোনো পথিক হয়তো দেবালয় দেখবার জন্য ঠিক এইখানে, এই ভয়ানক মাটির কাছে এসে এমনি এক সকালবেলায়···

এমনি এক সকালবেলায় মাত্র কয়েকটা দিন পরে তীর্থযাত্রীর মত কয়েকটি মানুষ হেঁটে হেঁটে তসীল কাছারির ফটকের প্রায় কাছাকাছি কাশফুলে ছাওয়া মাঠের ওপরে এসে দাঁড়ালো! প্রমীলা, প্রমীলার বাবা নন্দলাল, প্রমীলার ছোট ভাই বাসুদেব আর কৈলাস।

কি দেখতে ওরা এসেছে তা নিজেরাই ভাল করে জানে না। তবু ওরা তাকিয়েছিল ফটকের দিকে। বুড়ো নন্দলালের একজোড়া হতভম্ব চোখ জলে ভিজে গিয়েছে। বোধহয় লক্ষ বছরের ধৈর্যে কঠিন, পিতা হিমাদ্রির বুকের বরফে আবার নতুন করে পুত্রশোকের জ্বালা লেগেছে।

ছোট ছেলে বাসুদেব যেন কান্না লুকোবার জন্যে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছিল। হিন্দুস্থানের দেবদারু বনের একটি শিশু-ঝড় হঠাৎ বড় আকাশের মেঘের দিকে তাকাতে গিয়ে চোখে জলের ঝাপটা লেগেছে, ভাল করে বুঝতে পারছে না বলেই অভিমান হয়েছে।

সবার পেছনে দু'হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল কৈলাস।

শুধু কাঁদতে পারলো না বিধবা প্রমীলা। প্রমীলা যেন এক তপস্বিনী সিদ্ধার্থিকার সত্তা লাভ করেছে। জীবনের এত বড় ক্ষতিটার হিসেব খতিয়ে দেখবার কোনো গরজ নেই। কোনো দুঃখকে আজ যেন আমল দিচ্ছে না প্রমীলা। কেমন দেবী-দেবী ভাব। যেন একটা চন্দন-চর্চিত কঠিন আত্মাভিমানের মূর্তি। যাবার আগে একটা মুখের কথা পর্যন্ত না বলে যে চলে গেল, তার দেওয়া শাস্তি সে নিশ্চয় গ্রহণ করবে। কিন্তু কেঁদে কেটে নয়, হেসে হেসেও নয়—একেবারে শূন্য হয়ে গিয়ে। এই কয়টা দিন, সকাল সন্ধ্যা ও রাত্রি, শুধু গভীর বিশ্বাসে শিবনাম জপেছে আর শিবস্তোত্র পড়েছে প্রমীলা। শূন্যতার ভগবান তাকে কৃপা করে পথ দেখিয়ে দিয়েছেন।

ঘরে ফেরবার আগে প্রমীলা একবার কৈলাসের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো—আর কাঁদবেন না, কৈলাসভাই।

এই সান্ত্বনাকে সইতে না পেরে কৈলাস যেন অভিমানী ছেলেমানুষের মত আরও বেশী আবোল-তাবোল বকতে আরম্ভ করলো—আমি শিবভক্ত। প্রমীলা বহিন তুমি বিশ্বাস কর, আমি সত্যিই ভক্ত, শুধু ভক্ত।

তপস্বিনীর হৃদয়ভরা শূন্যতার গায়ে নেহাৎ অসাবধানে যেন এক টুকরো মেঘের

সজলতা লাগে। প্রমীলার গলার স্বর আর-একবার যেন ভুল করে মমতার ছোঁয়ায় স্নিগ্ধ হয়ে ওঠে—হ্যাঁ কৈলাসভাই।

কৈলাস—তাই তো আমি শিবালয় দেখতে এখানে এসেছি।

শিবালয়! প্রমীলার শুকনো চোখের দৃষ্টি তসীল কাছারির ফটকের একখণ্ড ঈষৎ শ্যামল মাটির বেদীর ওপর গিয়ে লুটিয়ে পড়লো। দু'টো পুলিশ তখনো জায়গাটা পাহারা দিচ্ছে। লম্বা লম্বা লাঠির ছায়া পড়েছে মাটির ওপর।

প্রমীলাদের সামনে অনেকগুলি কৌতূহলী পথচারী লোক একটা বিস্ময়ের ভিড় সৃষ্টি করে দাঁড়িয়েছিল। তারা শুধু বুঝতে চেষ্টা করছিল—কে এরা?

হঠাৎ বুকফাটা শোকের বিলাপ বাতাসে ছড়িয়ে, সুর করে টেনে টেনে, মাথা কুটে, ক্ষমা চেয়ে, কেঁদে উঠলো প্রমীলা। গৌরী নয়, সীতাও নয়। কৌতূহলী জনতা শুধু বুঝতে পারলো, নতুন সরাইয়ের অনন্ত মুদীর বউ কাঁদছে।

মি ষ্টি মু খ

সকলেরই মুখে একটা কথা শুনতে পাই—মিষ্টি কথায় কী না হয়?

কিন্তু, মিষ্টি কথা কাকে বলে?

বুঝতে চেষ্টা করেছি অনেক। ভেবেছি অনেক। এটাও মর্মে মর্মে টের পেয়ে গিয়েছি যে, একটা খুব ভাল কথাকে সামান্য একটু শক্ত করে বললেও ফল বড় খারাপ হয়। বন্ধুকে বলেছিলাম—এত সুন্দর গলা তোমার, আর ভাল ক্ল্যাসিকাল গান যখন এত ভাল গাইতে পার, তখন ঐ সব যত আধুনিক রাবিশ গাইতে তোমার লজ্জা হয় না?

এর পরেই দেখলাম, বন্ধু ক্ল্যাসিকাল সঙ্গীত একেবারেই ছেড়ে দিলেন, এবং দিনরাত আরও বেশী করে আধুনিক গাইতে আরম্ভ করলেন।

নিজের রেশন কেনা স্থগিত রেখে প্রতিবেশী সনাতনবাবুকে টাকা ধার দিলাম। বললাম—দেখুন রেশন না কিনে সেই টাকাটা আপনাকে ধার দিচ্ছি। কিন্তু দেখবেন, টাকাটা বাজে কাজে খরচ করবেন না।

জানতে পেলাম, সনাতনবাবু সেই সপ্তাহের প্রত্যেকটা দিন দুবার করে সিনেমা দেখেছেন।

ভাল কথাও অমিষ্টি করে বললে যে ফল খারাপ হয়, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। চাণক্যও সাবধান করে দিয়ে গেছেন, শুনতে অপ্রিয় মনে হবে যে-কথা, সে-কথা সত্য হলেও বলবে না। প্রাচীন কবিও উপদেশ দিয়ে রেখেছেন—শীতল বুলি বোল কর চলো, সবহি তুমহারা দেশ! মিষ্টি কথা বলো, তাহলে সব দেশেই তুমি প্রিয় হয়ে যাবে।

মিষ্টি কথার শক্তি আছেই তো। অপ্রিয় সত্য তো বলতেই নেই, প্রিয় সত্যকেও মিষ্টি করে বলতে হয়। কিন্তু এর পরেও আছে। মিষ্টি কথার যে তত্ত্ব চাণক্যও

ব্যাখ্যা করে যাননি, আর প্রাচীন কবিও শুনিয়ে যাননি, সেই তত্ত্ব জীবনে প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ পেয়েছি একবার। আমাদের ওপাড়ার সিদ্ধেশ্বরবাবুকে কথা বলতে দেখে আর শুনে আশ্চর্যই হয়ে গিয়েছি, আর বুঝতে পেরেছি, খারাপ কথাও কত মিষ্টি করে বলতে পারা যায়, আর তার ফল হয় কী চমৎকার!

সিদ্ধেশ্বরবাবুদের বহুকালের পুরনো ঝি দুদিন কাজে কামাই করেছে। ঝি বেচারীর নাতিটি হঠাৎ মারা গেছে। ঘরে বসে দুদিন কান্নাকাটি করার পর ঝি কাজ করতে এল। সিদ্ধেশ্বরবাবু জিজ্ঞেস করলেন—এ দুদিন কাজে কেন আসনি মা? কি হয়েছিল?

ঝি বলতে গিয়ে কেঁদেই ফেলে—নাতিটি মারা গেল।

সিদ্ধেশ্বরবাবু প্রায় কেঁদে ফেলতেই চেষ্টা করেন—আহা কী কষ্টের কথা!...যাক দুঃখ করো না মা, দুঃখ করে কোন লাভ নেই।

ঝি বলে—কপালে দুঃখু লেখা ছিল, তাই পেতে হলো।

সিদ্ধেশ্বরবাবু—ঠিক বলেছ মা। যাক্...দু'দিন কামাই, তার মানে হলো...মাসে পনর টাকা হলে...দু'দিনের মাইনে দাঁড়ায় আট-আনা আর আট-আনা, অর্থাৎ এক টাকা।

বেদনার্তভাবে সিদ্ধেশ্বরবাবু বলেন—তোমার এ মাসের মাইনে থেকে এক টাকা কাটা গেল মা। কিছু মনে করো না।

একটি খাঁটি মিষ্টি মুখের মানুষ হলেন সিদ্ধেশ্বরবাবু। ভুলেও কাউকে কটুকথা বলেন না। কাউকে আস্তে ধমক দিয়েও একটা কথা বলেন না।

গত বছরেও দেখেছি, তাঁর বাগানের লেবু গাছটার দিকে একদিন শান্তভাবে তাকিয়ে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। কাল রাত্রেও দেখেছিলেন যে, লেবুতে ভরে আছে গাছটা। কিন্তু আজ গাছটা শূন্য, রাত্রের মধ্যেই সব লেবু চুরি হয়ে গিয়েছে।

আস্তে আস্তে বাড়ি থেকে বের হলেন সিদ্ধেশ্বরবাবু। ঘণ্টাখানেক পরে ফিরে এসে পাশের বাড়ির নেপালবাবুকে ডাক দিয়ে হেসে হেসে বলেন,—আপনার নামে থানায় ডায়েরী করে এলাম নেপালবাবু।

নেপালবাবু চমকে ওঠেন—কেন?

সিদ্ধেশ্বরবাবু—একটাও লেবু রাখলেন না, সব উজাড় করে নিয়ে গেলেন। যাক ...তার জন্য দুঃখ নেই। ভাবতে দুঃখ হচ্ছে, পুলিশ এসে আপনার ওপর এখন উপদ্রব করবে, কি বিশ্রী ব্যাপার হবে!

এক বছর পরে মিষ্টিমুখ সিদ্ধেশ্বরবাবুকে আর একবার দেখলাম, এবং সেই দেখাই হলো শেষ দেখা।

কিছুদিন থেকে অসুখে পড়েছিলেন সিদ্ধেশ্বরবাবু। অনেক চিকিৎসাও হয়েছে। সবচেয়ে বড় ডাক্তার আর সবচেয়ে বড় কবরেজ পালা করে সিদ্ধেশ্বরবাবুকে সুস্থ করার সাধনা করলেন। অনেক টাকা খরচ হলো সিদ্ধেশ্বরবাবুর, যদিও তাঁর টাকার পুঁজি তাতে ক্ষয় হয়ে গেল না। কম করে লাখ দুই তিনি জমিয়ে ফেলেছেন, সারা

জীবনের মিষ্টিমুখের ওকালতীর জোরে।

ছেলেরা বললেন, এ রোগ সারাবার সাধ্যি ডাক্তার কবরেজের নেই। সারাবার হাত ভগবানের।

সেই সময়ে উপস্থিত হলেন সিদ্ধেশ্বরবাবুদের কুলগুরু বংশের এক সন্ন্যাসী, যাঁর নাম হলো গুরুমহারাজ।

ছেলেরা আশা করে, সিদ্ধেশ্বরবাবুর এ রোগ সারাবেন ভগবান। কিন্তু গুরুমহারাজ বললেন—এ রোগ সারিয়ে সিদ্ধেশ্বরকে একেবারে বিশবছর বয়সের স্বাস্থ্যে ফিরিয়ে আনতে পারি, আমি।

—তবে তাই করুন গুরুমহারাজ। সিদ্ধেশ্বরবাবু অনুরোধ করলেন।

গুরুমহারাজ বললেন—একটা যজ্ঞ করতে হবে। দুদিন দুরাতের যজ্ঞ।

—হ্যাঁ আর একটা কথা। গুরুমহারাজ সাবধান করে দিলেন—আর একটা কথা হলো, ডাক্তার কবরেজের ওষুধ একেবারে বন্ধ রাখতে হবে।

ছেলেরা বললেন—তাই হবে।

গুরুমহারাজ বললেন—আর একটা কথা। বাড়ির সবাই হাসিমুখ নিয়ে থাকবে। মুখভার করে কেউ থাকবে না। কেউ আক্ষেপ করে ফেললে, কিংবা কেউ দুশ্চিন্তা করে কেঁদে ফেললে, এই যজ্ঞের ফল একেবারে ব্যর্থ হয়ে যাবে। সবাই নিশ্চিন্ত হয়ে, প্রসন্নমনে সর্বদা হাসিমুখে তাকাবে, হাসিমুখে কথা বলবে।

বাড়ির সবাই বলেন—যে আজ্ঞে।

যজ্ঞের দ্বিতীয় দিনটাতেই হঠাৎ কৌতূহলের বশে সিদ্ধেশ্বরবাবুর বাড়িতে উপস্থিত হলাম। শুনতে পেয়েছিলাম, এক সন্ন্যাসীর যজ্ঞের ফলে সিদ্ধেশ্বরবাবু মুহূর্তে মুহূর্তে সুস্থ হয়ে উঠছেন, প্রায় সেরে উঠেছেন। অদ্ভুত দৈবী ক্ষমতা আছে এই সন্ন্যাসীর।

সিদ্ধেশ্বরবাবুর বাড়িতে পৌঁছে সত্যই আশ্চর্য হয়ে গেলাম। সবাই হাসছেন। কিছু জিজ্ঞাসা করলে হাসছেন, উত্তর দিতে গিয়েও হাসছেন। দেখলাম, সিদ্ধেশ্বরবাবুর দুই পুত্রবধূ হাসিমুখে সিনেমা দেখতে চলে গেলেন।

বড়ছেলে কৈলাসবাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম—আপনার বাবার শরীর এখন কেমন?

কৈলাসবাবু কোন উত্তর না দিয়ে শুধু হাসতে থাকেন। চাকরটাকে বললাম—এক গেলাস জল দাও তো, বড় তেষ্টা পেয়েছে।

চাকরটা হেসে ফেললো, এবং একটু পরে ফিরে এসে হাসিমুখে বললো—জল নিন দাদাবাবু।

দেখে খুশি হলাম, এবং আশ্চর্যও হলাম। শুনতে পেলাম, ছাদের ওপর গুরুমহারাজ গম্ভীর স্বরে মন্ত্র উচ্চারণ করছেন। মাঝে মাঝে খুব জোরে এক একটা শব্দ বেজে উঠছে—ওং শময় শময়!……এধি এধিঃ!…স্বাহা স্বাহা!

পোড়া ঘি-এর গন্ধে ঘরের বাতাস থমথম করছে। আস্তে আস্তে এগিয়ে সিদ্ধেশ্বরবাবুর ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ভেতরে উঁকি দিলাম।

একটা বিছানার ওপর উঁচু বালিসে মাথা রেখে শুয়ে রয়েছেন সিদ্ধেশ্বরবাবু। নীরব ও নিশ্চল, চোখ দুটিও বন্ধ। ঘুমিয়ে রয়েছেন সিদ্ধেশ্বরবাবু। আরও আশ্চর্য লাগলো, এক সারি পিঁপড়ে খাটের পায়া বেয়ে বিছানার ওপরে উঠেছে। অনেকগুলি পিঁপড়ে থোকা-থোকা হয়ে জমে রয়েছে সিদ্ধেশ্বরবাবুর সেই চিরকালের মিষ্টিমুখের ওপর।

হাসতে হাসতে কৈলাসবাবু এসে বলেন—দেখা হলো ?

আমার উত্তর শোনার আগেই কৈলাসবাবু তাকালেন সিদ্ধেশ্বরবাবুর মুখের দিকে। তারপরেই চেঁচিয়ে উঠলেন—পিঁপড়ে কেন ? কি সর্বনাশ, এত পিঁপড়ে কেন ?

ছুটে আসেন মেজছেলে ভুবন, ছুটে আসে চাকর। এক এক করে সবাই ছুটে আসতে থাকে।

মিষ্টিমুখের বাড়িতে হাসিমুখের মেলার মধ্যে কান্নার চিৎকার বেজে উঠবার আগেই সরে গেলাম।

পথে নেমেই মনের ভেতরে কেমন একটা ভয় ধরিয়ে বিশ্রী একটা প্রশ্ন ছটফট করতে লাগলো—বেশি মিষ্টিমুখ হলে মুখে আবার পিঁপড়েও ধরে নাকি ?

স্ব স্ত্য য় ণ

পাহাড় পরেশনাথের পায়ের কাছ থেকে ঢালু ধ'রে ধ'রে আমলকির বন যেখানে এসে শেষ হয়েছে, সেখানে বেশ ঘন ছায়া জমিয়ে দাঁড়িয়ে আছে শিশু আর সেগুনের ছোট একটা ভিড়, তারই পাশে দাঁড়িয়ে আছে হলদে রঙের ডাকবাংলো; এবং এই ডাকবাংলোরই হাতার লতা-জড়ানো বেড়ার কাছাকাছি এসে বাঁ দিকে ঘুরে গিয়েছে কাঁকর-ছড়ানো গিবিডি রোড।

ছোট ডাকবাংলো! বারান্দায় দাঁড়ালে দেখা যায়, পরেশনাথের পাথুরে মাথা জড়িয়ে একটা কালো মেঘ ধোঁয়াটে হয়ে ঝুলছে। বৃষ্টি হবে বোধহয়।

বাংলোর মধ্যে পাশাপাশি মাত্র চারটি কামরা, তিনটি কামরাই খালি। শুধু একটি কামরার দরজার কড়াতে, আজ তিনদিন হল, সুতো দিয়ে বাঁধা কার্ড ঝুলছে। কার্ডের উপর লাল পেন্সিলে লেখা—মিস্টার অ্যাণ্ড মিসেস চক্রবর্তী।

কিন্তু বৃষ্টি হল না। আজ তিনদিন হল রোজ সকালে যেমন হয়, আজ সকালেও তেমনি, হঠাৎ ঝড়ের হাওয়া ছুটতে আরম্ভ করে, মেঘের ঘোর কেটে যায়, আর ঝলক দিয়ে রোদ ছড়িয়ে পড়ে আমলকির বনের উপর। যেমন এই তিনদিন, তেমনি আজও বেড়াতে বের হয়ে যান মিস্টার অ্যাণ্ড মিসেস চক্রবর্তী। অর্থাৎ, এন চক্রবর্তী ও তাঁর স্ত্রী স্বস্তিকা চক্রবর্তী।

বাংলোর গাড়ি-বারান্দা থেকে ছুটে বের হয়ে যায় চক্রবর্তী-দম্পতির মোটর গাড়ি, নতুন মডেলের একটি ঝকঝকে টুরার। গাড়ির নম্বর হল পাঞ্জাব জলন্ধরের একটি নম্বর।

ড্রাইভার এই সময় বাংলোর খানসামার ঘরে খাটিয়ার উপর পড়ে ঘুমোতে থাকে। গাড়ি ড্রাইভ করেন স্বয়ং এন চক্রবর্তী। স্বামীর পাশে, স্বামীর সঙ্গে বড বেশী গা ঘেঁসে বসে থাকে স্বস্তিকা চক্রবর্তী। স্বস্তিকার মাথাটা সুন্দর একটি নেট জড়ানো খোঁপা নিয়ে আধভাঙা বোঁটার ফুলের মত এলিয়ে পডে এন চক্রবর্তীর কাঁধের উপর।

গাড়ি চালান এন চক্রবর্তী, কিন্তু গাড়ি থামে স্বস্তিকা চক্রবর্তীর ইচ্ছায়। পৃথিবীর বুকের উপর এমন একটি ভাল জায়গায় এসে কিছুক্ষণ থামতে আর থাকতে চায় স্বস্তিকা, যেখানে আরও অবাধ স্বাচ্ছন্দ্যে নিজেকে স্বামীর বুকের কাছে আরও আপন করে দিতে পারা যায়।

এন চক্রবর্তী হঠাৎ গাড়ির স্পীড মৃদু করে দিয়ে বলেন, এই তো একটা ভাল জায়গা, এর চেয়ে নির্জন জায়গা আর হতে পারে না স্বস্তি।

স্বস্তিকা বলে : ধেৎ!

এন চক্রবর্তী আশ্চর্য হন : ধেৎ কেন ?

স্বস্তিকা : দেখছ না একটা রাখাল ছোঁড়া গাছটার তলায় ঘুমিয়ে রয়েছে।

এন চক্রবর্তী : তাতে কি হয়েছে ?

স্বস্তিকা : না, এখানে থেমে কোন লাভ হবে না। এর চেয়ে বরং ডাকবাংলো-টাই ঢের বেশী ভাল জায়গা। চল, ফিরে যাই।

এই হল এন চক্রবর্তীর আর স্বস্তিকা চক্রবর্তীর বেড়াতে যাওয়া আর বেড়িয়ে আসা। এবং এই ছোট হলদে রঙের ডাকবাংলোটাও সত্যিই বেশ ভাল জায়গা। তাই তো মাত্র এক ঘণ্টার জন্য থাকতে এসে এই ডাকবাংলোতে তিন দিন ধরে থেকেই গিয়েছে দুজনে। স্বস্তিকার ইচ্ছা, আরও কটা দিন থেকে যেতে হবে। তিনটি কামরাই খালি, ডাকবাংলোর বুক জুড়ে বড় সুন্দর আর বড মিষ্টি একটা নির্জনতা যেন থমথম করে। বারান্দার উপর পড়ে আছে একটি মাত্র চেয়ার এবং ওই এক চেয়ারের উপর স্বামীর সঙ্গে ইচ্ছামত আর যেমন খুশি তেমনি করে বসে থাকতে পারে স্বস্তিকা। কোন বাধা নেই। ঘণ্টা না বাজালে খানসামাও কখনো হঠাৎ এদিকে এসে পডে না।

আজ তিন দিন হল যেমন রোজ সকালে তেমনি আজও সকালে বেড়িয়ে ফিরে আসেন এন চক্রবর্তী ও স্বস্তিকা, স্বামী আর স্ত্রী, জলন্ধরের সবচেয়ে বেশি নামকরা সার্জন এন চক্রবর্তী ও লুধিয়ানার সবচেয়ে বড ফার্মাসির মালিক এস ভট্টাচার্যের শ্যালিকার মেয়ে স্বস্তিকা।

আজ মাত্র এক মাস হল বিয়ে হয়েছে স্বস্তিকার। যে বয়সে বিয়ে হলে ভাল হয়, তার চেয়ে বেশ একটু বেশি বয়স হয়েছে স্বস্তিকার। স্বস্তি পেয়েছে, ধন্য হয়েছে, সুখী হয়েছে স্বস্তিকার জীবন। মনে হয়েছে স্বস্তিকার, আট বছর ধরে লুধি-য়ানাতে এসে লুকিয়ে পডে-থাকা জীবনের একমাত্র আশা এতদিনে সফল হয়েছে। ব্যর্থ হয়নি তার বয়সের প্রতীক্ষা।

ডাকবাংলোর বারান্দার উপর উঠেই স্বস্তিকার এতক্ষণের উল্লাস-চঞ্চল দুটি চোখের দৃষ্টি হঠাৎ অপ্রসন্ন হয়ে একটি কামরার বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে থাকে। কেউ একজন এসেছে। লোকটাকে একটু বেহায়া বলে মনে হয়। আরও দুটো কামরা খালি পড়ে থাকতে, লোকটা বেছে বেছে ঠিক স্বামী-স্ত্রীর মেলামেশার নীড় এই সবুজ রঙের কামরাটির পাশের কামরায় এসে ঠাঁই নিয়েছে। কার্ড ঝুলছে বন্ধ দরজার কড়াতে—পরিতোষ গাঙ্গুলী, টিম্বার মার্চেণ্ট।

এন চক্রবর্তীর চোখে কৌতুকের হাসি ফুটে ওঠে : কি ভাবছ স্বস্তি ? এ জায়গার চেয়ে সেই জায়গাটাই তো ভাল ছিল, কেমন ?

উত্তর দেয় না স্বস্তিকা। এন চক্রবর্তী হেসে ফেলেন : আর ক'দিন এখানে থাকতে চাও ?

স্বস্তিকার মনের অপ্রসন্নতা যেন ঝংকার দিয়ে বেজে ওঠে : আর এক মিনিটও না।

পাশের কামরার বন্ধ দরজা হঠাৎ খুলে যায়। দু'বার জোরে জোরে গলা কেশে দরজার বাইরে এসে দাঁড়ান এক ভদ্রলোক। সিল্কের গেঞ্জি গায়ে, পায়ে হরিণের চামড়ার চটি, তাঁতের ধুতি পরা এক ভদ্রলোক।

কে জানে কেন, বোধহয় আলাপ করার জন্য ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে এসেছেন ভদ্রলোক। কিন্তু বের হয়েই থমকে গিয়েছেন। কোন কথা বললেন না ভদ্রলোক। স্বস্তিকার মুখের দিকে কিছুক্ষণ অপলক চোখে তাকিয়ে রইলেন, তার পরেই মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বোধহয় পরেশনাথের চূড়ায় আলো ঝলসানো রূপ আরও ভাল করে দেখবার জন্য বারান্দার ওই প্রান্তে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন, টিম্বার মার্চেণ্ট পরিতোষ গাঙ্গুলী।

এক হাত দিয়ে এন চক্রবর্তীর একটা হাত বড় বেশি শক্ত করে আঁকড়ে ধরে থাকে স্বস্তিকা। আস্তে আস্তে বলে : ঘরের ভেতর চল।

এন চক্রবর্তী আবার হাসেন : কি হল ?

স্বস্তিকা বলে : না, সত্যিই আর এক মিনিটও না। চল, এখুনি এখান থেকে সরে পড়ি।

এন চক্রবর্তী : এখুনি মানে আজকের দিনটা কাটিয়ে কাল সকালে, এই তো ?

স্বস্তিকা ছটফট করে ওঠে : না না, এখুনি, এইমাত্র চলে যেতে হবে। ড্রাইভারকে ডাক, জিনিসপত্র গাড়িতে তুলুক। খানসামাকে ডেকে বিল চুকিয়ে দাও।

ঘরের ভিতরে ঢুকে ঝুপ করে একটা চেয়ারের উপর বসে পড়েন এন চক্রবর্তী। মুখের পাইপে ছোট ছোট টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়েন, মাঝে মাঝে শিস দেন আর পা দোলাতে থাকেন।

ঘরের ভিতরেও ওই একটি মাত্র চেয়ার। এই চেয়ারে স্বামীর সঙ্গে গা ঘেঁসে বসবার জন্য দু'পা এগিয়ে যাবার আগেই স্বস্তিকার পা দুটো যেন টলে ওঠে। দরজার কপাট বন্ধ করে দিয়ে, বন্ধ কপাটের উপর পিঠ ঠেকান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, যেন

শ্রান্ত ক্লান্ত ও ভীত দেহের আলস্যভার কোন মতে সামলে রাখবার চেষ্টা করছে স্বস্তিকা।

এন চক্রবর্তী বলেন: কিন্তু আমার যে আজই সন্ধ্যায় একবার গিরিডি পর্যন্ত দৌড়ে আসবার কথা।

শিউরে ওঠে স্বস্তিকার চোখের পাতা: হঠাৎ গিরিডিতে কিসের দরকার হ'ল?

এন চক্রবর্তী: আমার বন্ধু লেফটেন্যাণ্ট জয়সোয়ালের বিয়ে।

স্বস্তিকা আতঙ্কিতের মত চেঁচিয়ে ওঠে: না, না, আমি একা থাকতেপারব না।

এন চক্রবর্তী: তা হলে তুমিও চল।

স্বস্তিকা: না, না, তুমি তো জানই যে আমি লোকজনের ভিড় সহ্য করতে পারি না, তবে মিছিমিছি কেন ওসবের মধ্যে আমাকে যেতে বলছ?

এন চক্রবর্তী: কিন্তু···।

স্বস্তিকা: কিন্তু-টিন্তু কিছুই নেই। এখান থেকে এখুনি সোজা ফিরে চল জলন্ধরে। আমি তোমাকে আগেই বলেছিলাম, এদিকে বেড়াতে এসো না, ঈস্ট ইণ্ডিয়া আমার মোটেই ভাল লাগে না।

—এটা একটা নতুন কথা বটে, এই প্রথম শুনলাম। হাসি-মুখে স্বস্তিকার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে তারপর হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে থাকেন এন চক্রবর্তী এবং বোধহয় ভাবতে থাকেন, স্বস্তিকার মনে তা হলে আরও একটা বাতিক আছে। বিয়ে হবার পর এই এক মাসের মধ্যে স্বস্তিকার মন আর মেজাজের অনেককিছু জানবার সঙ্গে সঙ্গে এন চক্রবর্তী শুধু এইটুকুই জেনেছেন যে, লোকের চোখের দৃষ্টি সহ্য করতে পারে না স্বস্তিকা। ভিড়ের চোখের সামনে পড়লেই ছটফট করে স্বস্তিকা, লোকের চোখের দৃষ্টি সত্যিই যেন ওর গায়ে বিঁধছে। অনেক ঠাট্টা করেও স্বস্তিকার মনের এই বাতিক আজও সারাতে পারেননি এন চক্রবর্তী।

—বড় বেশি তাড়াতাড়ি করতে বলছ, স্বস্তি। এখন মাত্র সকাল নটা, না খেয়ে-দেয়ে এখুনি রওনা হলে—।

স্বস্তিকার মুখের দিকে তাকিয়েই একটু চমকে ওঠেন এন চক্রবর্তী। ভয়-পাওয়া রোগীর চোখের মত চোখ, স্বস্তিকা অদ্ভুত চোখের দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে আছে তারই মুখের দিকে।

—কি? জ্বর-টর হল নাকি?

—জ্বরের মতনই লাগছে। খুব মাথা ধরেছে।

—তাই বল। শুয়ে পড় এখুনি। আমি মনে করলাম, তুমি তোমার মনের বাতিকে ওই একটা বাজে লোকের তাকানিতে রাগ করে আর ভয় পেয়ে একেবারে একটা···ইয়ে হয়ে গেলে—বুদ্ধিসুদ্ধি হারিয়েই ফেললে।

আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে, তারপর শরীরটাকে যেন ঝুপ করে হঠাৎ একটা আছাড় খাইয়ে বিছানার উপর শুয়ে পড়ে স্বস্তিকা। আঁচলটা টেনে মুখের উপর আলগা করে ছড়িয়ে দেয়। কী ভয়ানক সত্য কথা স্বস্তিকার স্বামী এন চক্রবর্তীর

মুখে নতুন একটা আদালতের রায়ের মত ধ্বনিত হয়েছে। ওই লোকটা সত্যই যে সেই বাজে লোকটা, আট বছর আগে যে লোকটা স্বস্তিকার মুখের দিকে শেষবারের মত তাকিয়েছিল। সেই রকম সিল্কের গেঞ্জি, সেই রকম তাঁতের ধুতি, আর সেই ধরনের হরিণের চামড়ার চটি। আট বছরের মধ্যেও কোন অপঘাতে মরে যায়নি লোকটা।

কেমন করে এখানে এল লোকটা? লোকটা কি দৈববাণী শুনেছিল যে, আলিপুরের সেই দোতলা বাড়ির মেয়েকে একদিন এই হলদে রঙের ডাকবাংলোর ভিতরে পাওয়া যাবে?

মাটির একটা রঙিন পুতুলকে যত সহজে গুঁড়ো করে আর ধুলো করে দিতে পারা যায়, আজ স্বস্তিকার এই সুখের জীবনকে তার চেয়েও সহজে ধুলো করে দিতে পারে লোকটা। তার জন্য স্বস্তিকার গায়ে একটা টোকা দিতেও হবে না। শুধু কয়েকটা কথা এন চক্রবর্তীর কানের কাছে বলে দিয়ে চলে গেলেই হল। আট বছর আগের আলিপুর দায়রা-জজের আদালতের একটি মামলার রায়। বাস্, তার পর মুখের উপর থেকে এই আঁচল সরিয়ে তাকালে স্বামীকে এই ঘরের মধ্যে আর কি দেখতে পাবে স্বস্তিকা? এই বিছানার উপর স্বস্তিকাকে এই ভাবেই একটা দুঃস্বপ্নের দুঃসহ ক্লেদের মত ফেলে রেখে এন চক্রবর্তী তাঁর ট্রাংক নিয়ে ছুটে চলে যাবেন জলন্ধর।

আসছে বোধহয়, হরিণের চামড়ার চটি বাংলোর বারান্দার উপর উল্লাসের শব্দ করে ছটফটিয়ে ছুটে আসছে। সেই শব্দ শুনে স্বস্তিকার কানের কাছে ঘাম হয়ে ফুটে উঠেছে শরীরের ভয়ার্ত রক্তের কণাগুলি।

স্বস্তিকার আঁচল-ঢাকা মুখটা আস্তে একবার ফুঁপিয়ে ওঠে। হাতের বইয়ের উপর থেকে চোখ তুলে স্বস্তিকার দিকে তাকিয়ে এন চক্রবর্তী বলেন: ঘুমোবার চেষ্টা কর স্বস্তি। বেশ ভাল একটা স্বপ্ন দেখলে সব সেরে যাবে।

না, কেউ এল না। বন্ধ দরজার কড়া শব্দ করে বেজে উঠল না। বোধহয় আর একটু পরেই আসবে। অসহায়ের মত সব পরিণাম দৈবের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিয়ে শান্ত হতে চেষ্টা করে স্বস্তিকা, এবং ঘুমোতেও চেষ্টা করে। ঘুম আসে না, কিন্তু আট বছর আগের সেই ঘটনার ছবিগুলি যেন টুকরো টুকরো স্বপ্নের মত চোখের উপর ভাসতে থাকে।

পরিতোষ গাঙ্গুলী নয়, ওর নাম হল রতন গাঙ্গুলী। পুরনো নাম ফেলে দিয়ে নতুন নামের আড়ালে জীবনটাকে লুকিয়ে বোধহয় পৃথিবীর এই দিকের গোপন আনাচে-কানাচে ঘোরাফেরা করে লোকটা।

স্বস্তিকা নামটাও যে নিতান্ত নতুন একটা নাম, নামটার বয়স আট বছরের বেশী নয়। আট বছর আগের সেই আলিপুরের দোতলা বাড়ির মেয়ে রেবা মজুমদারই নতুন নামের আবরণ জীবনের উপর জড়িয়ে নিয়ে আর স্বস্তিকা মজুমদার হয়ে লুধিয়ানার মেসোমশাইয়ের বাড়িতে এতদিন ছিল। মাত্র এক মাস হল স্বামীর

পাশে দাঁড়াবার পর স্বস্তিকা মজুমদার হয়েছে স্বস্তিকা চক্রবর্তী।

আলিপুরের সেই দোতলা বাড়ির মামা-মামীর আদরে বেশ ভালই তো কাটছিল বাপ-মা-মরা মেয়ে রেবা মজুমদারের জীবন।

বাইশ বছর বয়সের সব অহংকার আর কল্পনা নিয়ে গান গেয়ে গেয়ে আর বি.এ. ফাইন্যালের পড়া পড়ে পড়ে, মুখটাকে সুন্দর করে রাঙিয়ে আর শরীরটাকে নানা ছাঁদে সাজিয়ে সুখের দিনগুলি তরতর করে পার হয়ে যাচ্ছিল। তার পরেই হঠাৎ সেই ঘটনা।

ঘরের ভিতরের নীরব স্তব্ধতাকে সন্দেহ করে চমকে ওঠে আর ধড়ফড় করে বিছানার উপর উঠে বসে স্বস্তিকা! লোকটা কি সত্যিই এরই মধ্যে ঘরের ভিতরে এসে এন চক্রবর্তীর কানে কানে সেই হিংস্র গল্পটা ফিসফিস করে শুনিয়ে দিয়ে চলে গিয়েছে?

না, আসেনি লোকটা। দেখতে পায় রেবা, এন চক্রবর্তী তেমনি মন দিয়ে বই পড়ছেন, আর দরজাটা তেমনি বন্ধ আছে। কিন্তু বুঝতে পারে না রেবা, রেবার উপর প্রতিশোধ না নিয়ে থাকতে পারবে কেমন করে ওই রতন গাঙ্গুলী?

কল্পনা করতে পারে রেবা, এই ঘরের দরজার বাইরে বারান্দার উপর এখন পা টিপে-টিপে ঘুরছে প্রতিশোধের একটা কঠোর প্রতিজ্ঞা। এন চক্রবর্তী এই ঘরের বাইরে যাওয়া মাত্র ওই প্রতিজ্ঞা হেসে হেসে এগিয়ে এসে এন চক্রবর্তীর কানের কাছে সেই রাক্ষুসে ঘটনার গল্পটা বলে দেবে। এই ঘরের ভিতরে আসবার দরকার হয় না, রেবার জীবনের ভালবাসার মানুষটাকে শুধু একটু একা আর আড়ালে পেতে চায় রতন গাঙ্গুলী।

এন চক্রবর্তী বই বন্ধ করে উঠে দাঁড়ান।

চেঁচিয়ে ওঠে রেবা: কোথায় যাচ্ছ তুমি?

এন চক্রবর্তী: যাই, ড্রাইভারকে বলে দিয়ে আসি, গাড়ির ইঞ্জিনটাকে একটু ভাল করে চেক করে রাখুক।

রেবা: না, যেতে হবে না। কখ্খনো যেও না।

এন চক্রবর্তী আশ্চর্য হন: তার মানে?

রেবা: তুমি এখানেই আমার কাছে বসে থাক, লক্ষ্মীটি। দেখেও বুঝতে পারছ না কেন, মাথাধরাটা আমাকে কিরকম জ্বালাচ্ছে?

চেয়ারের উপর বসে আবার বই হাতে তুলে নিলেন এন চক্রবর্তী। তারপর বলেন, এতটুকু ঘুমোলে ভাল স্বপ্ন দেখা যায় না, আর মাথাধরাও ছাড়ে না।

স্বপ্ন না দেখলেও আট বছর আগের সেই জীবনকে এখন স্বপ্নেরই মত মনে হচ্ছে রেবার।

বসিরহাটের অত বড় বাড়িটা বিক্রি করে দিয়েও সব দেনার দায় মিটাতে পারেন নি মামা। বিক্রি করবার আর কিছুই ছিল না। দেউলে হয়ে গিয়ে আর বসিরহাট থেকে সবাইকে সঙ্গে নিয়ে চলে এসে আলিপুরের সেই দোতলা বাড়িতে যেদিন উঠ-

লেন মামা, সেই দিন মামী ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এত বড় বাড়ির ভাড়া আসবে কোথা থেকে আর দিন চলবেই বা কেমন করে ?

বিছানার উপর বসে বসেই টলতে থাকেন মামা। বিছানার উপরে মামার হাতের কাছে কাঠের একটা ট্রে, তার উপর হুইস্কির বোতল আর গেলাস। গেলাসে একটা চুমুক দিয়ে, আর কোলের উপর একটা বালিশ টেনে নিয়ে মামা এলোমেলো স্বরে বলতে থাকেন, আমি সুখময় চৌধুরী, আমি জানি কি করে দিন চালাতে হয়, মঙ্গলা।

চুপ করে থাকেন মঙ্গলা। সুখময় চৌধুরী আবার বলেন, আমার বাবার মুহুরী ছিল যার বাবা, ওই বিনোদ গাঙ্গুলী যদি এত স্টাইল আর চটক দেখিয়ে দিন কাটাতে পারে, তা হলে আমিই বা পারব না কেন ?

মঙ্গলা জানেন, এর মধ্যে একটা সত্য কথা বলেছেন তাঁর স্বামী। এই দোতলা বাড়ির চোখের সামনেই রাস্তার ওপারে ওই মস্ত চারতলা বাড়িতে থাকেন যে বিনোদ গাঙ্গুলী, তাঁর বাবা একদিন এই সুখময় চৌধুরীর বাপের মুহুরী ছিলেন। কিন্তু সেই গাঙ্গুলীরাই দিন দিন উঠেছে আর এই চৌধুরীরা পড়েছে। একই গ্রামে ওদের দেশ। মুহুরীর ছেলে বিনোদ গাঙ্গুলী বিলেত থেকে পাস করে এসে ত্রিশ বছর ধরে বড বড চাকরি করেছে, আর নিজের রোজগারের টাকায় এত বড বাড়ি তুলেছে। কিন্তু মুহুরীর বড-বাবুর ছেলে সুখময় চৌধুরী বাপের আমলের বাড়ি বেচে দিয়ে আর দেউলে হয়ে এই দোতলা বাড়ির ভাড়াটে হয়েছে।

প্রথম মাসটা কষ্টেই কেটেছিল। কিন্তু তারপর আর নয়। সুখময় চৌধুরী সত্যিই প্রমাণ করে দেখিয়ে দিলেন যে, এক পয়সা রোজগার না করেও স্টাইল করে থাকবার আর নিত্য হুইস্কি খাবার বিজ্ঞান তিনি জানেন। তেজবাহাদুর, ভীম বাহাদুর আর বংশীলাল—তিন চাকরের কোন চাকরকেই বিদায় দিতে হল না। নতুন রেডিও আর গ্রামোফোন কিনলেন, একটা বিলিতী কুকুরও কিনে ফেললেন। কুকুরের জন্য চৌরঙ্গীর দোকান থেকে বিস্কুট কিনে আনতে যায় ভীমবাহাদুর।

রেবা বলে, আমি তাহলে বি. এ. ফাইনালের জন্য তৈরী হই মামা।

সুখময় চৌধুরী বলেন, নিশ্চয়।

রেবার জন্য প্রাইভেট টিউটরও রেখে দিলেন মামা। প্রতি মাসে একশো টাকা নেন প্রাইভেট টিউটর।

রবিবারের সন্ধ্যায় সিনেমা ছবি দেখতে যায় রেবা। কিন্তু যেতে আসতে বড় কষ্ট হয়। মামার কাছে এসে অভিযোগ করে রেবা, ট্রাম-বাসে যাওয়া আসা করতে বড় বিশ্রী লাগে মামা।

সুখময় চৌধুরী বলেন, এবার থেকে ট্যাক্সি করে যাবি, তোর সঙ্গে যাবে তেজ বাহাদুর।

রেবা একদিন বলে, ট্যাক্সিও একটা ঝঞ্ঝাট। একটা গাড়ি কিনে ফেল না মামা ?

সুখময় চৌধুরী বলেন, এইবার কিনেই ফেলব বোধহয়।

সুখময় চৌধুরীর ডাইনে বাঁয়ে সর্বক্ষণ গেলাস-ভর্তি হুইস্কি ছলছল করে, মাথাটা সর্বক্ষণ ঝুঁকেই রয়েছে, যেন গলে গিয়েছে মেরুদণ্ডটা। এক মুহূর্তের জন্যও বাড়ির বাইরে যান না। কিন্তু এই বাড়ির সব ক্ষুধা তৃষ্ণা আর দরকারের দাবী পূর্ণ করবার জন্য তাঁর হাতের কাছে থোকা থোকা নোট এসেই যাচ্ছে। আদরের ভাগ্নী রেবার সব স্টাইলের আশা ও আবদার মিটিয়ে দিচ্ছেন সুখময় চৌধুরী।

রেবা হেসে হেসে বলে, আমি যদি বিলেত গিয়ে পড়াশুনা করতে চাই মামা?

সুখময় চৌধুরী বলেন, বেশ তো, তার ব্যবস্থাও করে দেব।

রেবা মজুমদারের জীবনের অনেক আশা ও অনেক কল্পনা মত্ত হয়ে রেবার মনটাকেও মাতিয়ে রাখে সর্বক্ষণ। এই সুখের জীবনের মধ্যে শুধু একটা উপদ্রব দিনের মধ্যে অন্তত তিন-চারবার রেবার মনটাকে দুঃসহ যন্ত্রণা দিয়ে উত্ত্যক্ত করে। সামনের চারতলা বাড়ির বিনোদ গাঙ্গুলীর ছেলে রতনের চোখের দৃষ্টি। সারা দিনের মধ্যে অন্তত একবার এই বাড়ির ভিতরে আসবেই রতন, আর অন্তত দুবার এই বাড়ির ফটকের কাছে এসে দাঁড়াবে ও চলে যাবে। ওর চোখ দুটো যেন সারাক্ষণ একটা পিপাসার রোগে ভুগছে; দিনের মধ্যে তিন-চারবার রেবা মজুমদারের সুন্দর মুখটার দিকে তাকাতে না পারলে ওর চোখের রোগের জ্বালা যেন শান্ত হয় না!

রেবা মজুমদারের মনটাও জ্বলে ওঠে! মামার উপরেও রাগ হয়। গল্প করবার জন্য পৃথিবীতে আর লোক পাননি মামা! থার্ড ক্লাস না ফোর্থ ক্লাস পর্যন্ত পড়েছে, বিদ্যা আর এগোয়নি, দু-বেলা কুস্তি আর কসরৎ করে, বেহায়ার মত রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে ভীমবাহাদুরের সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে। সন্ধ্যা হলে থিয়েটারের ক্লাবে গিয়ে কিছুক্ষণের জন্য চন্দ্রগুপ্ত হয়ে গর্জন করে। এই তো ওর মনুষ্যত্ব। এই মানুষের সঙ্গে গল্প করে মামা কী যে আনন্দ পান কে জানে!

বারান্দার সামনে এক টুকরো খোলা জমির উপর পাতাবাহারের কয়েকটা কেয়ারি, আর একটা শিউলি গাছ। সেই শিউলির কাছে নিশ্চিত মনে সন্ধ্যাবেলাটা একবার দাঁড়াতেও পারে না রেবা মজুমদার। দেখতে পায় রেবা, ঠিকই, আর কেউ নয়, সেই রতনই ফটক পার হয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে বারান্দায় উঠল, আর সোজা মামার ঘরের দিকে চলে গেল। তাঁতের ধুতি, পায়ে হরিণের চামড়ার চটি, গায়ে শুধু একটা সিল্কের গেঞ্জি; ভদ্রতাসম্মত একটা জামাও পরতে ভুলে গিয়েছে ওই অশিক্ষিতটা। যেন এই বাড়িরই কত আপনজন। স্বচ্ছন্দে আসে আর স্বচ্ছন্দে চলে যায়।

রেবার সঙ্গে কথা বলতে কোনদিন ভুলেও সাহস করেনি রতন। যদি সে সাহস কোন দিন করে রতন, তবে রেবাও কি করবে সেটা মনে মনে জেনেই রেখেছে রেবা। তখুনি ভীমবাহাদুরকে ডেকে বলে দেবে রেবা, এই ভদ্রলোক কী বলছেন শোন।

কিন্তু ভীমবাহাদুরকে ডাকবার দরকার হয়নি এখনো। মুখে নয়, রতনের চোখেই যত দুঃসাহস। অযোগ্যের আকাঙ্ক্ষার লোভ; গাছের অনেক উপরের একটা ফোটা শিউলির দিকে শুধু লুব্ধভাবে তাকিয়ে থাকার মত মূর্খতা। যেন শুধু ওরকম করে

তাকালেই দয়া করে সেই শিউলি টুপ করে ওর বুকের উপর ঝরে পড়বে। কী যন্ত্রণা! রেবার মুখের দিকে রতন তাকালেই মুখ ফিরিয়ে নেয় রেবা। রেবা মজুমদারের সব কল্পনার অহঙ্কারে শেষ পর্যন্ত ঘেন্না ধরিয়ে দেবে এই লোকটার ওই বিশ্রী আশার দৃষ্টি। নিরেট একটা লিপ্সা যেন রেবার সুন্দর মুখের আর শিক্ষিত রুচির মান-সম্মান ধ্বংস করবার জন্য সব সময় সুযোগ খুঁজছে। রতন গাঙ্গুলীর ছায়ার দিকে তাকাতেও ঘেন্না করে রেবার।

রেবা জানে না, মামা সুখময় চৌধুরী রেবার বোঝবার অনেক আগেই বিনোদ গাঙ্গুলীর ছেলে রতনের ওই চোখের আশা আর ইচ্ছাকে বুঝে ফেলেছেন। অশিক্ষিত রতনের চোখের সেই লুব্ধতা ও মুগ্ধতা, সেই আশা ও ইচ্ছার সুযোগ নিতে একটুও দেরি করেননি বসিরহাটের দেউলে জমিদার সুখময় চৌধুরী, হুইস্কির লোভে স্যাঁত সেঁতে হয়ে যাঁর জীবনের মেরুদণ্ড গলে গিয়েছে। তাই রতন গাঙ্গুলীর হাত থেকে থোকা থোকা নোট আর থলিভরা টাকা পেয়েই যাচ্ছেন সুখময় চৌধুরী। এই তিন মাসের মধ্যে একটি বারের মতও 'না' করেনি রতন।

তোয়ালে তুলে ভেজা ঠোঁট মুছে নিয়ে সুখময় চৌধুরী বলেন, আমার জীবনে টাকার আর কী দরকার! আমি তো একরকমের সন্ন্যাসী হয়েই গিয়েছি। রেবার জন্যই বলছি। সাজতে ভালবাসে মেয়েটা, সাজলে মানায়ও সুন্দর। অন্তত হাজার পাঁচেক পেলে রেবার জন্য একটা জড়োয়া সেট অর্ডার দিতে পারি।

রতন বলে, কবে টাকা পেলে চলতে পারে?

সুখময় চৌধুরী: আজই দাও না।

রতন বলে, অন্তত একটা দিন সময় পেলে ভাল হয়।

সুখময় চৌধুরী: বেশ, তাহলে কালই এসে টাকাটা দিয়ে যাবো।

প্রায় প্রতিদিনই, সুখময় চৌধুরীর চোখের সামনে এসে বসে এই রকম গল্প শোনে চারতলা বাড়ির ছেলে রতন গাঙ্গুলী। গল্প শুনতে একটু ভয়-ভয়ও করে রতনের। কিন্তু গল্পের মধ্যে রেবার দরকারের দাবীটা মুখ খুলে বলে ফেললেই সেই গল্প রূপকথার মত মিষ্টি হয়ে যায়। এই তিন মাসের মধ্যে যতবার যত টাকা চেয়েছেন সুখময় চৌধুরী, ততবার তত টাকা এনে দিয়েছে রতন।

এর পরেই সেই সন্ধ্যা, কী সুন্দর বাতাসে ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল বৈশাখের সেই সন্ধ্যাটা! রেবা মজুমদার তার একলা ঘরের নিভৃতে বসে এসরাজ বাজিয়ে গান করে। বাড়ির পিছনের পাঁচিলের গায়ে হেলান দিয়ে বসে ভাং খায় আর গলা ছেড়ে হল্লা করে ভীমবাহাদুর ও তেজবাহাদুর। চৌধুরী-গৃহিণী মঙ্গলা আছেন তাঁর পূজার ঘরে। আর বাইরের ঘরে সুখময় চৌধুরীর সঙ্গে গল্প করে রতন।

রতন কুণ্ঠিতভাবে বলে, এত টাকা?

সুখময় চৌধুরী চেঁচিয়ে বলেন, হ্যাঁ হ্যাঁ এত টাকাই লাগবে। ওর কমে হয় কি করে?

রতন: রেবা কি সত্যিই বিলেতে গিয়ে পড়াশুনা করতে চায়?

—তাই তো ওর ইচ্ছে। কিন্তু তার জন্যে আমাকেও তো এখন থেকেই টাকার যোগাড় করে রাখতে হবে।

—আমার মনে হয়, রেবার বিলেতে যাবার কোন দরকার নেই।

—হয়তো দরকার নাও হতে পারে। কিন্তু টাকাটা আমার চাই।

—আমার ইচ্ছা…।

—কি তোমার ইচ্ছা ?

—অর্থাৎ আপনারই ইচ্ছা, অর্থাৎ আপনি সেই যে বলেছিলেন, আমার সঙ্গে রেবার বিয়ে দিতে চান, সে ব্যাপারে আর দেরি না হওয়াই ভাল।

—আহা! সে ইচ্ছে তো আছেই, এবং আমার সেই ইচ্ছে পূর্ণও করব একদিন। কিন্তু এই টাকাটা আমার অবিলম্বে চাই।

—এত টাকা কোথা থেকে পাব বুঝতে পারছি না।

—একটু ভেবে দেখ রতন, রেবার মত মেয়ে তোমার স্ত্রী হবে। স্ত্রীরত্নই হল রত্ন, এর কাছে ওই কটা টাকা কত তুচ্ছ জিনিস বল তো ?

—কিন্তু আমি যে বাবার কাছে ধরা পড়ে গিয়েছি চৌধুরীমশাই, আর টাকা পাওয়ার পথ বন্ধ।

—তাই নাকি ? কি বললেন বিনোদবাবু ?

—বাবা বললেন, তুমি আমার সই জাল করে চেক কেটে ব্যাঙ্ক থেকে যে এতগুলি টাকা সরিয়েছ, তার জন্যে খুব বেশী দুঃখ করি না। কিন্তু বুঝতে পেরেছি, তুমি নিশ্চয় কোন খারাপ স্ত্রীলোকের সংসর্গে পড়ে লম্পট হয়েছ। বলতে বলতে কেঁদে ফেলেছেন বাবা।

সুখময় চৌধুরী মুখ বিকৃত করে হাসেন: বিনোদটা ওই রকমই একটা অসভ্য।

ছ্যাঁক করে যেন চমকে ওঠে রতনের চোখ: বাবার সম্পর্কে ওরকম করে কথা বলবেন না চৌধুরীমশাই।

সুখময় চৌধুরী বলেন, আমি কিছুই বলতে চাই না, শুধু জানতে চাই টাকাটা কবে পাব।

রতন: আমার পক্ষে এত টাকা দেওয়া আর সম্ভব হবে না চৌধুরীমশাই।… কিন্তু একটা উপায় হতে পারে।

—বল কী উপায় ?

—আপনি যদি রেবাকে সঙ্গে নিয়ে বাবার কাছে একবার যান, আর দরকারের কথাটা একটু বুঝিয়ে বলতে পারেন, তবে বোধহয়…।

ক্রুদ্ধ বিড়ালের মত কিছুক্ষণ রতনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন সুখময় চৌধুরী। তারপরেই ফ্যাঁস করে চেঁচিয়ে ওঠেন, তোমার বাবা আমাকে টাকা দেবে ? আমার কথা বিশ্বাস করবে তোমার বাবা ? বিনোদ গাঙ্গুলী কি সেই কাঁচা লোক ? সে মুহুরীর বাচ্চাকে কি আমি চিনি না ?

রুষ্ট চিতাবাঘের মত লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায় রতন। এক থাবা দিয়ে সুখময়

চৌধুরীর গলা টিপে ধরবার জন্য হাত বাড়ায়।

চিৎকার করেন সুখময় চৌধুরী : জলদি আও ভীমবাহাদুর, তেজবাহাদুর! শালা আমাকে খুন করে ফেলেছে।

খোলা ভোজালি হাতে নিয়ে ছুটে আসে ভীমবাহাদুর আর তেজবাহাদুর। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে রতন। সুখময় চৌধুরীর মুখটা কাঁপতে কাঁপতে বীভৎস হয়ে ওঠে।

—মুহুরীর বাচ্চার বাচ্চা এই হতভাগা আমার গলা টিপে ধরতে চায়! বলতে বলতে হুইস্কির বোতল হাতে তুলে নিয়ে রতনের কপালের উপর প্রচণ্ড এক আঘাত আছড়ে দিলেন সুখময় চৌধুরী। ঝঙ্কার দিয়ে চূর্ণ হয়ে ছড়িয়ে পড়ে ভাঙা বোতলের কাঁচ। রতনের কপালে আঁকা-বাঁকা একটা ফাটলের রেখা ভেদ করে ফুটে উঠতে থাকে রক্তের বুদ্বুদ।

হাত দিয়ে কপাল টিপে ধরে ঘরের ভিতর থেকে ছুটে বের হয়ে যায় রতন। কিন্তু ফটক পর্যন্ত পৌঁছবার আগেই, শিউলির কাছে এসে হঠাৎ কাটা গাছের মতই আস্তে আস্তে হেলতে হেলতে মাটির উপর পড়ে যায়।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখতে থাকেন সুখময় চৌধুরী। তাকিয়ে থাকে ভীমবাহাদুর আর তেজবাহাদুর। এসরাজ ফেলে ছুটে এসে বাইরের ঘরের জানলার কাছে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে রেবা মজুমদার।

সুখময় চৌধুরীর কুঁজো শরীরটা থরথর করে কাঁপতে থাকে। তারপরেই ভয়ানক কর্কশস্বরে চেঁচিয়ে ওঠেন সুখময় চৌধুরী, মরে গিয়েছে শালা।

ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে একটা ভিড় তাকিয়ে দেখতে থাকে, শিউলির কাছে রক্তমাখা-মাথা একটা মানুষ পড়ে আছে। চেঁচিয়ে ওঠে ভিড়ের লোক, পুলিস, পুলিস! খুন খুন!

ছুটে ঘরের ভিতর ঢুকে পড়েন সুখময় চৌধুরী। সিরসির করে কাঁপতে থাকে কুঁজো শরীরের পাঁজরা। ভূতের ভয়ে আতঙ্কিত ছোটছেলের মত চিৎকার করে ওঠেন সুখময় চৌধুরী, রেবা! রেবা!

রেবা কাছে এসে দাঁড়ায় : কি হল মামা?

ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আর ঠক ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে সুখময় চৌধুরীর বুকের ভিতর থেকে যেন একটা আধমরা প্রাণ হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, আর রক্ষে নেই রেবা। বিনোদ গাঙ্গুলী আমাকে ফাঁসিতে না ঝুলিয়ে ছাড়বে না।

আতঙ্কে চেঁচিয়ে ওঠে রেবা, কি সর্বনেশে কথা বলছ মামা?

সুখময় চৌধুরী : রতন গাঙ্গুলীকে মেরেছি; মরেই গিয়েছে বোধহয়। কিন্তু আমি বাঁচব কি করে?

রেবা : কি করেছিল লোকটা?

ফটকের কাছে পুলিসের লরি এসে থেমেছে। জানলা দিয়ে উঁকি দিয়ে তাকিয়ে পুলিসের মূর্তি দেখতে পেয়েই সুখময় চৌধুরীর কুঁজো শরীরটা যেন এক বিভীষিকার

ভয়ে টলতে টলতে দেয়ালের কোণের দিকে হেলে পড়তে থাকে। কিন্তু সামলে নেন। দেয়াল ধরে কোন মতে দাঁড়িয়ে থাকেন সুখময় চৌধুরী। রেবার দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করেন : রতন তোরই সর্বনাশ করতে এসেছিল।

ভ্রূকুটি করে তাকায় রেবা : তার মানে ?

সুখময় চৌধুরী তাঁর দাঁতের কাঁপুনি সামলাতে সামলাতে বলেন : তোকে নষ্ট করতে চেয়েছিল। তাই ওকে মেরেছি।

ঠোঁটে ঠোঁট চেপে রেবা বলে : ঠিক করেছ।

—পুলিসকে এই কথা তুইও বলবি রেবা। সোজা স্পষ্ট ভাষায় কোন পরোয়া না করে বলে দিবি।

রেবা : নিশ্চয় বলব।

এগিয়ে আসছে পুলিস। শক্ত হয়ে আর দেয়াল ধরে দাঁড়িয়ে থাকে সুখময় চৌধুরীর কুঁজো শরীর। হঠাৎ ছটফট করে যেন দমবন্ধ গলাটা দীর্ণ করে ফুটে ওঠে সুখময় চৌধুরীর এক ভয়ার্ত আবেদন : শুধু এ কথা বললে আমি পার পাব না রেবা। আর একটু বাড়িয়ে বলতে হবে।

রেবা : কি বলতে হবে বলে দাও।

সুখময় চৌধুরীর ভীরু চোখের দৃষ্টিটা দপদপ করে : ওই ভয়ানক লোকটা তোকে নষ্ট করেই দিয়েছে। জোর করে, খুন করবার ভয় দেখিয়ে, তোর শরীরের সব লজ্জা আর সম্মান একেবারে শেষ করে দিয়েছে।

—তাই বলে দেব মামা। অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে হাঁপাতে থাকে রেবা।

বারান্দার উপরে পুলিসের পায়ের শব্দ। সুখময় চৌধুরী বলেন, ওই ঘরের ভিতর গিয়ে মেঝের উপর লুটিয়ে পড়ে থাক্ রেবা। শিগগির যা। মনে থাকে যেন, তোর খোঁপা ভেঙে দিয়েছে, তোর গলা টিপে দম বন্ধ করে দিয়েছে, তোর গায়ের শাড়ি লুটপাট করে সরিয়ে দিয়েছে। তুই কত কেঁদেছিস, তবু রতন তোকে ছাড়েনি।

স্বচক্ষে অনেক কিছুই দেখে নিল পুলিস, স্বকর্ণে অনেক কথা শুনে নিল। রেবা মজুমদারের সম্ভ্রমহারা সেই বিধ্বস্ত মূর্তির দিকে তাকিয়ে আর সুখময় চৌধুরীর মুখের সেই করুণ বিলাপ শুনে খুবই ব্যথিত হল পুলিস অফিসারের চক্ষু। এত বড় ভদ্র-লোকের ছেলে হয়েও যে কত বড় পশু হতে পারে, বুঝতে পেরে আশ্চর্য হয়ে গেলেন অফিসার। যেমন মামা সুখময় চৌধুরী, তেমনি ভাগ্নী রেবা মজুমদারের হাত বেশ স্বচ্ছন্দে সই করে দিল স্টেটমেণ্টে, এক মুহূর্তের জন্যও হাত কাঁপেনি।

কিন্তু মরেনি বিনোদ গাঙ্গুলীর ছেলে রতন গাঙ্গুলী। কপালের আঘাত এমন কিছু সাংঘাতিক হয়নি। ক'দিন পরে সেরে যাবার পরেও হাসপাতাল থেকে সোজা পুলিস-হাজতে চলে গেল রতন। এত বড় পাপের মামলার আসামী ওই ছেলের জামিন হতে রাজী হননি বিনোদ গাঙ্গুলী।

কী আশ্চর্য! আসামী অপরাধ অস্বীকার করল না। সব সাক্ষীর সাক্ষ্য দায়রা-জজের আদালতের সব প্রশ্নের সম্মুখে সত্য বলে প্রমাণিতও হল। একটি কথা না

বলে, একটুও বিচলিত না হয়ে, কোন আক্ষেপ প্রকাশ না করে, চার বছরের সশ্রম কারাবাসের আদেশ বরণ করে নিল রতন গাঙ্গুলী।

মামলার রায় বের হবার পর দশদিনের মধ্যেই চারতলা বাড়ি বিক্রি করে দিয়ে চলে গেলেন বিনোদ গাঙ্গুলী। কোথায় চলে গেলেন কে জানে?

কিন্তু সুখময় চৌধুরীর দোতলা বাড়িরও সব জানলা সব সময় বন্ধ। বাড়ির সামনের রাস্তার উপর যখন-তখন ছোট ছোট এক-একটা ভিড় জমে ওঠে। জানলার দিকে তাকিয়ে থাকে জোড়া-জোড়া চোখের সতৃষ্ণ কৌতূহল। মামলার সেই বিচিত্র কাহিনীর নায়িকা থাকে এই বাড়ির কোন একটি ঘরে!

এ কি হল? একদিন যেন রেবা মজুমদারের মনটাই হঠাৎ ঘুম-ভাঙা শিশুর মত চমকে জেগে ওঠে আর ভয় পেয়ে চারদিকে তাকায়। জানলাগুলো কি আর এই জীবনে খোলা যাবে না? ওই চোখগুলো পথের উপর থেকে সরে যাবে কবে? জেলের চেয়েও বেশী বদ্ধ এই ঘরের বাইরের আলোতে এই মুখ নিয়ে কি দাঁড়াতে পারা যাবে? রেবার বিলেতে পড়তে যাবার কথা নিয়ে রেবার সঙ্গে আর কোন আলোচনা কেন করে না মামা? হঠাৎ এই রকম কঠিন একটা অসুখে পড়ে কেন, এবং হঠাৎ আবার পুরোহিত ডেকে প্রায়শ্চিত্ত করে কেন মামা?

মামার কাছে এসে আর একবার আবদার করে রেবা: এই বাড়ি ছেড়ে দিয়ে অন্য কোথাও গিয়ে নতুন একটা বাড়ি কিনে ফেল মামা?

কোন উত্তর দেয় না সুখময় চৌধুরী। এবং তারপর ক'টাই বা দিন? সুখময় চৌধুরীর হুইস্কিলোভী মুখ চিরকালের মত নিরুত্তর হয়ে যাবার পর, আরও কয়েকটা দিনের বর্ষার ঘোর কেটে যাবার পর হঠাৎ এক সন্ধ্যায় পুজোর ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে এসে মামী বলেন, সেদিন তুই কি যেন জানতে চেয়েছিলি রেবা?

রেবা বলে, মারা যাবার কদিন আগে মামা প্রায়শ্চিত্ত করলো কেন?

—তাহলে শুনবি সব?

—সবই শুনব মামীমা।

মামীমা সবই বলেন, এবং সবই শোনে রেবা। রেবার চোখ দুটো পাথরের চোখের মত স্তব্ধ হয়ে থাকে। জোরে নিঃশ্বাস টানতে গিয়ে যেন একটা জ্বালা গিলে ফেলে রেবা। ছটফট করে চেঁচিয়ে ওঠে রেবা. তুমি কী অদ্ভুত কথা বলছ মামীমা!

মামী বললেন, হ্যাঁ রে মেয়ে, আমি যে শেষে তোর মামার মুখ থেকে সবই জানতে পেরেছি।

বদ্ধ জানালা ঘরের ভিতর হাঁসফাঁস করে দিনগুলিকে আর খুব বেশীদিন সহ্য করতে হয়নি রেবার। কাশী চলে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন মামী, এবং যাবার আগে রেবাকে লুধিয়ানার মেসোমশাইয়ের কাছে পাঠিয়ে দেবার সময় একটি কথা বললেন, এখান থেকে তোর এখন অনেক দূরে সরে থাকাই ভাল রেবা, বাঁচতে যদি চাস।

লুধিয়ানা রওনা হবার সময় মামীকে প্রণাম করতেই রেবাকে আর একটা কথা বলেছিলেন মামী, পারিস যদি তুইও একটা স্বস্ত্যয়ন করিস রেবা।

আট বছর আগের সেই ঘটনার জ্বালা কি সত্যিই আজ স্বস্ত্যয়ন খুঁজছে? আমলকি-বনের হাওয়া জানালার পর্দা উড়িয়ে দিয়ে ঘরের ভিতর ঢুকে রেবার নেট-জড়ানো খোঁপার উপর ফুরফুর করে। চোখের পাতায় কেমন একটা ঠাণ্ডার শিহর, হাওয়া লাগলে বাসি চোখের জল যেমন স্নিগ্ধ হয়ে সিরসির করে। আস্তে আস্তে চোখ মেলে তাকায় রেবা।

এন চক্রবর্তী বলেন, বসে বসেই অনেকক্ষণ বেশ তো ঝিমোলে।

হ্যাঁ, অনেকক্ষণ বেশ ভাল করে ঝিমিয়েছে রেবা। খানসামা এসে কখন খাবার দিয়ে চলে গিয়েছে, তাও টের পায়নি রেবা। সত্যিই, একটা স্বপ্নের পাল্লায় পড়ে মনটা যেন কোথায় চলে গিয়েছিল!

এন চক্রবর্তীর খাওয়া হয়ে গিয়েছে। একটা বাজলে খাবার খেতে আর এক মিনিটও দেরী করেন না এন চক্রবর্তী, তাঁর দশ বছরের অভ্যাসের রুটিন। কিন্তু রেবা শুধু খাবারগুলোকে ছোঁয়াছুঁয়ি করে সামান্য একটু খেয়ে ব্যস্ত-ভাবে হাত ধুয়ে ফেলে।

রেবা যদি শপথ করে স্বামীর কাছে বলে যে, সেই কাহিনী হল এক স্নেহশীল মামাকে ফাঁসির মরণ থেকে বাঁচাবার জন্য এক আদুরে ভাগ্নির কতগুলি ভয়ানক মিথ্যা কথার কাহিনী, তা হলে? আদালতের সেই বিশ্বাসগুলি মিথ্যা, আর স্বস্তিকার এই কথাগুলিই শুধু সত্য, এতটা বিশ্বাস করবার মত কোন মোহ এখনো ঘনিয়ে ওঠেনি জলন্ধরের সার্জনের মনে, স্বস্তিকার মুখ দেখে যতই মুগ্ধ হোক না কেন তার চোখ। তবু ভয় করবার কিছু নেই। শুনে হয়তো, হয়তো কেন, নিশ্চয়ই করুণা করবেন স্বামী এন চক্রবর্তী। মনে করবেন, শুধু আট বছর আগে একটা ক্ষ্যাপা কুকুরের কামড়ে আহত হয়েছিল স্বস্তিকার শরীরটা। নিগৃহীতা নারীর মনের বেদনাগুলি কল্পনা করতেও পারবেন। স্বস্তিকাকে তেমনি আগ্রহে বুকের কাছে টেনে আপন করে ধরে রাখবেন। মিথ্যাই সারা সকালটা শুধু একটা মিথ্যা ভয়ে নিজেকে আতঙ্কিত করেছে, আর মাথাধরার জ্বালা সহ্য করেছে রেবা।

আর ভয় নয়, কিন্তু হঠাৎ কেমন যেন নতুন রকমের একটা ছটফটানি সহ্য করবার চেষ্টা করে রেবা। রেবার মনেরই ভিতরে যেন কিসের একটা ব্যস্ততা জেগে উঠেছে। দু-চোখের চাঞ্চল্যের মধ্যে যেন একটা ইচ্ছার বিদ্যুৎ মাঝে মাঝে ঝিক করে চমকে ওঠে। কি যেন বুঝতে চায় রেবার মন, কিসের একটা সন্দেহকে যেন নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করতে চায় রেবা।

এন চক্রবর্তী চেয়ারের উপরেই ঘাড় কাত করে চোখ বন্ধ করতে যাচ্ছিলেন। রেবা বলে: তোমাকে অনেকক্ষণ ঘরের ভেতর আটক করে রেখেছি বলে রাগ করনি তো?

এন চক্রবর্তী চোখ বড় করে তাকিয়ে আশ্চর্য হন: রাগের কোন প্রমাণ পেয়েছ না কি?

হেসে হেসে মিনতিমাখা স্বরে রেবা বলে: যাও, এখন বাইরে গিয়ে একটু বস

লক্ষ্মীটি। তোমাকে এখানে অনেকক্ষণ মিছিমিছি বসিয়ে রেখে কষ্ট দিয়েছি।

এন চক্রবর্তী: আঃ, বলছি কোন কষ্ট হয়নি।

রেবা আবার হাসে: কিন্তু ভাবতে আমার মনে কষ্ট হচ্ছে যে। অন্তত আমার মনের বাতিকটাকে খুশি করবার জন্যে ওই বারান্দাতেই কিছুক্ষণ ঘুরে ফিরে তারপর চলে এস।

পাইপ ধরিয়ে ঘরের বাইরে বারান্দার উপর এদিকে থেকে ওদিকে আস্তে আস্তে হেঁটে আর শিস দিয়ে আনাগোনা করেন এন চক্রবর্তী, রেবা যেন তার কল্পনা থেকে কুড়োনো এক সুন্দর বিশ্বাসকে একটা পরীক্ষার কাছে ইচ্ছা করেই পাঠিয়েছে। ওই তো, উৎকর্ণ হয়ে শুনতে থাকে রেবা, পাশের ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে শিস দিচ্ছে রেবার স্বামী। এই তো রতনের সুযোগ। তবু চুপ করে ঘরের ভিতরে কেন বসে আছে রতন? এখুনি ছুটে বের হয়ে রেবার স্বামীর কানের কাছে মুখ নিয়ে বলে দিচ্ছে না কেন, স্বস্তিকা নামে এই নারী হল পরপুরুষের লালসায় লাঞ্ছিত রেবা মজুমদার নামে এক নারী।

ঘরের ভিতরে ফিরে আসেন এন চক্রবর্তী। রেবার দুই চোখের তারায় অদ্ভুত এক কৌতূহলের উল্লাস জলজল করে ওঠে: দেখা হল ওর সঙ্গে?

—কার সঙ্গে?

—এই যে যিনি এই পাশের ঘরেই রয়েছেন, টিম্বার মার্চেন্টের সঙ্গে?

—হ্যাঁ।

—কি বললেন ভদ্রলোক?

—ভদ্রলোক না। অদ্ভুত লোক। কথা বলা দূরে থাক্, ভদ্রলোক একবার তাকালেনও না।

বাস্, আর কোন প্রশ্ন করবার দরকার নেই। যা সন্দেহ করেছিল রেবা, তাই সত্য হয়েছে। যে বিশ্বাস মনের মধ্যে পাওয়ার জন্য ছটফট করছিল, সেই বিশ্বাস এতক্ষণে পেয়ে গেল রেবা। রেবার স্বামীর কাছে নয়, রেবারই কাছে এসে কথা বলবার অপেক্ষায় আছে আর সুযোগ খুঁজছে রতন। এন চক্রবর্তীকে নয়, স্বস্তিকা চক্রবর্তীকে একবার একা পেতে চায় রতন। বুঝতে পারে রেবা, পাশের ঘরে এখন নীরব হয়ে বসে রয়েছে যেন একটা প্রবল অভিমান। রাগ নয়, প্রতিশোধ নেবার প্রতিজ্ঞাও নয়। রেবার সেই হিংস্র মিথ্যার আঘাতে ক্ষতাক্ত হয়েছে যার জীবনের সম্মান, সেই মানুষ আজও শুধু রেবারই কাছে এসে প্রশ্ন করতে চায়: তুমি আমার জীবনের উপর এতখানি বিষ ঢেলে দিলে কেন? কোন অপরাধে? তোমাকেই সুখে রাখবার জন্যে চোর হয়েছিলাম বলে? তোমার সুন্দর মুখের মায়ায় বড় বেশি লুব্ধ হয়েছিলাম বলে?

আসুক, সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিতে পারবে রেবা। শুনে যাক রতন, সেইসব মিথ্যা কথা রেবার মিথ্যা কথা নয়। জেনে যাক রতন, তার মত মানুষের চোখের আশাকে একদিন ঘৃণা করেছিল বলে আজও রেবা তার নিঃশ্বাস দিয়ে একটা জ্বালাকে

চুপ করে বুকের ভিতরে গিলে গিলে শান্ত হতে চেষ্টা করে।

কোন সন্দেহ নেই, এক সুযোগে হঠাৎ ঘরের ভিতরে এসে একলা রেবার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে রতনের মনের অভিমান ওই কয়েকটা প্রশ্ন করতে চায়। প্রশ্ন করতে কতক্ষণই বা সময় লাগবে? আধ মিনিটের বেশী নয়। উত্তর দিতে রেবারই বা কতটুকু সময় লাগবে? আধ মিনিটের বেশী নয়। ভালই হবে, এক মিনিটের মধ্যে আট বছরের পুরনো একটা অশান্ত ক্ষোভ মিটে যাবে। রেবার কথা শুনে রেবাকে ক্ষমা করে আর সুখী হয়ে চলে যাবে রতন, রেবার মনের জ্বালাও মিটে যাবে।

বিকালের চা দিয়ে যায় খানসামা। চায়ের কাপ হাতে তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়ান এন চক্রবর্তী। রেবা প্রশ্ন করে, যাচ্ছ কোথায়?

এন চক্রবর্তী : যাই, লনের ওপর একটু বেড়িয়ে বেড়িয়ে চা খেতে ইচ্ছে করছে।

চলে যান এন চক্রবর্তী! এই ঘরের ভিতরে আসবার সুযোগ এইবার পেয়েছে রতন। অদ্ভুত একটা ছায়া-ছায়া হাসির আভা যেন হঠাৎ শিউরে উঠেছে রেবার ঠোঁটের উপর। রেবা তার ইচ্ছার ভাগ্যটা দেখে আশ্চর্য হয়ে যায়। ব্যস্তভাবে হঠাৎ হাত বাড়িয়ে পাউডারের কৌটা খুলে ফেলে রেবা। মিররের সামনে দাঁড়ায়। ডান গালের নীচটায়, কপালের বাঁ দিকটায়, আর ঘাড়ের চারদিকে একটু পাউডার দরকার। তাড়াতাড়ি হাত চালিয়ে মুখের উপর এখানে-ওখানে পাউডারের পাফ বুলিয়ে নেয় রেবা।

বারান্দায় পায়ের চলার শব্দ শোনা যায়। হরিণের চামড়ায় চটি মৃদু শব্দ করে আনাগোনা করছে। রেবার বুকের ভিতরটা টিপটিপ করে। কিন্তু তবু মুখটাকে হাসিয়ে নিয়ে মনটাকে প্রস্তুত করে রাখে রেবা। রতন এসে হঠাৎ ঘরে ঢুকলে বোকার মত ভয়ে চমকে উঠবে না রেবা।

এক মিনিট, দু মিনিট, তিন মিনিট। ঘরের ভিতরে এসে একলা রেবার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে কয়েকটি কথা বলে চলে যাবার সুযোগ অনেকক্ষণ ধরে তো পেয়েই যাচ্ছে রতন, কিন্তু তবু আসে না কেন?

হঠাৎ একটা সন্দেহ চমকে ওঠে রেবার মনে। এবং সেই সন্দেহে ধীরে ধীরে বিহ্বল হয়ে উঠতে থাকে রেবার সুন্দর চোখের আনমনা আর অপলক দৃষ্টি।

এতক্ষণে বুঝতে পেরেছে রেবা, কিসের অভিমান এবং কেমন অভিমান রেবার এই ঘরের পাশে এখন কি আশা করে বসে আছে। আমলকি-বনের হাওয়া বড় বেশি ফুরফুর করে রেবার নেট-জড়ানো খোঁপার চারদিকে। এক মিনিট বা দু' মিনিটের সুযোগ পাওয়ার জন্য কোন লোভ নেই ওই অভিমানের মনে। রতনের মনের ইচ্ছার গুঞ্জন যেন স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে রেবার দুই কান। অবাধে, অনেকক্ষণ ধরে, দু চোখের দৃষ্টিতে যত খুশি তত লোভ মায়া আর মুগ্ধতা নিয়ে তাকাবার জন্য রতন আজ তার সেই রেবা মজুমদারের সুন্দর মুখটাকে চোখের সামনে পেতে চায়।

শিস দিতে দিতে ঘরের ভিতর ঢোকেন এন চক্রবর্তী। রেবা বলে, আচ্ছা, যদি তুমি এখুনি গিরিডি রওনা হও, তবে লেফটেন্যাণ্ট জয়সোয়ালের বিয়ে দেখে তোমার

ফিরে আসতে কতক্ষণ সময় লাগবে ?

এন চক্রবর্তী বলেন, কত আর সময় লাগবে ? চার-পাঁচ ঘণ্টার বেশী নয় ! রাত দশটার মধ্যেই ফিরে আসতে পারব।

রেবা : তাই বল ! মাত্র চার-পাঁচ ঘণ্টা ! তা হলে যাও, ঘুরে এস।

এন চক্রবর্তী : আর দরকার নেই গিয়ে। আমার এমন কোন ঘনিষ্ঠ বন্ধু নয় জয়সোয়াল যে ওর বিয়েতে যেতেই হবে।

রেবা : না না, যাওয়াই ভাল। যতই কম ঘনিষ্ঠ বন্ধু হোক না কেন, ভদ্রলোক যখন তাঁর বিয়েতে নেমন্তন্ন করেছেন, তখন যাওয়াই উচিত।

এন চক্রবর্তী নতুন টাই হাতে তুলে নিয়ে গলায় জড়াতে থাকেন : তা হলে যেতেই বলছ তুমি ?

রেবা হাসে।—হ্যাঁ, আমি গলা ছেড়ে পাঞ্জাবী গজল চেঁচিয়ে এই চার-পাঁচ ঘণ্টা পার করে দিতে পারব।

এন চক্রবর্তীর টুরার কাঁকর-ছড়ানো গিরিডি রোডের ধুলো উড়িয়ে চলে যায়। সন্ধ্যা হয়ে আসে ! রেবার একলা ঘরের দেয়ালের গায়ে আলো ঝুলিয়ে দিয়ে চলে যায় খানসামা।

তাড়াতাড়ি করে সাজতে গিয়েও বেশ একটু দেরি করে ফেলল রেবা। সবুজ-রঙের শাড়িটা যখন প্রায় অর্ধেক পরা হয়ে গিয়েছে, তখন হাত থামিয়ে কি-যেন ভাবে রেবা। না, রাতের আলোয় এই সবুজকে নিতান্ত কালো দেখাবে। অন্য রঙের শাড়ি বাছে রেবা। সাজ শেষ হবার পরেও মিররের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে। রেবার কপালটার গড়নে বেশ একটু খুঁত আছে, দু পাশে কেমন যেন চাপা-চাপা ভাব। এই খুঁত নিশ্চয়ই রতনের চোখে পড়েনি কোনদিন। কাছে এসে রেবার মুখের দিকে তাকাবার সুযোগ জীবনে কোনদিন পায়নি তো রতন। শুধু দূর থেকেই দেখেছে। কিন্তু আজ যে রেবার কপালের এই খুঁত রতনের চোখে ধরা পড়ে যাবে। খুঁতটা ঢাকা দেবার জন্য কানের দু পাশে হাত রেখে খোঁপা চাপে রেবা।

ঘরের দরজা খুলে দিয়েছে রেবা। খোলা দরজা দিয়ে ঘরের আলো ছড়িয়ে পড়েছে বারান্দার উপর, যেন রেবার বিহ্বল মনের প্রতীক্ষাটা পথের উপর আঁচল পেতে দিয়েছে। চেয়ারের উপর বসে হাতঘড়িটার দিকে তাকিয়ে থাকে রেবা। সোনার চেন দিয়ে কব্জি জড়িয়ে বাঁধা ছোট্ট হাতঘড়ি, চলছে বলেই তো মনে হয়। কানের কাছে তুলে নিয়ে হাতঘড়ির শব্দ শোনে রেবা

সারা পৃথিবীর মধ্যে এমন একটি নির্জনতা কি আর কোথাও আছে ? কোটি কোটি লোকচক্ষুর নাগাল থেকে ছিন্ন-করা এমন একটি নিভৃত ?

বুঝতে পেরেছে রেবা ! শুধু রেবার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেই ত সুখী হবে না ওই অভিমানের মন। হতে পারে না। ওর চোখে যে বড় দুরন্ত একটা পিপাসা ছিল।

এসেই যদি হাত ধরে? যদি আদর করে আস্তে আস্তে বুকের কাছে টেনে নেয়? যদি রেবার এই সাজানো দেহের উপর সব পিপাসা ঢেলে দেয় রতন?

ছটফট করে একটা হাত তুলে কপাল টিপে ধরে রেবা। রেবাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে সবচেয়ে বেশী সুখী হবার সবচেয়ে বেশী অধিকার যে ওরই ছিল।

পাশের ঘরে এলোমেলো শব্দ উসখুস করে। দরজা খোলার শব্দ শোনা যায়। বারান্দার দিকে তাকিয়ে হেঁটমুখ হয়ে বসে থাকলেও বুঝতে পারে রেবা, রতনের ছায়ার চঞ্চলতা এই ঘরের দরজার বড কাছাকাছি এসে আবার চলে গেল। চেয়ার ছেড়ে উঠে ঘরের ওদিকের খাটের উপর এসে বসে থাকে রেবা। দুরু দুরু বুকের যত মিথ্যা ভয়ের শিহরগুলিকে দু'হাতে আঁকড়ে ধরে চুপ করিয়ে দিতে ইচ্ছা করে। ভয় করবার কি আছে? ওই মানুষকে কি ভয় করতে আছে? ও যে ভয়াল হতেই জানে না।

আসতে বড দেরি করছে। আসে না কেন রতন? রেবাকে আদর করবার আর ইচ্ছামত সুখী হবার এমন অবাধ সুযোগ আর কবে পাবে রতন? রেবার বিহ্বল চোখের প্রতীক্ষার মধ্যে বেশ একটু অভিমানের ছায়াও ফুটে ওঠে।

সন্ধ্যা ফুরিয়ে গিয়েছে অনেকক্ষণ। রাতের অন্ধকারে একেবারে ঢাকা পডে গিয়েছে পরেশনাথ। আমলকি-বনের ফুরফুরে হাওয়াই বা কোথায় চলে গেল? শুধু মৃদু ঝডের শব্দ ছডায় শাল আর সেগুনের ভীড।

ছলছল করতে থাকে রেবার চোখ। আর একটা সন্দেহ দেখা দিয়েছে রেবার মনে, এবং এইবার বুঝতে পেরেছে রেবা, এতক্ষণ ধরে রতনের আশা আর ইচ্ছাকে বুঝতে খুবই ভুল হয়েছে রেবার।

কাঠের বাঘ রাগ করে না, কিন্তু মাটির মানুষও অপমানিত হলে বোধহয় রাগ না করে পারে না। তবে বিনোদ গাঙ্গুলীর ছেলে, অমন কুস্তিকরা হট্টাকট্টা একটা মানুষ, সেই রতন গাঙ্গুলীই বা কেমন করে সেই অপমানের জ্বালা ভুলে যাবে? যে মেয়েকে এত ভালবেসেছিল আর উপকার করেছিল রতন, সেই মেয়েই রতনের জীবনের বুকে এক মিথ্যা অপবাদের ছুরি বসিয়ে দিয়েছে। সেই মিথ্যা অপবাদকেই বর্ণে বর্ণে সত্য করে দিয়ে চলে যাবার সুযোগ খুঁজছে রতন। এই রকমই একটি প্রতিশোধ না নিলে কেমন করে তৃপ্ত হবে রতনের মত মানুষ, পুরুষের মত পুরুষ।

তবে কি ডাকাতের মত হঠাৎ এসে গলা টিপে ধরতে চায়? একটা অসহায় শরীরকে, একটা অনিচ্ছাকে, কতগুলি আর্তনাদকে, এক জোডা চোখের সজল কান্নাকে, আর সাজসজ্জার সব লজ্জালুতাকে লুটপাট করে সরিয়ে দিয়ে তৃপ্ত হতে চায় ওই প্রচণ্ড অভিলাষ? চায় বইকি, নইলে শান্ত হতে পারে না রতন গাঙ্গুলীর আট বছরের অশান্ত আত্মার ক্ষোভ।

আজ আর পুলিস আসবে না; সেদিনের সেই মিথ্যা এজাহারের কাহিনীটাকে শুধু আর একবার অভিনয় করতে হবে। শুধু ইচ্ছা করে একটা অনিচ্ছার ছলনা হয়ে যেতে হবে। অসহায়ের মত আর্তনাদ করে আর চোখের জল ফেলে গাঙ্গুলীর

দস্যুতা বরণ করে নিতে হবে। ওর ক্ষমাহীন প্রতিশোধের প্রতিজ্ঞাকে সুখী করে দিতে হবে। রতনের উগ্র চক্ষুর দিকে নকল জ্বালায় জ্বলন্ত দুটি চক্ষুর দৃষ্টি হেনে মনে মনে হেসে উঠবে রেবা।

আসুক তা হলে। বিছানার উপর লুটিয়ে শুয়ে পড়ে রেবা, এবং শোয়া মাত্র একেবারে অসহায় হয়ে যায় রেবার দেহটা। মনে হয়, এখুনি ঘুমে জড়িয়ে যাবে চোখের পাতা। বুঝতে পারবে না রেবা, কখন রতন এসে ঘরের ভিতরে ঢুকে রেবার ঘুমন্ত, অসহায় ও একলা পড়ে থাকা এই সাজানো রাঙানো সুন্দর মূর্তিটার উপর ক্ষুধার্তের মত ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য তৈরী হয়েছে।

ছিঃ, নিজেরই উপর রাগ করে উঠে বসে রেবা। রতনের মত মানুষের মনকে বুঝতে গিয়ে এত ছোট মন নিয়ে এসব কি ছাই আবোল-তাবোল চিন্তা করছে রেবা! এ ভাবে রেবার কাছে আসবার মানুষ নয় রতন। রেবার মনটা যেন এতক্ষণ পাগলামি করে রতনের মনের একটা অত্যন্ত সহজ ও সরল স্বাভাবিক ইচ্ছাকেই বুঝতে পারেনি।

রেবার কাছে আসবার জন্য যতই ব্যাকুল হয়ে উঠুক না কেন রতনের মন, তবু আসবে কেন রতন, কোন্ সাহসে, রেবা যদি নিজে গিয়ে হাত ধরে না নিয়ে আসে?

এতক্ষণে রেবার সারা মুখের উপর হাসিভরা বিহ্বলতা একেবারে উচ্ছল হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। এই হল রতনের আশা? হাত ধরে ডেকে নিয়ে না এলে রেবাকে আর বিশ্বাস করা যায় না। বেশ তো, তাই হোক, তোমাকে হাত ধরে ডেকে আনতে পারলে যে আমাকেও নিঃশ্বাস দিয়ে সেই জ্বালা আর গিলতে হবে না কোনদিন।

আসছি আমি—মনে মনে বলতে গিয়ে মুখ ফুটে প্রায় বলেই ফেলেছিল রেবা। বিছানা থেকে এক লাফ দিয়ে উঠে নেট-জড়ানো খোঁপাটাকে চটপট দুটো গুঁতো দিয়ে ছাদে বসিয়ে দেয়। তারপর আর এক মুহূর্তও দেরি করে না রেবা। ঘরের দরজা পার হয়ে বারান্দার উপরে এসে দাঁড়ায়। মুখচোরা অথচ প্রাণঢালা এক ভালবাসার আট বছরের অভিমান ভেঙে দেবার জন্য রেবার মুখেও যেন একটা দুষ্টু হাসির প্রতিজ্ঞা মিটমিট করে। রতনের ঘরের দিকে তাকায় রেবা।

দুই চোখ দুই হাতে ঢেকে চেঁচিয়ে ওঠে রেবা: খানসামা!

রতনের ঘরের দরজা বন্ধ। বন্ধ তালা ঝুলছে দরজার কড়াতে। নেই, টিম্বার মার্চেন্ট পরিতোষ গাঙ্গুলীর নাম লেখা সেই কার্ড আর নেই। কখন কোন ঝড়ের হাওয়ায় উড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল ওই কার্ড?

প্রায় দৌড়ে দৌড়ে চলতে থাকে রেবা। বারান্দা পার হয়ে ঘাসভরা লনের উপর নেমে, দূরের কিচেনের সেই কেরোসিনের আলোর দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে রেবা—খানসামা!

ছুটে আসে খানসামা: কি হুকুম মেমসাব?

—আমার পাশের ঘরের সেই বাবু কোথায়?

—গাঙ্গুলীবাবু ?

—হ্যাঁ।

—এই তো থোড়া আগে চলিয়ে গেলেন বাবু।

কী ভয়ংকর মানুষ! কী ভয়ানক প্রতিশোধ নিতে জানে লোকটা! রেবার বুকের গভীর থেকে উথলে-পড়া উৎসের মত এত বড় ইচ্ছাটাকে যেন থেঁতলে দিয়ে, আছাড় মেরে আর চূর্ণ করে পালিয়ে গেল লোকটা। আজ ওর কপালে বোতল ছুঁড়ে মারবার কেউ নেই। পুলিস নেই, হাজত নেই, জেল নেই।

আস্তে আস্তে বারান্দার বাতাস ঠেলে ঠেলে ঘরের দিকে চলে যায় রেবা। সারা গায়ে যেন দুঃসহ এক অপমানের কামড় লেগে রয়েছে। অনিচ্ছার উপর দস্যুতা করলে অপমানের যে জ্বালা লাগে মনে, সে জ্বালা কি এই জ্বালার চেয়ে বেশী দুঃসহ ?

ঘরের ভিতরে ঢুকে চেয়ারের উপর স্থস্থির হয়ে বসে থাকতে চেষ্টা করে রেবা। কিন্তু পারে না। রতনের আজকের এই সত্যিকারের দস্যুতাকে যে অপরাধ বলেই মনে করে না পৃথিবীর শাস্ত্র। কোন্ পুলিসের কাছে এহাজার দেবে রেবা ?

রেবার নিজেরই হাত দুটো যেন থেকে থেকে পাগল হয়ে উঠতে চাইছে। খোঁপা ভেঙ্গে দিয়ে, গলা টিপে দম বন্ধ করে দিয়ে পটপট করে এক টানে এই শাড়ি আর ব্লাউজের সব লজ্জালুতা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে রেবাকে পৃথিবীর এই নিভৃতে আট বছর আগের একটা এহাজার করে মাটির উপরে লুটিয়ে দিতে চায়।

চেয়ার থেকে উঠে বিছানার উপরে লুটিয়ে পড়ে রেবা। বালিশের উপর ভেজা চোখ ঘষে ঘষে আর জ্বালাভরা শরীরটাকে নিয়ে লুটোপুটি করতে করতে যখন ক্লান্ত হয় রেবা, তখন আমলকি-বনের হাওয়া আবার নতুন করে রাতের বুক ঠাণ্ডা করতে আরম্ভ করেছে।

রাত দশটার কয়েক মিনিট আগেই গিরিডি থেকে ফিরে এলেন এন চক্রবর্তী। কিন্তু টুরারের হর্নের শব্দেও ঘুম ভাঙে না রেবার।

দরজা খোলা। ঘরে আলো। তবু বিছানার উপর এরকম অদ্ভুতভাবে ঘুমিয়ে পড়ে আছে কেন স্বস্তি ? এ কি ছিরি ? খোঁপাটা যেন নেট ছিঁড়ে ভেঙে পড়েছে, এলোমেলো কতগুলি চুলের কুণ্ডলী ছড়িয়ে রয়েছে বালিশের পাশে। শাড়িটার প্রায় সবটাই বিছানা বেয়ে মেঝের উপর ঝুলে লুটিয়ে রয়েছে। অমন সুন্দর চেহারাটা যেন এই বিশ্রী ঘুমের ঘোরে বিধ্বস্ত হয়ে একটা লাসের মত পড়ে রয়েছে। এরকম করেও মানুষ ঘুমোয় ?

স্বস্তি!—বেশ জোরে চেঁচিয়ে ডাক দেন এন চক্রবর্তী।

ধড়ফড় করে উঠে বসে স্বস্তিকা।

এন চক্রবর্তী হাসেন।—এ কি ?

স্বস্তিকা—কি ?

এন চক্রবর্তী: মনে হচ্ছে, যেন একটা বাঘে তোমাকে খেয়ে চলে গিয়েছে।

স্বস্তিকা: খেয়ে গেল আর কোথায় ? খেলে তো ভালই হত।

এন চক্রবর্তী : কি বললে ? কি ভাল হত ?

স্বস্তিকা হেসে ফেলে : তোমার আবার একটা বিয়ে করতে হত।

অ পো প কা র

সীতানাথবাবুর বৈঠকখানায় ঢুকে নিতাইবাবু বেশ একটু তপ্তস্বরে বললেন—কথাটা ঠিকই বলেছিলেন বিদ্যাসাগরমশাই।

—সীতানাথবাবু—কি কথা ?

নিতাইবাবু—বলেছিলেন, ঐ লোকটা আমার এত নিন্দে করে কেন হে, আমি তো ওর কোন উপকার করিনি।

সীতানাথ—আপনিও কি বিদ্যাসাগরমশাই-এর মত ঐরকম একটা দুরবস্থায় পড়েছেন ?

নিতাইবাবু—হ্যাঁ মশাই, আমিও হুবহু বিদ্যাসাগরমশাই-এর মত দুরবস্থায় পড়েছি। যার উপকার করি সে-ই নিন্দে করে।

—তাই নাকি ?

—এই দেখুন না, অভয়বাবু বাতে ভুগছেন, নড়তে চড়তে পারেন না ; আমি সেই জামির লেন পর্যন্ত হেঁটে গিয়ে ওর ছেলের জন্য ছাগলের দুধ যোগাড় করে নিয়ে এলাম, আর উনিই কি না রামবাবুর কাছে দিব্যি বলে দিলেন যে, নিতাইবাবুর সময়ের কোন দাম নেই, সারাদিন ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়ান।

—যেতে দিন, যেতে দিন। ওসব কথা কানেই তুলবেন না।

—যাক্, খুব শিক্ষা হয়েছে। আর কোন বেটার উপকার করবো না সীতানাথ-বাবু।

সীতানাথবাবু হাসেন—তাহলে কি করবেন ?

নিতাই—না, অপকারও করতে চাই না। নিউট্রাল থাকবো। উপকারও না অপকারও না।

—এইখানে কিন্তু বিদ্যাসাগরমশাই-এর সঙ্গে আপনার একটা পার্থক্য হয়ে গেল।

—কী পার্থক্য ?

—নিন্দা শুনে বিদ্যাসাগরমশাই রাগ করেননি, কিন্তু আপনি খুব রেগে গেছেন।

—তা, তা একটা পার্থক্য বটে। কিন্তু বিদ্যাসাগরমশাই রাগ না করে মস্ত ভুল করেছিলেন। সেইজন্য সারাজীবন তাঁকে পস্তাতে হয়েছে। আমি পস্তাতে চাই না।

চলে গেলেন নিতাইবাবু। খুবই সাবধান হয়ে গেলেন, এবং মনে মনে কঠোর একটা প্রতিজ্ঞা করে ফেললেন—না, আর না, কোন অন্ধকে রাস্তা পার করে দেবেন না। বৃষ্টির সময় ট্রাম স্টপের কাছে দাঁড়িয়ে নিজের ছাতার নীচে শুধু একা নিজেই দাঁড়িয়ে থাকবেন। পাশের ভদ্রলোক ভিজে ঢোল হয়ে গেলেও তাঁর মাথার দিকে ছাতাটা একটুও কাত করতে পারবেন না। একটা টোকা দিয়েও কারও জামার

ছারপোকা সরিয়ে দিতে পারবেন না।

সত্যিই সেই সন্ধ্যাতেই বালিগঞ্জ স্টেশনের কাছে তিনজন ভদ্রলোকের কোন উপকার না করে বাড়ি ফিরে এলেন নিতাইবাবু।

ভদ্রলোকেরা জিজ্ঞাসা করেছিলেন—এই রাস্তা ধরে এগিয়ে গেলেই তো কাঁকুলিয়া রোড পাওয়া যাবে?

নিতাইবাবু বলেন—ভেবে দেখুন।

বাড়ি ফিরে এসে দশটি মিনিটও পার হয়নি, দেখে চমকে উঠলেন নিতাইবাবু, সেই তিন ভদ্রলোক এসেছেন। এঁরাই কি তবে রিসড়ার পাত্রপক্ষ, পাঁচিকে দেখবার জন্য যাঁদের আজ এই সন্ধ্যাতেই আসবার কথা, যাঁদের জন্য এতক্ষণ ধরে পথের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করছেন নিতাইবাব?

পাঁচিকে দেখলেন পাত্রপক্ষ। সন্দেশ সিঙ্গাড়াও খেলেন। তারপর নিতাইবাবুর দিকে কটমট করে তাকিয়ে বললেন—সত্য কথা বলছি মশাই, আপনার মেয়েকে পছন্দ হলো না।

চলে গেলেন পাত্রপক্ষ ভদ্রলোকরা। গম্ভীর হয়ে অনেকক্ষণ ধরে চিন্তা করলেন নিতাইবাবু। ভুল হয়েছে, মস্ত ভুল। লোকগুলোর স্রেফ অপকার করে দেওয়াই উচিত ছিল। পথ ভুল করিয়ে দিয়ে একেবারে ডালহৌসির ট্রামে ঐ তিনটি অভদ্রকে তুলে দিয়ে বলে দিলেই হতো, যান ডালহৌসি গিয়ে গালিফ স্ট্রীটের ট্রামে উঠে সোজা কাঁকুলিয়া রোড চলে যান। তাহলে আজ আর এতগুলো সিঙ্গাড়া আর সন্দেশ মিথ্যে খরচ হতো না।

সীতানাথবাবুর বৈঠকখানাতে ঢুকেই ফেটে পড়লেন নিতাইবাবু।—না মশাই, নিউট্রাল থাকা চলবে না। ভেবে দেখলাম লোকের অপকারই করা উচিত, নইলে নিজের ক্ষতি হয়।

চমকে উঠলেন সীতানাথবাবু—সে কি মশাই?

—বিদ্যাসাগরমশাই যে ভুল করেছিলেন, আমি আর সে ভুল করবো না মশাই। বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে চলে গেলেন নিতাইবাবু। এবং মাত্র চার দিন পার হতেই সন্ধ্যাবেলা সীতানাথবাবুর বৈঠকখানায় ঢুকে হাঁপাতে হাঁপাতে একটা চেয়ারের উপর বসে পড়লেন।—নাঃ, জানি না বিদ্যাসাগরমশাই এরকম দুরবস্থায় পড়েছিলেন কিনা?

সীতানাথবাবু—ব্যাপার কি?

নিতাইবাবু—একটু অপকার করেছিলাম মশাই। কর্ণরোডের কাছে এক ভদ্রলোক আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কাঁকুলিয়া রোড কোন্ দিকে? আমি হাত তুলে সোজা ঐ কর্ণফিল্ড রোডটাকে দেখিয়ে দিলাম।

—তার পর?

—আমি কি জানতাম ছাই যে ভদ্রলোক হলেন চন্দননগরের পাত্রের বাপ তারকবাবু? আমার পাঁচিকেই দেখবার জন্য যাচ্ছিলেন তারকবাবু।

—শেষপর্যন্ত ব্যাপারটা কতদূর গড়ালো ?

—কর্ণফিল্ড রোডের আশুবাবুর সঙ্গে তারকবাবুর ছেলের বিয়ের সম্বন্ধ পাকা-পাকি হয়েছে।

—যাক্ !

চেঁচিয়ে ওঠেন নিতাইবাবু। অপকার করা যাবে না, উপকারও করা যাবে না, তাহলে কি করি বলুন দেখি ?

সীতানাথবাবু—আপাতত একটু অপোপকার করুন।

—নিতাইবাবু—তার মানে ?

—একটু তামাক খান। ভাল বিষ্টুপুরী তামাক।

চতুর্থ পাণিপথের যুদ্ধ

আমাদের ক্লাসটা ছিল একটি নৃতত্ত্বের ল্যাবরেটরির মতো। এমন বিচিত্র মানবতার নমুনা আর কোন্ স্কুলের কোন্ ক্লাসে আছে জানি না। তিনজন রাজার ছেলে ছিল আমাদের ক্লাসে। একজন জংলী রাজার ছেলে, কুচকুচে কালো চেহারা। আর দুজন ছিল সত্যিকারের ক্ষত্রিয়াত্মজ, সুগৌর গায়ের রঙ, পাগড়িতে সাঁচ্চা মোতির ঝালর ঝুলত। তা ছাড়া ছিল—সিরিল টিগ্‌গা, ইম্যানুয়েল খালখো, জন বেস্‌রা, রিচার্ড টুডু আর স্টিফান হোরো এবং আরো অনেক। এত ওরাওঁ আর মুণ্ডা সন্তানের সমাবেশের মাঝখানে তবু আমরা কজন ইন্টারক্লাস পরিবারের বাঙালী ও বিহারী ছেলে শুধু বুদ্ধির জোরে সব কর্মের মোড়লীর গৌরব অধিকার করে বসে-ছিলাম। রাজার ছেলেগুলিকে আমরা বলতাম সোনা ব্যাং, আর মুণ্ডা ও ওরাওঁদের বলতাম কোলা ব্যাং। ওদের কাউকে আমরা কোন দিন গ্রাহ্যের মধ্যে আনতাম না। রাজার ছেলেগুলি অবশ্য আমাদের সঙ্গে কথা বলত না। অপর পক্ষে টিগ্‌গা খাল্‌খো, বেস্‌রা ও টুডু আমাদের সঙ্গে দুটো কথা বলতে পারলে ধন্য হয়ে যেত। টিফিনের সময় একটা আনি নিয়ে টুডুকে দিতাম। বলতাম—টুডু, চট করে এক দৌড়ে এক আনার ঝালবাদাম নিয়ে এস তো। গঙ্গা সাহুর দোকান থেকে আনবে।

স্কুল থেকে গঙ্গা সাহুর দোকান এক মাইল হবে। কৃতার্থভাবে আনিটা হাতে তুলে নিয়ে টুডু সেই প্রচণ্ড রোদে ঝলসানো মাঠের উপর দিয়ে পোড়া হরিণের মতো উদ্দাম বেগে দৌড়ে চলে যেত গঙ্গা সাহুর দোকানে। ফিরে এসে ঝাল বাদামের ঠোঙাটা আমাদের হাতে সঁপে দিয়ে নিজে দূরে সরে যেত। আমরা বলতাম—কী আশ্চর্য টুডু, এতটা পথ দৌড়ে এলে, তবু তুমি একটুও হাঁপাচ্ছ না !

আমাদের এই ফাঁকা কথার কারসাজিকে আন্তরিক অভিনন্দন মনে করে টুডু দূরে দাঁড়িয়ে গর্বভরে হাসত। আমরা চোখ টিপে লক্ষ্য করতাম টুডু কেমন জোর করে তার পরিশ্রান্ত শ্বাসবায়ুটাকে ঢোঁক গিলে লুকিয়ে রাখবার চেষ্টা করছে। তাকে ঝালবাদামের একটু শেয়ার দিতে আমরা বোধহয় ইচ্ছা করেই মাঝে মাঝে

ভুলে যেতাম। দিতে গেলেও টুডু নিত না।

আমরা দেখতাম, একটু দূরে দাঁড়িয়ে সুতীব্র একটা দৃষ্টি দিয়ে স্টিফান হোরো আমাদের হাবভাব লক্ষ্য করছে। আমরা ঘাবড়ে যেতাম। স্টিফান যেন তীর মেরে আমাদের বুকের ভিতরের ধূর্ত রসিকতায় তৈরী ফুসফুসটাকে খোঁচা দিয়ে দেখছে। সব বুঝে ফেলতে পারছে স্টিফান। কিন্তু সবার মধ্যে একমাত্র স্টিফানই পারে, আর কেউ নয়।

টুডু খাল্‌খো, টিগ্‌গা আর বেস্‌রা, সকলেই কতকটা এই রকমেরই বাধ্য বোকা বিশ্বাসী আর নিরীহ ছিল। আমরা মনে মনে হাসতাম—হায় রে, জঙ্গলের যত কোল, যত সব কোলা ব্যাঙ!

ওদের মধ্যে ঐ একটিমাত্র কালো কেউটে ছিল, স্টিফান হোরো। বড় উদ্ধত ছিল স্টিফানের স্বভাবটা। স্বীকার করতে লজ্জা নেই, হোরোর কাছে আমাদের আভিজাত্য চুপে চুপে হার মেনে নিত। ওর সঙ্গে সদ্ভাব রাখার জন্য মাঝে মাঝে যেচে ওর সঙ্গে কথাও বলতে হয়েছে। আরও লজ্জার বিষয়, হোরো এক-এক সময় আমাদের প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়ে অন্যমনস্কভাবে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। ঐ মাথাঠাসা মোটা মোটা চুলের ঘুঙুর, চেপটা নাক, আবলুস-কালো চেহারা, তবু এত অহংকার!

স্টিফানের উপর আর একটু ভয় এবং প্রথম শ্রদ্ধা হলো আর একটা ঘটনায়। সেদিন খেলার মাঠে দেখলাম, স্টিফান হোরো হকিস্টিক আনেনি। হোরো তবু খেলতে চায়। কিন্তু নিজের নিজের স্টিক নিয়ে খেলতে হবে, এই ছিল আমাদের নিয়ম। হোরো বার বার আমাদের অনুরোধ করল—কিছুক্ষণের জন্য কেউ আমাকে একটা স্টিক ধার দাও, একহাত খেলেই আবার দিয়ে দেব।

কেউ কারও স্টিক পরের হাতে দিতে রাজি ছিল না। হোরো বলল—আমি বিনা স্টিকেই খেলব।

গোঁয়ার হোরো একটি ঘণ্টা আমাদের উদ্দাম হকিস্টিকের বাড়ি আর আছাড়ের সঙ্গে সমান স্বাচ্ছন্দ্যে পা দিয়ে খেলে গেল। হোরোর দুটো নিরেট সীসু কাঠের মতো পায়ের উপর বেপরোয়া হকিস্টিক চালাবার সময় এক-একবার সন্দেহে আমাদেরই হাত কেঁপে উঠেছে, স্টিকটাই ভেঙে না যায়।

স্টিফান হোরো ক্রমেই আমাদের ভাবিয়ে তুলছিল। শুধু ভয় আর শ্রদ্ধা নয়, আর একটা কারণে আমরা হোরোকে এইবার ঈর্ষা করতে আরম্ভ করলাম। লেখাপড়ার ব্যাপারে হোরো আমাদের মনের শান্তি নষ্ট করতে চলেছে। ইংরেজী কবিতার আবৃত্তি ও ব্যাখ্যায় সে আমাদের ইন্দুকেও পরাজিত করে ছাব্বিশ নম্বর বেশি পেল। ঘটনাটা জাতীয় অপমানের মতো আমাদের গায়ে বিঁধল। বিহারী ছাত্রদের জাতীয়তা কতটা ক্ষুণ্ন হয়েছিল জানি না, কিন্তু হোরোর সম্পর্কে একটা নিন্দার ষড়যন্ত্রে তারাও আমাদের সঙ্গে ইউনাইটেড ফ্রণ্ট করল। আমরা বেশ জোর গলায় রটিয়ে দিলাম—এ স্কুলে অখৃষ্টানদের উপর বড় অবিচার চলেছে। মাস্টারেরা সবাই

খৃষ্টান। সুতরাং খৃষ্টান বেশি নম্বর পাবে তাতে আর আশ্চর্য কী? কিন্তু কী ভয়ানক অন্যায়!

আমাদের অভিযোগকে মনেপ্রাণে সত্য বলে বুঝলেন এবং বিশ্বাস করলেন শুধু একমাত্র অখৃষ্টান শিক্ষক, সংস্কৃতের টিচার বৈদ্যনাথ শর্মা, অর্থাৎ পণ্ডিতজী।

পণ্ডিতজী আমাদের সান্ত্বনা দিলেন—কি আর করবে বাবা! পাদরীদের স্কুলে এই রকমই অন্যায় কাণ্ড হয়ে থাকে। যাক্, ইউনিভার্সিটি তো আছে। সেইখানে ধরা পড়ে যাবে কার কতখানি যোগ্যতা।

প্রমোশনের পর নতুন বছরে স্টিফান হোরো ভয়ানক এক গোঁয়ার্তুমি করে বসল, পা দিয়ে হকি খেলার চেয়েও ভয়ানক। স্টিফান হোরো তার অ্যাডিশনাল ইংরেজী ছেড়ে দিয়ে সংস্কৃত নিল। খৃষ্টান টিচারেরা সবাই হোরোকে ধমকালেন, হেডমাস্টার ফাদার লিগুন ক্ষুণ্ণ হলেন, আর পণ্ডিতজী অদ্ভুতভাবে হাসতে লাগলেন। তবু অনার্য হোরোর সংস্কৃত পড়ার প্রতিজ্ঞা তিলমাত্র বিচলিত হলো না।

পণ্ডিতজী আমাদের আড়ালে ডেকে নিয়ে একটা অস্বস্তির হাসি হেসে বললেন—স্টিফান হোরো সংস্কৃত নিয়েছে। আর কি? এইবার দেবভাষার কপালে কি আছে কে জানে।

পণ্ডিতজী হাসতে লাগলেন। আমাদের কেমন সন্দেহ হলো, পণ্ডিতজীকে যেন খুশি খুশি দেখাচ্ছে! যাক্।

শীঘ্রই আমাদের যত ধারণা সংশয় আক্রোশ ও আশঙ্কা পর পর কতগুলি ঘটনায় আরও জটিল হয়ে উঠতে লাগল।

নিউ টেস্টামেন্ট থেকে ডেভিডের কয়েকটা গাথা আগাগোড়া নির্ভুল আবৃত্তি করে ফার্স্টপ্রাইজ পেল স্টিফান হোরো। সেকেণ্ড, থার্ড ও ফোর্থ প্রাইজের অগৌরবে মুখ শুকনো করে আমরা বসে রইলাম। ফাদার লিগুন উচ্ছ্বসিত আনন্দে হোরোর প্রশংসা করে ঘোষণা করলেন—তুমি ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করা মাত্র আমি তোমাকে নিশ্চয় দারোগা করে দিতে পারব হোরো, আমি প্রতিশ্রুতি দিলাম।

তা করতে পারেন ফাদার লিগুন। পুলিশের আই-জি সাহেবের কাছে এটুকু সুপারিশ করার ক্ষমতা তাঁর আছে। কিন্তু ঐটুকুই যদি হোরোর জীবনের পরমার্থ হয়, হোক, তার জন্য আমরা মোটেই হিংসা করি না। দারোগা হবার জন্য কষ্ট করে নিউ টেস্টামেণ্ট মুখস্থ করার দরকার নেই আমাদের।

তার পরের দিনই বাইবেল ক্লাসে হোরোকে একেবারে ভিন্ন রূপে দেখতে পেলাম আমরা। দুর্বোধ্য বিস্ময়ে আমরা শুধু খাবি খেতে লাগলাম।

বাইবেল ক্লাসের একেবারে পিছনের বেঞ্চিতে বসেছিল হোরো। পড়াতে পড়াতে ফাদার লিগুন বার বার হর্ষ-পুলকিত নেত্রে হোরোকে প্রশ্ন করছিলেন—স্টিফান, তুমিই উত্তর দাও। তুমিই সবচেয়ে ভাল উত্তর দিতে পারবে।

—জানি না স্যার। স্টিফানের রুক্ষ গলার স্বরে চমকে উঠে আমরা সবাই তার দিকে তাকালাম। দেখলাম, স্টিফান হোরোর আরও রুক্ষ ও বিরক্ত মুখটা ডেস্কের

উপর ঝুঁকে রয়েছে। ফাদার লিগুনের দিকে যেন তাকাতে চায় না হোরো।

ফাদার লিগুনের সোনালী দাড়ির উপর লালচে মুখে ক্ষণে ক্ষণে গাঢ় রক্তচ্ছটা ছড়িয়ে পড়ছিল। চোখের দৃষ্টিটা তীব্র হয়ে উঠছিল। স্টিফানের দিকে তাকিয়ে রুষ্ট স্বরে বললেন—স্টিফান, আজ কি তোমার ব্রেনটাকে দরজার বাইরে রেখে ক্লাসে এসেছ তুমি? উত্তর দিতে পারছ না কেন?

—জানি না স্যার। আবার স্টিফান হোরোর সেই স্পষ্ট অবিচল ও অকুতোভয় উত্তর শুনে আমাদের বুকে ঢুক ঢুক সুরু হয়ে গেল। আকস্মিকভাবে অসময়ে ক্লাস বন্ধ করে ফাদার লিগুন চলে গেলেন।

কিন্তু স্টিফান হোরোর মনে এত রাগ কেন? এত অভিমান কেন? নিউ টেস্টা-মেণ্ট মুখস্থ করে করে মাথা কিনেছে? কি হতে চায় হোরো? হাউস অব লর্ডস্-এর সদস্য?

এর পর বিপদে পড়লেন পণ্ডিতজী। পণ্ডিতজীর মতি-গতিও কদিন থেকে কেমন একটু বিসদৃশ ঠেকছে। আমাদের এড়িয়ে যেতে পারলেই যেন পণ্ডিতজী একটু সুস্থ বোধ করেন। দেখা হলেই ব্যস্ত হয়ে সরে পড়েন। অথচ পণ্ডিতজীকে কত কথাই না জিজ্ঞাসা করার আছে। ফার্স্ট টার্মিনাল পরীক্ষা হয়ে গিয়েছে। এই তো যত নম্বর প্রমোশন আর পজিশন নিয়ে একটা দুশ্চিন্তিত গবেষণা ও কৌতূহলের সময়। পণ্ডিতজীর উদার হাতের নম্বর অনেক সময় আমাদের টোটালকে পরিস্ফীত করে কৃপণ খৃষ্টান শিক্ষকদের ষড়যন্ত্র থেকে আমাদের বাঁচিয়েছে। আজও আমরা তাই জানতে চাই, পণ্ডিতজী কার জন্য কতদূর করলেন। ইন্দুকে যদি একবার বুক ঠুকে পঁচাশি দিয়ে দেন পণ্ডিতজী, তবে টোটালে তার ফার্স্ট হওয়া সম্বন্ধে আর কোন সংশয় থাকে না। সব খৃষ্টানী ষড়যন্ত্র জব্দ হয়ে যায়।

পণ্ডিতজীর বাড়িতে গিয়েছি, লাইব্রেরি-ঘরে একা একা পেয়েছি, পথে পথরোধ করেছি, কিন্তু পণ্ডিতজী কিরকম গোলমেলে কথা বলে আমাদের সব কৌতূহল যেন চাপা দিতে চান। আমাদের সন্দেহ আরও প্রখর হয়ে ওঠে।

আমৃতা আমৃতা করে দুবার মাথা চুলকিয়ে পণ্ডিতজী শেষে সত্য সংবাদটা এক-দিন ব্যক্ত করে দিলেন।—সংস্কৃতে স্টিফান হোরো সবচেয়ে বেশি নম্বর পেয়েছে, একশোর মধ্যে পঁচাত্তর।

আর ইন্দু? আমাদের প্রশ্নে একটু অপ্রস্তুত হয়ে পণ্ডিতজী অপরাধীর মতো বল-লেন—বত্রিশ।

মাত্র বত্রিশ! পণ্ডিতজীর মতো বিশ্বাসহন্তা পৃথিবীতে আর নেই। আমাদের ক্ষোভ অসংযত হয়ে উঠছিল। পণ্ডিতজী মিনতি করে বললেন—স্টিফান হোরো এত ভাল সংস্কৃত লিখেছে, এ তো তোমাদেরই গৌরব, আর্যভাষার গৌরব। এতে তো তোমাদের খুশি হবার কথা। এটা হোরোর জয় নয়, এটা হলো সংস্কৃতভাষার জয়।

চুলোয় যাক্ সংস্কৃতভাষার জয়। ইন্দু ফার্স্ট হতে পারবে না, এটা যে বাঙালীর কত বড় অপমান, সেটা পণ্ডিতজী বুঝলেন না। কিন্তু আমরা রহস্যটা ঠিক বুঝে

ফেললাম। পণ্ডিতজী হলেন বিহারী, বাঙালীর দুঃখ বুঝবার মতো হৃদয় নেই এই বৈজনাথ শর্মার।

কিন্তু বাতাসের নিশ্চয় সেই পরম গুণ আছে, যার জন্য শত অন্যায়ের অবরোধের মধ্যেও ধর্মের কল নড়ে ওঠে। লাইব্রেরি-ঘরে যেদিন বোর্ড-নিবদ্ধ মার্ক-শীটের কাছে আমরা গিয়ে চোখ তুলে দাঁড়ালাম, সেদিন আমরা বিশ্বাস করলাম, সত্যের জয় আছে, মিথ্যার পরাজয় আছে।

ইন্দু ফার্স্ট হয়েছে। স্টিফান হোরোর পজিশন অনেক নীচে। ইংলিশে, ইতিহাসে, ভূগোলে, অঙ্কে, সব বিষয়ে অতি নগণ্য নম্বর পেয়েছে স্টিফান হোরো, একমাত্র সংস্কৃত ছাড়া। ভেবে অবাক হলাম আমরা, খৃস্টান টিচারেরা হোরের উপর হঠাৎ এত নির্দয় হয়ে উঠলো কেন?

আরও কিছুদিন পরে স্টিফান হোরো আমাদের কাছে একেবারে দুর্বোধ্য হয়ে গেল। শুধু আমাদের কাছে নয়, খালখো, বেসরা, টিগ্গা ও আর সবাই বলাবলি করে, কি যেন হয়েছে হোরোর!

বড়দিনের উৎসবে আমরা পিকনিক করতে গিয়েছিলাম শিলোয়ারার জঙ্গলে। রান্নার কাঠের জন্য মহা উৎসাহে একটা মরা কেঁদগাছ ভাঙছিলাম আমরা। হঠাৎ দেখলাম, স্রোতের ধার দিয়ে একা একা হোরো চলেছে। হাতে একটি গুলতি। আমরা চেঁচিয়ে ডাকলাম হোরোকে। এ রকম অভাবিতভাবে হোরো যখন এসেই পড়েছে, তখন সেও আমাদের সঙ্গে এই বনভোজনের আনন্দের একটু শেয়ার নিক্ না কেন। পোলাও হবে, মাংস দই আছে, বৈকুণ্ঠ ময়রার সন্দেশও আছে—এসব খেলে খুশিই হবে হোরো। একেবারে আনকোরা মুণ্ডা, জীবনে এসব খায়নি তো কখনো।

হোরো এগিয়ে এল। আমাদের কাছে এসেই একটা শালগাছের শাখার দিকে চোখের দৃষ্টি নিবিষ্ট করে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপরেই শিকার লক্ষ্য করে গুলতি তুলে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে একটা হৃষ্টপুষ্ট কাঠবিড়ালী আহত হয়ে ধপ করে মাটির উপর পড়ল। একটা লাফ দিয়ে আহত কাঠবিড়ালীটাকে লুফে নিয়ে পকেটের ভিতর রাখল স্টিফান।

আমরা আতঙ্কিত হয়ে প্রশ্ন করলাম—ওটা কি হবে স্টিফান?

—খাব। নিঃসঙ্কোচে কথাটা বলে ফেলল হোরো। মনের ঘেন্না মনের ভিতর চেপে রেখে তবু আমরা হোরোকে নিমন্ত্রণ করলাম—ওসব ছুঁড়ে ফেলে দাও স্টিফান। পাগল কোথাকার। এস, আমাদের পিকনিকে তুমিও পোলাও খাবে আমাদের সঙ্গে।

—না। হোরোর কালো মুখের ভিতর থেকে ঝক্‌ঝকে দুপাটি শাদা দাঁতের হাসি আপত্তি জানাল। চলে গেল স্টিফান।

এ রকম জংলী হয়ে যাচ্ছে কেন স্টিফান? রিচার্ড টুডু একদিন কানে কানে আমাদের বলল—সত্যিই কি যেন হয়েছে হোরোর। বোধহয় শিগগির পাগল হয়ে

যাবে। ফাদার লিগুন আমাদের সাবধান করে দিয়েছেন, হোরোর সঙ্গে যেন কেউ না মেশে।

আমরা জিজ্ঞাসা করলাম—কেন টুডু?

—একজন বুড়ো সোখার সঙ্গে আজকাল বড় ভাব হয়েছে স্টিফানের। লুকিয়ে লুকিয়ে প্রতি মঙ্গলবার হাটে গিয়ে সোখার সঙ্গে দেখা করে হোরো।

—তাতে কি এমন অপরাধ হয়েছে হোরোর?

টুডু ভুরু কুঁচকে বলল—অপরাধ নয়? নিশ্চয়ই অপরাধ। এতে বাইবেলের অপমান করেছে হোরো। চার্চে যায় না, কারও কথা শোনে না, তিনদিন হোস্টেলে ছিল না হোরো। ওকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে।

—হোস্টেলে ছিল না? কোথায় ছিল?

টুডু গলার স্বর আরও নামিয়ে চুপে চুপে বলল।—বুরুতে গিয়েছিল। সেখানে নেচে গেয়ে এসেছে। পেট ভরে ইলি খেয়ে নেশা করেছে। তাছাড়া······।

টুডু হঠাৎ থেমে গিয়ে বলল—একটা কথা বলছি, কাউকে বলো না যেন! জানতে পারলে হোরো আমায় মেরে ফেলবে।

টুডুকে অভয় দিলাম—না, কেউ জানতে পারবে না, তুমি বল।

—একটি মেয়ের সঙ্গে ওর খুব ভাব হয়েছে। মেয়েটার নাম চিবৃকি, মোরাঙ্গি পাহাড়ের মুরমুদের মেয়ে।

টুডুর কথাগুলি মুগ্ধ হয়ে যেন গিলছিলাম আমরা। আমাদেরই সহপাঠী দীন দরিদ্র মুণ্ডা হোরো, কতই বা বয়স। তবু সেই হোরো আজ এক মুহূর্তে আমাদের বাইবেল ক্লাস, সংস্কৃতের নম্বর আর হকি খেলার সব আনন্দ ও উত্তেজনাকে মূল্যহীন করে দিয়ে এক রোমাঞ্চময় অনুরাগের স্কুলে গিয়ে সবার অগোচরে নাম লিখিয়ে এসেছে। সেই মেয়েটি, চিবৃকি মুরমু তার নাম, তাকে যেন আমরা চোখে দেখতে পাচ্ছি। শাল ফুলের মালা গলায় দিয়ে, খোঁপায় একটা বনজবা গুঁজে, স্রোতের ভাষার মতো কলকল হাসির জাদু দিয়ে হোরোর কালো হৃদয়ের সব দুরন্তপনাকে বন্দী করে নিয়ে কোন্ উপত্যকার একটি নিভৃতে চলে গিয়েছে। সেখান থেকে ফিরে আসবার সাধ্য নেই হোরোর। কোন্ সাধেই বা আসবে?

টুডু তখনো সেই রকম পাকা পাকা কথা বলে চলেছিল।—মুরমুরা বোঙা পুজো করে, ওদের সঙ্গে হোরোর মেলামেশা করা কি উচিত? বড় ভুল করেছে হোরো।

স্টিফান হোরোকে হোস্টেল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে, এটা শুধু একটা গুজব হয়েই রইল। কার্যত দেখলাম, হোরোকে তাড়ানো হলো না। ইচ্ছা মতো ক্লাসে আসে হোরো। নিজের ইচ্ছা মতোই অনুপস্থিত হয়। ফাদার লিগুনের অনুগত খৃস্টান ছাত্রেরা হোরোকে এড়িয়ে যায়। হোরো যেন এক ঘরের মধ্যেই একঘরে হয়ে আছে। হোস্টেলেই থাকে হোরো, অথচ তার সম্পর্কে যেন সব শাসন প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে।

কয়েকদিন পরে আমরা আরও অবাক হয়ে গেলাম। দেখলাম, ফাদার লিগুন

টেনিস খেলছেন হোরোর সঙ্গে। আশ্চর্য! টুডু বেসরা ও টিগ্‌গা, এরা হোরোর চেয়ে কম কালো আর বেশি বিশ্বাসী খৃষ্টান। কিন্তু আজ পর্যন্ত ওরা শুধু ফাদার লিওনের টেনিস খেলার সময় বল কুড়িয়ে দেবার মর্যাদা পেয়েছে। তার বেশি নয়। আর স্টিফান একেবারে···সত্যি আশ্চর্য। হোস্টেলের বাগানে বিকালবেলা জল দেবার ভার ছিল হোরোর উপর। এই কর্তব্যটুকুর বিনিময়ে হোরো হোস্টেলে ফ্রি খেতে পেত আর থাকত। আমরা দেখলাম, হোরো আর বাগানে যায় না, জলও তোলে না। উদ্যান-সেবার ভার টিগ্‌গার উপর চাপানো হয়েছে। বেচারী টিগ্‌গা! সকালবেলার রান্নার কাঠ কাটে, তার উপর আবার বিকালবেলা জল তোলা।

টুডু এসে আর-একদিন আর-একটা খবর দিল—আজকাল আর হাটে যাবার সুযোগ পায় না স্টিফান, প্রতি মঙ্গলবারে সারা দুপুর ফাদার লিওনের ঘরে বসে পিলগ্রিমস্ প্রগেস পড়ে। পড়া শেষ হলে নাকি চা-বিস্কুট খায় হোরো। ফাদার লিওন খাওয়ান।

আমাদের উৎসাহ ঔৎসুক্য আলোচনা আর গবেষণার সীমা ছিল না। অলক্ষ্যে কতবড় একটা ঘটনার দ্বন্দ্ব জমে উঠেছে, তার কিছু কিছু আভাস আমরা আমাদের অনুভব দিয়ে ধরতে পারছিলাম। এক দিকে কেম্ব্রিজের এম-এ, বিখ্যাত শিক্ষিত সুসভ্য ও শ্রদ্ধেয় ফাদার লিওন। অপর দিকে কোন্ এক জংলী ডিহির বুড়ো সোখা, দীনতম নগণ্য অর্ধোলঙ্গ ও বর্বরবেশী এক জাদুমন্ত্রা। যেন দুই যুগে লড়াই—বিংশ শতক বনাম প্রাক্ ইতিহাস। বুড়ো সোখা বোধহয় সে লাঞ্ছনা ভুলতে পারে না, ছেলেধরা পাদরীরা তাদের ডিহির ছেলেকে ধরে নিয়ে গিয়েছে, খৃস্টান করে দিয়েছে হোরোকে। তারই প্রতিশোধ নেবে বুড়ো সোখা। এই সুসভ্য ডাইনদের দুর্গ থেকে আবার জঙ্গলে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে।

ফাদার লিওনও তাই বোধহয় বেশি সতর্ক হয়েছেন। স্টিফান হোরো যদি আবার জংলী হয়ে যায়, সে পরাজয় আর অপমান বেশি করে তাঁর বুকে বাজবে। সহ্য করা কঠিন হবে। ফাদার লিওন জানেন, প্রতি মঙ্গলবারের হাটে বুড়ো সোখা আসে। একটা আরণ্য আত্মা যেন প্রতিশোধ নেবার জন্য আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সুযোগ খুঁজছে। তাই চা-বিস্কুট ও টেনিস, সুসভ্যতার এক-একটি প্রসাদ খাইয়ে হোরোকে যেন পোষ মানিয়ে রাখতে চাইছিলেন ফাদার লিওন।

আমরা বলতাম—চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধ। দেখা যাক্, কে জেতে আর কে হারে।

গুড ফ্রাইডের ছুটিতে হোস্টেলের জংলী ছেলেরা সবাই নিজে নিজের জঙ্গলের দেশে যাবার ছুটি পেল। টুডু টিগ্‌গা বেস্‌রা খাল্‌খো—সবাই চলে গেল। ওদের পক্ষে যাবার কোন বাধা ছিল না। কাঁধের লাঠিতে এক-একটা পোঁটলা ঝুলিয়ে জঙ্গলের মধ্যে ত্রিশ-চল্লিশ মাইল পথ একটানা হেঁটে ওরা চলে যাবে নিজের নিজের ডিহিতে। কোন পাথেয় দরকার হয় না। গাড়ি চড়ে যাওয়ার মতো পয়সা খরচ করার সামর্থ্যও নেই ওদের।

কিন্তু হোরোকে ছুটি দিতে গিয়ে রীতিমতো বিচলিত হয়ে পড়লেন ফাদার

লিগুন। হোরো যেদিন গেল, সার্ভিস বাসটা এসে দাঁড়াল হোস্টেলের দরজার কাছে। আমরা দেখলাম, ফাদার লিগুন মানিব্যাগ থেকে টাকা বের করছেন, বাসের টিকিট কিনে দিচ্ছেন হোরোকে।

আমাদের মধ্যে বাজি ধরা হলো, হোরো আর ফিরে আসবে কিনা। ইন্দু বলল —নিশ্চয় আসবে। ফাদার লিগুন ওর জংলীপনা ঘুচিয়ে দিয়েছেন ভাল করে। দুবেলা চা-বিস্কুট মারছে আজকাল। তার স্বাদ কি ভুলতে পারবে হোরো।

আমি বললাম—আর ফিরে আসবে না হোরো। এখানে না হয় চা-বিস্কুট আছে, কিন্তু ওদিকে যে··· ।

ইন্দু—ওদিকে কি?

বললাম—চির্‌কি মুরমুর কথা ভুলে গেলে?

ইন্দু একটু নিরাশ হয়ে পড়ল—তাই তো।

ছুটি ফুরিয়ে যাবার পর আবার হোস্টেলের জীবন চঞ্চল হয়ে উঠল। সবাই ফিরে এল, টুডু টিগ্‌গা বেস্‌রা আর খাল্‌খো। স্টিফান হোরোও ফিরে এল। ইন্দুর জিত হলো। আমরা নিরাশ হয়ে পড়লাম। রাগ হলো হোরোর উপর। হোরোটা সত্যিই একটা গবেট ও বেরসিক।

কিন্তু টুডুর কাছে গল্প শুনে আমাদের এই আক্ষেপ এক মুহূর্তে মুছে গেল। আমরা শুনলাম বুড়ো সোখার কথা, চির্‌কি মুরমুর কথা। হোরোদের জঙ্গলের ছবিটা মুহূর্তের মধ্যে যেন দূরের এক ফোটা-পলাশের রঙীন ছবির মতো আমাদের কল্পনার সীমার কিনারায় দুলতে শুরু করে দিল। ইন্দু বলল—চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধে বুড়ো সোখার জয় অবধারিত।

হোরোর পাশে ডিহির ছেলে টুডু। খৃস্টান টুডুরা অখৃস্টানদের সঙ্গে মেশে না। টুডু তবু যেন গোয়েন্দার মতো অখৃস্টান মুরমুদের ডিহিতে গিয়ে হোরোর সব কীর্তি দেখে এসেছে। তবে টুডু প্রাণ থাকতে ফাদার লিগুনের কানে ওসব কীর্তির কথা কখনো তুলবে না। হোরোর উপর প্রচণ্ড একটা শ্রদ্ধা ও মমতা আছে টুডুর। হোরোর কাছে গিয়ে কিছু বলতে পারে না বলেই আমাদের কাছে বলে। বলে বলে যেন স্তব্ধ শ্রদ্ধার বেদনা খানিকটা হালকা করে নেয় টুডু।

টুডু দেখেছে, একদিন তীর দিয়ে একটা হরিণ মেরেছিল হোরো। স্রোতের ধারে হোরো দাঁড়িয়েছিল ধনুক হাতে। চির্‌কি মুরমু তার পা ধুইয়ে দিচ্ছিল।

টুডু দেখেছে, চির্‌কি তাদের গাঁয়ের ঘুমঘর থেকে জ্যোৎস্নারাতে চুপে চুপে পালিয়ে এসেছে। হোরো আড়াল থেকে বের হয়ে এসে চির্‌কিকে হাত ধরে নিয়ে গিয়েছে।

টুডু দেখেছে, হোরো খৃস্টান হয়েও আখড়াতে গিয়ে মাদল বাজিয়েছে। চির্‌কিও নাচে কি না সেখানে। বুড়ো সোখা ভালবাসে হোরোকে। কেউ তাই হোরোকে ঘৃণা করে না।

টুডু বলল—জংলীদের সঙ্গে মিশে দুদিন সেণ্ডেরা করেছে হোরো। টাঙি হাতে

উৎসবে পাগলের মতো নেচেছে। শিমুল গাছে আগুন ধরিয়েছে, দাউ দাউ করে আগুন জ্বলেছে। সবার আগে এক লাফ দিয়ে এক কোপে সেই জ্বলন্ত গাছ কেটেছে হোরো।

টুডু তার গলার স্বর খুব অস্পষ্ট করে নিয়ে ভয়ে ভয়ে বলল—আমি দেখেছি, তারপর গায়ের ফোস্কাতে ঠাণ্ডা বাতাস লাগাবার জন্য যখন আড়ালে গিয়ে দাঁড়িয়েছে হোরো, তখন চিবৃকি মুরমু আস্তে আস্তে এসে হোরোকে বুকে জড়িয়ে ধরেছে।

বোর্ডিং-এর পাশে ছোট মাঠের ঘাসের উপর সন্ধ্যার অন্ধকারে বসে আমরা টুডুর মুখ থেকে এই অদ্ভুত অথচ বর্ণে-বর্ণে সত্য এক রূপকথা শুনছিলাম। হঠাৎ হোস্টেলের বারান্দা থেকে একটা বাঁশির স্বর ভেসে এল। তখনি সেই স্বরের সঙ্গে সুর মিলিয়ে, তালে তালে মাথা দুলিয়ে, টুডু গুন্ গুন্ করে গাইতে লাগল।—

রাতা মাতা বিরকো তালা
রে নালো হোম নিরজা
রাগা ইংগা……

উৎফুল্ল টুডুর হাবভাব আর উৎসাহ দেখে মনে হলো, এখনি সে নাচতে শুরু করে দেবে।

—কে বাজাচ্ছে বাঁশি? কে?

আমাদের ব্যস্ত জিজ্ঞাসার উত্তরে টুডু গান থামিয়ে বলল—ঐ সেই গান। হোরো বাঁশিতে সেই গানের সুরটা বাজাচ্ছে।

—কোন্ গান?

—চিবৃকি মুরমুর গান।

—গানটার মানে কি টুডু?

টুডু উত্তর দিল—গানটার অর্থ, শোন আমার জোয়ান বন্ধু, পালিয়ে যেও না, এই ঘন জঙ্গলে আমায় একা ফেলে চলে যেও না।

একটা আনন্দের রোমাঞ্চময় সঞ্চার আমাদের মনের উপর ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছিল। বললাম—এ যে আমাদের মতো গান, টুডু!

ইন্দু চাপা সুরে আবৃত্তি করল—শুন শুন হে পরাণ পিয়া…!

কিছুক্ষণ আবিষ্টের মত নিঝুম হয়ে বসেছিলাম আমরা। বোধহয় আমরা মনে মনে চিবৃকি মুরমু নামে বনের লতার মতো না-দেখা একটি মেয়েকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলাম—না, তোমার বন্ধু পালিয়ে যাবে না। আমরা প্রার্থনা করছি, হোরো তোমার কাছে ফিরে যাবে।

কিন্তু হঠাৎ ফাদার লিণ্ডনের গর্জন শুনতে পেয়ে চমকে উঠলাম। হোস্টেলের বারান্দায় অন্ধকারে যেন একটা ধস্তাধস্তি চলেছে। টুডু দৌড়ে গিয়ে ঘটনাটা স্বচক্ষে দেখে ফিরে এল। সন্ত্রস্তের মতো হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—ফাদার লিণ্ডন হোরোর বাঁশি ভেঙে দিয়েছেন।

আমাদের সবার মনে একসঙ্গে ধক্ করে কতগুলি প্রতিহিংসার শিখা জ্বলে

উঠল। রাগের মাথায় বললাম—দাড়িওয়ালাকে ঘা কতক জমিয়ে দিতে পারলে না হোরো ?

টুডু বিমর্ষভাবে বলল—আমারও কেমন ভয় হচ্ছে! হোরো বড় গোঁয়ার। ফাদারকে এর ফল টের পাইয়ে দেবে হোরো।

কিন্তু এত বড় দুঃসহ ব্যাপারের পরেও স্টিফান হোরোর গোঁয়ার্তুমির কোন প্রমাণ পেলাম না। বরং দেখলাম, গোঁ ধরেছেন ফাদার লিগুন।

ফাদার লিগুনের অভিযান আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। প্রতি সপ্তাহে একবার সফরে বের হন। কখনো ভোজপুরী লেঠেল সঙ্গে যায়, কখনো বা আট-দশটা কনস্টেবল। থানাতে একটা চিঠি দিলেই কনস্টেবল চলে আসে। যেন একটা যোদ্ধার দল নিয়ে দু'দিনের জন্য জঙ্গল এলাকায় অদৃশ্য হয়ে যান ফাদার লিগুন। সত্যিই কি কোন ধর্মযুদ্ধ বাধিয়েছেন ফাদার লিগুন? আমরা শুধু মনমরা হয়ে ভাবতাম, ফাদার লিগুনের এই রহস্যময় আনাগোনা কবে বন্ধ হবে? কবে শান্ত হবে তাঁর লালচে মুখের উত্তেজনা?

টুডুর কাছে খবর শুনে ব্যাপারটা স্পষ্ট করে বুঝলাম—মোরাঙ্গি পাহাড়ের মুর-মুদের ডিহিতেই ফাদার লিগুনের অভিযান শুরু হয়েছে। পাহাড়ের গায়ে এরই মধ্যে একটি মাটির গির্জা তৈরি করে ফেলেছেন ফাদার লিগুন। অরণ্যের বুকের ভিতর ঢুকে তিনি যেন হাজার হাজার বছরের বৃদ্ধ যত বোঙাদের শিলাময় বেদী কাঁপিয়ে দিয়ে এসেছেন।

খুব বেশি দিন পার হয়নি, শুনলাম, মোরাঙ্গি পাহাড়ে একটা হাঙ্গামা হয়ে গিয়েছে। মাটির গির্জাটা ভেঙ্গে ধুলো করে দিয়েছে।

কে করেছে?

যে করেছে, তাকে আমরা স্বচক্ষেই দেখলাম। বুড়ো সোখা। সেসন জজের আদা-লতের ভিড়ের মধ্যে মাথা গুঁজে আমরাও রায় শুনলাম—বুড়ো সোখার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।

স্টিফান হোরোকে দেখতাম, বোর্ডিং-এর বাগানে একটা বুড়ো বটের ঝুরিতে দোলনা বেঁধে সময়-অসময় শুধু দোল খায়। দুলে দুলে যেন এক দুঃসহ গায়ের জ্বালা জুড়িয়ে নিচ্ছে স্টিফান হোরো।

কদিন পরেই নন্-কো-অপারেশনের ঝড় বইতে শুরু করল সারা দেশে। আমরা স্কুল ছাড়ব। রক্তমাখা জালিয়াঁওয়ালা বাগের জ্বালা আমাদের অশান্ত করে তুলল।

আমরা বাঙ্গালী আর বিহারী ছেলেরা স্কুল ছাড়লাম। রাজার ছেলেরা কেউ ছাড়ল না। খ্রীস্টান ছেলেরাও নয়, টুডু টিগ্‌গা বেস্‌রা খাল্‌খো কেউ নয়। আমরা পিকেটিং করে ওদের বাধা দিতে লাগলাম।

আমাদের খুব ভরসা ছিল, হোরো আমাদের দলে আসবে। ফাদার লিগুন ওকে যে অপমান করেছেন, তার পর জীবনে সে আর কোন পাদরী বা শাদা চামড়াকে সহ্য

করতে পারবে কি না সন্দেহ।

আমরা স্কুলের ফটকে পিকেটিং করছিলাম। দেখলাম হোরো আসছে।

স্বতন্ত্র ভারত কি জয়! জয়ধ্বনি করে আর হাত তুলে আমরা হোরোকে থামতে অনুরোধ করলাম,—এস হোরো, আমাদের সঙ্গে দাঁড়াও, ঐ পাপের বাসাতে আর আমরা ঢুকব না।

হোরো এগিয়ে এসে ইন্দুকে একটা ধাক্কা দিল, পরেশের হাতটা ঠেলে সরিয়ে দিল। বনশূয়রের মতো গোঁ গোঁ করে পথ করে নিয়ে ক্লাসে গিয়ে ঢুকল হোরো।

সেই দিন হোরোকে আমরা ভাল করে চিনলাম। পাদরীদের ক্রীতদাস, মনুষ্যত্ব-হীন, মর্যাদাশূন্য, মূর্খ জংলী হোরো। ভারতবর্ষকে চিনল না, একটু শ্রদ্ধাও করল না। চিনল শুধু ওর জঙ্গলটাকে। কিন্তু তোর জঙ্গলটা যে ভারতবর্ষের মধ্যেই রে! ভারতবর্ষের বাইরে তো নয়।

আট বছর পরের কথা। আমি লেপো থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগা। সকালবেলায় ক'জন বিরসাইট মুণ্ডা এসেছে হাজিরা দিতে। জেল থেকে আজই ওরা খালাস পেয়েছে। এখানে হাজিরা দিয়ে তারপর নিজের নিজের ডিহিতে ওরা চলে যাবে।

আইনের চক্ষে বিরসাইটরা অত্যন্ত সন্দেহভাজন মানুষ। প্রতি বছর হাঙ্গামা বাধায়। পুলিশকে ব্যতিব্যস্ত করে। জঙ্গল আইন মানে না, মহাজনদের পিটিয়ে তাড়িয়ে দেয়, চৌকিদারী ট্যাক্স দিতে চায় না। বাজারে বসলে তোলা দেবে না। জমি ক্রোক করতে গেলে আদালতের পেয়াদাকে টাঙি নিয়ে কাটতে আসে। দুবছর আগে একবার স্বরাজ ঘোষণা করেছিল বিরসাইট মুণ্ডারা। পাদরীকে মেরেছে, অনেকগুলি পুল ভেঙেছে। ওরমানঝির জঙ্গলে একটা খণ্ডযুদ্ধ হয়েছিল ওদের সঙ্গে পুলিশের।

সব শেষে হাজিরা লেখাতে যে উঠে এল, তার নাম রুনু হোরো।

ডায়েরির উপর থেকে চোখ তুলে লোকটার মুখের দিকে তাকালাম। তার মাথার চুলের জংলী খোঁপাটা রুক্ষ জটার চূড়ার মতো হয়ে গিয়েছে। গলায় ভেলা-ফলের একটা মালা, আদুড় গা, কোমরে ছোট্ট একটা কাপড় জড়ানো। হাতে একটা কাঁসার বালা। এই প্রাগৈতিহাসিক সজ্জার মধ্যে শুধু একজোড়া সুশানিত আধুনিক চোখ······।

বিস্ময় চাপতে গিয়ে তার মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে বললাম—স্টিফান হোরো!

লোকটা মিষ্টি হেসে বলল—না ঘোষ, আমি হলাম রুনু হোরো।

—তুমিও একজন বিরসাইট?

—আমি বিরসা ভগবানের শিষ্য!

—বিরসা ভগবান? সে কে?

—সে আমাদের গান্ধী ছিল ঘোষ। আমি তাঁকে চোখে দেখিনি, আমার বাবার

মুখে তাঁর কথা শুনেছি। ইংরাজের জেলখানার অন্ধকারে একজন কয়েদীর মতো মরে গিয়েছে আমাদের বির্‌সা ভগবান। তাঁর চেহারা দেখতে কেমন ছিল, জান?

—কেমন?

—যীশুখৃষ্টের মতন।

একটু চুপ করে থেকে হোরো বলল—আমাদের জঙ্গলে বাইরে থেকে অনেক পাপ এসে ঢুকেছে। তাই বির্‌সা ভগবান আমাদের সাবধান করে দিয়ে গিয়েছেন। তাঁর অনুরোধ কি ভুলতে পারি?

আমি ডাকলাম—স্টিফান হোরো!

হোরো প্রতিবাদ করল—বল, রুনু হোরো

চুপ করে গেলাম। হোরো নিজের থেকেই খুশি হয়ে নানা খবর জিজ্ঞাসা করল—ইন্দু কোথায়? পরেশ কি করছে?

চারদিকে একবার সাবধানে তাকিয়ে নিয়ে হোরোকে প্রশ্ন করলাম—এত রোগা হয়ে গেলে কেন হোরো?

হোরো—আমার টি-বি হয়েছে।...আচ্ছা, এবার যাই আমি।

একটা কথা জানবার জন্য মনটা ছটফট করছিল। তবু সঙ্কোচ কাটিয়ে উঠতে পারছিলাম না। শেষে সাহস করে বলেই ফেললাম।

—একটা খবর জানতে বড ইচ্ছা করছে, হোরো।

হোরো—বল।

জিজ্ঞাসা করলাম—চির্‌কি মুরমু কোথায়?

হোরো একটু হেসে নিয়ে শান্তভাবে উত্তর দিল—জা না বুঝি? ফাদার লিগুনের মিশনে চলে গিয়েছে চির্‌কি। খৃস্টান হয়েছে চির্‌কি। এখন হাজারিবাগের কনভেণ্টে থাকে।

স্টিফানের চোখের দৃষ্টিটা চিকচিক করে উঠল, তীক্ষ্ণ তীরের ফলার মতোই, কিন্তু জলে ভেজা। আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করা হলো না, স্টিফানও নিঃশব্দে চলে গেল।

কাউকে মুখ ফুটে বলতে লজ্জা করবে, একটা ভুলের স্মৃতি কিছুক্ষণের জন্য কাঁটার মতো মনের মধ্যে বিঁধছিল। হয়তো আমরাই একেবারে নিরপেক্ষ থেকে চতুর্থ পাণিপথের যুদ্ধে স্টিফানকে হারিয়ে দিয়েছি। আর স্টিফানও সেই পরাজয়ের দুঃখে বনবাসে চলে গেল।

মা হিংসীঃ

'অজস্র প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে যে, আসামী গিরধারী গোপ বহুদিন আগে থেকেই হিংস্র হয়ে উঠেছিল। বর্তমান মামলা আসামীর সেই বিকৃত জীবন ও স্বভাবের চরম পরিণাম। পৃথিবীতে পত্নীনির্যাতক নামে এক ধরনের লোক দেখা যায়, আসামী

গিরধারী বোধহয় নিষ্ঠুরতায় সেই অপমানবদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর অন্যতম। প্রতিদিন ও প্রতিকথায় সে তার স্ত্রীকে অকথ্য প্রহার অত্যাচার ও নির্যাতন করত।'

চারজন অ্যাসেসর অবিচল আগ্রহ নিয়ে ছোট ছোট বিষণ্ণ পাথরের মূর্তির মতো স্থির হয়ে বসেছিল, আর দায়রা জজের রায় শুনছিল।

রায় পড়তে পড়তে দুতিন মিনিট পর পর দায়রা জজ যেন ঢোঁক গিলবার জন্য থেমে যাচ্ছিলেন। রুদ্ধ শ্বাসবায়ু মুক্ত করে দিয়ে নতুন বাতাসে দম ভরে নিচ্ছিলেন।

একটা শব্দহীন ভিড আদালতকক্ষে জমাট হয়ে দাঁড়িয়েছিল। প্রাণের ধুকপুক শব্দগুলি যেন প্রত্যেকের বুকের কোটরে আড়ষ্ট হয়ে রয়েছে। প্রত্যেকের নিঃশ্বাস থেকে, প্রত্যেকের চোখের দৃষ্টি থেকে কিছুক্ষণের জন্য সকল চঞ্চলতা যেন নির্বাসিত, যেন একটু নড়ে উঠলেই এই মুহূর্তের শোকাক্রান্ত ছন্দের লয় ক্ষুণ্ণ হবে। শুধু ব্যস্ত ছিল পাংখাকুলিটা, মেঝের উপর প্রায় চিৎপাত হয়ে শুয়ে, যেন আক্রোশের সঙ্গে অবিরাম পাখার দড়ি টানছিল। এজলাসের মাথার উপর পাখার ঝালর একঘেয়ে শব্দ করে চলেছে—ঝট্‌পট্‌ ঝট্‌পট্‌ ঝট্‌পট্‌। আজকের কাহিনীর সকল যন্ত্রণাকে যেন ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটে তাড়াতাড়ি বিদায় করে দিতে চায় ঐ পাখা।

এক-একটা বিরামের পর, রায় পড়তে গিয়ে দায়রা জজের গলাটা অস্পষ্টভাবে ঘড়ঘড় করে, পরমুহূর্তেই বেশ স্পষ্ট ও তীব্র হয়ে ওঠে।

'আসামী গিরধারী গোপের এই হিংস্রতার পিছনে একটা ইতিহাস আছে। আসামী ইচ্ছা করেই নিজেকে হিংস্র করেছিল, বেশ ভেবে-চিন্তে সে এই পথ ধরেছিল, তার মনের ভিতর একটি সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য ছিল। আসামী গিরধারী তার প্রতিবেশী সহদেব গোপের তরুণী পত্নী শনিচরার প্রতি আকৃষ্ট ছিল। হাবেভাবে ইঙ্গিতে এবং স্পষ্ট ভাষায় সে বহুবার শনিচরীর প্রতি প্রণয় প্রস্তাব করেছে। গিরধারীর ধারণা হয় যে, তার নিজ বিবাহিত পত্নী রাধিয়া যতদিন তার ঘরে আছে, ততদিন শনিচরীর প্রতি তার ঐ অভিলাষ সফল হবার আশা নেই। রাধিয়া তার পথের কাঁটা। রাধিয়ার উপর আসামীর সকল অত্যাচারের রহস্য হলো, পথের কাঁটাকে সে দূরে সরিয়ে দিতে চেয়েছিল।'

'আসামী বলেছে যে, সে তার স্ত্রী রাধিয়ার চরিত্রে সন্দেহ করত। আসামীর সব সময় আশঙ্কা ছিল যে, রাধিয়া তাকে বিষ খাওয়াবার চেষ্টায় আছে। সেই হেতু আসামী তাকে মারধর করেছে, তাড়িয়ে দিতে চেয়েছে। আসামার স্ত্রী রাধিয়া জেরার উত্তরে বলেছে যে, আসামী তাকে কখনো মারধর করেনি। এই দুই উক্তিই অবিশ্বাস্য।'

মুখ তুলে তাকাল গিরধারী। কাঠের খাঁচার মতো আসামীর ডক, তার মধ্যে গুটিসুটি হয়ে সম্মুখের ঘটনার স্পর্শ থেকে নিজেকে আড়াল করে আর চুপ করে বসেছিল গিরধারী গোপ! জজ সাহেবের বর্ণিত কাহিনীর সঙ্গে একমাত্র ওরই যেন এতক্ষণ কোন সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু হঠাৎ মুখ তুলে তাকিয়েছে গিরধারী। ওর দুচোখে একটা অদ্ভুত রকমের কৌতূহল ফুটে উঠেছে। ওর সমগ্র জীবনের এলো-

মেলো অর্থহীন ও ভাঙাছেঁড়া ভাষাগুলি সুন্দর একটা কাহিনী হয়ে গিয়েছে। হোক না ইংরাজী ভাষা, প্রত্যেকটি ধ্বনিতে একটা নতুনত্ব আছে। রাধিয়া। রাধিয়া। জজসাহেব উচ্চারণ করছেন, এই নামটার কোন ইংরাজী করা যায় না। ঐ নামটাকে বদলানো যায় না।

'শেষ পর্যন্ত রাধিয়া টিঁকে থাকতে পারেনি। আসামীর হাতে নিগ্রহ অসহ্য হওয়ায় সে বাপের বাড়ি চলে যায়। তারপর এক মাসের মধ্যে ঘটনার মোড় অন্য-দিকে ঘুরে যায়।

'আসামীর প্রস্তাবে শনিচরী রাজী হয়নি। গত অক্টোবরের পয়লা তারিখে, ভোরবেলায় কুয়াশার মধ্যে শনিচরী জল আনবার জন্য কলসীহাতে গ্রামের বড় ইঁদারার দিকে চলেছিল। পথের পাশে আখের ক্ষেতের ভিতর আসামী গিরধারী একটা হেসো নিয়ে অপেক্ষায় ছিল। ঠিক হিংস্র প্যান্থারের মত গিরধারী আখের ক্ষেত থেকে লাফ দিয়ে বের হয়, শনিচরীর গলার উপর তিনটি পোঁচ দেয়। শনিচরী সেইখানে দাঁড়িয়ে একবার চিৎকার করে, তারপরেই প্রাণহীন হয়ে পড়ে যায়।

'গিরধারী গোপ যখন এই কাজ করছিল, গ্রামের তিনজন চাষী তাকে দেখতে পায় ও চিনতে পারে। আসামী পালিয়ে গিয়ে ফেরার হয়। পাঁচদিন পরে কাটিহার বাজারে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

'আসামী তিনবার অপরাধ স্বীকার করেছে, তিনবার অপরাধ অস্বীকার করেছে। সকল সাক্ষ্য প্রমাণ ও তদন্তের হিসাব নিলে এ বিষয়ে তিলমাত্র সংশয় থাকে না এবং সিদ্ধান্ত করতে হয় যে, গিরধারী গোপ শনিচরীকে বেশ একটা মতলব করে আর প্রতিহিংসাবশে খুন করেছে।

'এক্ষেত্রে আসামীর প্রতি সুবিচার করার জন্যই আমি তাকে চরম দণ্ড—প্রাণ-দণ্ড দিলাম।'

ঝটপট, ঝটপট, ঝটপট—ঝালর-লাগানো প্রকাণ্ড পাখাটা সশব্দে দুলতে থাকে। আদালত-ঘরে আর কোন শব্দ ছিল না। জনতা শুধু নিষ্পলক চোখে তাকিয়েছিল গিরধারী গোপের মূর্তিটার দিকে। পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়স, রোগা চেহারার গির-ধারী। চোখের কোল দুটো কালো, যেন বেশ মোটা সুর্মা লেপে দেওয়া হয়েছে। দু হাতে হাঁটু দুটোকে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে পা দোলাচ্ছিল গিরধারী।

জজসাহেবের গলা ঘড়ঘড় করে উঠল, হিন্দী ভাষায় বললেন—'আসামী গির-ধারী গোপ, তোমার অপরাধ সবুদ হয়েছে, তুমি মুসাম্মত শনিচরীকে খুন করেছ। মহামান্য সরকারের ফৌজদারী দণ্ডবিধির ৩০২ ধারার নির্দেশ-মতো আমি তোমাকে প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলাম। তোমাকে দড়িতে ঝুলিয়ে দেওয়া হবে, যতক্ষণ না তোমার প্রাণ শেষ হয়ে যায়।'

—বহুৎ আচ্ছা!

গিরধারী উত্তর দিল। শানিত বিদ্রূপের হিংসামাখা একটা ক্ষুদ্র প্রতিধ্বনি যেন আদালত-ঘরের স্তব্ধতাকে খান্‌খান্ করে দিল। ডকের চারদিকে পুলিশেরা উঠে

দাঁড়াল। উকিল-মোক্তারের দল একে একে আসন ছেড়ে বাইরে চলে গেল। জনতা টলমল করে একবার ডকের দিকে কৌতুহলের আবেগে ঝুঁকে পড়ল। পুলিস বাধা দিয়ে জনতা সরিয়ে দিতে থাকে—আগে চলো! আগে চলো! রাস্তা ছাড়ো, খবরদার!

কোমরে দড়ি, হাতে হাতকড়া, গিরধারী গোপ আদালত-ঘর ছেড়ে হেঁটে চলল। তার আগুপিছু দু'দিকে প্রহরী। দু'পাশে তিন-তিনজন করে বন্দুকধারী পুলিশ। গিরধারীর প্রতিটি পদক্ষেপ শান্ত ও নিভুর্ল। কিন্তু প্রহরীদের উৎকণ্ঠা ও ব্যস্ততার সীমা ছিল না। আদালতের সিঁড়ি থেকে অপেক্ষমান হাজতগামী পুলিশ-লরিটা পর্যন্ত বড়জোর দেড়শো গজ পথ। এইটুকু পথ পার হতে হবে, তবু হাবিলদার তিনবার অ্যাটেনশন আর দশবার লেফ্‌ট রাইট হাঁক দেয়। ধুপ ধাপ বুট ঠোকাঠুকি চলে। তবু এতদিনের প্যারেডে অভ্যস্ত পায়ের কদম বার বার ভুল হয়ে যায়। এদিকে দু'জন পুলিশ হুমড়ি খেয়ে এগিয়ে যায় তো ওদিকে একজন হোঁচট খেয়ে পিছনে পড়ে থাকে।

গিরধারীর কোমরের দড়ির একপ্রান্ত শক্ত করে মুঠোর মধ্যে ধরে এমন জোয়ান চেহারার সিপাহীটাও হাঁপাতে থাকে। হাবিলদারের হাতের ছড়ির ইঙ্গিতের তালে তালে বন্দুকধারীরা শরীর দুলিয়ে এক ঢঙে কদম ফেলবার চেষ্টা করে। স্বেদাক্ত কপালের রগ দপদপ করে কাঁপে। বড় বেশি উৎকণ্ঠা, বড় বেশি উদ্বেগ, ভয়ানক রকমের দায়িত্ব। সাধারণ আসামী নয়। এক জঘন্য খুনের আসামী, তার পরমায়ু নিলামে বিকিয়ে গিয়েছে আজ। তাই তার আজ এত দাম। তাই এত সাবধানতা। রোগা গিরধারী গোপের ছোট ফুসফুসটাকে লোহার আবরণ দিয়ে ঘিরে নিয়ে যেতে পারলেই ভাল ছিল। ওর গায়ে যেন এককণা ধুলো না লাগে, ওর কানে যেন পাখির ডাকের শব্দ না পৌঁছয়। কে জানে কোথা থেকে কোন্ ফাঁকে কোন্ বে-আইনী সূর্যের রক্তমাখা আলোক ওর চোখের দৃষ্টিকে উতলা করে দেবে? হয়তো থমকে দাঁড়াবে, আকাশের দিকে তাকাবে, নড়তে চাইবে না। গিরধারীর জীবনে আজ এই পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধ অবান্তর হয়ে গিয়েছে। আলগোছে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে গিরধারীকে। ফাঁসির আসামীর বুক যেন আনন্দে দুলে না ওঠে, ছিঁড়ে যেতে পারে। যেন চমকে না ওঠে—ফেটে পড়তে পারে। তাহলে এতবড় মামলার ঘটা, আইন-দুরস্ত পৃথিবীর এত বন্দোবস্ত, সব ভেস্তে যাবে। কোন রোগীকে, কোন মুমূর্ষুকে, কোন আহতকে এত সতর্ক সমাদরে কোনদিন তারা বহন করেনি।

পুলিশ-লরির ভিতর পা দিয়েই গিরধারী একবার বাইরের দিকে উঁকি দিয়ে দেখবার চেষ্টা করল। কাউকে যেন সে খুঁজছে।

হাবিলদার ব্যস্তভাবে বলল—উঁহু, বসে পড। দেখবার মতো কিছু নেই।

গিরধারী হেসে ফেলল—আপনি ঠিক বলেছেন হাবিলদার সাহেব। আর দেখবার কিছু নেই, কেউ আসেনি।

আদালত এলাকার সীমা ছাড়িয়ে পুলিশ-লরি দ্রুতবেগে দৌড়ে চলেছে। প্রহরীরা যেন একটু স্বস্তি ফিরে পেয়েছে। আসামী লোক ভাল। কোন দৌরাত্ম্য করল না। আসামী একেবারেই ছিঁচকাঁদুনে নয়, একবারও একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল না, হা-হুতাশ করল না। এই ধরনের আসামীর হেপাজত নিতে বেশ ভাল লাগে। কোন হাঙ্গামা সইতে হয় না।

মাথার পাগড়ি খুলে পাশে রাখল সিপাহীরা। কপালের ঘাম মুছল। গিরধারীর দিকে একটু করুণাভরা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তারা বার বার তাকিয়ে দেখতে থাকে। মনে হচ্ছে, লোকটার প্রাণ বেশ পোক্ত ধাতুতে তৈরী, একটুও ঘাবড়ায়নি।

অর্জুন সিং বলে—শেষ পর্যন্ত এই রকম দেমাক নিয়ে টিঁকতে পারলে ভাল। কোন কষ্ট পাবে না।

হাবিলদার সন্দিগ্ধভাবে উত্তর দেয়—হুঁ।

ভগীরথ পাণ্ডে হাতের চেটোয় এক-টিপ খৈনি নিয়ে জোরে জোরে টিপতে আরম্ভ করে। আলোচনায় যোগ দেয়—হ্যাঁ, আর ঘাবড়ে গিয়েই বা লাভ কি? জোরসে রাম নাম কর, আর শখসে ঝুলে পড়। ভয় করবার কিছু নেই।

ঠোঁট কুঁচকে গিরধারী আর একবার হাসল। সিপাহীদের দিকে তাকিয়ে যেন একটু তাচ্ছিল্য করেই বলল—আপনারা কেন এত মাথা ঘামাচ্ছেন? মনে হচ্ছে, আপনারাই ঘাবড়ে গিয়েছেন। বড় বেশি প্রেম দেখাচ্ছেন। কিন্তু জেনে রাখুন, আমি ফাঁসি যাব না।

সিপাহীরা একটু অপ্রস্তুত হয়ে শুকনো মুখে হাসতে থাকে—মাপ কর ভাইয়া। বেশ, তোমার কথাই ঠিক। তোমার সঙ্গে তর্ক করার ইচ্ছা নেই আমাদের।

হাবিলদার গিরধারীর মুখের দিকে তীব্র একটা দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে রইল। তারপরেই পাশের সিপাহীর কানের কাছে ফিস্‌ফিস্ করে বলল—দেখছ, ওষুধ ধরে গিয়েছে। এরই মধ্যে মাথার গোলমাল শুরু হলো। হতেই হবে, মানুষ তো আর লোহার তৈরী নয়।

কনষ্টেবল সাকির আলি বলে—বোধহয় আপীল করবে বলে ঠিক করেছে।

হাবিলদার ঠাট্টা করে—হুঁ, আপীল করবে। ওর সংসার বিক্রী করলে দশটা টাকাও হবে না। এক নম্বরের দরিদ্দর, আপীল করবে কোথা থেকে?

অর্জুন সিং—তবে ও কি বলতে চায়?

হাবিলদার—বলতে চায় ওর মাথা আর মুণ্ডু। বুদ্ধি বিগড়ে যাচ্ছে, আর কদিনেরই মধ্যেই...।

গিরধারী হঠাৎ এক-টিপ খৈনি চায়। হাবিলদার একটু দয়ার্দ্রস্বরে আপত্তি জানায়—মাপ কর ভাইয়া।

গিরধারী আবার ঠাট্টা করে—দিয়ে ফেলুন সিপাহাজি, আমি এখনি মরছি না। কোন ভয় নেই আপনাদের, হাজত পর্যন্ত বেঁচে বেঁচে পৌছে যাব। আপনাদের মাথার পাথর নেমে যাবে।

সিপাহীরা সবাই চুপ করে থাকে। হাবিলদার বলে—আমাদের কাছে মেহের-বানি করে কিছু চেয়ো না গিরধারী। এই তো আর কিছুক্ষণের মধ্যে হাজতে পৌঁছে যাবে। জেলরবাবুর কাছে আরজি ক'রো, যা চাইবে সব পাবে।

গিরধারী একটা অহঙ্কারের সুরে উত্তর দেয়—আমি কিছুই চাইব না। কিছু দরকার নেই আমার। আমি সব পেয়ে গিয়েছি। বড় খুশি লাগছে সিপাহীজি।

প্রহরী পুলিশদের মধ্যে কানাকানি আলোচনা হয়—এত টনটনে জ্ঞান ভাল নয়। এরাই শেষপর্যন্ত বেশি ভেঙে পড়ে। এখন তো শুধু জেদের জোরে ফরফর করছে, লম্বা লম্বা বুলি ঝাড়ছে। আর দুটো দিন পার হোক, অন্ধ মোষের মতো গরাদে মাথা ঠুকবে আর গোঁ গোঁ করবে। ফাঁসির শাস্তি, এ কি ঠাট্টার কথা রে ভাই!

গিরধারী বলে—আমি সব শুনতে পাচ্ছি সিপাহীজি। যত খুশি আফসোস করুন আপনারা। কিন্তু আমি জানি. আমার ফাঁসি হবে না।

গিরধারীর কথাবার্তায় পাগলামির কোন আভাস নেই। কিন্তু এত জোর গলায় সে যে কথা বলছে, সেটা প্রলাপ ছাড়া আর কি হতে পারে? প্রহরীদের সংশয় আর কৌতূহল একসঙ্গে মনের মধ্যে প্রবল হয়ে উঠছিল। কোথা থেকে এই বিশ্বাস পেল গিরধারী?

মোটরলরি একটা চক পার হয়ে বাঁদিকে মোড় ঘুরল। মুখ ঘুরিয়ে ডানদিকের পথের দিকে যেন একটা তৃষ্ণার্ত দৃষ্টি প্রসারিত করে গিরধারী কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। লাল কাঁকরের একটা কাঁচাসড়ক চলে গিয়েছে এঁকেবেঁকে, দুপাশে দু'সারি আম শাল আর তেঁতুলের ছায়া নিয়ে। অবাধ অবারিত মাঠের বুকের উপর দিয়ে সড়কটা ডাইনে বাঁয়ে এক-একটা ছোট ছোট গ্রাম ছুঁয়ে দিগ্বলয়ের কোণে গিয়ে যেন মিলিয়ে গিয়েছে।

গিরধারী জিজ্ঞাসা করল—এই রাস্তা কোন্‌দিকে গিয়েছে হাবিলদার সাহেব?

হাবিলদার—অনেক দূর গিয়েছে। রফিনগরের বাজার ছাড়িয়ে, বাবুঘাট থানা পার হয়ে একেবারে মুঙ্গের জেলায় গিয়ে পড়েছে। কেন বল তো?

গিরধারী—মিঠাপুর গাঁ এই পথে পড়ে?

হাবিলদার—হ্যাঁ। কিন্তু মিঠাপুরের সঙ্গে তোমার কি সম্পর্ক?

গিরধারী—আমার শ্বশুরবাড়ি ঐ গাঁয়ে।

প্রহরীর দল চাপাস্বরে একসঙ্গে আফসোস করে—আর তোমার শ্বশুরবাড়ি!

গিরধারী মুখ ঘুরিয়ে আবার মিঠাপুরের কাঁচাসড়কের দিকে স্থির দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে থাকে। পুলিশদের কোন মন্তব্য বোধহয় কানে শুনতে পাচ্ছে না গিরধারী। দূরের সর্পিল পথের মাটির সঙ্গে গিরধারীর সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাম যেন পাকে পাকে জড়িয়ে পড়েছে। ওর চোখ-মুখে সেই রকম একটা মুগ্ধ আবেশ থমথম করছিল।

.আবার সোজা হয়ে বসতেই অর্জুন সিং প্রশ্ন করল—সত্যি কথা বল তো গির-ধারী, মেয়েটাকে তুমি খুন করেছিলে?

গিরধারী—হ্যাঁ, আমি আগেই ওকে জানিয়ে দিয়েছিলাম যে, একদিন সব দেনা-

পাওনার হিসাব নেব। যেদিন সুবিধা পেলাম, হিসাব নিয়ে নিলাম।

হাবিলদার—বড় ভুল করেছিলে গিরধারী।

গিরধারী যেন ভুল বুঝতে পেরেছে, তেমনি অনুশোচনার সুরে জবাব দিল—হাঁ, হাবিলদার সাহেব, রাত্রিবেলায় একটু নিরালা জায়গাতে কাজ খতম করা উচিত ছিল, কিন্তু সকাল হয়ে গিয়েছে বুঝতে পেরেও মনের রাগকে বোঝাতে পারলাম না। লোকে দেখে ফেলল। নইলে······।

খুন করেছে, তার জন্য কোন অনুতাপ নেই গিরধারীর মনে। এবিষয়ে সে নিজেকে আজও নির্ভুল মনে করে। শুধু ভুল, সে ধরা পড়ে গিয়েছে। অপরাধীর দীনতা লজ্জা ও মর্মপীড়ার কোন চিহ্ন আবিষ্কার করা যায় না গিরধারীর কথায়।

সাকির আলি আশ্চর্য হয়ে বলে—আমি বাস্তবিক এই কথা ভেবে আশ্চর্য হই, আজ পর্যন্ত কোন ফাঁসির আসামীকে তার কসুরের জন্য দুঃখ করতে দেখলাম না।

হাবিলদার—আর দুঃখ করার মতো মন ওদের থাকে না ভাই। নিজের কসুরের কথা ওরা একদম ভুলে যায়।

অর্জুন সিং বলে—ফাঁসির হুকুম না হলে, মানুষের মতো মনটা তবু থাকে। নিজেকে পাপী বলে বুঝতে পারে, এক আধটুকু আফসোস করেও। কিন্তু···।

হাবিলদার একটু সম্ভ্রম ও সঙ্কোচে আমতা-আমতা করে বলে—একটা প্রশ্ন করব গিরধারী, মাপ করো ভাই।

গিরধারী—বলুন।

হাবিলদার—তোমার জেনানা রাধিয়া কি সত্যিই খারাপ হয়ে গিয়েছিল?

গিরধারীর মুখটা কঠিন হয়ে উঠল, শান্তভাবে বলল—সে খবর সে জানে আর আমি জানি। আপনাদের শুনে কি লাভ?

হাবিলদার তীক্ষ্ণ মেজাজে বেশ চড়া গলায় বিদ্রূপ করে—আরে তুমি তো দুনিয়াকে সে খবর শুনিয়ে দিয়েছ। নিজেই আদালতে আর পুলিশের কাছে বলেছ···।

গিরধারীর মুখটা অসহায়ের মত করুণ ও বিষণ্ণ হয়ে ওঠে। অনুনয়ের সুরে প্রশ্ন করে—হ্যাঁ, মেহেরবানি করে বলুন তো হাবিলদারসাহেব, আমি কি বলেছি। আমার ঠিক মনে পড়ছে না।

হাবিলদার—তুমি বলেছ যে, তোমার জেনানা রাধিয়া তোমাকে বিষ খাওয়াবার চেষ্টা করত।

কথাগুলিকে যেন মনের সব আগ্রহ দিয়ে বরণ করে নিচ্ছিল গিরধারী। শুনতে শুনতে সারা মুখে বিচিত্র এক পরিতৃপ্তি উজ্জ্বল হয়ে ছড়িয়ে পড়ছিল। নৌকার ঘুমন্ত যাত্রী যদি হঠাৎ জেগে উঠে ঘাটের মাটি নিকটে দেখতে পায়, সফল ভরসার আনন্দে দীর্ঘ অপেক্ষার ক্লান্তি মুহূর্তে নিঃশেষ হয়ে যায়, গিরধারীর দৃষ্টিটা যেন সেই রকমের। এক প্রচণ্ড অন্ধকারের স্রোতের টানে অবধারিত অন্তিমের দিকে টেনে নিয়ে চলেছে গিরধারীকে, কিন্তু গিরধারীর মনে কোন শঙ্কা নেই, তার হাতের মুঠোয় যেন একটা শক্ত কাছির অবলম্বন রয়েছে, দূর তটভূমির হৃদয়ের এক কঠিন

আশ্বাসের সঙ্গে বাঁধা। মাঠের পর মাঠ পার হয়ে আরও দূরে, মুঙ্গের রোডের এক-পাশে মিঠাপুর গ্রাম। গিরধারীকে ফাঁসির অপমান ও বেদনা থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে, মিঠাপুরের এক মাটির ঘরের নিভৃতে একটা বুকভরা আকুলতা এখন প্রস্তুত হচ্ছে, উপায় খুঁজে বের করছে। সব বুঝতে পেরেছে রাধিয়া, এতখানি বুদ্ধি তার আছে।

সাকির আলি প্রশ্ন করে—বল গিরধারী, কথাটা কি সত্য?

গিরধারী প্রশ্ন শুনে চমকে ওঠে। ঘোর মিথ্যার আবরণ দিয়ে ঢাকা এ কথার অর্থটা কি ধরা পড়ে গেল? সামলে নিয়ে বেশ শান্তভাবে গিরধারী উত্তর দেয়—সত্য না মিথ্যা, সে খবর আমি জানি আর সে জানে।

হাবিলদার মন্তব্য করে—এটা কিন্তু একেবারে মিথ্যা কথা বলেছ গিরধারী। নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্য জঘন্য একটা মিথ্যা কথা বললে, কিন্তু কোন লাভ হলো না। না বাঁচল নিজের প্রাণ, না রইল নিজের স্ত্রীর ইজ্জত।

অর্জুন সিং কর্কশস্বরে বলে—একবার ভেবে দেখলে না, কি ভাবল তোমার বউ। বেচারী নিজের কানে তোমার ঐ কথা শুনেছে।

অনুযোগ আর ধিক্কার শুনে গিরধারী একটুও কুণ্ঠিত হয় না, তার চেহারার উৎফুল্লতা যেন নতুন বিশ্বাসে আরও সজীব হয়ে ওঠে। মনের ভিতর আদালত-ঘরের ছবিটা অস্পষ্টভাবে দেখতে পায় গিরধারী। কালো কালো কতগুলি নরমুণ্ড তাকে ঘিরে ধরে রয়েছে। জজ আর উকিলেরা প্রশ্ন করছে। প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিল গিরধারী—রাধিয়া আমাকে বিষ খাওয়াবার চেষ্টা করত। আমি জানি একদিন না একদিন সে নিশ্চয় আমাকে বিষ খাওয়াবে। আমি তাই……।

আদালত-ঘরের এক কোণে আঁচল দিয়ে মুখ ঢেকে বদরি চাচার পাশে চুপ করে বসেছিল রাধিয়া। হঠাৎ গিরধারীর এই অদ্ভুত প্রলাপ শুনতে পেল রাধিয়া। চোখ তুলে তাকাল গিরধারীর ধূর্ত মূর্তিটার দিকে। কয়েকটি মুহূর্তের মতো গিরধারীর চোখের তারা দুটো রাধিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে কে-জানে কিসের আবেদন জানাবার জন্য স্থির হয়ে রইল।

সব বুঝতে পারে রাধিয়া, গিরধারীর শেষ কামনার নিবিড় আগ্রহ ঐ প্রলাপের আড়ালে কিসের স্পষ্ট ইশারা জানিয়ে দিচ্ছে। রাধিয়ার হাতের কাঁচের চুড়িগুলি একবার শব্দ করে বেজে ওঠে। শুনতে পায় গিরধারী। বুঝতে পারে গিরধারী, তাহলে বুঝতে পেরেছে রাধিয়া। গিরধারীর সকল উদ্বেগ এক সাফল্যের গর্বে নিশ্চিহ্ন হয়ে উড়ে যায়। ফাঁসির মৃত্যুর অসম্মান থেকে গিরধারীর অন্তরাত্মা উদ্ধার পাবার জন্য রাধিয়ারই কাছে আপীল জানাচ্ছে, আবছা ভাষার সেই অর্থ পৃথিবী ধরতে না পারুক রাধিয়া নিশ্চয় ধরেছে।

জেলের ফটক দেখা যায়। বুড়োবটের ছায়ায় ফটকের দাঁতগুলি অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। উপরে বটের পাতার আড়ালে শত শত বাদুড় ঝুলছে। নীচে বন্দুক কাঁধে •পায়চারি করছে সান্ত্রী। ফটকের পাশে একটা কাঠের ত্রিভুজের মধ্যে পিতলের ঘণ্টা

ঝুলছে।

মোটরলরি ক্রমে মন্থর হয়ে ফটকের সামনে এসে একেবারে থেমে গেল। ঝটপট মাথায় পাগড়ি গুঁজে, লাঠি খাতা বন্দুক আর গিরধারীকে নিয়ে প্রহরীরা লরি থেকে বুড়োবটের ছায়ায় দাঁড়াল।

অর্জুন সিং-এর মনটা একটু করুণাপ্রবণ। গিরধারীর পাশে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে বলল—আর সময় নেই গিরধারী। এইবার আমাদের হেপাজত ছেড়ে তোমাকে ভিতরে ঢুকে পড়তে হবে। ধরিত্রীকে প্রণাম করে নাও।

গিরধারী বিস্মিতভাবে অর্জুন সিংয়ের দিকে তাকাল। অর্জুন সিং বলল—সবাই করে ভাইয়া। নাও, তাড়াতাড়ি একটু ধুলো কপালে ছুঁইয়ে নাও। আর সুযোগ পাবে না।

ফটকের ছোট দরজাটা তখন কঁকিয়ে কঁকিয়ে খুলছে, গিরধারীর জীবনের রথ এসে পথের শেষে পৌঁছে গিয়েছে। গিরধারীর জীবনে আর উল্টোরথের আশা নেই। পিছনের দুনিয়ার মাটি সরে যাবে এই মুহূর্তে। আর সামনে, ঐ লোহার গরাদের ওপারে প্রণাম করার মতো মাটি আর পাওয়া যাবে না। কিন্তু অর্জুন সিং দুঃখিত হয়ে দেখছিল, গিরধারী চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

হাবিলদার বললো—চল।

চললো গিরধারী, ফটক পার হয়ে অন্য পৃথিবীর বুকের ভিতর গিয়ে ঠাঁই নিল। সিপাহীরা ভিতর থেকে ফিরে এসে যখন আবার ফটকের কাছে দাঁড়াল, ঢং ঢং করে বাজল পাঁচটা ঘণ্টা। বুড়োবটের ছায়া লম্বা হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে তখন। পুলিশ-লরির ইঞ্জিনটা স্টার্ট নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফোঁপাচ্ছিল। ফটকের মুখ থেকে বের হয়ে এসে প্রহরীর দল অলসভাবে আবার লরির ভিতর একে একে উঠে বসল—হাবিলদার, অর্জুন সিং, সাকির আলি ও আর সবাই। শুধু গিরধারী নেই, জ্যান্ত গিরধারীর প্রাণ জেলরের কাছে জমা দিয়ে শুধু রসিদ নিয়ে ফিরে চললো প্রহরীর দল।

মোটরলরিটা আচমকা একবার বাম্প করে দ্রুত দৌড়ে চলে গেল।

পাঁচ হাত লম্বা পাঁচ হাত চওড়া নিরেট পাথর আর কংক্রিটের গাঁথুনি দিয়ে তৈরি খুপরির মধ্যে ভাগলপুরী কম্বলের উপর শুয়ে সে রাত্রে গিরধারী কি স্বপ্ন দেখেছিল, তা কেউ জানে না। কিন্তু সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে জেলের প্রত্যেক কর্মচারী, ওয়ার্ডার, সান্ত্রী আর কয়েদী বুঝতে পারল—এক অতি দুর্দান্ত ফাঁসির-আসামী এসেছে। জেলর থেকে আরম্ভ করে ওয়ার্ডার সান্ত্রী আর ডাক্তার, সবাইকে যা-খুশি টিটকারী দিয়েছে আর গালাগালি করেছে। একেবারে বেপরোয়া আসামী। মেথরের সঙ্গে রসিকতা করে শালা সম্পর্ক পাতিয়েছে। স্থূলাকার সান্ত্রী পাঁড়েজীকে একটা নতুন নাম দিয়েছে—বীর বৃকোদর।

তাঁতঘরের কয়েদীরা কাজ করতে করতে তখনো শুনতে পাচ্ছিল, সেলের মধ্যে

ফাঁসির আসামী গিরধারী গলা খুলে গান গাইছে—নজরিয়া লুভায় লিয়ে যায়, মন তিরছি! হাঁরে মন তিরছি!

কে জানে কিসের স্বপ্নে মাতোয়ারা হয়ে আছে গিরধারী। সারাদিন গোলমাল করে। মাঝে মাঝে চিৎকার করে বলে—কোন্ শালা আমার ফাঁসি দেবে দেখব।

আবার বিদ্রূপ করে বলতে থাকে—আহা! কত শখ! দড়িতে ঝুলিয়ে মারবে! পাগলা কুত্তা পেয়েছ, না?

প্রতিদিন খাবার নিয়ে হাঙ্গামা করে গিরধারী! একগ্রাস ভাত মুখে দিয়েই থু থু করে ফেলে দেয়।

সন্ধ্যা হতেই চেঁচামেচি আরম্ভ করে—মশারি চাই। উঃ কী ভয়ানক মশা। যেমন জেলের লোকগুলি তেমনি মশাগুলি।

সান্ত্রী পাঁড়েজী মেজাজের ধৈর্য কষ্ট করে অটুট রাখে। শান্তভাবে বোঝাতে চেষ্টা করে—এই রকম গোলমাল করো না, সব পাবে। ঘুমোও ঘুমোও।

আরও কিছুক্ষণ দাপাদাপি করে একটু শান্ত হয় গিরিধারী, ঝিমোতে থাকে, তারপর ঘুমিয়ে পড়ে। গরাদের বাইরে পাঁড়েজীর একটানা পাহারা ও বুটের শব্দ অন্ধকারে মচমচ করে। ঘণ্টা বাজে। পাহারা বদল হয়। ঘুমন্ত গিরধারীর বুকের প্রতিটি স্পন্দনকে সযত্নে পাহারা দেবার জন্য নতুন সান্ত্রী আসে।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে উঠে বসে গিরধারী। জিজ্ঞাসা করে—কত রাত হলো?

—এগারোটা। চুপ করে ঘুমোও। সান্ত্রী দিলবর মিঞা উত্তর দেয়।

গিরধারী তবু জেগে জেগে কিছুক্ষণ উসখুস করে। তারপর ঘুমিয়ে পড়ে অঘোরে। সমস্ত পৃথিবীর জীবনযন্ত্রের ছন্দের সঙ্গে নিঃশ্বাসে ও প্রশ্বাসে তাল রেখে সেই রাতের কোটি কোটি মানুষের মতো ঘুমোতে থাকে গিরধারী।

তু' মিনিট পরেই জেগে ওঠে গিরধারী, সান্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বলে—খুব ভালো ঘুম হলো সিপাহীজি! আঃ!

দিল্‌বর মিঞা বলে—আবার ঘুমোও।

গিরধারী বিরক্ত হয়ে বলে—আর কত ঘুমোব সিপাহীজি!

হাইকোর্টের সহি নিয়ে লাল চিঠি এসে গিয়েছে। ওয়ার্ডার আর সান্ত্রীরা সকলেই সে খবর রাখে। গিরধারীর আয়ুর মুহূর্তগুলি এইবার হিসাব করে বেঁধে দেওয়া হয়েছে। এইবার চলে যেতে হবে।

ব্যারাকের রসুইঘরে রান্না করতে করতে ওয়ার্ডারেরা আলোচনা করে—তুদিন থেকে গিরধারী গোপ একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে। আরও ঠাণ্ডা হওয়া এখনো বাকি আছে। এখনো কিছু কিছু ইয়ার্কি করে।

—এখনো ওর বিশ্বাস যে ওর ফাঁসি হবে না।

—তাই ভাল, তাই ভাল। ঐ বিশ্বাস নিয়েই বাকি ক'টা দিন পার করে দিক্।

—যাই বল গিরধারী গোপ কিন্তু বড় শক্ত খুনী। এদের যাওয়াই ভাল।

—আরে নেহি ভাই, তাতে কোন লাভ হয় না।

—সব খুনীর যদি ফাঁসি হতো, তবে নাহয় বলা যেত, একটা নিয়ম আছে!

—যারা খুন করে ধরা পড়ে, তাদেরই শুধু ফাঁসি হয়।

—ভেজাল খাবার খাইয়ে কত লোককে খুন করা হচ্ছে, তাদের তো কই ফাঁসি হয় না?

—উল্টো তাদের লাইসেন্স দেওয়া হয়।

—গাঁজা আফিম খেয়ে কত লোক রক্ত শুকিয়ে মরে যায়। কই, কেউ তো বাধা দেয় না, বিচার করে না?

—কত লোকে ফুর্তি করে মোটরগাড়ি চালিয়ে কত লোক মারে।

—কিন্তু জেনে শুনে তো মারে না ভাই, ভুল ক'রে মারে!

—আরে হাঁ হাঁ। সব খুনই ভুল করে হয়। মেজাজের ভুল।

সান্ত্রী পাঁড়েজী পাহারায় এসে দেখল, ধীরস্থির হয়ে বসে আছে গিরধারী। এই রকম দৃশ্যই পাঁড়েজী আশা করছিল। মৃত্যুর ফাঁদে পড়ে প্রত্যেক অভিশপ্ত প্রাণ প্রথম কয়েকটা দিন যেন দুরন্ত হয়ে ওঠে আর বিদ্রোহ করে। তারপরেই ধীরে ধীরে নেতিয়ে পড়ে। শত আশ্বাসে ও প্রেরণায় তখন তাকে আর ঠেলে তুলতে পারা যায় না।

পাঁড়েজী বললো—লাল চিঠি তো এসে গিয়েছে গিরধারী।

গিরিধারী—হাঁ, পাঁড়েজী।

পাঁড়েজী—বাস্, ভয় করবার কিছু নেই। প্রেমসে রাম নাম কর।

গিরধারী শান্তভাবে উত্তর দিল—আপনি সান্ত্বনা দেবেন না পাঁড়েজী, আমার ফাঁসি হবে না।

সান্ত্রী পাঁড়েজি চুপ করে। এখনো মুক্তির স্বপ্ন দেখছে গিরধারী। সব দিকে এত টনটনে জ্ঞান, শুধু একটি ক্ষেত্রে গিরধারী একেবারে অপোগণ্ড শিশুর মতো বোকা। এর কোন কারণ খুঁজে পায় না পাঁড়েজি। হয়তো মাথার দোষ দেখা দিয়েছে গিরধারীর।

গিরধারী বলে—আমাকে এক টুকরো খড়ি যোগাড় করে দিতে পারেন পাঁড়েজি!

পাঁড়েজি—কেন?

গিরধারী—ছবি আঁকব।

পাঁড়েজি—জেলরবাবুকে বলব।

গিরধারী—জেলের গরুগুলি এত রোগা কেন পাঁড়েজি?

পাঁড়েজি—আমি জানি না।

গিরধারী—নিশ্চয় ভাল করে খাওয়ানো হয় না।

পাঁড়েজি—জানি না, আমি গয়লা নই।

গিরধারী—জেলরবাবু আসুক, আচ্ছা ক'রে দু'কথা শুনিয়ে দিতে হবে।

দুনিয়ার শখ আবদার দয়া আর মায়াগুলির জন্য গিরধারীর মনে যেন আরও বেশি করে একটা অদ্ভুত গরজ জেগে উঠেছে। আশ্চর্য হয় সান্ত্রী পাঁড়েজি।

গিরধারী আর গান গায় না। শুধু বার বার প্রশ্ন করে—কটা বেজেছে সিপাহীজি? আজ কত তারিখ?

এক-এক সময় ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিঝুম হয়ে থাকে গিরিধারী, তার অন্তর্লোকের পথে যেন কারও পায়ের শব্দ শুনছে। সে আসছে, সে এতক্ষণে নিশ্চয়ই রওনা হয়ে গিয়েছে। আর কি দেরি করতে পারে সে? মিঠাপুর থেকে লাল কাঁকরের সড়ক ধরে হেঁটে হেঁটে শান্তিময় মৃত্যুর উপঢৌকন নিয়ে রাধিয়া আসবেই। তার ইশারা বুঝতে কি ভুল করবে রাধিয়া?

না, না, খুব চালাক মেয়ে রাধিয়া। জীবনের সব কাজে রাধিয়া গিরধারীকে সাহায্য করেছে, আজ করবে না কেন?

শুধু একটি কাজে কোন সাহায্য করতে পারেনি রাধিয়া। কোন্ স্ত্রী-ই বা স্বামীর সেই পাগলামীতে সাহায্য করতে পারে। রাধিয়াও পারেনি কিন্তু রাধিয়ার জীবনের সেই একটিমাত্র অভিশাপকে গিরধারী হেসো দিয়ে নির্মূল করে দিয়েছে। তবে আর কেন? এখন তো পথে আর কোন কাঁটা নেই, স্বচ্ছন্দে রাধিয়া চলে আসতে পারে।

গিরধারীর বিশ্বাস একটুও বিচলিত হয় না। রাধিয়া ঠিক সময়-মতো পৌঁছে যাবে। ফাঁসির মৃত্যু থেকে রাধিয়া তাকে মুক্তি দেবে নিশ্চয়।

কিন্তু গিরধারীর স্বপ্ন বোধহয় মিথ্যে হতে চলল। জেলর ও ডাক্তার এসে দাঁড়ালেন সেলের কাছে। গিরধারীর ওজন নেওয়া হলো।

গিরিধারী কোন প্রশ্ন করার আগেই জেলর জানিয়ে দিলেন—কাল তোমার ফাঁসির দিন, গিরধারী গোপ।

গিরধারী চুপ করে রইল।

জেলর বললেন—যা খেতে টেতে চাও বল, সব মিলেগা।

গিরধারী জবাব দিল—কিছু না।

সেলের দরজা বন্ধ হলো।

দুপুর পর্যন্ত সেলের মেজের উপর গিরধারীর শীর্ণ মূর্তিটা কুঁকড়ে পড়ে থাকে। দেয়াল মেজে ছাত, সব নিরেট, কোথাও একটা ফুটো নেই যে সাপ হয়ে পালিয়ে যাওয়া যায়। কয়েদীদের খাওয়া হয়ে গিয়েছে বোধহয়, কাকের ঝাঁক এঁটো খাওয়ার জন্য কলরব করে উড়ে বেড়াচ্ছে বাইরে—শব্দ শোনা যায়।

হঠাৎ যেন নিজের বুকের কাছেই একটা শব্দ শুনে চমকে ওঠে গিরধারী। সেলের দরজা খুলে দিলবর মিঞা এসে খবর দিল—মোলাকাতে চল। তোমার জেনানা এসেছে।

না, স্বপ্ন মিথ্যা হয়নি। এক লাফে উঠে দাঁড়াল গিরধারী। মেজের উপর কম্বলটাকে এক লাথি মেরে পিছনে সরিয়ে দিল। গিরধারী যেন এই কারাগারের সব বন্ধন ছিন্ন করে চলেছে। আর এখানে ফিরে আসতে হবে না।

অফিস ঘরের পাশে, একটা গরাদের ওপারে এসে বসল গিরধারী। একজন

ওয়ার্ডারের সঙ্গে রাধিয়া ঢুকল অফিস-ঘরে।

এক দৌড়ে এসে গরাদের উপর যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল রাধিয়া। মেজের উপর জোরে মাথা ঠুকে ঢিপ করে একটা প্রণামও করল।

ফুঁপিয়ে কাঁদছিল রাধিয়া। চরম বেদনা ও হতাশার একটা প্রতিধ্বনি যেন টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ছিল। রাধিয়া বলে—ছিনিয়ে নিলে গো। তোমার খাবার ছিনিয়ে নিলে।

অতি নগণ্য কয়েকটা খাবার জিনিস। একটুখানি গুড়ের হালুয়া আর একটা পেঁড়া পাতায় মুড়ে নিয়ে এসেছিল রাধিয়া। কিন্তু স্বামীকে নিজের হাতের খাবার খাওয়াবার সেই শেষ সাধও সফল হলো না। ফটকের সান্ত্রীর কাছে সেই খাবার জমা রেখে আসতে হয়েছে।

জেলর রাধিয়াকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন—এর জন্য এত কান্না কেন? আরও ভাল খাবারের বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি। তুমিই নাম কর, কি খাওয়াতে চাও। রস-গোল্লা জিলিপী গজা—।

গিরধারী তাকিয়ে থাকে অদ্ভুতভাবে। একটা মৃত মানুষের চোখের কোটর দুটো যেন হাঁ করে রয়েছে। সে দৃষ্টিতে কোন অর্থ নেই, ভাষা নেই, আবেগ নেই, জ্যোতি নেই। আজ এতদিনে সত্যিকারের ফাঁসির হুকুম শুনতে পেয়েছে গিরধারী। রাধিয়ার নিজের হাতের তৈরী মধুর মৃত্যুর উপহার হাতের নাগালে পৌঁছল না। গিরধারীর মেরুদণ্ডটা কাঁপছে, বেঁকে যাচ্ছে, কট্‌কট্ করে বাজছে, যেন জীবনকাঠি ভাঙছে।

ভয়ার্ত ছোট ছেলের মত হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল গিরধারী।—বাঁচাও রে বাবা! বাঁচিয়ে দে রে বাবা!

সবাইকে আশ্চর্য করল গিরধারী। অদ্ভুত। গিরধারীর মতো এত শক্ত আসামী হঠাৎ এভাবে ভেঙে পড়ে কেন?

কেরানীবাবু ঘড়ি দেখলেন। মোলাকাতের সময় শেষ হয়ে গিয়েছে। দু'জন ওয়ার্ডার রাধিয়াকে হাত ধরে টেনে ফটকের বাইরে নিয়ে গেল।

সেই সন্ধ্যায় জেলের সমস্ত কয়েদী আশ্চর্য হয়ে শুনল, ফাঁসীর আসামী গিরধারীর ব্যাকুল চিৎকার আর কান্নার শব্দ। বধ্যভূমির গন্ধ পেয়ে একটা পশু যেন আর্তনাদ করছে।

সন্ধ্যা শেষ হয়। সান্ত্রী পাড়েজি পাহারায় আসেন। কান্না থামিয়ে গিরধারী কম্বলের উপর মুখ গুঁজে পড়ে থাকে।

রাত্রি আর অন্ধকার ক্রমে ঘনিয়ে ওঠে। সব নম্বর বন্ধ হলো। দেখা যায়, কল-ঘর থেকে একটু দূরে খোলা মাঠের উপর নতুন একটা বাতি জ্বলছে। ফাঁসির তক্তা পাহারা দিচ্ছে সান্ত্রী। ঠিক আছে, সব ঠিক আছে।

দড়ি পরীক্ষা করা হয়ে গিয়েছে। তিন মণ ওজনের বালির বস্তা ঝুলিয়ে দড়ির শক্তি টেস্ট করা হয়েছে। পোষা অজগরের মতো চর্বি-মাখানো দড়িটা এখন গুটিয়ে

পাকিয়ে পড়ে আছে অফিস ঘরের একটা সিন্দুকে তালাবন্ধ হয়ে।

আর একটা নম্বরের কুঠুরিতে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে পড়েছে জহ্লাদ বংশী দোসাদ। ফাঁসি প্রতি পাঁচ টাকা উপহার। আজ রাত শেষ হয়ে সকাল হলেই বংশী দোসাদের রোজগারের হিসাবে পাঁচ টাকা জমা হবে, ঘাতকতার মজুরি।

জেলখানার মাথার উপরে অন্ধকারে বুড়ো বটের পাতার ভিড় ছেড়ে মাঝে মাঝে বাদুড়ের ঝাঁক উড়ছে। টর্চ হাতে নিয়ে জেলর হাবিলদার আর সান্ত্রী রাউণ্ড দিয়ে গেলেন। সব ঘুমিয়ে পড়েছে, প্রত্যেকটি নম্বর নিঝুম। তাঁতখানা, কলঘর, ঘানি—তারপর বাঁ দিকে ঘুরে ঘাসের উপর দিয়ে হেঁটে সেলের কাছে এসে সবাই দাঁড়াল।

সেলের দরজা খুলে যায়।

শ্রান্ত ক্লান্ত গিরধারী উঠে বসে, একটা সেলামও জানায়।

জেলর জিজ্ঞাসা করলেন—কেমন আছ? ঘুম হয়েছে?

গিরধারী—হ্যাঁ বাবু।

জেলর—তবিয়ৎ ভাল আছে?

গিরধারী—হাঁ বাবু।

জেলর—খেয়েছ?

গিরধারী—হাঁ বাবু।

জেলর—বেশ বেশ। এখনও অনেক রাত আছে, ঘুমোও।

জেলরবাবু চলে যাবার জন্য পা বাড়িয়েই আর একবার দাঁড়ালেন। জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার কিছু বলবার আছে?

গিরধারী কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল—না।

জেলরবাবু চলে যাচ্ছিলেন। গিরধারী ডাকল—বাবু!

জেলর—কি?

গিরধারী—রোজ রাত্রিবেলা বাইরে গান হয় শুনতে পাই। কে গায়?

জেলর অপ্রস্তুতভাবে বলেন—আমার মেয়েরা গান গায়।

গিরধারী—কিন্তু আজ কেন দিদিদের গান শুনতে পেলাম না।

জেলর যেন তাঁর মনের মধ্যেই কিছুক্ষণের জন্য ছটফট করেন। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকেন। তারপর, কোন কথা না বলে বের হয়ে গেলেন। বন্ধ হলো সেলের দরজা। সেলের সামনে ডবল সান্ত্রীর পাহারা অন্ধকার আগলে দাঁড়িয়ে রইল।

আর-নিঃশব্দে বসে রইল গিরধারী।

সান্ত্রী পাঁড়েজি বলে—ঘুমোবার চেষ্টা কর গিরধারী।

গিরধারী বলে—কিছু তুলসীবচন শোনাতে পারেন পাঁড়জি?

পাঁড়েজি—রাম নাম কর গিরধারী। তুলসীবচনের সার হলো রাম নাম। কোন ভয় নেই।

—সীতারাম! সীতারাম। নিঃশ্বাসের সঙ্গে আস্তে আস্তে নাম উচ্চারণ করতে থাকে গিরধারী।

ভোরের আবছা অন্ধকারে জেল কম্পাউণ্ডের বাইরে সড়কের উপর গাছতলায় চুপ করে বসে ছিল রাধিয়া। একটা কুপিতা নিশাচরীর মূর্তি যেন সময় গুনতে গুনতে ভোর করে ফেলেছে, আর পালিয়ে যেতে পারেনি। রাধিয়ার কাপড় ধুলোয় লাল হয়ে গিয়েছে। রুক্ষ চুলগুলি এলোমেলো হয়ে আছে। সারা রাত যেন জেলখানার প্রত্যেকটি শব্দ উৎকর্ণ হয়ে পাহারা দিয়েছে রাধিয়া, চোখের পলক ফেলেনি। চোখ দুটো ফুলে লাল হয়ে আছে। রাধিয়ার আচলে কয়েকটি কড়ি আর খই পুঁটলি করে বাঁধা। পাশে একটা মাটির কলসী, জলে ভরা।

ফটকের আলো নিভে গেল। জেলখানার মাঝখানে একটা গাছের মাথায় সারারাত যে নতুন আলোর ছটা লেগেছিল, সে আলোও নিভেছে, রাধিয়া দেখতে পায়।

ফটকের ভিতর দিয়ে লোক আসা-যাওয়া করছে। ভোরের কাকের দল শব্দ করে পুব আকাশের দিকে ছুটেছে।

—সীতারাম! সীতারাম! সীতারাম! মানুষের বুক থেকে একটা আর্ত মন্ত্রের শব্দ ছিটকে বের হয়ে জেলখানার বাতাসে ছুটাছুটি করে বেড়াচ্ছে। শুনতে পায় রাধিয়া।

জলের কলসী হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল রাধিয়া। তারপরেই ফটকের দিকে এগিয়ে চললো।

সীতারাম! সীতারাম! সীতারা…।

এক অদৃশ্য সেতারের তার হঠাৎ ছিঁড়ে গেল! হুমম্—হ্যাঁচকা টানে একটা ভাষাহীন বোবা যন্ত্রণা যেন নিমেষের মধ্যে পৃথিবীর বুকের ভিতর ঢুকে পড়ল। শুনতে পায় আর বুঝতে পারে রাধিয়া।

ফটকের কাছে একটা গরুর গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল লাস নিয়ে যাবার জন্য। রাধিয়া ফটকের কাছে এসে দাঁড়াতেই সান্ত্রী বলল—বসো, চুপ করে বসো, লাস আসছে।

লাস এল, কম্বলে জড়ানো গিরধারী।

রাধিয়া বললো—কম্বল সরাও। আমি ওকে একবার দেখব।

ডোমেরা কম্বলের ঢাকা সরিয়ে দিতেই চমকে কপালে হাত দিয়ে এক ঠাঁয় দাঁড়িয়ে রইল রাধিয়া। গিরধারীর আধ হাত লম্বা জিভ আর দড়ির মতো লিক্লিকে গলাটার দিকে রাধিয়া তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। কাপড়ের আঁচল দিয়ে চোখ দুটো জোরে জোরে ঘষে নিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে আস্তে আস্তে বলতে থাকে রাধিয়া—মাপ কর, তোমাকে বাঁচাতে পারলাম না, মাপ কর।

তারপর চারদিকে তাকায় রাধিয়া। যেন সমস্ত পৃথিবীকেই ধিক্কার দেবার জন্যে চেঁচিয়ে উঠল রাধিয়া—ছি ছি, হায় হায়, ফাঁসিওয়ালারা কী ভয়ানক শয়তান গো! একি চেহারা করে দিয়েছে গো! এর চেয়ে আমার বিষের হালুয়া যে ঢের ভাল ছিল গো!

বলতে বলতে কেঁদে ফেললো রাধিয়া।

—কি বলছে? কি বলছে? ওয়ার্ডারেরা একে একে সবাই এসে রাধিয়াকে ঘিরে দাঁড়াল।

এক আছাড় দিয়ে জলের কলসটা ফটকের সামনে ফাটিয়ে দিল রাধিয়া। আঁচল থেকে কড়ি আর খই বের করে গিরধারীর লাসের উপর ছিটিয়ে দিল।

শেষ ব্রত সাঙ্গ হয়েছে রাধিয়ার। রাধিয়া আর ফিরে তাকাল না। ওয়ার্ডারদের পাশ কাটিয়ে দৌড়ে চলে যায় রাধিয়া।

ওয়ার্ডারেরা দৌড়ে এসে রাধিয়াকে ঘিরে ধরে—দাঁড়াও, পালিয়ো না।

রুষ্টা বাঘিনীর মতো হিংস্র দৃষ্টি তুলে রাধিয়া তাকায়। প্রশ্ন করে—কেন?

ওয়ার্ডার বলে—তোমাকে পুলিশের হাতে দিতে হবে।

রাধিয়া—কি দোষ করলাম?

ওয়ার্ডার—তুমি তোমার স্বামীকে বিষ খাওয়াতে এসেছিলে।

রাধিয়া চিৎকার করে কাঁদতে থাকে—তাতে তোদের কি রে? আমি তো আমার স্বামীকে ফাঁসি থেকে বাঁচাতে এসেছিলাম রে!

মধুরেণ সমাপয়েৎ

জায়গাটার নাম যোগিবন। এখানে কোন যোগী মানুষ অবশ্য নেই, কিন্তু বন আছে অনেক। কোনকালে হয়তো কোন যোগী এখানে ছিলেন। কিন্তু কেমন করে যে ছিলেন, সেটা কল্পনা করেও বুঝতে চেষ্টা না করাই ভাল। আজও এখানে কোন মানুষ রাত্রিকালে কোন গাছের তলায় পাঁচ মিনিট দাঁড়িয়ে থাকতে সাহস করবে না। জঙ্গলের ভালুক সন্ধ্যা হতেই রেল লাইনের সিগন্যালের খুঁটির কাছে চুপ করে বসে থাকে। ডাকবাংলোর হাতার সূর্যমুখীর ঝোপের কাছ থেকে একজোড়া জ্বলন্ত সবুজ চোখ হঠাৎ একটা লাফ দিয়ে ছুটে পালিয়ে যায়। এই যোগিবনে এখন বহু অযোগী মানুষের গৃহ ও গৃহস্থালী আছে। জঙ্গলের গা ঘেঁষে একটা বস্তিও আছে। সে বস্তিতে সন্ধ্যাবেলা মাদলও বাজে; আর এখানে-ওখানে ছোট ছোট বাড়িতে জাগন্ত জীবনের প্রদীপও জ্বলে। মাটির দেয়াল আর খাপরার চালা, ছোট ছোট বাড়ি। কিন্তু সেজন্য এই যোগিবনের চারদিকের ভয়ানক বন্যতা একটুও বিচলিত হয় না। রাতের নেকড়ে একেবারে ঘরের দুয়ারের কাছে এসে বসে থাকে। আখের ক্ষেতের কাছে যেখানে কুঁয়োর জল একটা গর্তের মধ্যে দু'চারটে রোগা ব্যাঙ নিয়ে ছুপছুপ করে, একটু রাত হলেই সেখানে হায়নার তেষ্টার জিভ চক্ চক্ শব্দ করে জল খায়।

হ্যাঁ, ছোট ছোট পাহাড়গুলিকে যোগী বলেই মনে হয়। যেমন দুপুরে তেমনই বিকালে ও সন্ধ্যায়, আর চাঁদের আলো থাকলে রাতের বেলাতেও এইসব ছোট-ছোট পাহাড়ের দিকে চোখ পড়লে মনে হবে, ভয়ানক কঠোর ও অবিচল এক-একজন যোগী বসে রয়েছেন।

এই নিদারুণ বন্যতার বুকের ভিতরেও কিন্তু মানুষের কাজ চলতে থাকে। সকাল থেকে বিকেল, ব্যস, তারপর আর নয়। জঙ্গলের ভিতরে পাথরের খাদের কাছে আগুন জ্বালিয়ে রাত কাটায় পাথর-কাটা জংলী কুলীর দল। পালা করে জাগে, আর পালা করে ঘুমোয়। জঙ্গলের বাঁশ কাটবার জন্যে যে ঠিকেদার তার মোটর ট্রাক আর লোকজন নিয়ে সকালবেলাতে জঙ্গলে ঢোকে, সেও সন্ধ্যার আগেই ফিরে আসে। রেলের সাইডিং-এর কাছে বাঁশের টাল নামিয়ে দিয়ে ঠিকেদারের মোটর ট্রাক তিরপাল মুড়ি দিয়ে সারা রাত পড়ে থাকে। সে তিরপালের গায়ে রাতের নেকড়ের নখের আঁচড়ের শব্দ শুনে আশ-পাশের দশটা ট্রাকের মানুষ হল্লা করে নেকড়ে তাড়ায়।

এহেন যোগিবনে গৃহ গৃহস্থালী ও গৃহিণী নিয়ে একজন নিতান্ত বাঙালী ভদ্রলোকও থাকেন, যাঁর নাম বিজয় বসু। এক পাথর সাপ্লাই কোম্পানীর চালানবাবু হলেন এই বিজয় বসু। কোম্পানীর হেডঅফিস কলকাতায়। ছ'মাসে ন'মাসে হেডঅফিস থেকে কোন একজন সুপারভাইজর আসেন। চালানবাবুর কাজের রকম-সকম দেখে আর পাথরকাটার কাজের অসুবিধের কথা জেনে নিয়ে আবার কলকাতাতে ফিরে যান।

স্টেশনে গিয়ে ওয়াগনের বন্দোবস্ত করা, সাইডিং-এ ঘুরে ঘুরে ওয়াগনের পাথর বোঝাইয়ের কাজ শুধু একবার চোখে দেখে নেওয়া, আর ঠিকাদারের খাতাতে হিসেবের অংকগুলিকে একবার পরীক্ষা করে নিয়ে সই দেওয়া ; এ ছাড়া চালানবাবুর চাকরিতে আর কোন দায়িত্বের ঝঞ্ঝাট নেই। তাই চালানবাবু বিজয় বসু অনায়াসে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে একজন নতুন আগন্তুকের সঙ্গে পুরো একটি ঘণ্টা গল্প করতে পারেন। ডাকবাংলোতে গিয়ে নতুন অভ্যাগতের পরিচয় জানতে পারেন। সুবিধে বুঝলে দু'এক ঘণ্টা গল্পও করে নেন। দিনে একবার ট্রেন আসে আর চলে যায়, এহেন স্টেশনে নতুন আগন্তুকের ভিড় নেই। যারা আসে, তাদের বেশির ভাগই কাছাকাছি দশ বারোটা জংলী গাঁয়ের মানুষ। তাদের হাতে তীর-ধনুক, কাঁধে একটা পুঁটলি, তার ভিতরে হয়তো এক-আধসের নুন আছে আর আছে কিছু শুকনো মহুয়া ফল। ট্রেন এলেই বিজয় বসুর চোখের দৃষ্টিটা একটু বেশী উৎসুক হয়ে ছটফট করে দেখতে চেষ্টা করে, কোন বাঙালী ভদ্রলোক এলেন কিনা।

ক্বচিৎ কখনও বাঙালী ভদ্রলোক আগন্তুকের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। আর বিজয় বসুও ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। নিজেই এগিয়ে গিয়ে আগন্তুক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করেন। তারপর বিজয় বসু তাঁর আসল ইচ্ছার কথাটা বেশ জোর করে বলে দেন। —তা কী হয়, আপনি ডাকবাংলোতে থাকবেন কেন? এখানে আমার বাড়ি থাকতে কোন বাঙালী ভদ্রলোক ডাকবাংলোর অতিথি হবেন, এটা কী ভাল দেখায়?

আগন্তুক ভদ্রলোক অনেক আপত্তি করেও শেষপর্যন্ত বিজয় বসুর অনুরোধের কাছে নতি স্বীকার না করে পারেন না। আগন্তুক ভদ্রলোক যে দুটো-তিনটে দিন বিজয় বসুর বাড়িতে অতিথি হয়ে থাকেন, সেই দুটো-তিনটে দিন যেন বিজয় বসুর

বাড়ির জীবনের একটা উৎসব। বাড়ির সবাই ব্যস্ত হয়ে ওঠে। বিজয় বসুর স্ত্রী শোভনা বসু কাঁচা পেঁপের ডালনা রাঁধেন। বিজয় বসু খোঁজ করেন, জঙ্গলের নালার জল থেকে অন্তত কিছু কুচো মাছ কাউকে দিয়ে ধরিয়ে আনতে পারা যায় কি না। বিজয় বসুর বড় মেয়ে টুলি, যার বয়স দশ বছর, সে'ও আগন্তুক ভদ্রলোকের কাছে মাঝে মাঝে ছুটে আসে আর জিজ্ঞেস করে—সুপুরি খাবেন?

আজ ট্রেন থেকে যিনি নমেলেন, যাঁর নাম বি দত্ত, তিনি কিন্তু কিছুতেই বিজয়-বাবুর অতিথি হতে রাজি হলেন না। ইনি বিজয়বাবুর কাছে আজ অবশ্য একজন অপ্রত্যাশিত হঠাৎ-আবির্ভাব নন। ইনি ওই পাথর কোম্পানীর কলকাতা অফিস থেকে আসছেন। ইনি হলেন, সুপারভাইজর বি দত্ত।

উপরওয়ালা মানুষ যেভাবে খুশি হয়ে কথা বলেন, দত্তবাবুও ঠিক সেই ভাবে খুশি হয়ে বিজয়বাবুকে জানিয়ে দিলেন—ধন্যবাদ, কিন্তু আমি ডাকবাংলোতেই থাকবো।

বিজয়বাবু—আমার ওখানে থাকলে আপনার খুব বেশি অসুবিধে হবে না স্যার।

দত্তবাবু—হবে। আপনি বোধহয় সেটা বুঝতে পারছেন না।

বিজয়বাবু—কিন্তু ডাকবাংলোর খাওয়া-দাওয়া, অদ্ভুত রান্না, আর খানসামাটার কাণ্ড; এসব কি আপনার সহ্য হবে?

—হবে।

—খানসামাটা কিন্তু কানে শুনতে পায় না, স্যার।

হেসে ফেলেন দত্তবাবু—আমি তো এখানে গান গাইতে আসিনি যে, ভাল কান-ওয়ালা একটা খানসামা দরকার হবে। দু'বেলা মুরগী-ভাত করে দেবে, ব্যস, তাহলেই হয়ে গেল।

—এটা অবিশ্যি ঠিক বলেছেন স্যার; আমার ওখানে মুরগী-ভাতের ব্যবস্থা করা খুবই কঠিন।

—তবে আর এত পীড়াপীড়ি করছেন কেন?

—আমাদের খুব ভাল লাগতো, সেই জন্যেই আপনাকে অনুরোধ করে বিরক্ত করছি।

—থাক এসব কথা। আপনি খাতাপত্র নিয়ে ডাকবাংলোতে কখন আসছেন?

—যখনই আসতে বলবেন।

—আজ রাত্রিতে আসুন।

—রাত্রিতে হবে না স্যার। এখানে সন্ধ্যা হলেই নেকড়ে ঘুরে বেড়ায়, আর, একটু রাত হলে আরও বড় জিনিস ঘুরঘুর করে।

হেসে ফেলেন দত্তবাবু।—তাহলে আজ বিকালেই আসুন।

বিজয়বাবু—যে আজ্ঞে।

সুপারভাইজার বি দত্ত দেরি না করে ডাকবাংলোর রাস্তায় এগিয়ে গেলেন; আর বিজয় বসু চলে গেলেন তাঁর নিজের বাড়ির দিকে, স্টেশন থেকে সামান্য একটু দূরে; পেঁপে গাছের একটা ভিড়ের কাছে যে বাড়ির খাপরার চালার উপর এখন

একটা পাহাড়ী ময়না বসে রয়েছে।

দুই

মুরগী ভাত খেয়ে নিয়ে, ডাকবাংলার ঘরের একটা জানলার কাছে বসে যোগিবনের চারদিকের ভয়ানক বন্যতার রূপ দেখতে থাকেন দত্তবাবু। বন্দুকটা নিয়ে এলেই ভাল হতো। এই যে রাস্তাটা, এটাও যেন একটা অদ্ভুত বন্যতা। এই দুপুরেও একেবারে জনহীন।

চমকে ওঠে দত্তবাবুর দুই চোখ। একটা বাচ্চা মেয়ের হাত ধরে আর আস্তে আস্তে হেঁটে স্টেশনের দিকে চলে যাচ্ছেন যে মহিলা, সে যে একজন খাঁটি বাঙালী মহিলা। বাঙালী মহিলা না হলে কি কোন মহিলা ঠিক ওভাবে শাড়ি পরে? মহিলার হাতে কয়েকটা চিঠি। বুঝতে অসুবিধে নেই, স্টেশনের ডাক-বাক্সে চিঠি ফেলবার জন্যে মহিলা তাঁর মেয়ের হাত ধরে, আর যেন এই শীতের দুপুরের রোদে একটু বেড়িয়ে নেবার আনন্দ নিতে এখন বের হয়েছেন। এখানে তো সন্ধ্যা হলেই নেকড়ে ঘোরে, তাই বোধহয় দুপুরে বিকেলে বেড়িয়ে নেওয়া এখানকার নিয়ম।

মহিলা হেসে হেসে তাঁর মেয়েকে কী যেন বলছেন। এইবার মহিলার মুখটাকে একেবারে স্পষ্ট করে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। সুপারভাইজার দত্তবাবুর দুই চোখ এইবার যেন দুঃসহ একটা বিস্ময়ের ঝড়ের মধ্যে পড়ে ছটফট করতে থাকে, সত্যিই কি শোভনা? এই পৃথিবীতে এত জায়গা থাকতে শোভনা শেষে এই ভয়ানক বন্যতার যোগিবনে এসে ঠাঁই পেয়েছে?

দত্তবাবুর দুই চোখ যেন পনের বছর আগের চোখ হয়ে এক পরিচিতার মুখ দেখছে। হ্যাঁ, সেই শোভনা, যার পনের বছর আগের সেই প্রাণটা এই বিলাস দত্তের জন্য আকুল হয়ে উঠেছিল। রাঁচিতে বিলাস দত্তের বাড়ি যে-পাড়াতে, সেই পাড়াতে একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকতেন যে প্রতুল ঘোষ, তাঁরই মেয়ে শোভনা। মাড়োয়াড়ীর কাপড়ের দোকানের কেরাণী প্রতুল ঘোষের মেয়ে শোভনা সেদিন বিলাস দত্তের কাছ থেকে যেন একটা সান্ত্বনার কথা শোনবার জন্যে মরিয়া হয়ে কত কাণ্ডই না করেছিল। বিলাসের বাড়িতে নিজেই গিয়ে বিলাসের বোনের হাতে উপহার দিয়ে এসেছে শোভনা, নিজের হাতে রঙীন সুতোর কাজ করা একটা টেবিল ক্লথ। বিলাসের বুঝতে অসুবিধে হয়নি, কা'কে লক্ষ্য করে এই উপহার দিয়ে গেল শোভনা। যখন-তখন এসেছে শোভনা; বিলাসের ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়ে কথা বলেছে, কেমন আছেন? নিজের হাতের তৈরী খাবার কতবার নিয়ে এসেছে; কখনও ঢাকাই পরোটা, কখনও নারকেলপুলি। বিলাসের জন্মদিনে মস্ত বড় একটা ফুলের তোড়াও পাঠিয়েছিল শোভনা। আজও মনে পড়ে বিলাস দত্তের, শোভনার সেই বারবার ছটফটে যাওয়া-আসা আর উপহারের রকম দেখে বিলাসের বাড়ির সকলেই একটু চিন্তিত হয়েছিল। শোভনা নিশ্চয় জানে না যে, বিলাসের বিয়ে একরকম ঠিক হয়েই আছে। আর বিলাসও একরকম ধরেই নিয়েছে যে, পাট-

নায় ডাক্তার জনার্দনবাবুর মেয়ে রেবার সঙ্গে বিলাসের বিয়ে হবে। পুরো একটা বছর বিলাসের জন্য মনেপ্রাণে একটা আশা জাগিয়ে রেখে, তারপর নিরস্ত হয়েছিল শোভনা। কে জানে কেন হঠাৎ দমে গেল শোভনা। বিলাসদের বাড়িতে ছ'মাসের মধ্যেও যখন শোভনাকে আসতে না দেখে খোঁজ নিয়েছিল বিলাসের বোন সুজয়া, তখন জানতে পেরে একটু আশ্চর্য হয়েছিল, যেমন সুজয়া তেমনি বিলাস, মাত্র এক সপ্তাহ হলো শোভনারা চলে গিয়েছে।

রাস্তাতে আর সেই ছবি নেই। শোভনা তার মেয়ের হাত ধরে স্টেশন থেকে আবার কোন্ পথে চলে গেল কে জানে? কিন্তু ও কী সত্যিই শোভনা?

খাতাপত্র হাতে নিয়ে ডাকবাংলোর বারান্দাতে এসে দাঁড়িয়েছেন বিজয় বসু।
—আমি এসেছি স্যার।

—আসুন। আচ্ছা একটা কথা। আপনি বিয়ে করেছেন কোথায়?

বিজয় বসু—চন্দননগরে।

চমকে উঠলেন দত্তবাবু, তবু হাসেন—শুধু চন্দননগর বললেই তো সব বলা হলো না।

বিজয়বাবু—আমার শ্বশুর মশাইয়ের নাম প্রতুল ঘোষ। উনি চিরকাল বাইরে বাইরে, ধানবাদ, রাঁচি, টাটানগরে কাজ করে শেষে চন্দননগরে এসে দেহরক্ষা করলেন।

অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন দত্তবাবু। একটা খাতা হাতে তুলে নিয়ে আনমনার মত জানালার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

বিজয়বাবু—আপনার খাওয়া-দাওয়া হয়ে গিয়েছে তো স্যার?

দত্তবাবু হাসেন—হ্যাঁ, হয়েছে, কিন্তু খুব শিক্ষা হয়ে গিয়েছে।

—আজ্ঞে?

—এ মুরগী তো মুরগী নয়, যেন শকুন। যেমন চিমসে, তেমনই শক্ত। দাঁতে ছেঁড়ে কার সাধ্যি?

—এঃ, তা হলে তো খুব দুঃখের ব্যাপার হলো।

—তার উপর ঝাল, শুকনো লংকা গুলে দিয়েছে।

—সর্বনাশ!

—তা ছাড়া, আপনাদের ডাকবাংলোর এই নেয়ারের খাট তো খাট নয়, ছারপোকার কলোনি। জিরোবার জন্য একটু শুয়েছিলাম মশাই, কিন্তু এক মিনিট পরেই লাফিয়ে উঠতে হলো। শোয়া তো নয়, একেবারে ভীষ্মের শরশয্যা।

বিজয়বাবু আবার আক্ষেপ করেন।—এঃ, আপনার তো এখানে তাহলে খুবই কষ্ট হচ্ছে। কী করে আরও দুটো দিন কাটাবেন?

দত্তবাবু—তাই তো ভাবছি। তার ওপর আপনি আবার যে-ভয় দেখিয়ে রেখেছেন।

—আজ্ঞে? কিসের ভয় দেখালাম!

—ওই যে বললেন, সন্ধ্যা হতেই যত নেকড়ে-টেকড়ে আর রাত হতেই আরও বড় জিনিস……।

বিজয়বাবু হাসেন—কিন্তু ডাকবাংলোর ঘর-দরজা তো সবই পাকা আর মজবুত; ভয় করবার কিছু নেই

দত্তবাবু—তার ওপর একটা সমস্যা হচ্ছে, এই বধির খানসামা। চেঁচিয়ে ডাকলেও কোন সাড়া দেয় না। চেয়েছিলাম একটু গরম জল; দিয়ে গেল একটা লেবু আর কুচানো পেঁয়াজ।

বিজয়বাবু হাসেন—আপনি তাহলে একটা বিপদেই পড়েছেন, দেখছি।

দত্তবাবু—আরও দেখুন, এই ডাকবাংলোতে এখন একটিও গেস্ট নেই। একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে যে এক-আধ ঘণ্টা মনের সুখে গল্প করবো, তারও উপায় নেই। নাঃ, ভাবছি আপনার ওখানেই চলে যাব, বিজয়বাবু।

বিজয়বাবু—আমাকে বড় লজ্জায় ফেললেন; আমার বাড়ির বাইরের ঘরে তো এখন আপনার জন্যে সামান্য একটু স্থান করে দেবারও উপায় নেই। আজ স্টেশনমাস্টার মশাইয়ের তিন শ্যালিকা এসেছেন। তাঁদের সঙ্গে পাঁচটি ছেলেমেয়েও আছে। মাস্টারমশাইয়ের বাড়িতে বলতে গেলে শুধু একটা ঘর; কাজেই মাস্টারমশাইয়ের কুটুম্বিনীদের আজ আমারই বাড়ির বাইরের ঘরে থাকতে হবে।

দত্তবাবু এবার বেশ একটু চিন্তিতভাবে কথা বলেন—এখানে আমার খাওয়া দাওয়ারও তো খুব অসুবিধে হচ্ছে। দরকার নেই মশাই মুরগী-ভাত, আপনি আমাকে একটু ডাল-ভাত খাওয়ান। এখানে বাঙালীর বাড়ির একটু সুক্তো ঘণ্ট আর ছেঁচকি খেতে পেলে ধন্য হয়ে যাব।

বিজয়বাবু—নিশ্চয় নিশ্চয়। কাল দুপুরবেলাটা তাহলে আমার ওখানেই ডাল-ভাত খাবেন।

দত্তবাবু—খাতাপত্র আজ থাকুক। এখন আর হিসেব করতে মন চাইছে না। আপনি বরং বাড়ি যান। আর, আমি এখানেই…কী আর করবো, চুপ করে যোগীর মত বসে থাকি।

চলে যাচ্ছিলেন বিজয়বাবু, কিন্তু দত্তবাবু ডাকলেন—শুনছেন।

বিজয়বাবু—কী?

দত্তবাবু—আপনি বোধহয় শুধু জানেন যে, আমি হলাম বি দত্ত। আমার পুরো নামটা জানেন কি?

বিজয়বাবু—না।

দত্তবাবু—আমার নাম বিলাস দত্ত।

বিজয়বাবু হাসেন—আমার কাছে বি দত্ত যা, বিলাস দত্তও তা। আমি তো ভুলতে পারি না যে, আপনি আমাদের সুপারভাইজর। আপনাকে তো আমি নাম ধরে ডাকতে পারি না, স্যার।

দত্তবাবু হাসেন—ঠিক কথা। আমি বলছি এই কারণে যে, কেউ হয়তো হঠাৎ

আপনাকে জিজ্ঞেস করতে পারে, বি দত্তের পুরো নামটা কী ?

বিজয়বাবু—আচ্ছা, আমি এখন চলি। কাল দুপুরে আমিই এসে আ". ডেকে নিয়ে যাব।

তিন

বিজয় বসুর বাইরের ঘর। স্টেশন মাস্টারের কুটুম্বিনীরা, যাঁরা কাল রাতে এ-ঘরে ছিলেন, তাঁরা চলে গিয়েছেন। আজ এখন এই ঘরটি একটি পরিচ্ছন্ন অভ্যর্থনার ঘর। একটি তক্তপোষের উপর নতুন সতরঞ্চি পাতা। ছোট একটা টেবিল, তার উপরে রঙীন সুতোর কাজ করা একটা সাটিন কাপড়ের ঢাকা। টেবিলের উপর চীনেমাটির একটা ফুলদানি, তার মধ্যে টাটকা ফুলের একটা গুচ্ছ।

ঘরে ঢুকেই বেশ প্রসন্নভাবে হাসতে থাকেন সুপারভাইজার বিলাস দত্ত—বাঃ, চমৎকার ফুল।

বিলাস দত্তের চোখে যেন পনের বছর আগের এক অভ্যর্থনার বিস্ময় চিকচিক করে হাসতে থাকে। সে অভ্যর্থনা এখনও যে সত্যিই টাটকা ফুলের গুচ্ছ হয়ে বিলাস দত্তের চোখের সামনেই এসেছে। আশ্চর্য হয়ে ভাবতে থাকেন, আর ভাবতে গিয়ে ফুলদানির গায়ে হাত বোলাতে থাকেন বিলাস দত্ত; শোভনা যে সত্যিই আজও তার পনের বছর আগের আশার মানুষটাকে ভুলে যেতে পারেনি।

ঘরের দরজার দিকে তাকালেন বিলাস দত্ত। আজ কী কথা বলবে শোভনা, যখন এই দরজার কাছে এসে দাঁড়াবে আর বিলাস দত্তকে দেখতে পাবে ? সেই শোভনা, যে প্রতি মাসে অন্তত তিনবার বিলাস দত্তের রাঁচির বাড়িতে ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে আর জিজ্ঞেস করেছে, কেমন আছেন ? আজও শোভনার এই জিজ্ঞাসার জবাবে বলে দিতে পারবেন বিলাস দত্ত, আমি ভাল আছি, কিন্তু তুমি কেমন আছ, শোভনা ?

কিন্তু অনেকক্ষণ তো হয়ে গেল। বাড়ির ভিতরে শুধু বিজয়বাবুর হাঁক-ডাক শোনা যাচ্ছে। শোভনা কি এখনও জানতেই পারেনি যে, সেই বিলাস দত্ত এখন এই ঘরে বসে রয়েছে। শোভনা কি স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছিল যে, তার পনের বছর আগের একজন ভালবাসার মানুষ আজ এতদিন পরে এই জঙ্গলে ঘেরা যোগিবনে এসে তারই সমাদরের অতিথি হবে ?

ঘরে ঢুকলেন বিজয়বাবু—আর দেরি নেই, স্যার। হঠাৎ দুটো বেগুন পেয়ে গিয়েছি, তাই বললাম, ভাজা করে দাও। ভাজা হয়েও গিয়েছে।

বিলাস দত্ত—ভাজা-টাজা না হলেও চলতো। আমিও ভাজার অপেক্ষায় বসে সময় নষ্ট না করে, দুটো কথা বলে সময় নষ্ট করতেই ভালবাসি। কিন্তু কেউ তো এখনও...... ।

বিজয়বাবু—আজ্ঞে ?

বিলাস দত্ত—আপনার গৃহিণী নিশ্চয় সেকেলে ধরনের মানুষ নন।

বিজয়বাবু—ঠিক উল্টো। বড় বেশি একেলে। কোন লজ্জা-টজ্জার ধার ধারে না। মাঝে মাঝে আমার সাইকেলটা নিয়ে নিজেই চালিয়ে স্টেশনে চলে যায় আর ডাকের চিঠি ফেলে দিয়ে আসে।

বিলাস দত্তের চোখের তারা চমকে ওঠে আর ছটফট করে।—বলেন কি? যাই হোক্, গৃহিণীকে এখন বলুন, আমি দুটো ডাল-ভাত খেয়ে নিয়ে সরে পড়তে চাই। ভাজা না হলেও চলবে।

বিজয়বাবু হাসেন—বেগুন ভাজবে আমার মেয়ে টুলি। গৃহিণী এখন স্টেশন-মাস্টারের বাড়িতে তাঁর একদিনের চেনা বান্ধবীদের সঙ্গে গল্প করতে ব্যস্ত রয়েছেন।

—অ্যাঁ? উনি এখন বাড়িতে নেই?

—না।

—উনি কি জানেন না যে, আজ একজন অতিথি তাঁর বাড়িতে আসবেন?

—জানেন বইকি। কিন্তু মাস্টারমশাইয়ের কুটুম্বিনীরা আজই চলে যাবেন। তাই তাদের সঙ্গে শেষ গল্প করে নিতে চলে গেলেন।

—উনি কি জানেন না যে, বি, দত্ত মানে বিলাস দত্ত?

—জানেন বইকি। আমিই তো বলে দিয়েছি।

বিলাস দত্ত আমার হঠাৎ আনমনার মত টেবিলের ফুলদানির দিকে তাকিয়ে থাকেন। তারপর একটা কথা যেন তাঁর মনের হঠাৎ-আকুলতার ভাষার মত মুখ থেকে বের হয়েই পড়ে। উনি ঘরে না থাকলেও ঘর ব্যবস্থা বেশ ভালমত করে রেখে দিয়েছেন, দেখছি।

বিজয়বাবু—আজ্ঞে, কী বললেন?

বিলাস দত্ত—টাটকা ফুলের তোড়াকে সাজিয়েছেন ভাল। ফুল আর পাতা এভাবে কায়দা করে মিশিয়ে দিয়ে……।

বিজয়বাবু—ফুলের তোড়া আমিই বেঁধেছি। এটা আমার পুরণো অভ্যেস।

বিলাস দত্তের চোখ দুটো হঠাৎ কুঁচকে যায়—তাই নাকি? কিন্তু এই টেবিল ক্লথের রঙীন সুতোর কাজ তো আপনার হাতের কাজ নয়। এটা নিশ্চয় আপনার স্ত্রীর হাতের একটা চৎমকার কাজ।

বিজয়বাবু—না না না, এটা আমার বাড়ির জিনিসই নয়। এটা স্টেশনমাস্টারের বাড়ি থেকে আমি আনিয়েছি।

বিলাস দত্ত—কেন? আপনার বাড়িতে কি কোন টেবিল ক্লথ নেই?

বিজয়বাবু—অনেক অনেক আছে। কিন্তু গৃহিণীই বললেন, স্টেশনমাস্টারের বাড়ি থেকে একটা টেবিল ক্লথ আনিয়ে নাও।

গম্ভীর হয়ে গেলেন সুপারভাইজার বিলাস দত্ত। খুব গম্ভীর। যোগিবনের জঙ্গলের বাতাসে সত্যিই ভয়ানক বন্যতা আছে, এখানে এসে চাঁপা ফুলও বোধহয় ধুতরাফুল হয়ে যায়।

বিজয়বাবু ডাকলেন—হরিরাম, জলদি কর।

াধময়লা খাটো ধুতি পরা, চাকর হরিরাম এসে ঘরে
ক গেলাস জল রেখে যায়।
ন্তকে খেতে বসতে ইঙ্গিত করেই চলে যান বিজয়-
তের থালা হাতে নিয়ে ঘরে ঢোকেন। ভাতের
বিজয়বাবু আবার একটা থালায় চারটে বাটি নি৲
। ডালনা, বেগুন ভাজা আর আলুর দম।
থাকেন বিলাস দত্ত। কিন্তু খেতে গিয়ে অদ্ভুত রকমের
কন। গরম ডালের বাটিতে মিছিমিছি হাতটাকে
টা। আলুর দম পাতে ঢেলে তার উপর একটা বেগুন
গ্রাস ভাত মুখে দিয়ে তিনবার জল খান বিলাস দত্ত।
ডালনাটা ফেলে দেবেন না, স্যার। খেয়ে দেখুন, আপ-
ঘি-ফোড়ন দিয়ে ডালনা করা হয়েছে, খাঁটি গাওয়া ঘি!
ার রান্নার হাত তো বেশ ভালই মনে হচ্ছে।
রিরাম রেঁধেছে। আমার স্ত্রী এরকমের একটা আধা-
ান্না শিখিয়ে ছেড়েছে। বলতে বলতে শেষে হেসেই

; দুপুরবেলার এমন চনমনে ক্ষুধার মুখটাও যেন বিস্বাদে
। বিলাস দত্ত।
একবার উঠে গিয়ে এক বাটি পায়েস নিয়ে আসেন আর
রেখে দিয়ে, আর খুবই বিনীতভাবে কথা বলেন—
আমার স্ত্রী অবিশ্যি……।
ত্তর দুই চোখ—তাই বলুন, আর কিছু করতে না পেরে
সটুকু নিজের হাতে তৈরী করতে পেরেছেন আপনার

এই পায়েস স্টেশনমাস্টারের স্ত্রী আমাদের জন্য পাঠিয়ে
য়েস, স্যার।
মুখে দিয়েই উঠে পড়লেন বিলাস দত্ত। তাড়াতাড়ি
আর ঘরের ভিতরের তক্তপোষের উপরও বসলেন না।
ডাক দেন বিলাস দত্ত—আমি চলি।
—এখনই যাবেন?

বশ কষ্ট হলো, স্যার।
দুটো কেঁপে ওঠে; মুখ থুবড়ে পড়ে যাওয়া মানুষ মাথা
টো যেমন করুণ হয়ে কাঁপে আর জ্বলে। হঠাৎ চেঁচিয়ে
বশ কষ্ট হয়েছে। আমি এখন, চলি।